সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

কারওয়ানে যিন্দেগী

(১ম খণ্ড)

ইয়াহিয়া ইউসুফ নদভী
ও
মাওলানা আবু কাওছার
অনূদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

কারওয়ানে যিন্দেগী-১ম খণ্ড

মূল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ ঃ ইয়াহিয়া ইউসুফ নদভী
ও
মাওলানা আবু কাওছার

প্রকাশকাল
৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী
পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ; রবিউল আউয়াল, ১৪৩৭ হিজরী

গ্রন্থস্বত্বঃ প্রকাশক

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাঃ 01822-806163; 01728-598440

মুদ্রণে : মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
সালসাবিল

ISBN: 978-984-91840-0-3

মূল্য : ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র

Karwaney Zindegee - Vol-1.: Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvee (R) in Urdu and translated by Yeahia Yousuf Nadvee & Moulana Abu Kawsar into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, M/s Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka - 1100. BANGLADESH
Cell : 01822-806163 Price Tk. 400/- & U S $ 4.00 only

(17) کاروانِ زندگی اول از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: یحیٰ یوسف ندوی اور مولانا ابوکوثر

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

উৎসর্গ

'মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত
দা'ঈ ও মুবাল্লিগ, মশহুর বুযর্গ,
আমাদের রূহানী উস্তাদ, মুফাক্কির-এ ইসলাম
আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর
অমর রূহের ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে– যিনি ১৯৯৯ সালের
৩১ ডিসেম্বর/২২ রমযান শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন
শরীফের সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর আহ্বানে
তাঁর প্রিয় সান্নিধ্যে গমন করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

প্রকাশকের কথা

আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বিশ্বখ্যাত ও জননন্দিত এক মনীষী ও বরেণ্য ইসলামী দা'ঈ। মেধা ও মননের বহুমাত্রিকতা তাঁর আলোকিত জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আরবী সাহিত্যিক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষক ও সীরাত গবেষক হিসেবে গোটা দুনিয়ায় রয়েছে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি। জীবদ্দশায় তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বহু এলাকা পরিভ্রমণ করেন। কেবল পর্যটন নয় বরং দাওয়াতী মেহনত, শিক্ষাবিষয়ক ও ধর্মতাত্ত্বিক সেমিনারে অংশগ্রহন ছিলো এসব সফরের উদ্দেশ্য। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণ ও জীবন অভিজ্ঞতার নির্ভরযোগ্য বিবরণ এবং মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ।

সাত খণ্ডে বিন্যস্ত কালোত্তীর্ণ এ গ্রন্থটিতে রয়েছে নানা জাতি-গোষ্ঠির জীবন ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ এবং ইসলামী সভ্যতা ও উত্তরাধিকার ঐতিহ্যের অনুপুঙ্খ ও আনন্দঘন পরিবেশনা। সর্বোপরি, বিজ্ঞ গ্রন্থকারের উপস্থাপনার নৈপুন্যশৈলী পাঠককে বিস্মিত ও শেকড়সন্ধানী করে তোলে। 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর প্রতিটি ছত্রে, প্রতি পাতায় লেখকের পাণ্ডিত্য ও সৃজন-সামর্থের অভিব্যক্তি লক্ষনীয়।

এ গ্রন্থটি বিশ্ববিশ্রুত আফ্রিকান পর্যটক ইব্‌ন বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮)-এর 'রিহ্‌লা' ও চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান (৩৩৭-৪২২) রচিত Memories of Eminent Monks-এর সমপর্যায়ের তো বটেই বরং নানা ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর আঙ্গিকে রচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও প্রতিভাসিত করেছে। বাংলাদেশে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ক্ষেত্রে এক অনন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নদভী (রহ.)-এর খিলাফতপ্রাপ্ত প্রিয়ভাজন আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)-এর উদ্যোগ প্রচেষ্টার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় তরজমা এটাই প্রথম। বেশ ক'জন বিজ্ঞ অনুবাদকের মাধ্যমে মার্জিত বাংলায় ভাষান্তর করে অনূদিত কপি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তা'য়ালার শোকরিয়া আদায় করছি। হযরত নদভী রহ.-এর

অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমাদের আয়াসাধ্যশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

অনেকের অনুরোধে বইটি দ্রুত প্রকাশের কারণে প্রথম সংস্করণে অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই প্রত্যাশা। আগামীতে আরো যত্নবান হয়ে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে বইটি প্রকাশের প্রয়োজনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য, আপনাদের আন্তরিক সহোযোগিতা ও দোয়া প্রার্থী।

আমার বন্ধুবর অধ্যক্ষ অশোক তরু একজন অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হযরত নদভী রহ.-এর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং উজ্জীবিত করেছে। জীবনের কঠিনতম সময়ে পাশে থেকে আমার বিশেষ অনুরোধে হযরত নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ সতর্কতার সাথে সেগুলো সংশোধন, পরিমার্জন ও সম্পাদনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

এ গ্রন্থ প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল ও কামিয়াবি করুন। আমিন!

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ ঈসায়ী, ঢাকা — মুহাম্মদ আবদুর রউফ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

ابوالحسن علی الحسنی الندوی
ندوۃ العلماء - لکھنؤ - الهند

Ref:

التاریخ: ١١ ربیع الاول ١٤١٨ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مجھے یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی کہ ڈھاکہ میں چند مخلص
و اہل علم حضرات نے دینی و اسلامی اور اصلاحی کتابوں کی تیاری
اور اشاعت کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے اسکے ذریعہ میری
کتابیں بھی شائع ہونگی، ان میں سے جن کتابوں کے ترجمہ کی ضرورت محسوس ہوگی
ترجمہ کر کے شائع کرینگے، ادارہ کا نام مجلس نشریات اسلام تجویز
ہوا ہے اور چاٹگام کے عالم دین مولانا سلطان ذوق صاحب ندوی
اور ڈھاکہ کے مولانا محمد علی صاحب اور مولانا سلمان صاحب اس ادارہ
کے ذمہ دار ہیں، میں ان حضرات کو اجازت دیتا ہوں کہ میری
جن کتابوں کو یہ مناسب سمجھیں ترجمہ کرا سکتے ہیں اور شائع کر سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور قبول
فرمائے آمین

ابوالحسن علی ندوی
ندوۃ العلماء لکھنؤ

١١/٣/١٤١٨ھ

بسم الله الرحمن الرحیم

Phones: 73864, 72336, 72338

Abul Hasan Ali Nadwi
P. O. BOX, No. 93, NADWATUL ULAMA,
LUCKNOW—226 007. U. P. (INDIA)

ابو الحسن علی الحسنی الندوی
ندوۃ العلماء - لکھنؤ - الہند

Ref:

التاریخ: ۱۸ ربیع الاول ۱۴۱۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

আমি এ কথা জানতে পেরে অত্যাধিক আনন্দিত হয়েছি যে, ঢাকার কিছু মুখলেছ আহলে ইল্‌ম হযরত ধর্মীয় ও ইসলামী এবং সংশোধিত ও সংস্কারমূলক কিতাব ছাপানো ও প্রচারণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তার মাধ্যমে আমার রচিত কিতাবও প্রকাশ করবেন। তার মধ্যে আমার যে কিতাবগুলো অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করবেন, অনুবাদ করে তা প্রকাশ করবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' (Academy of Islamic Publications) স্থির হয়েছে।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা সুলতান যওক নদভী সাহেব এবং ঢাকার মাওলানা ওমর আলী সাহেব ও মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব ঐ সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমি ঐ হযরতদেরকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তাঁরা আমার যে কিতাব গুলো উপকারী মনে করবেন, সেগুলো তরজমা করে প্রকাশ করতে পারবেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের প্রচেষ্টায় বরকত দিন এবং মঙ্গল করুন। আমিন!

আবুল হাসান আলী নদভী
নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ
ভারত

১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম

(Academy of Islamic Publications)

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ.................................. তারিখ..................................

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামী গ্রন্থের রচিয়তা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী বাংলাদেশে অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য একমাত্র 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে তাঁহার ১৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিজরী তারিখের এক পত্র দ্বারা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। 'মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম' গ্রন্থগুলি প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স', ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-কে শর্তাধীনে অনুমতি প্রদান করায় 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' গ্রন্থগুলি প্রকাশ ও বাজারজাত করিয়া আসিতেছে। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত রূপ অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে গ্রন্থগুলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার অবৈধ চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। কাজেই এই মর্মে সতর্ক করা যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অননুমোদিত ও বে-আইনীভাবে মাওলানা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. রচিত গ্রন্থগলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

'মজলিশ নাশরিয়াতে-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

১৫.০৬.০৫ইং

(আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী)

সাধারণ সম্পাদক

মজলিস নাশ্‌রিয়াত-ই-ইসলাম
(Academy of Islamic Publications)
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; বাংলাদেশ

সূত্রঃ.......................   তারিখ..........................

সংশ্লিষ্ট মহলের জ্ঞাতার্থে

বিশ্বখ্যাত ইসলামী দাঈ, মণীষী ও আধ্যাত্মিক রাহবার আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বাংলাদেশ সফরের পূর্বেই তাঁর রচিত কয়েকটি কিতাব 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এরপর অজ্ঞাত কারণে 'ইফাবা' কর্তৃপক্ষ তাঁর কিতাবগুলো প্রকাশে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

হযরত আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.-এর উদ্যোগে হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব ও আমি মুহাম্মাদ সালমান 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করি । এ সংস্থার মাধ্যমে ৯০ দশকের শেষের দিকে হযরতের 'নবীয়ে রহমত', 'হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া', 'ইসলাম-ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি' ও 'দাওয়াতের উপহার' নামক ৪টি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলো বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর সম্পাদক ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী ও 'ঢাকা কলেজ'-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ-এর উপর হযরতের বইগুলো প্রকাশনার ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

একাডেমিক প্রকাশনা বাদ দিয়ে ২০০৩ সাল থেকে নিরলসভাবে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' সেই গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে এ যাবত প্রায় ৩৫টিরও অধিক বই বাংলাভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, 'নদওয়াতুল উলামা'-এর প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরী রহ.-এর জীবনী 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' প্রকাশ করে আমাদের কৃতার্থ করেছেন এবং সাত খণ্ডে রচিত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনীমূলক আলেখ্য 'কারওয়ানে যিন্দেগী'-এর দু'আ ও এজাযত লিখে দিতে পেরে নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পুস্তক প্রকাশ করে। এতে আখিরাতের নাজাত প্রাপ্তিই যে একমাত্র উদ্দেশ্য— তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আমরা এটা জেনে আরো আনন্দিত যে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বইগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেবকে সভাপতি করে 'মানশুরিয়াত-ই-ইসলাম সোসাইটি' নামক ট্রাস্টের মাধ্যমে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' তার সারা জীবনের অর্জিত সম্পত্তি ইসলামী প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ– বিশেষ করে, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর কিতাবসমূহ প্রকাশের নিমিত্তে ওয়াক্ফ করে দেবেন। আই ইউ টি-এর সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ফজলে ইলাহী, বিচারপতি মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ও প্রফেসর ড. মোঃ নূর ইসলাম প্রমুখ উক্ত ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের অনুরোধে এ মহতী উদ্যোগের সাথী হতে পেরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি কায়মনবাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করছি, 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর এ নিঃস্বার্থ উদ্যোগ আল্লাহ্ কবুল করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ কাফেলা সুনামের সাথে এগিয়ে যাক। আমিন।

'মজলিশ নাশরিয়াত-ই-ইসলাম'-এর পক্ষে

মুহাম্মদ সালমান
২৫.১২.১৫
(মুহাম্মাদ সালমান)

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chiep Editor: The Monthle Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية بنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٨٨٠٣١٢٥٨١٦٩٣+ الفاكس والرقم الخاص: ٨٨٠٣١٢٥٨١٦٨٧+
جوال : ٨٨٠٠١٨١٩٣١٣٢٤٢+

التاريخ :

بنگلہ دیش میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتابوں کا
بنگلہ زبان میں ترجمہ مولانا کے سفر سے پہلے شروع ہوا، اس میں محب گرامی محترم
پروفیسر محمد علی صاحب کی محنت اور مخلصانہ جدوجہد سب سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے
خیر دے، اس کے بعد اسلامی فاؤنڈیشن نے ترجمہ شروع کیا، لیکن مسلسل طباعت
و ترجمہ کا کام جاری نہیں، اس پر مولانا نے افسوس کیا، پروفیسر محمد علی صاحب کے
ساتھ مشورہ کر جناب پروفیسر عبد الرؤف صاحب (مالک محمدی لائبریری، بنگلہ بازار
ڈھاکہ نے بھی کافی کتابوں کا ترجمہ اور نشر کرایا، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس دفعہ
آپ نے کاروان زندگی (حضرت مولانا کی خود نوشت سوانح) کا ترجمہ کرا کے اشاعت کا
کام شروع کیا، اس اہم کتاب کی سات جلدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے
اور ان کی حیات میں برکت عطا کرے، موصوف عزیزم ڈاکٹر اے ایف ایم خالد حسین کو
لیکر کلمۂ دعائیہ کے لئے ڈھاکہ سے میرے گھر تک پہنچے، میں اس کے لئے شکر گزار ہوں،

محمد سلطان ذوق ندوی

[signature]

٦ر١١ر١٥م

Md. Sultan Zauq Nadwi

Principal: Jamiah Darul Ma'arif Al-Islamiah, Chittagong.
Member: International League of Islamic Literature.
Member: International Union for Muslim Scholars.
Chairman: Anjuman-e-Ittihadul Madaris
(Qawmi Madrasah Education Board) Bangladesh.
Chief Editor: The Monthle Al-Hoque
Phone : 031-2581693, Fax : 031-2581687
Mobile : 01819-313242
E-mail : sultanzauq.bd@gmail.com

محمد سلطان ذوق الندوي

مدير : جامعة دار المعارف الإسلامية شيتاغونغ
عضو : مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية
عضو : الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس : هيئة إتحاد المدارس الأهلية بنغلاديش
رئيس تحرير : مجلة "الحق" الشهرية
الهاتف: ٠٠٨٨٠٣١٢٥٨١٦٩٣+ الفاكس والرقم الخاص: ٠٠٨٨٠٣١٢٥٨١٦٨٧+
جوال : ٠٠٨٨٠١٨١٩٣١٣٢٤٢+

التاريخ :

আল্লামা সুলতান যওক নদভী (দাঃ বাঃ)-এর অভিমত ও দু'আ

বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় তরজমা করার কাজ মাওলানার বাংলাদেশ সফরের আগেই শুরু হয়। এতে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ওমর আলীর মেহনত ও আন্তরিক প্রয়াস সবার আগে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমিন।

এরপর 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' অনুবাদের কাজ শুরু করে কিন্তু ধারাবাহিক মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে ছেদ পড়ে এবং তা বেশীদূর এগোয়নি। এ জন্য আল্লামা নদভী রহ.-এর আফসোস ছিলো। অধ্যাপক ওমর আলী সাহেবের সাথে পরামর্শ করে ঢাকার বাংলাবাজারস্থ 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব হযরত মাওলানার বহু গ্রন্থ বাংলায় ভাষান্তর করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

এটা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, এবারে তিনি 'কারওয়ানে যিন্দেগী' (হযরত মাওলানার আত্মজীবনী) অনুবাদ করিয়ে তা প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ সাত খণ্ডে বিন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে তাওফিক দিন এবং হায়াতে বরকত দান করুন, আমিন! আমার স্নেহভাজন ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনকে সাথে নিয়ে তিনি আমার বাসায় হাযির হন। এ জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

محمد سلطان ذوق ندوی

০৬.১১.২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ (মুহাম্মদ সুলতান যওক)

৬/১১/১৫ ই

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ
মাওলানা মোঃ মহীউদ্দিন খান সাহেবের অভিমত ও দু'আ

বিগত শতাব্দীর বিশ্বসেরা প্রাজ্ঞ আলেমেদ্বীন ও বরেণ্য আধ্যাত্মিক রাহবার হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বিশেষ আনন্দবোধ করছি। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' অর্থাৎ জীবনের কাফেলা নামক সাত খণ্ডে রচিত এ বইটি বলতে গেলে মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি দর্পণ বিশেষ। হযরত মাওলানা তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে সমকালীন মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি সঠিক চিত্রই আঁকেননি, একই সঙ্গে অনুকরণীয়, অনুসরণীয় জীবনের একটি রূপরেখাও অঙ্কন করেছেন।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকব্যাপি হযরত আল্লামার কিছুটা সান্নিধ্য লাভ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো। পবিত্র মক্কাকেন্দ্রিক বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী'-এর একজন নগণ্য সদস্য হিসেবে অন্যূন দশ-বারোটি সম্মেলনে আমি হযরত আল্লামার সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়েছে।

সময়টা ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বিশেষ সমস্যাসংকুল– ইরানের কথিত ইসলামী বিপ্লব এবং সউদী আরবসহ আরব বিশ্বের সাথে ইরানের বিপ্লবী কর্মকর্তাদের মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য খুবই বিব্রতকর অবস্থা। এ সময় সঠিক পথের সন্ধানে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর প্রাজ্ঞ অভিমত ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয়।

মাওলানা আলী মিয়া রহ. বিগত শতাব্দীর শেষ দিনটিতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এর দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, আলী মিয়া ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বিগত শতাব্দীর একজন বরণীয় মুজাদ্দেদ। তাই তাঁর জীবনসংগ্রামের বর্ণনার প্রতিটি ছত্রই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অনুকরণীয়। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' নামক গ্রন্থটি এই দিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অবশ্য পঠনীয় একটি মহাগ্রন্থ।

বাংলাভাষায় তাঁর সেই মহাগ্রন্থের অনুবাদ একটি নেয়ামত বিশেষ। আশা করি, বইটির সব কয়টি খণ্ড অনুবাদ করার তৌফিক আল্লাহ্‌পাক দান করবেন। আমিন।

মোঃ মহীউদ্দিন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

তারিখঃ ২৪-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

مدرسة دار الرشاد ميربور داكا بنغلاديش

মাদরাসা দারুর রাশাদ
১২/ ডি-ই, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৮০১৩১৬৩, মোবা : ০১৭১১-৯৭০৫৮৮, ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

Madrasah Darur Rashad
12/ D-E Mirpur, Pallabi, Dhaka-Bangladesh
Ph: 8013163, Mob: 01711-970588, 01552-356421

দারুর রাশাদ মাদরাসার মুহতামিম ও হযরত আলী নদভী রহ.-এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেবের দু'আ ও অভিমত

মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করছি যে, আমার মুরশিদ ও পীর হযরত মাওলানা আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগী' বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আল্লামা সাইয়িদ আলী মিয়া নদভী রহ-এর জীবন বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের আলোকবর্তিকা। সারা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের নির্দেশিকা উপস্থাপনের যে ধারা তিনি 'মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন' গ্রন্থের মাধ্যমে সূচনা করেছিলেন, তা অব্যাহত ছিলো তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

ইব্‌নে বতুতার পরে মুসলিম বিশ্ব ও সমকালীন পরাশক্তিকে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে হয়ত তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। জীবনের ধারা ও প্রবাহ বর্ণনা করতে গিয়ে মূলতঃ তিনি নিজের চিন্তা, দর্শন ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে।

তাঁর এই জীবনের কাফেলা দেশ ও মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ লালন, সংরক্ষণ ও বিস্তার জাতীয় কর্তব্য এবং বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে তা পৌঁছে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল। 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ আমাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করছি।

দু'আ করি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হোক এবং হযরতের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মুসলিম জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল উম্মাহ্‌র সংস্কার ও পুনর্জাগরণে কর্মসূচী গ্রহণ করুক। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের নেক মকছুদ কবুল করুন। আমিন!

মুহাম্মাদ সালমান
২৫.১২.১৫
(মুহাম্মাদ সালমান)
মুহতামিম, দারুর রাশাদ মাদরাসা

তারিখঃ ২৫-১২-২০১৫ খ্রীস্টাব্দ, ঢাকা

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমার কলম থেকে ইসলামি বোধ-বিশ্বাস, ইবাদাত, পবিত্র কুরআনের তাফসীর, সীরাতে রাসূল-এর মতো স্পর্শকাতর ও মর্যাদাপূর্ণ বিষয় থেকে শুরু করে পরম দায়িত্বের সঙ্গে ইতিহাস ও জীবনী পর্যন্ত; সমকালীন ব্যক্তিত্বদের জীবনচরিত ও তাঁদের মূল্যায়ন-প্রতিক্রিয়ার উপর কণ্টকময় ও দুর্গম বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে কবিতা ও সাহিত্যের মতো সূক্ষ্ম বিষয়াদির অনেকগুলো পুস্তক বেরিয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা কয়েক ডজন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেসবের কোনো একটি গ্রন্থের রচনার কাজ শুরু করতে আমাকে এত দ্বিধা, এত মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখিন হতে হয়নি, যতখানি হতে হয়েছে নিজের আত্মজীবনী লেখার কাজটি শুরু করার ক্ষেত্রে। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে কয়েকটা বছর এবং এ বিষয়ে কলম ধরার সাহস আমার হয়নি।

তার বিভিন্ন কারণ ছিল। একটি কারণ ছিল, 'নিজের মূল্য-মর্যাদা বোঝো হে আয়ায!'– এই ঐতিহ্যবাহী ও বিজ্ঞোচিত বাক্যটি এই কণ্টকাকীর্ণ উপত্যকায় পা রাখতে আমাকে বারণ করছিল। রাজনীতি, ব্যক্তিত্ব, খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞানের পূর্ণতা– এগুলোর মধ্য থেকে একটিও এমন ছিল না, যে আমাকে এই রচনার বৈধতার কারণ জোগাবে। তদুপরি নিজের অবস্থা ও ঘটনাবলির বর্ণনা এবং সহকর্মীবৃন্দ ও সমকালীন ব্যক্তিত্বদের উল্লেখ ব্যতীত (যার থেকে যদি আত্মজীবনী শূন্য থাকে, তা হলে তা অর্থহীন ও নিষ্প্রাণ হয়ে যায়) এ পথে দুপাও হাঁটা যায় না এবং তাতে পায়ে-পায়ে হোঁচট খাওয়া, নিজের ব্যাপারে আত্মপ্রবঞ্চনা, বন্ধু-সাথীদের হক নষ্ট হওয়া বা অতিরঞ্জনের আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া একজন বিবেকবান মানুষ থেকে এই আশা করা যায় না যে, নিজের জীবনী লেখার সময় তিনি আশপাশের ঘটনা,

আন্দোলন-সংগ্রাম, দল-সংস্থা ইত্যাদি থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবেন। বিশেষ করে যখন তিনি এমন কোনো ধর্ম ও জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট হবেন, যার মাঝে বহিঃপরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ও প্রভাবিত করার অসাধারণ যোগ্যতা বিদ্যমান। তদুপরি এমন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও পরিবেশের সাথেও তাঁর সম্পর্ক রয়েছে, যার মর্যাদা আকাশচুম্বী এবং যার অনীহা মনঃকষ্টের সীমানায় পৌঁছে যায়। সর্বোপরি কালও তিনি এমন পেয়েছেন, যে-সময়ে শতাব্দির দূরত্ব কয়েক বছরে, বছরের দূরত্ব মাসে, মাসের দূরত্ব সপ্তাহে এবং সপ্তাহের দূরত্ব দিনের হিসাবে পরিক্রম করছে এবং এমনসব ঘটনা ঘটে চলছে, যেগুলো শুধু যে পৃথিবীর রাজনৈতিক চিত্রই ওলট-পালট করে দিচ্ছে, তা নয়; বরং জীবনের অবকাঠামো এবং মানবতার চেহারা-ই বদলে যাচ্ছে। বিশেষ করে সেই জাতিটির বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলছে, যার সঙ্গে এই আত্মজীবনীর লেখকের ভাগ্য সম্পৃক্ত, হৃদয় ও বিবেক গ্রন্থিত। এমন পরিস্থিতিতে কলবকে কলমর থেকে, আবেগকে, 'জগত-কাহিনী'কে 'আত্মকাহিনী' থেকে আলাদা করে বড়-থেকে-বড় কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এবং পেশাদার কাহিনীকারও কোনো কাহিনী শোনাতে পারবেন না। যখনই এ-বিষয়টির উপর কলম ধরতে বন্ধু-সুহৃদগণ ফরমায়েশ করতেন কিংবা মনে তাগাদা জন্মাত, তখনই এ পথের দুর্গমতা এই চিন্তা থেকে দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিত যে, 'না করা এক দোষ; করা শত দোষ।'

এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে সময় কেটে যেতে লাগল। এ সময়ের মধ্যে সেই আপন-সুহৃদরাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, যারা এর জন্য আমাকে বিশেষভাবে তাগাদা দিতেন এবং যাদের কাছ থেকে আমি জীবনের নানা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, খুঁটিনাটি ও সন-তারিখ জানার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পেতাম। আমার এমন বেশ কজন অনুরক্তও চলে গেছেন, যারা আমার আত্মজীবনী সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে পড়তেন।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে আমি এমন তিন-চারটি কাজ সম্পন্ন করে অবসর হলাম, যেগুলো বেশ

কয়েকটা মাস আমাকে পুরোপুরি ব্যস্ত রেখেছিল এবং যেগুলো সম্পন্ন না করা পর্যন্ত অন্য কোনো দিকে মনোযোগী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন আমি অবসর। কিন্তু একেবারে বেকার থাকা হলো জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্টকর ব্যাপার এবং একধরনের সাজা। এই অবসর সময়ে, যার সময়কাল খুবই অল্প ও সীমিত বলে মনে হচ্ছিল এবং তখনও পর্যন্ত বড় কোনো গুরুত্বপূর্ণ রচনার কাজে হাত দেওয়ার মতো পুরোপুরি আয়োজন হাতে ছিল না হঠাৎ আমার মনে চিন্তা এল, আত্মজীবনী লেখার কাজটি শুরু করেই দেই। তার উপকারিতার দুটি দিক আমার সামনে এল।

১. নিজের জীবনের ঘটনাবলি ও আমার সঙ্গে আল্লাহর আচরণ দেখে নিজের অজান্তেই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে যায়। আল্লাহ বলছেন :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

'আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে আর তাদের নিজেদের মধ্যেও। তাতে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তা-ই (কুরআনই) সত্য। তোমার রবের ব্যাপারে এটুকু কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন?'

সামান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, সীমিত পরিবেশ, প্রতিকূল পরিস্থিতি ও অপর্যাপ্ত উপকরণের সঙ্গে আল্লাহর রহমতের যে-কারিশমা আর বান্দাবাৎসল্য প্রত্যক্ষ করলাম, তার দ্বারা পিতামাতার দু'আর প্রতিফল, নেক নিয়ত ও আপাদমস্তক মমতাপূর্ণ শিক্ষা ও দীক্ষা, মমতাময় ও সুযোগ্য শিক্ষকদের পরিশ্রম, আল্লাহর মকবুল বান্দাদের সুদৃষ্টি ও সন্তুষ্টির উপকারিতা ও তাঁদের উপর আস্থাশীলতার বরকত প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের সঠিক লক্ষ্য ও ব্যস্ততা বেছে নেওয়া (যেটি আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত সম্ভব ছিল না), চরম শারীরিক দুর্বলতা, সাহসের অভাব ও মনের বিক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও কতগুলো নিয়মের অনুসরণের ফলাফল স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে চিন্তা এল, আপন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাবলির আদলে যদি এই বাস্তবতাগুলো সামনে চলে আসে, তা হলে

উপদেশ ও শিক্ষার জোগানও হবে আবার সাহস বৃদ্ধি ও আল্লাহর উপর আস্থা তৈরির কারণও হবে।

এই বাস্তবতা ও শিক্ষালাভের উপকরণগুলোকে একটা সরল-সোজা কাহিনী ও আমার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘটনাবলির আদলে যেরকম হৃদয়গ্রাহীরূপে উপস্থাপন করা যাবে, একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ ও দীনি ভাষণের মাধ্যমে তেমনটি সম্ভব হবে না। বিশেষত, একজন নিম্নমানের সমকালীন ব্যক্তির আত্মকাহিনীতে জীবনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলির যে-ফলাফল সামনে চলে আসে, তেমনটি অনেক সময় ইতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও পুরনো যুগের মনীষীদের জীবনী থেকে গ্রহণ করা যায় না এবং তাঁদের অনুসরণের সেই জযবা সৃষ্টি হয় না, যা কিনা সমকালীন ব্যক্তি বা ছোট কারুর আত্মজীবনী থেকে সৃষ্টি হয়। কারণ, তাতে কালের ব্যবধান ও কল্যাণ-বরকতের যুগ আর অকল্যাণ ও ফেতনার যুগের তারতম্য রাখা হয় না।

২. দ্বিতীয় কারণটি ছিল, অনেক বিষয়বস্তু, ঘটনা, প্রতিষ্ঠান-আন্দোলন, ব্যক্তি-সংগঠন এমন যে, সেগুলোকে শুধু নিজের জীবনীতেই গ্রন্থিত করা যেতে পারে। যদি সেগুলোর উপর স্বতন্ত্রভাবে আলোকপাত করা হয়, তা হলে প্রতিটির জন্য আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন। তদুপরি তার ইতিহাসসুলভ দায়িত্ব-কর্তব্য ও রচনাবিষয়ক রীতি-নীতি এমন, যা এমন অনেকগুলো বাস্তবতা ও সারকথা সামনে আসতে দেয় না, যা আত্মজীবনী ও নিজের লেখা জীবনচরিতে অনায়াসে আসতে পারে। এভাবে একজন ব্যক্তির জীবনচরিত (যদি তিনি কল্পনার জগতে বাস না করেন এবং আল্লাহ তাকে পরিস্থিতি ও আশপাশ বুঝবার মতো অনুভূতি, তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ও অপরের সামনে উপস্থাপনের যোগ্যতা দান করেছেন) সে-যুগের সবাক প্রতিচ্ছবি হয়ে যায় এবং অনেক সময় তার দ্বারা একজন ঐতিহাসিক ও লেখক এমনসব কাজের কথা পেয়ে যান, যা গতানুগতিক ইতিহাস ও বর্ণাঢ্য জীবনীগুলোতে পাওয়া যায় না।

একটি চিন্তা আমার জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারত যে, আমি একটি বেদআত কর্মে জড়াতে যাচ্ছি এবং যে-সময়গুলো

আমি এখনও পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও উম্মতের সংশোধনকারী ও সংস্কারক লোকদের জীবনী সংকলন ও তাঁদের কীর্তিমালাকে উদ্ভাসিত করার কাজে ব্যয় হয়েছিল, তাকে আমি আত্মপ্রদর্শন ও আত্মপ্রশংসার কাজে ব্যয় করে সময় নষ্ট করছি এবং নিজের আমলনামায় কলঙ্কের দাগ লেপন করছি। প্রখ্যাত আরব সাহিত্যিক ও লেখকদের কলম থেকে এ কালে অত্যন্ত সফল, হৃদয়গ্রাহী ও ক্রিয়াশীল আত্মজীবনী বের হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে 'ফাজরুল ইসলাম' ও 'দুহাল ইসলাম' সিরিজের প্রখ্যাত লেখক মিশরি পণ্ডিত ডক্টর আহমাদ আমীন-এর 'হায়াতী' অগ্রগণ্য। এর দ্বারা শুধু তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাবলি ও অভিজ্ঞতা-ই নয় – তাঁর যুগের সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষাব্যবস্থা ও তৎকালের মিশরের জীবনচিত্র সামনে চলে আসছে। কিন্তু আমার মনে সাহস ও প্রশান্তিজোগানোর জন্য (যিনি হিন্দুস্তানের দীনি পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেছেন) একা এই দৃষ্টান্তটি যথেষ্ট ছিল না যে, খোদ হিন্দুস্তান ও ইউরোপে এই অর্ধশতাব্দিতে কয়েকশো 'আত্মজীবনী' ও 'আমার ভাষায় আমার কাহিনী' লিপিবদ্ধ হয়েছে। হঠাৎ এখানকার দীনি ও ইলমি স্তরের কয়েক ব্যক্তি ও আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বীদের তিনটি দৃষ্টান্ত সামনে এল। একটি হলো শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর 'নকশে হায়াত', যেটি তিনি আত্মজীবনী লেখার মধ্য দিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, ১৩০ নং পৃষ্ঠায় গিয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা শেষ করে দিয়ে হিন্দুস্তানের সেই স্বাধীনতার জিহাদের ইতিহাস লেখা শুরু করে দিলেন, যেখানে তাঁর ওস্তাদ ও মুরুব্বী শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেবের নেতৃত্বসুলভ অংশ ছিল। পরে তারই বিস্তারিত বিবরণ, কারণ ও পেক্ষাপট আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডটিও সমাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আমার শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের দৃষ্টান্ত সামনে এল, যিনি 'আপবীতী' নামে সাত খণ্ডে আত্মজীবনী সংকলিত করেছেন, যেটি শুধু তাঁর নয়; বরং তাঁর আমল, পরিবেশ এবং বিশেষ

করে দ্বীনি শিক্ষাব্যবস্থা, বৈশিষ্ট্য এবং তার কর্মীদের জীবনরীতি, মেজাজ ও চরিত্রের আরশিতে পরিণত হয়ে গেছে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হলো মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদির, যিনি নিজের বিশেষ ধারায় 'আপবীতী' সংকলিত করেছেন, যেটি শিক্ষামূলকও, সাহিত্যপূর্ণও, আবার নিজের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের একটি 'টেপরেকর্ডার'ও। এই তিনটি দৃষ্টান্ত সামনে আসার পর, যাঁদের সঙ্গে আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও খণ্ডকালীন সমসাময়িকতার মর্যাদাও অর্জিত হয়েছিল এই ভাবনাটিকে শক্তি জোগালো এবং মনে চিন্তা জাগ্রত হলো যে, এই কাজটি অন্তত আমার নিজের অঙ্গন ও পরিবেশে এখন আর বেদআত নেই। যদি হয়ও, 'বেদআতে হাসানা' আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

আরও যে-চিন্তাটি আমাকে এ-রচনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, তা হলো, যদি কাজটি করি, তা হলে আমি আমার চিন্তানৈতিক অনুভূতি, মানসিক উন্নতি, লেখালেখির ইতিহাস, সমকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি, দাওয়াত ও আন্দোলনের আলোচনায় নিজের মতামত, চিন্তা, চোখে দেখা বিবরণ, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সংক্ষেপে হলেও এবং নিজের রচনা ও গ্রন্থাদির মূল বক্তব্য ও চিন্তাধারা ও সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ চয়ন উপস্থাপন করার সুযোগ পাব, যেগুলো বিপুলসংখ্যক নিবন্ধ ও গ্রন্থগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা এখন পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে এবং যেগুলোর উপর যেকোনো রুচিবান মানুষের একই সময়ে চোখ পড়া কঠিন ব্যাপার।

আলোচনায় সম্মানিত পাঠকবৃন্দ কোথাও-কোথাও দীর্ঘতা দেখতে পাবেন। কিন্তু আমি মনে করি, জীবনী, ইতিহাস আর আত্মজীবনীর এই স্বাভাবিক পার্থক্যটা মেনে নেওয়া দরকার যে, অপরের জীবনীতে লেখক সেসব সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের উকিল ও মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করেন আর নিজের জীবনীতে হন এক ধরনের স্বাধীন ও নিজেরই উকিল ও মুখপাত্র। সে-কারণে আত্মজীবনীর আলোচনাকে ভারসাম্যের সেই পাল্লায় মাপা সঠিক হবে না, যে-পাল্লা দ্বারা সাধারণত অপরের জীবনীর আলোচনা পরিমাপ করা হয়। আত্মজীবনীর

লেখককে এই অনুমতি দেওয়া দরকার যে, তিনি যেখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে চাইবেন, সেখানে সংক্ষিপ্ত করবেন আর যেখানে দীর্ঘ করতে চাইবেন, সেখানে দীর্ঘ করবেন। অন্যথায় অপরের জীবনী আর নিজের জীবনীতে কোনো পার্থক্য থাকে না।

ঘটনাক্রমে চিকিৎসার প্রয়োজনে আমি মাসদুয়েক বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে গেলাম। এ সময়টিতে আমি আমার বাসস্থান ও গ্রন্থভাণ্ডার থেকে দূরে থাকার কারণে এমন কোনো কাজ করতে পারছিলাম না, যার জন্য বারবার বিভিন্ন গ্রন্থ ও সূত্রের শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এই কাজটি শুরু করে দিলাম এবং তার ধারা ১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে কর্নাটক রাজ্যে ভটকল নামক স্থানে এবং বোম্বাইয়ের শান্তিময় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৯৮৩ রায়বেরেলিতে আপন বাসগৃহ 'দায়েরা শাহ ইলমুল্লাহ'য় সমাপ্ত হয়, যেখানে আমার সেই পুরনো ডায়েরি ও রচনাগুলো ছিল, যেগুলো ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই সীমিত অবসরে আমি শুধু অর্ধশতাব্দির (১৩১৫ হিজরি থেকে শুরু করে ১৩৬৫-৬৬ হিজরি পর্যন্ত) সময়কার রোয়েদাদ লিপিবদ্ধ করব। তারপর যদি বেঁচে থাকি আর আল্লাহ তাওফীক দান করেন, তা হলে বাকিটুকুও সম্পন্ন করব। অন্যথায় কোনো আপনজন একাজটি আঞ্জাম দেবে। যদি পরবর্তী অংশটুকু থেকেও যায়, তাতেও আমার মনে কোনো কষ্ঠ থাকবে না। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অংশটি এ গ্রন্থে এসে পড়েছে।

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্, রায়বেরেলী
০৯. ০৬. ১৪০৩ হি. ২৫. ০৩. ১৯৮৩ ঈসায়ী

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়
পরিবার দেশ পরিবেশ-পরিস্থিতি শৈশব, শৈশবের স্মৃতিগাথা
পারিবারিক ক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদান ও ইলমী
উত্তরাধিকারের অগাধ আনুকূল্য
পরিবার /৩৫
উত্থান-পতন যে কোনো খানদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ /৩৭
কিছু ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা /৪০
দাদা-নানার কথা, তাঁদের নিকটাত্মীয়তার সেই ইতিহাস /৪৭
আমার জন্মের পূর্বে আমাদের ঘরের চিত্র /৫০
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ বা তাকিয়াকেল্লাঁ /৫২
তাকিয়াকিল্লাঁ'য় আমার শৈশবের দিনগুলো
কিছু ঘটনা, কিছু মানুষের মুখ/ ৫৪
পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন /৫৮
তোংক-এ অবস্থিত এ-খানদানের অন্য শাখা এবং তার বৈশিষ্ট্য /৫৯
দ্বিতীয় অধ্যায়
শৈশবের কিছু স্মরণীয় ঘটনা, লখনৌ অবস্থান, কিতাবের দুনিয়ার
সাথে প্রথম পরিচয় ও খেলাফত আন্দোলন
শৈশবের কিছু স্মরণীয় ঘটনা /৬১
পারিবারের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তা থেকে
বেরিয়ে আসার চেষ্টা /৬২
লখনৌ'র পরিবেশ ও সেখানকার শৈশব॥ কিতাবের প্রতি
আগ্রহ, জীবনের প্রথম বক্তৃতা /৬৩
মহল্লার পরিবেশ /৬৮
মুন্সী আবদুল গণি সাহেব সম্পর্কে আরো কিছু কথা /৬৯
শৈশবের স্মৃতি /৭১
আব্বার সঙ্গে /৭৩
নিয়মিত শিক্ষার সূচনা /৭৭
খেলাফত আন্দোলন /৭৯
খেলাফত বাতিল করার সেই দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত /৮০

তৃতীয় অধ্যায়
আব্বার ওফাত, গৃহশিক্ষা, শায়খ খলীল বিন মুহাম্মদ আলইয়ামানী'র কাছে আরবী শেখার সূচনা উর্দূ শিক্ষা, পরিবেশ, আঁকুপাঁকু মনের বাসনা আরবী পাঠের পূর্ণতা
আব্বার ওফাত /৮৩
ভাইজানের স্নেহ-মমতা ও অভিভাবকত্বকাল /৮৪
তাকিয়ায় আরো কিছুদিন, আম্মার তারবিয়াত /৮৫
শৈশবে জেঁকে-বসা হতাশার কথা /৮৯
একটি ঐতিহাসিক দিন /৯০
আমীর নওয়াব নুরুল হাসান মহলে অবস্থান /৯১
আরবী ভাষা শেখার সূচনা /৯৪
আল্লাহর তাওফিক /৯৭
বাকি পয়সা ফেরৎ দাও! /৯৮
উর্দূ ভাষা ও সাহিত্য এবং কিছু উপকারী কিতাব অধ্যয়ন /৯৯
বাজার ঝাউলালে ফিরে আসা /১০২
নদওয়াতুল উলামা'র কানপুর সম্মেলন /১০২
তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি এবং আমার প্রিয় শখ ১০৩
খাজা আবদুল হাই ফারূকী সাহেবের সান্নিধ্যে তাফসীরের প্রথম পাঠ ১০৪
মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা সাহেবের নিকট অধ্যয়ন /১০৫
লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি /১০৬
একটি আক্ষেপ /১০৯
চতুর্থ অধ্যায়
লাহোরে ঐতিহাসিক সফর, আল্লামা তাকিউদ্দীন হিলালীর আগমন নদওয়াতুল উলামায়, ভাইজানের দিক-নির্দেশনা, ইলমী ও যিহনী ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁক এবং মুক্তি, লাহোর ও দেওবন্দের সফর
লাহোরে ঐতিহাসিক সফর /১১১
একটি সঠিক পরামর্শ /১১৩
দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র দরসে হাদীসে /১১৫
পারিবারিক কুতুবখানার গভীরে প্রবেশ /১১৭
জীবনের মোড়-বদলানো একটি অনুভব /১১৮
আল্লামা তাকিউদ্দীন হিলালীর আগমন /১১৯
আমার তালিম-তারবিয়তের ব্যাপারে ভাইজানের প্রাজ্ঞোচিত পন্থা, লেখালেখির সূচনা /১২৩

৮

ইংরেজির প্রতি ঝোঁক, মায়ের পেরেশানি /১২৫
আমাদের এখানে শায়খ মাদানী'র অবস্থান /১২৮
আরবী পত্র-পত্রিকা পাঠ শুরু রচনা ও লেখালেখির চর্চা আরম্ভ /১২৯
লাহোর ও দেওবন্দে /১৩১
দেওবন্দে /১৩৩
দেওবন্দ থেকে আবার লাহোর /১৩৬
আবার এলাম লাহোরে /১৩৭
পঞ্চম অধ্যায়
দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতার সুতোয় গেঁথে
যাওয়া শিক্ষা ও পাঠদানের সেই দশ বছর
আমি যখন দারুল উলুমের শিক্ষক /১৩৯
চিন্তা ও বুদ্ধির ভারসাম্য /১৪৪
শিক্ষকতার সূচনা, ছাত্রদের মুখোমুখি /১৪৯
দারুল উলুমের সাধারণ পরিবেশ /১৫১
বিবাহ /১৫৩
আরবী পাঠদানে এক নতুন অভিজ্ঞতা /১৫৩
অন্যান্য বিষয়ের কিতাব ও ঘন্টা /১৫৪
দারুল উলুম-এর পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠাতা ও
স্বপ্নদ্রষ্টাদের সাথে পরিচিতি /১৫৬
ছাত্রদের কিছু বৈশিষ্ট্য /১৫৮
ড. উম্বেদকারের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও বোম্বাই সফর /১৫৯
মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবকে মানপত্র /১৬৭
মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স /১৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়
সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ লেখার সূচনা, হযরত
থানভী রহ.-এর মাজালিস, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সফর
ও ঘটনা, ইকবাল-কাব্যের প্রতি আকর্ষণ
তোংক সফর এবং সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ লেখার সূচনা /১৭১
নাগপুর ও অন্যান্য সফর /১৭৪
লখনৌতে হযরত থানভীর আগমন ও মজলিস /১৭৭
আল্লামা ইকবালের সাথে শেষ সাক্ষাত /১৭৭
পাটনা সফর /১৮২
আলীগড় বিশ্ববিদ্যায় সফর এবং কিছুদিন অবস্থান /১৮৪

মাওলানা আবু বকর শীস সাহেব ফারূকী /১৮৫
মুসলিম লীগ ও খাকসার আন্দোলনের তোড়জোর /১৮৬
সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ -এর প্রকাশনা
ও সমাদৃতি, তখনকার প্রেক্ষাপট /১৮৭
আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভীর সাথে
একটি ঐতিহাসিক সফর /১৯২
'আন নাদওয়া' পত্রিকার তৃতীয় প্রকাশ /১৯৪
দারুল উলুমে নতুন উস্তায /১৯৫

সপ্তম অধ্যায়

নদওয়াতুল উলামা'র পক্ষ থেকে সিলেবাস ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর কিতাব রচনা, আরো কিছু নতুন কিতাব

নতুন করে সিলেবাসের কিতাব প্রণয়ন ও তার গুরুত্ব /১৯৮
আরবী ভাষা ও সাহিত্য : যেভাবে সিলেবাসের সংস্কার শুরু /২০২
মুখতারাত সংকলন /২০৩
আল-ক্বিরাআতুর রাশিদা /২১০
শিশু সিরিজ 'কাসাসুন নাবিয়্যিন' লেখার ইতিহাস /২১২
কুরআনের খিদমত /২১৬
সিলেবাস ঢেলে সাজানোর আরো কিছু প্রয়াস /২১৭

অষ্টম অধ্যায়

মাদরাসার চার দেয়ালের বাইরে এসে আরো একটু বিস্তৃত পরিসরে পাঠ গবেষণা এবং চিন্তা ও আমলের ময়দানে অগ্রসর হওয়া

রুচির পরিবর্তন /২২১
নানামাত্রিক মুতালা'আর বিস্তৃত জগতে /২২৩
নয়া নেতৃত্বের সন্ধান এবং পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান সফর /২২৭
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সফর শুরু /২৩১
জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ এবং তা ছেড়ে আসা /২৩৩
জামিয়া মিল্লিয়া'র সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন /২৩৯
মুসলমানদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব ও আরাম-আয়েশমুখিতা /২৪১
হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরামের বাস্তবতা ॥ উপলব্ধি ও জাগরণ /২৪২

নবম অধ্যায়

আরবী ভাষায় দাওয়াতি লেখালেখির ধারাবাহিকতার প্রস্তুতি ও সূচনা

আরবী প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লেখার সূচনা-ইতিহাস /২৪৫
মাযা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন /২৪৯

إلى ممثلي البلاد الإسلامية — ইসলামী দেশের প্রতিনিধিদের সমীপে /২৬০
ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দরসে কুরআন ও 'তামির' পত্রিকা /২৬৩

দশম অধ্যায়

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনের সাথে আমার সম্পর্ক

হযরত মাওলানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত /২৬৭
লখনৌ শহরের আশপাশে তাবলিগের কাজ এবং হযরতের চিঠি /২৭১
হযরতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ কিছু কারণ /২৭২
ছাত্রদের দীনি তারবিয়াত এবং দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ /২৭৪
শায়খুল হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রহ.-এর সাথে সাক্ষাত /২৭৭
লখনৌতে তাবলিগের কাজ এবং মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আগমন /২৭৮
তারজুমানি'র গৌরব অর্জন /২৮০
তাবলিগী সফর ও ইজতেমা /২৮১
দারুল উলুম থেকে দীর্ঘ ছুটি এবং তাবলিগের কাজে গভীর একাত্মতা /২৮২
মাদারিসে দীনিয়ার সাথে সম্পর্ক /২৮৪
পেশাওয়ারের ঐতিহাসিক সফর /২৮৪
আলহাজ্ব আরশাদ সাহেব /২৮৮
সীমান্ত প্রদেশের প্রথম সফর /২৮৯
হাভ একটি বিপজ্জনক কৌতুক /২৯০
পাঞ্জতার ও বালাকোটে /২৯২
মাওলানার অসুস্থতার শেষ দিন ও মৃত্যু /২৯৭
মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের স্থলাভিষিক্তি ও খেলাফত /৩০১
আমার অবস্থান ও চিন্তার রীতি /৩০২
লাখনৌর দীনি ও ইলমি মহলে কাজের গ্রহণযোগ্যতা এবং গুরুত্বপূর্ণ তাবলীগি সমাবেশসমূহ /৩০৪
প্রথম হজের সফর ও হেজাযের তাবলীগি ভ্রমণ /৩০৭
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সফর /৩০৭
একটা ভুল ও তার প্রতিকার /৩১০
মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব (রহ.)-এর খেদমতে হাজিরি /৩১১

একাদশ অধ্যায়

হজের দুটি সফর

হেজায সফর ও সেখানকার দাওয়াতি কাজের জন্য নির্বাচন /৩১৩
হেজাযের সফর ও মক্কা-মদীনার অবস্থান /৩১৬

الى ممثلى البلاد الاسلامية পুস্তিকা /৩২০
হেজায অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ /৩২২
بين الجباية والهداية পুস্তিকা /৩২৩
দেশবিভক্তি ও তার প্রতিক্রিয়া /৩২৪
মুসলমানদের হীনম্মন্যতা ও হতাশার মোকাবেলা
এবং নতুন পরিস্থিতিতে কাজ করার 'পথের দিশা' /৩২৬
লাখনৌর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও সেগুলোর আরবি অনুবাদ /৩৩১
আরবদের মাঝে দাওয়াতের জযবা /৩৩২
নদওয়াতুল উলামার সদস্য ও সেক্রেটারির পদপ্রাপ্তি /৩৩৪
হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ও যাওয়া-আসা /৩৩৪
হজের দ্বিতীয় সফর /৩৩৫
হেজাযে পশ্চিমা সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব /৩৩৯
হেজাযি লেখক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক /৩৪০
সৌদি রেডিওতে ভাষণ /৩৪২
ত্রয়োদশ অধ্যায়
মিশর সফর ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ
মিশর আরব বিশ্বের ইলমি ও ফিকরি মারকায /৩৪৫
মিশরের মাটিতে /৩৪৬
নাসেরি যুগের আগের মিশর /৩৪৬
শিক্ষা ও সাহিত্যের অঙ্গনগুলোতে পরিচিতি ও মতবিনিময় /৩৪৯
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও নিবন্ধ /৩৫০
ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাত-যোগাযোগ ও অঞ্চলভিত্তিক সফর /৪৫১
'শোনো হে মিশর!' /৩৫৪
আরও কয়েকটি পুস্তিকা /৩৫৫
বিশেষ যোগাযোগ /৩৫৫
মিশরের 'এখওয়ানুল মুসলিমীন' ও তার সঙ্গে
সম্পর্ক-যোগাযোগ /৩৫৬
সুদানে/ ৩৬১
দামেশকে /৩৬২
সিরিয়ার আলেমসমাজ ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়
এবং ধর্মীয় ও শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন /৩৬৩
বাইতুল মুকাদ্দাস ও আল-খলিল /৩৬৪

অপরাপর ঐতিহাসিক নগরী ও স্থানসমূহ /৩৬৪
জর্ডান ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ /৩৬৫
ফিলিস্তিন ট্রাজেডির ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলি
ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন /৩৬৫
ফিলিস্তিন সমস্যার উপর ভাষণ /৩৬৬
সিরিয়ার অন্যান্য ভাষণগুলো /৩৬৮
হযরত খালেদ সাইফুল্লাহর নগরী হেমসে ভাষণ /৩৬৮
নানাজনের কবর যিয়ারত /৩৬৯
হেজায প্রত্যাবর্তন ও নানা ব্যস্ততা /৩৬৯
মাওলানা মাদানির একটি পত্র /৩৭১

চতুর্দশ অধ্যায়

মিশ্র সভা-সমাবেশ, কয়েকটি সফর ও নতুন কিছু রচনা

(অক্টোবর ১৯৫১–এপ্রিল ১৯৫৬)

মিশ্র সভা-সমাবেশ এবং মানবতা ও চরিত্র বিষয়ে
কতগুলো ভাষণ /৩৭৩
দারুল উলূম দেওবন্দের একটি ভাষণ /৩৭৭
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সফর /৩৮১
লাহোরের দ্বিতীয় সফর /৩৮৪
জামেয়া সালাফিয়ায় একটি মানপত্র /৩৮৪
'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' সিরিজ গ্রন্থটি লেখার সূচনা /৩৮৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

দামেশক ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বক্তৃতার ধারা

এবং সিরিয়া, লেবানন ও তুরস্ক সফর

দামেশক ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণপত্র /৩৯১
দামেশকে /৩৯৪
সিরিয়ার এক আরেফ বুযুর্গ শায়খ আহমাদ আল-হারূন /৩৯৭
রেডিওতে দুটি ভাষণ /৩৯৯
লেবানন ও তুরস্ক সফর /৪০০
দামেশকের মুতামারে ইসলামী (ইসলামি কনফারেন্স) /৪০৩
দামেশক অবস্থানের শেষ দিন ও রওনা /৪০৪
আতাতুর্ক সম্পর্কে সত্য উচ্চারণ এবং মাওলানা মাদানির সত্যপ্রিয়তা /৪০৫
বাগদাদে /৪০৬
করাচিতে /৪০৭

ষোড়শ অধ্যায়
হিন্দুস্তানের অবস্থান, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
রেঙ্গুন ও কুয়েত সফর (১৯৫৬-১৯৬২)
সমকালীন মাশায়েখের খেদমতে /৪০৯
কাদিয়ানি মতবাদের উপর গ্রন্থ রচনা /৪১৩
হায়দারাবাদ সফর /৫১৫
'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত' প্রতিষ্ঠা /৪১৬
মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের সমস্যার সাথে সম্পৃক্ততা
ও সহযোগিতা /৪১৯
বর্মা সফর /৪২০
স্বাধীন ভারতে দীনি শিক্ষার বিরাট উদ্যোগ ও প্রাদেশিক
দীনি শিক্ষা কনফারেন্স /৪২২
কাজী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসী /৪২৩
যফর আহমাদ সিদ্দীকি সাহেব /৪২৫
কেরালার একটি সফর ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ /৪২৬
ভাইজানের মৃত্যু ও জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা /৪২৭
কুয়েত সফর /৪২৯
সপ্তদশ অধ্যায়
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা ও রাবেতা আলমে ইসলামী
মক্কা মুকাররমার প্রতিষ্ঠা, পবিত্র হেজাযে তৃতীয় সফর ও
'নেদায়ে মিল্লাত'-এর সুভ যাত্রা
জামেয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা /৪৩৩
রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা /৪৩৬
জামেয়ায় লেকচারের ধারা /৪৩৮
বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎ ও পত্রযোগাযোগ /৪৩৯
সাপ্তাহিক 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর প্রকাশনা শুরু /৪৪৩
অষ্টাদশ অধ্যায়
কয়েকটি গুরুতর দুর্ঘটনা, ইউরোপের প্রথম সফর, স্পেন পরিদর্শন
ও হিন্দুস্তানের শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি দাঙ্গা
হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব (রহ.)
ও হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর মৃত্যু /৪৪৫
ইউরোপ সফর /৪৪৫
স্পেনের মাটিতে /৪৪৭

ইউরোপ সফরের কিছু প্রতিক্রিয়া /৪৫০
ইউরোপের দ্বিতীয় সফর /৪৫২
কলিকাতা, জমশেদপুর ও রাওড়কেলার ভয়াবহ
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা /৪৫৩
সবার আগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মতো ইস্যু /৪৫৪
অনুবা ভাওজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হতাশা /৪৫৫
দাঙ্গাকবলিত অঞ্চলগুলো পরিদর্শন এবং জমশেদপুর
ও রাওড়কেলার সফর /৪৫৭
'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত'-এর আহ্বান ও তার প্রতিষ্ঠা /৪৫৮
বোম্বাইয়ে চোখের অপারেশন ও লাখনৌয়ে মজলিসে
মুশাওয়ারাত-এর সম্মেলন /৪৫৯
সংগঠনের প্রতিনিধিদলের দাঙ্গাকবলিত এলাকাগুলো পরিদর্শন /৪৬১
রাবেতার সম্মেলনে যোগদান /৪৬৩
বজ্রপাতের মতো একটা সংবাদ /৪৬৩
রাবেতার সম্মেলন /৪৬৪
ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল জলীল ফরীদি /৪৫৬
চোখের ব্যথা ও বারবার হাসপাতালে ভর্তি /৪৬৬

কারওয়ানে যিন্দেগী

১ম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পরিবার দেশ পরিবেশ-পরিস্থিতি শৈশব, শৈশবের স্মৃতিগাথা পারিবারিক ক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদান ও ইলমী উত্তরাধিকারের অগাধ আনুকূল্য

পরিবার

নিজের পরিবারের অবস্থা, আভিজাত্য ও বংশ-কৌলিন্যের কথা এবং সে পরিবারের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বদের কীর্তিগাথা ও অবদানের কথা সমুজ্জ্বল করে বর্ণনা ও উপস্থাপনা করতে যেয়ে একটু দীর্ঘসূত্রতায় আটকে গেলে এবং বর্ণনাধারায় আবেগ-মথিত হয়ে গেলে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কেননা, এ হলো সেইসব লেখক ও ঐতিহাসিকদের পুরোনো দুর্বলতা, যাঁরা সৌভাগ্যবশত এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যে পরিবার অভিজাত ও কূলীন হিসাবে সর্বজনবিদিত, যে বংশে দীর্ঘকাল ধরে জন্ম নিতে থাকেন সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, একের পর এক মনীষী। সম্ভবত হিন্দুস্তানে ব্যাপক প্রচলিত প্রবাদ پدرم سلطان بود —পিতৃপুরুষের জোরে রাজা হয়ে গেছে— এমন ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে।

কিন্তু লেখক এখানে সে সব দীর্ঘাশ্রয়ী বর্ণনা ও আলো-ছড়ানো উপস্থাপনার কোনো প্রয়োজন মনে করছেন না। কেননা রায়বেরেলির কুতবী হাসানী পরিবারের বংশ, পেছনে ফেলে-আসা তাঁদের গরবের ইতিহাস এবং এ-খান্দানের ইতিহাসখ্যাত ও নামকরা ব্যক্তিত্বদের পরিচিতি এতোটাই ইতিহাস-প্রমাণিত ও দেদীপ্যমান যে, আত্মজীবনীতে নতুন করে এর উপর কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। হিন্দুস্তানে 'আওলাদে রাসূল' বা সায়্যিদ বংশের অন্যতম ধারা— হাসানী কুতবী খান্দানের উপর যে-সব ঐতিহাসিক উপাদান বিদ্যমান রয়েছে এবং তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য ও ইলমী কামালাত—উৎকর্ষের বর্ণনায় রচিত যে-সব গ্রন্থাবলী রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে এ-কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, সায়্যিদ বংশের আর কোনো

ধারার উপর —আমরা যতোটুকু জানি— এতো ঐতিহ্যিক, ঐতিহাসিক ও গবেষণালব্ধ গ্রন্থ রচিত হয় নি। এর মানে এই নয় যে, সে-সব খান্দানে কোনো মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কোনো সুযোগ্য ও খ্যাতিমান ছিলেন না। আসল ব্যাপার হলো, হাসানী কুতবী খান্দানে এবং হোসাইনী ধারায় ইতিহাস-প্রেম লালনকারী লেখক ও ঐতিহাসিক ছিলেন একটু বেশীই। তাই তাঁদের কলমে চিত্রিত হয়েছে নিজেদের খান্দানের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক কীর্তিগাথার জয়গান। তাঁরা যেনো শেখ সাদী'র এ-উপদেশের উপর আমল করতে মোটেই দ্বিধা করেন নি—

نام نیک رفتگاں ضائع مکن

تا بماند نام نیکت پائدار

পূর্বপুরুষের সুকীর্তি (হেলায়) নষ্ট করো না ..

এভাবে পূর্বপুরুষের সুকীর্তিকে দান করো সুপ্রতিষ্ঠা।

বিলগ্রামের সায়্যিদ বংশের এক নক্ষত্র হলেন আল্লামা মীর গোলাম আলী বিলগ্রামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২০০ হিজরী), যাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে একে একে অনেক মূল্যবান কিতাব। مآثر الکرام (বড়দের কীর্তিগাথা) তাঁর একটি অনবদ্য কিতাব। خزانۂ عامرہ (আবাদ ভাণ্ডার) তাঁর আরেকটি অমর সৃষ্টি। الید البیضاء (সাদা হাত) তাঁর আরেকটি অনন্য রচনা। কিন্তু এ-সবের ভিতরে مآثر الکرام (বড়দের কীর্তিগাথা) যেনো আলোঝলমলে একটি নক্ষত্র। এর মাধ্যমে তিনি নিজের খানদান বরং বিলগ্রাম অঞ্চলকেই প্রাণচাঞ্চল্য ও ভাস্বরতা দান করেছেন।

অপরদিকে রায়বেরেলির হাসানী খানদানে জন্ম গ্রহণ করেছেন মাওলানা সায়্যিদ নু'মান (সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর চাচাজান) রহ., মাওলানা হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দীন রহ. এবং শেষে হিন্দুস্তানের ইবনে খাল্লিকান বা ইতিহাসবিদ মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই রহ., যিনি রচনা করেছেন অমর গ্রন্থ نزهة الخواطر। তাঁরা এ খানদানের বংশনামা সুসংরক্ষণ করেছেন, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এ-খানদানের কীর্তিপুরুষদেরকে অমরত্ব দান করেছেন নিজেদের আরবী-ফারসী-উর্দূ রচনাবলীর মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে মাওলানা সায়্যিদ নু'মান রহ.-এর أعلام الهدى (হিদায়াতের নিশানবরদার), মাওলানা হাকীম সায়্যিদ ফখরুদ্দীন রহ.-এর سیرۃ السادات ও مہر جہاں تاب এবং মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই

রহ.-এর تذكرةالأبرار ও نزهةالخواطر (১-৮) এ খানদানকে এক কালোত্তীর্ণ পরিচিতি এনে দিয়েছে। এখন নতুন করে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরার জন্যে নতুন কিছু রচনার কোনো অবকাশ নেই।

কুতবী হাসানী খানদানের ব্যাপক পরিচিতি এবং এ-খানদানকে নিয়ে ব্যাপক লেখালেখির আরেকটি অন্যতম কারণ হলো এই যে, এ-খানদানে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দিতে জন্ম নিয়েছেন ভারত উপমহাদেশের বৃটিশ খেদাও আন্দোলনের বীর সেনানী, ইতিহাস-স্রষ্টা ও যুগ-নন্দিত ব্যক্তিত্ব ইমাম সায়্যিদ আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ. —সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. নামে যিনি অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, যিনি ভারত উপমহাদেশের মুসলমানকে এবং পরবর্তী লেখক-গবেষক-ঐতিহাসিকদেরকে (যাদের ভিতরে অমুসলিমও শামিল ছিলেন) নিজের ব্যক্তিত্ব, জীবন ও কীর্তির দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন— শুধু তাই নয়, বরং উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের দৃষ্টিকে এ-খানদানের উপর নিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাশাপাশি এ খানদানের পূর্বপুরুষ, তাঁদের কীর্তিগাথাও আলোকময় হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে এ-খানদানের খ্যাতি ও সম্মানকে আরো সমুচ্চতা দান করেছেন মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই রহ., যাঁর ঐতিহ্যপ্রেমী কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো نزهةالخواطر (নুযহাতুল খাওয়াতির)[1] এর মতো 'অমর-অক্ষয়' ও কালজয়ী ঐতিহাসিক গ্রন্থ! প্রায় পাঁচ হাজার কীর্তিমান পুরুষকে চিরস্মরণীয় করে রাখার শ্রেষ্ঠ প্রয়াস, যা লিখতে তাঁর সময় লেগেছিলো সুদীর্ঘ ৩০ বছর! এ-কিতাবের সুবাদে আরব দুনিয়াসহ বিজ্ঞ মহল জানতে পারে অনেক জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ মনীষীকে। হ্যাঁ .. এরপর এ-খানদান সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার অবকাশ আর রইলো কোথায়?

উত্থান-পতন যে কোনো খানদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ

এখানে স্পষ্ট করে একটা সত্য উচ্চারণ করতে চাই। হিন্দুস্তানে এ-প্রবণতা বেশ প্রকট যে, যে কোনো খানদানের আলোচনা পড়তে বসলে মনে হবে— এ-খানদান পা থেকে মাথা পর্যন্ত নির্দোষ, যাবতীয় দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। ধর্মীয় কিংবা চারিত্রিক অথবা সামাজিক ও আত্মিক

---

১. এ কিতাবটি বর্তমানে الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام নামে প্রকাশিত হয়েছে নয় খণ্ডে।

দৃষ্টিকোণ্ থেকে তারা মানদণ্ড ও আদর্শ ছিলেন। এ সব ক্ষেত্রে যাদের জুড়ি মেলা ভার, তারা জুড়িহীন—নজিরবিহীন।

এমনকি পাঠক ভাবতে বাধ্য হবেন যে, এ-খানদানের সূচনা ও বর্তমান একই ধারায় প্রবাহিত। কোথাও কোনো ছেদ পড়ে নি। কোথাও কোথাও পাঠকের মনে হবে যে, এ-খানদানে জন্ম নিয়েছেন যারা, তারা সাধারণ কেউ নয়—সবাই ছিলেন আল্লাহর কামিল ওলী। কিংবা উৎকর্ষ ও পূর্ণতায় অদ্বিতীয়। মোটকথা, এ-খানদানের সবাই যেনো 'সূর্যসন্তান' কিংবা আগাগোড়া শ্রেষ্ঠত্বের কোনো সোনালী শেকলের অবিচ্ছিন্ন কড়ায় অচ্ছেদ্য।

অথচ ইতিহাসের চিরবাস্তবতা হলো এই যে, যে কোনো সম্প্রদায়, যে কোনো জাতি, যে কোনো পরিবার এক অবস্থায় থাকে না, বরং তাদের উত্থানের সবুজ দুনিয়ায় হানা দেয় কখনো কখনো পতনের খরাও। সব যুগে সব কালে এমন ছিলো। কখনো উত্থান, কখনো পতন। কখনো শীত, কখনো বসন্ত। কাল-সমাজ-প্রশাসন কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকুল। বড়দের লালন-প্রতিপালনে কখনো গড়ে ওঠে আদর্শ প্রজন্ম, সৃষ্টি হয় তাদের বীরত্বগাথা। বড়দের উদ্দেশে নতুন প্রজন্ম আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠে—

اولئك ابائي فجئني بمثلهم   اذا جمعتنا يا جرير المجامع

আবার কখনো নতুন প্রজন্মে এতোটাই জ্ঞান ও গুণের মহাসঙ্কট নজরে পড়ে যে, শত শত মানুষের ভীড়েও কোনো 'মানুষ' পাওয়া যায় না। তখন মুখের নীরবতায় সরব হয়ে ওঠে অবস্থার ভাষা—

ذهب الذين يعاش في اكنافهم   بقي الذين حياتهم لا تنفع

যারা ছিলেন সঞ্জীবনী ক্ষমতার অধিকারী, তারা সব চলে গেছেন ওপারে,

বেঁচে আছে যারা তারা তো কোনো উপকারেই আসছে না, থেকেও নেই-মানুষ তারা।

এটাই আল্লাহর চিরন্তন বিধান। এ-বিধান সবার জন্যে প্রযোজ্য। এর বাইরে যেতে পারবে না কেউ। না কোনো সম্প্রদায়, না কোনো খানদান।

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ.

মানুষ শুধু তাই পায় যার জন্যে সে চেষ্টা করে আর তার চেষ্টা (র ফল) অবশ্যই দেখা যাবে (তার সামনে আসবে)।[১]

---

১. সূরা নাজম

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ.

(নাজাত) তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর মিলবে না, আহলে কিতাবের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরও মিলবে না। যে মন্দকর্মে লিপ্ত হবে, তাকে অবশ্যই তার সাজা পেতে হবে।[১]

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا.

লক্ষ্য করো, আমি কেমন করে কতিপয়ের উপর কতিপয়কে প্রাধান্য দিয়েছি।[২]

উপরে বর্ণিত কবিতা ও আয়াতের মর্ম কী? মর্ম হলো কেউ এ-চিরন্তন নিয়ম-নীতির বাইরে নয়, সবাই এর আওতায়। এ বাস্তবতাকেই আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করেছেন এভাবে—

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

যাকে গতিহীন—নিশ্চল করে দেয়, তার কাজ তাকে গতিময় করে দেবে তার বংশ— এটা হয় না।

আমাদের পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। এ পরিবারেও কখনো এসেছে উত্থান, কখনো পতন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে কখনো অনেক এগিয়ে যাওয়া, কখনো কেবলই পিছিয়ে পড়া। আমাদের খানদানের বর্তমান প্রজন্মের ভেতরেও পরিলক্ষিত হয় একই সময়ে একই জায়গায় থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক ভিন্নতা। বিভিন্ন সময়ে তাদের ভিতরে ধর্মীয় ও চারিত্রিক ত্রুটিও নিশ্চিত দেখা দিয়ে থাকবে। কালচক্রের কুপ্রভাব থেকেও সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বয়স হওয়ার পর আমি নিজেও অনেক কিছু দেখেছি। আমি দেখেছি, আমাদের খানদানের কেউ কেউ দুনিয়াপ্রীতির শিকার হয়ে পড়েছে। আমি আরো দেখেছি, নিজেদের ভিতরে ঝগড়া-হানাহানি (যা কখনো কখনো মামলা-মকদ্দমা পর্যন্ত গড়িয়েছে)।

কখনো দেখেছি, একে অপরকে বয়কট করে চলা (যা কখনো বছর ধরে চলতো, কেউ কারো ছায়াও মাড়াতো না শুধু শোক উপলক্ষ ও প্রিয়জনের মৃত্যুই তাদেরকে একত্রিত করতো ক্ষণিকের জন্যে।)। ইলমে দীন অর্জনে অনীহা এবং আধুনিক শিক্ষা ও পার্থিব উন্নতির প্রতি ব্যাপক ঝোঁকও আমি

১. সূরা নিসা
২. সূরা ইসরা

দেখেছি। অনেকে হেলায় তরক করেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। সামাজিক অনুষ্ঠানে অনৈসলামী রুসুম-রেওয়াজও ঢুকে পড়েছিলো। জমিদারি প্রথায় অনেকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাবও কারো কারো মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।

কিছু ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা

কিন্তু এ শূন্যতা ও অসমতলতা সত্ত্বেও যা মানব জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকে স্বভাবগতভাবেই, যা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না কোনো সম্প্রদায় ও পরিবার, হ্যাঁ, এ সব সত্ত্বেও যখনই আমি আমার পরিবারের অতীত-ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং তাদের বর্তমান ভূমিকা যখনই আমি বিশ্লেষণ করতে বসি, যার কিছু কিছু আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছি, তখন কিছু বৈশিষ্ট্য আমার চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেগুলোর কথা এখানে উল্লেখ করাটা আমি খুবই ন্যায়সঙ্গত মনে করছি। এ সব উল্লেখ করাকে আমি মোটেই পারিবারিক জাত্যভিমান মনে করি না। আল্লাহই ভালো জানেন। যাহোক; খানদানের যে-বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই সেগুলো হলো এই :

১. এ-খানদানের ইতিহাস যতোটুকু সংরক্ষিত হয়েছে এবং তার অবস্থা যতোটুকু জানা গেছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ-খানদান নিজের বংশনামা সংরক্ষণ করেছে বেশ কঠোরতার সাথে, এমনকি এ ক্ষেত্রে তারা এতোটাই বাড়াবাড়ি করেছে শরিয়ত যা চাপিয়ে দেয় নি এবং আরব জাহানসহ (যেখান থেকে সায়্যিদ বংশ-এর উদ্ভব হয়েছে) কোনো দেশেই বংশনামা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এতোটা কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি করা হয় না। কিন্তু এর কারণ কী? আমার মনে হয়, এর কারণ হলো হিন্দুস্তানের আবহাওয়া (পরিবেশ পরিস্থিতি) এবং এখানকার সমাজব্যবস্থা। নিজেদের পারিবারিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য সুসংরক্ষণ এবং এর শোণিতধারাকে পরিচ্ছন্ন রাখার আবেগও এখানে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে। কেননা, হিন্দুস্তান এমন এক দেশ যেখানে অমুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই অধিকাংশ আরব বংশদ্ভুত পরিবার নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত রাখা জরুরি মনে করে। আমি এটিকে 'বাড়াবাড়ি' বলেছি, তার কারণ আছে। কেননা, আমাদের খানদান শুধুমাত্র 'নিজেদের মধ্যে' (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের মধ্যে—হযরত হাসান-হোসাইন রা.-এর বংশধরদের মধ্যে) বিবাহ-শাদি সীমাবদ্ধ রেখেছে, এবং তা অত্যন্ত

কঠোরভাবে। হ্যাঁ, কখনো কখনো বকরী ও উমরী এবং উসমানী ও আলাভী খানদানের সাথেও বিবাহ্-শাদি সম্পন্ন হয়। কিন্তু এর বাইরে আর নয়। যদি কখনো আমাদের খানদানের কেউ অন্য খানদানে অসম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে, তাহলে খানদান সেটাকে কোনোভাবেই গ্রহণ করে না, এমনকি ভবিষ্যতে তার সাথে বৈবাহিক সুত্রের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এবং বংশনামায় পরিস্কার ভাষায় সবার উদেশ্যে লিখে দেয়া হয় যে, সে বিবাহ্-শাদির ক্ষেত্রে খানদানের নিয়ম-নীতি রক্ষা করে নি, সায়্যিদ পরিবারের বাইরে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তার সাথে সায়্যিদ পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। তবে তাকে বংশের ভিতরে গণ্য করা হবে এবং তার সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ্ থেকে সাম্যের আচরণ করা হবে।

এতে-যে খানদানের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যিক ধারা অনেকটাই অক্ষুণ্ন আছে তা জোর দিয়েই বলা যায়। বিশেষত, খানদানের বিশুদ্ধ আক্বিদা বজায় রয়েছে, তাতে কোনো রকম শিরক ও বিদ'আত অনুপ্রবেশ করতে পারে নি। পরবর্তীতে এই কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি আরো বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের ভিতরের বিবাহ্-শাদির গণ্ডি ছোট হতে হতে এতোটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছিলো যে, এর প্রভাব পড়তে শুরু করলো বাচ্চাদের স্বাস্থ্য শারীরিক শক্তি ও মেধার উপর। কিছু কিছু অসুখ বংশের রক্তের সাথে মিশে গেলো। আজ একে আক্রমণ করছে তো কাল ওকে আক্রমণ করছে। এভাবে বংশের মাঝে বংশ বিস্তার করছে। এখানে মহান খলীফা ফারূকে আজমের একটি উপদেশবাণীর কথা আমার মনে পড়ছে। এক আরব গোত্রের লোকজন ছিলো ভীষণ খাটো ও বেঁটে। দুর্বল ক্ষীণকায়। তখন খলীফা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার, তোমরা এতোটা গোটানো-যে!' তারা জবাবে বললো, 'আমীরুল মুমিনীন! এ জন্যে দায়ী আমাদের মা-বাবার নিকটত্মীয়তা!' তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'একটু বাইরের খানদানে গিয়ে শাদি করো, তাহলে সুঠাম সন্তাম সন্তান জন্ম নেবে!' উভয় দিকেই আছে শক্তিশালী দলিল ও প্রমাণ। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, সব যুগে সব কালে এটি চূড়ান্ত অনুসরণীয় নীতি হতে পারে না। বরং দেখা গেছে, কখনো এটিতে সুফল ফলে আবার কখনো ওটিতে সুফল ফলে। এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। স্থান-কাল-পাত্রের সাথে এর গভীর সংযোগ আছে বলে মনে হয়।

২. এ-খানদানের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ-খানদান হিন্দুস্তানে আগমনের[১] পর থেকে এ পর্যন্ত কোনো শরিয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডে

১. দেখুন 'সীরাতুস সাদাত' মৌলভী হাকীম সায়্যেদ ফখরুদ্দীন সাহেব খেয়ালী (রহ.)

লিপ্ত হয় নি, বরং সব সময় বিশুদ্ধ চেতনা ও নির্মল স্বচ্ছ আক্বিদা-বিশ্বাস আঁকড়ে থেকেছে। কোনো প্রকার শিরকী আমল ও বিদ'আত তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে নি। শিয়া মতবাদ থেকেও তারা পূত পবিত্র। তাওহীদের দিকে এবং সুন্নতের অনুসরণের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এ খানদানের সার্বক্ষণিক বৈশিষ্ট্য।

এর প্রমাণ হলো এই যে, এ-খানদানের কোনো আলেম-উলামা ও বুযুর্গের কবর পাকা করা হয় নি। তাঁদের কারো কবরের উপরই নির্মিত হয় নি গম্বুজ ও পাকা ছাউনি। যদি কোথাও দেখা যায় যে, কবর পাকা করা হয়েছে অথবা প্রাচীর বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, তাহলে সেটা ব্যতিক্রম। হয়তো বন্যা ইত্যাদি থেকে কবর সংরক্ষণ উদ্দেশ্য নয়তো খানদানের অজান্তেই তা করেছে কোনো মুরিদ বা ভক্ত অনুরক্ত। যে ব্যাপারে খানদানের লোকজন অবগত নয়। এ ছাড়া এ খানদান কখনোই মৃত্যুবার্ষিকী বা জন্মবার্ষিকীর কবলে পড়ে নি। কবরের কাছে গিয়ে সমাবেশ করা, শোক-তাপ করা— এসবও এখানদানের ভীষণ অপছন্দ। অথচ হিন্দুস্তানে এ বাজারটা বেশ রমরমা। সুযোগ পেলেই এখানে বুযুর্গানে দীনের কবরকে কেন্দ্র করে মানুষ মেতে ওঠে নানা শরিয়তবিরোধী 'অপরাধ' কর্মে। হ্যাঁ, এখানে আরেক কথা বলা প্রয়োজন। তা হলো এ-খানদানের প্রধান কেন্দ্র—রায়বেরেলির মাকবারার কথা। এটি নিছক একটি মাকবারা। এখানে শুয়ে আছেন এ খানদানের বড় বড় কীর্তি পুরুষ। কিন্তু গেলে বোঝাই যায় না, মাটির সাধারণ কবরে শুয়ে আছেন তাঁরা, নামটা পর্যন্ত লেখা নেই সেখানে। এ যেনো মদীনার জান্নাতুল বাকি'র মতো কিংবা মক্কা মোকাররমা'র জান্নাতুল মু'আল্লা'র মতো। মোটকথা; এ-পরিবার এখনও যাবতীয় শিরক বিদ'আত থেকে মুক্ত। ভবিষ্যতের পেটে কী লুকিয়ে আছে, সে কথা আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষ তো কিছুই জানে না, আগামীকাল কী উপার্জন করবে ও খাবে— সে কথাও মানুষ জানে না।

৩. এ-খানদানের বংশনামা ও বর্তমান ইতিহাস বলে, সব সময় এ খানদানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান ছিলো। সেটা হলো ধর্মীয় চেতনাবোধ ও জিহাদী জযবা, আরবীতে الفتوة শব্দের ভিতরে যে-ভাবটা লুকিয়ে আছে।

এই জযবা ও চেতনার বদৌলতেই এ খানদানে আবির্ভূত হয়েছেন ইতিহাসের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বড় বড় সিপাহসালার ও বীরপুরুষ। বীরত্ব ও

সাহসিকতা মিশে ছিলো যাদের রক্তের পরতে-পরতে। যারা যুগে যুগে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন জিহাদে— একের পর এক। কখনো ধন্য হয়েছেন শাহাদতের লাল পেয়ালা পান করে। শায়খ আলামুল্লাহ রহ.-এর তিন ছেলে জিহাদে অংশ নিয়েছিলো। তাঁর দু' নাতি শাহাদত বরণ করেছেন। সায়্যিদ আজিমুদ্দীন বিন সায়্যিদ আয়াতুল্লাহ এবং সায়্যিদ মুহাম্মদ জামে বিন সায়্যিদ মুহাম্মদ আহসান বিন সায়্যিদ আয়াতুল্লাহ। আরো শাহাদত বরণ করেছেন এক ভাতিজা ও এক জামাতা সায়্যিদ আবদুর রহীম বিন সায়্যিদ হিদায়াতুল্লাহ।

শায়খ আলামুল্লাহ রহ.-এর পরনাতি (নাতির ছেলে) শায়খ আবু সাঈদ ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর একান্ত শাগরেদ এবং তাঁর বিশিষ্ট খলিফাদের অন্যতম। তিনি সব সময় চাইতেন, গুরুত্ব দিতেন ইসলাম যেনো এ-দেশে প্রসার লাভ করে। ইসলামের নক্ষত্র যেনো এ-দেশের ঊর্ধ্বগগনে জ্বলজ্বল করে জ্বলে। আমরণ তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো— এ-দেশে ইসলামের জয়-অভিযাত্রা। মুসলমানদের একতা, ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল দেদীপ্যমান অবস্থান। মুসলমানদের সুস্থিতি, পারস্পরিক সম্প্রীতি। এ-বিষয়টির ধারণা নিতে পারি আমরা শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ নু'মানের একটি চিঠি থেকে। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, একবার তিনি (শাহ আবু সাঈদ রহ.) ঝুঁকি নিয়ে এক লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে হাজির হলেন। মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছিলো। তিনি এ-যুদ্ধ থামানোর পদক্ষেপ নিলেন। উভয় দলের সাথে কথা বললেন। আল্লাহর কী মেহেরবানি, যুদ্ধ থেমে গেলো। উভয় দল যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে গেলো। ইমাম দেহলভী এ-ঘটনায় খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ-সন্তোষের কথা শায়খ সায়্যিদ নু'আন শায়খ আবু সাঈদকে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েও ছিলেন, ইমাম দেহলভীর ওফাতের পর। লক্ষ্য করুন চিঠির ভাষা—

> 'মহান আল্লাহর প্রশংসা। আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, ইমাম আপনার প্রতি ভীষণ খুশি হয়েছেন। অনেক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আপনার বিষয়টা খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন, আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তিনি আবদালীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যুদ্ধোন্মাদ সঙ্গিন মুহূর্তে সেখানে আপনার পৌঁছে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আপনি যুদ্ধের সে আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন, সে কথাও উল্লেখ করেছেন।'

পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা থেকে এবং ইমাম আহমদ ইবনে ইরফান আশ শহীদ (সায়্যিদ আহমদ শহীদ)-এর জীবদ্দশায় রচিত বিভিন্ন কিতাব থেকে জানা যায় যে সুলতান টিপু —যিনি ছিলেন আল্লামা ইকবালের এ উক্তির পূর্ণ হকদারঃ 'তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানের মুসলমানদের তূনীরের শেষ তীর', যিনি ছিলেন মুসলমানের সম্ভ্রম রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, যাঁর মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিলো মুমিনের বিচক্ষণতা এবং মুজাহিদের ঈমানী চেতনা, যাঁর কাছে সিংহের জীবন নিয়ে একদিন বেঁচে থাকা, শৃগালের জীবন নিয়ে শত বছর বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম, যিনি ইংরেজ বিরোধী তুমুল লড়াইয়ে সেরিঙ্গাপটমে লড়তে লড়তে এবং লাড়াতে লাড়াতে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে ধন্য হয়েছিলেন, রক্ষা করেছিলেন আযাদির সৈনিকদের প্রিয় হিন্দুস্তানের মান-মর্যাদা— তিনি এবং তাঁর পরিবার গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন শায়খ আবু সাঈদ এর সাথে এবং তাঁর ছেলে শায়খ আবুল লাইস এর সাথে, যিনি ছিলেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এর মামা। আর এই সম্পর্ক নিছক সাধারণ পরিচয় নয়, বরং 'পীর-মুরিদী' সম্পর্ক, 'ইসলাহী সম্পর্ক'।

আর এ খানদানে জিহাদের এ আবেগময় চেতনা অব্যাহত ছিলো আলোক মিনার হয়ে ত্রয়োদশ হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। সুতরাং এ খানদানে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর মতো মহাব্যক্তিত্ব জন্ম নিলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এমন দীন-দরদি জিহাদপ্রিয় মানুষ দেওয়ার কৃতিত্ব এ-পরিবারকে দিতেই হবে। এর প্রভাব পড়েছিলো পুরো খানদানের উপরই। তাই আমরা দেখতে পাই— সায়্যিদ আহমদ শহীদ যখন জিহাদের ডাক দেন, তখন তখন শত স্বতঃস্ফূর্ততায় সবাই সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর এ-জিহাদী কাফেলায় শরিক ছিলেন তাঁর আপন তিন ভাগ্নে—সায়্যিদ হামীদুদ্দীন, সায়্যিদ আহমদ আলী ও সায়্যিদ আবদুর রহমান। তাঁর এক নাতি—সায়্যিদ হাসান মুসান্না বিন সায়্যিদ আহমদ আলী। এ ছাড়া পরিবারের আরো অনেকে, যাদের ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেনঃ সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ, সায়্যিদ আবুল হাসান নাসিরাবাদী। এদের ভিতরে বীরবিক্রমে লড়াই করে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ সায়্যিদ আহমদ আলী, তাঁর কিশোর ছেলে সায়্যিদ হাসান মুসান্না, আরো দু'জন নিকটত্মীয়—সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ ও সায়্যিদ আবুল হাসান।

পরিবারের সবাই সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর এ-জিহাদী অভিযানকে জোর সমর্থন করেছিলেন। এই হৃদয়-তাড়িত ও আবেগমথিত সম্পর্কের

উপরই রচিত হয় তোংক শহরে এ-জিহাদী কাফেলার ভিত্তি। এ-আবেগ কখনো দমে নি। এ-দীনি চেতনা কখনো নিভে নি। ছাইচাপা আগুনের মতো জ্বলছিলো তাদের হৃদয়ে। এ-জ্বলন থেকেই সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর ভাগ্নে সায়্যিদ আহমদ আলী'র এক সন্তান—সায়্যিদ আবুল কাসে তোংকীর হাতে জন্ম নেয় মিসরবিজয়ধারার জিহাদী ইতিহাস, পদ্যের ভাষায় قمقام الإسلام নামে অমর এক গ্রন্থ। এরপর এ চেতনায় জ্বলতে জ্বলতে ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর অপর ভাগ্নে সায়্যিদ হামীদুদ্দীন রহ.-এর নাতি সায়্যিদ আবদুর রাযেক কালামী কাব্যাকারে রচনা করেন صمصام الإسلام। এটি মূলত ইমাম আল-ওয়াকিদী'র সাড়া জাগানো কিতাব فتوح الشام (সিরিয়া বিজয়ধারা)-এর চমৎকার কাব্যানুবাদ, যা ২৫ হাজার কবিতা-পঙক্তির একটি দুর্লভ সমষ্টি।

আঠার শ' সাতান্ন সালে ইংরেজবিরোধী যুদ্ধ যখন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, তখন এ পরিবার পাশে দাঁড়িয়েছিলো তাদেরই, যারা ইংরেজকে এ-দেশ থেকে বিতাড়িত করতে জীবন বাজি রেখে লড়াই করছিলেন। এমনকি এ-পরিবারের একজন বিশেষ ব্যক্তি তখন ইংরেজ রোষ থেকে বাঁচার জন্যে দীর্ঘ দিন প্রত্যন্ত পল্লীতে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। তিনি হলেন আমার দাদা আল্লামা ফখরুদ্দীন রহ.। পরিবারের জন্যে ঐ সময়টা বড়ো দুঃসময়। জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নেও তাঁরা ছিলেন আপোষহীন, নিজেদের আদর্শকে তাঁরা জলাঞ্জলি দেন নি। এ জন্যে ইংরেজ-শাসিত রাজ্যের পরিবর্তে হিন্দু প্রশাসন যেমন নাগপুর ও রেওয়াঁ অথবা ইসলামী রাজ্যে যেমন হায়দারাবাদ ভুপাল তোংক-এ চাকরি করাকে প্রাধান্য দিলেন। এ সবই ছিলো এ খানদানের জিহাদী জযবা ও ঈমানী চেতনার পক্ষে সরব থাকার ছিঁটেফোঁটা নমুনা।

৪. পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের জীবনেতিহাস এবং বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এ-কথা বলাটা একেবারেই ভুল হবে না যে, এ-খানদানের সদস্যদের মাঝে চাতুর্য ও ধূর্তামি ছিলো না। আরবীতে যাকে বলা হয় الشطارة। একটু বিস্তৃত-পরিসর-ব্যখ্যায় বলা যায়, 'শাতারাহ' হলো রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি ও চাতুর্যের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন করা। চালাকি করে কাউকে 'পেছনে ফেলে' এগিয়ে যাওয়া। বরং তারা খুবই সাদাদিল ও সরল সোজা (নির্বোধ ও আহমক নয়)। জালিম হওয়ার চেয়ে মাজলুম হওয়াকেই তারা বেছে নেন। কখনো নিজেদের অধিকারের দাবি থেকে পর্যন্ত সরে আসেন। অপরের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে নিজেদের

ক্ষতিকেই মেনে নেন। কারো বিরুদ্ধে কোনো রকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া— এ তাদের ধাঁচেই নেই। ঢালাওভাবে পরিবারের সবাই এমন ছিলেন— আমি তা বলছি না। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। পরিবারের কোনো সদস্য হয়তো এ-গুণে গুণান্বিত না। বিভিন্ন সময়ে হয়তো এ-পরিবারের কোনো সদস্যের স্খলন হয়েছে, তা অসম্ভব না, দূরের কোনো বিষয়ও না। হলে হতেই পারে। আমি বলছি, ব্যাপকভাবে সবাই এমন ছিলেন সে কথা। দু'একজন ব্যতিক্রম থাকলে এ-ব্যাপকত্ব নষ্ট হয় না, হতে পারে না।

৫. পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় যে, এ-খানদান সব সময় আঁকড়ে ছিলো দু'টি জিনিস—শরয়িত ও তরীকত, যেমনটা বুযুর্গানে দীন বলে থাকেন। অর্থাৎ ইলমের ময়দানে তারা যেমন দক্ষ হয়ে ওঠার সাধনায় অক্লান্ত ছিলেন, তেমনি রুহানিয়াতের ময়দানেও তারা গভীরভাবে সম্পর্কিত। ফলে একদিকে এ-খানদানে যেমন জন্ম নিয়েছেন বড় বড় শীর্ষসারির আলেমে দীন, অপরদিকে প্রকাশ পেয়েছেন উম্মতের রাহনুমা ও মুরুব্বী, আধ্যাত্মিক জগতের ইমাম ও দিশারী, যাঁদের কারো কারো সিলসিলা অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, যার সাথে সংশ্লিষ্ট বড় বড় আল্লাহর ওলী ও বুযুর্গ। এ-খানদানের সদস্যরা, যারা সব সময় আত্মশুদ্ধি ও রুহানী মাকাম হাসিলের জন্যে উদগ্রীব ও লালায়িত থাকেন, মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভোগেন নি, স্বীয় যুগের সহীহুল আক্বিদা বা সত্যিকারের 'ছাহেবে নেসবত' বুযুর্গের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে, তাঁর গভীর ইলম রুহানী শক্তি থেকে উপকৃত হতে। নিজেদের উচ্চ বংশধারা কিংবা অহঙ্কার অথবা লজ্জা এ পথে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, দাঁড়াতে পারে নি।

হাক্বানী বুযুর্গের একটু সান্নিধ্য তাদেরকে তাড়িত করতো, এ-সান্নিধ্যের মায়ায় ও ভালোবাসায় তারা অনায়াসে মাড়াতে পারতেন মাইলের পর মাইল দুর্গম পথ। এ জন্যে ইমাম সারহান্দি (মুজাদ্দিদে আলফে সানী)-এর মহা সংস্কার আন্দোলনের পর এ খানদানের সদস্যরা তাঁর বিশিষ্ট করীফা সায়্যিদ আদম বিন ইসমাঈল বিন্নুরী (১০১৩ হিঃ) রহ.-এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে তারা সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন ইমাম সারহান্দি রহ.-এর ছেলেদের সঙ্গে, নাতিদের সঙ্গে। পরবর্তীতে ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ.-এর সময়ে সবাই সম্পর্ক গড়ে তোলেন তাঁর বড় ছেলে আবদুল আজিজ দেহলভী রহ.-এর সঙ্গে। এমনকি ইমাম দেহলভী রহ.-এর চিন্তা-চেতনা, দাওয়াত ও সংস্কার কর্মের ধারক ও বাহকে পরিণত হন তারা। এ পথে নিজেদেরকে নিশানবরদার হিসাবে তুলে ধরেন।

৬. খোঁজ-খবর নিয়ে এটাও জানা গেছে যে, কখনো এ-খানদানে সম্পদ-প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি ছিলো না। বরং তাদের জীবন ছিলো অনাড়ম্বর, দারিদ্র্যের ছায়া জড়ানো, কখনো কষ্ট মোড়ানো। কারো এতোটা সচ্ছলতা ছিলো যে, জরুরত সেরে যেতো, না বেশি না কম। এ অবস্থা যেনো ছিলো মহান পূর্ব পুরুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দু'আরই বাস্তব রূপ, যিনি বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদের পরিবারের রিযিক বরাদ্দ করো
শুধু ততোটুকুই, যতোটুকুতে তাদের প্রয়োজন সেরে যাবে,
একটুও বেশী হবে না!

এই হলো পরিবারের কিছু বৈশিষ্ট্য, যা বেশ খোঁজ-খবর ও ঘাঁটাঘাটি করে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, দৃষ্টান্ত পেশ করারও চেষ্টা করা হয়েছে। যা কিছু উল্লেখ করা হলো তার সবই শত ভাগ বিশুদ্ধ ও সত্য— এমন দাবি করা যায় না। অজান্তে ও অনিচ্ছায় কোনো ও চিন্তা ঢুকে পড়লে পড়তেও পারে। এর থেকে কে-ই বা পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে পারে! মন তো কতোকিছুই কল্পনায় নির্মাণ করে চলে, বাস্তবের চোখে তাকালে কেবলই খাঁ-খাঁ শূন্যতা! ইমাম শাফেয়ী বড়ো চমৎকার বলেছেন :

وعينُ الرِّضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ

وَلٰكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

প্রিয়জনের দোষ খুঁজে খুঁজে দৃষ্টি ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু কোথায় দোষ! কিন্তু কী আশ্চর্য! বিরাগভাজনের সব গুণই হয়ে যায় দোষ! তার দোষ প্রচারই যেনো নেশা!

দাদা-নানার কথা, তাঁদের নিকটাত্মীয়তার সেই ইতিহাস

আমার এই আত্মকথায় আমার দাদা সায়্যিদ ফখরুদ্দীন আল-হাসানীর কথা বলবো না। আমার নানা জিয়াউন্নবী আল-হাসানীর কথা বলবো না। বলার কোনো প্রয়োজন আসলে নেই। কেননা, তাঁদের কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে আমার কিতাব حياة عبد الحي এবং আমার আব্বার কিতাব نزهة الخواطر গ্রন্থে। না, আমার আব্বা-আম্মার কথাও বলার প্রয়োজন মনে করছি না। তা ছাড়া সমুদ্রকে ছোট্ট একটা পাত্রে জমা করা কী করে সম্ভব?

তবে আমার আব্বার পরিবার আর আমার আম্মার পরিবার কেমন এক সঙ্গে মিশে গেলো, সে কথা আমাকে বলতে হবে, অথচ এ-দুই পরিবার খানদানের দু'টি পৃথক শাখা। আর এ-সম্পর্কে আল্লাহ্ যে বরকত ঢেলে দিয়েছিলেন, তা এক বিরাট নেয়ামত। এ ক্ষেত্রে আমি আম্মাজানকে নিয়ে লেখা ذکر خیر থেকে কিছু উদ্ধৃতি টানবো। এখানে আছে অনেক শিক্ষা। অনেক উপদেশ।

'খানদানের ভিতর আমার নানার পরিবার ছিলো বেশ সুখ-সচ্ছল, খাওয়া-পরার কোনো অভাব ছিলো না। কিন্তু আমার দাদার পরিবার ছিলো ঠিক তার উল্টো, এ-বাড়িতে দারিদ্র্যের ছাপ সব সময় লেগেই থাকতো। নেই ভূ-সম্পদ। নেই জমিদারি। বরং এখানে এ সবের পরিবর্তে ছিলো কিতাবের ভাণ্ডার। ইলম। বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় এ-ইলম চলে আসছিলো এ পরিবারে বহুদিন ধরে। এ কিতাব ও ইলমই ছিলো এ পরিবারের সবচে' বড় ভূ-সম্পদ ও জমিদারি। এ-ই স্থানান্তরিত হয়ে আসছিলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়টায় পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। আমার দাদা ছিলেন একজন নামীদামী চিকিৎসক (হাকিম)। বড়োই বিদ্বান ব্যক্তি ও প্রখ্যাত লেখক।

কিন্তু জীবিকা ও অর্থের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিলো না। এর পরোয়াও করতেন না তিনি। তাই দিনের পর দিন চলে যেতো আর তাঁর 'চুলায় আগুন জ্বলতো না'। সকাল গড়িয়ে যাচ্ছে, সকালের নাস্তা নেই। দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে, দুপুরের খাবার নেই। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে, রাতের খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই।

আমার বাবা প্রথমে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার প্রশাসন ও ব্যাবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। মাসে পেতেন ত্রিশ/চল্লিশ রুপি। এটাও তিনি এক সময় নেয়া ছেড়ে দিলেন। ঠিক এই অবস্থায় দাদাজানের পক্ষ থেকে তাঁর ছেলের জন্যে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা হলো সায়্যিদ জিয়াউন্নবী কাছে তাঁর মেয়ে খায়রুননেসার জন্যে। উল্লেখ্য যে, এটা ছিলো দ্বিতীয় বিবাহ। তখন আমার নানী বেশ দ্বিধায় পড়ে গেলেন, 'হ্যাঁ' বলবেন না 'না' বলবেন। মহিলারা এ সব ক্ষেত্রে বড়োই দূরদর্শী ও সূক্ষ্মানুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে। দোদোল্যমানতায় ভুগতে থাকে, ভালো-মন্দ চিন্তায় তলিয়ে যায়। এদিকে ঘরের পাশে ঘর, তাই দাদার ঘরের অবস্থা তার অজানা থাকার কথা

নয়। আর পূর্ব থেকেই তাঁর মেয়ে খায়রুননেসার জন্যে চাচাতো ভাইয়ের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসে ছিলো, যিনি ঐ জেলার ছোটখাট একজন তালুকদার (জমিদার) ছিলেন।

সুতরাং 'দারিদ্র্য-বিরাজিত' ঘরের প্রস্তাব তিনি বিবেচনায় আনবেন না—এটাই প্রত্যাশিত ছিলো যদিও বংশমর্যাদায় এ বিবাহ একেবারেই উপযোগী ও সমকক্ষ। তবুও জেনেশুনে মেয়েকে তো আর অভাবের মুখে ঠেলে দেয়া যায় না। তো ছিলো আমার নানী'র দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা। অপরদিকে পরিবারের মূল কা-ারী নানা সায়্যিদ জিয়াউন্নবী আল-হাসানী এ প্রস্তাবকে কীভাবে নিয়েছিলেন? নানা বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। বাবা ছিলেন তাঁর ছাত্র। বাবার নৈতিক ও চারিত্রিক জীবনটা অনেকটা তিনিই গড়ে দিয়েছেন। নানার কাছে বাবার ইলমী যোগ্যতা ও গভীরতার কথা অজানা ছিলো না। তাই প্রস্তাবের কথা শুনতেই তাঁর চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিলো। মুখাবয়বের আনন্দ রেখাগুলো দ্যুতিময় হয়ে উঠেছিলো। তিনি যেনো কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পেয়ে গেছেন! তাই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নানীকে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, অমন সুকর্মঠ যুবক, অমন সুযোগ্য আলেম কোথায় পাবো আমি! আমি একেই প্রাধান্য দেবো। আমার কাছে দারিদ্র্য ও সম্পদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইলম ও সততা।

নানীর মাঝে যখন সিদ্ধান্তহীনতা ও দ্বিধা কাজ করছিলো তখন আমার মা দেখলেন এক মুবারক স্বপ্ন, যে স্বপ্নে তাকে আমার বাবার গৃহে চলে আসার প্রচ্ছন্ন ইশারা দেয়া হয়েছে! আরো যেনো তাকে বলে দেয়া হয়েছে, এ-দুই ঘরের মিলনে, এ-দুই পরিবারের বন্ধনে রয়েছে অনেক মঙ্গল ও কল্যাণ। এছাড়া এ সময়টায় তিনি আরো সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। সবই ছিলো এক সুসংবাদ। (প্রায়ই তিনি এ ধরনের নেক খাব দেখতেন।) পরবর্তীতে এ সব স্বপ্নের কথা যখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তখন তার চেহারায় যেনো আনন্দ ঝিলমিল করে উঠতো! এক স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগ প্রকাশ করেছেন এভাবে—

এক রাতে আমি দেখলাম, আল্লাহর অপার অনুগ্রহে একটা আয়াত আমি পেয়েছি। আমি তা তিলাওয়াত করতে লাগলাম, আওড়াতে লাগলাম, একেবারে সকাল পর্যন্ত। কিন্তু ভয়ে কাইকে তা জানাচ্ছিলাম না। পড়ে তো যাচ্ছি, কিন্তু অর্থ কী তা জানি না। অর্থ জানতে গিয়ে দেখলাম, বড়ো সুন্দর অর্থ! মনটা আনন্দে হরষে ভরে গেলো। ভুলে গেলাম সব ব্যথা-বেদনা। গর্বে

বুকটা ফুলে উঠলো। এরপর যার কাছেই এ-স্বপ্নটা বলেছি সে-ই আমাকে ঈর্ষা করেছে! আর আমার পিতা তো শুনে আনন্দে কেঁদেই ফেললেন। আয়াতটা হলো এই—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

> কেউ বলতে পারে না, তাদের জন্যে কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে চোখজুড়ানো মন ভরানো, নয়নপ্রীতিকর তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে।[১]

শেষ পর্যন্ত আমার নানাই বিজয়ী হলেন। তাঁর চাওয়াই স্থির হলো। পূর্ণতা অর্জন করলো এ-মুবারক সম্পর্ক। নিরাপদে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। সময়টা ছিলো ১৩২২ হিজরী—১৯০৪ ইংরেজি। সবচে' বেশি খুশি ছিলেন দাদাজান। তিনিই তো এই সম্পর্কের মূল 'স্বপ্নদ্রষ্টা' ছিলেন! এখন এই সম্পর্ক রচিত হয়ে যাওয়াতে তাঁর আনন্দই তো বেশি হবে! সুনির্বাচনের আনন্দ বড়ো মধুময়![২]

আমার জন্মের পূর্বে আমাদের ঘরের চিত্র

মা এলেন নতুন ঘরে। এসে দেখলেন— যা শুনেছেন তাই। সর্বত্র অভাব-অনটনের সুস্পষ্ট ছাপ। মাঝে মধ্যে আসে সচ্ছলবেলা, কিন্তু সেও যেনো সকাল বেলার শিশির—এই চিকিচিক করছে, একটু পরই কোথায় মিলিয়ে গেছে, যেনো ছিলোই না। ঘরে মানুষ একাধিক, এদিকে আয়-রোযগার একেবারেই সীমিত। ওই দিকে নানীর দুশ্চিন্তার যেনো অন্ত নেই। সারাক্ষণ ভাবছেন আর ভাবছেন— 'নতুন বাড়িতে আমার মেয়েটা কষ্টে নেই তো! ও কি কিছু খেয়েছে? না-কি উপোস?' এ সবই অপার মাতৃস্নেহ। কখনো তিনি পাঠিয়ে দিতেন কোনো খাদেমাকে, 'যাও, দেখে এসো তো,

---

১. সূরা সেজদা

২. আমার দাদা ও নানা উভয়েই গভীরভাবে একে অপরকে ভালোবাসতেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন নিকটাত্মীয় ও পীরভাই। উভয়েই বায়আত হয়েছিলেন হযরত শায়খ খাজা আহমদ নাসিরাবাদী রহ.-এর হাতে। শেষ পর্যন্ত উভয়ে তাঁর খেলাফতও লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁদের সম্পর্ক ছিলো সুগভীর। আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং রুহানী সম্পর্ক। আর আমার বড় ভাই তখন ছিলেন ১১ বছরের বালক। এই সম্পর্ক রচিত হওয়ার পর আমার আম্মা তাঁকে আদর-স্নেহে কাছে টেনে নেন,তাঁর দ্বিতীয় মা হয়ে যান।

ঘরে কিছু পাক হচ্ছে কি না!' আমি মা'র কাছে অনেক বার শুনেছি এ-'গল্প'। মা বলেছেন, 'যখনই আমি দেখতাম ওখান থেকে কেউ আসছে, চুলোয় হাড়ি বসিয়ে জ্বাল দিতে শুরু করতাম, যাতে ও বুঝতে পারে কিছু পাক হচ্ছে। অথচ হাড়িতে তখন পানি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।' নানী ছিলেন বুদ্ধিমতি। প্রয়োজনের কথা টের পেয়ে যেতেন। তখন খাদেমাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

কিছুদিন পরের কথা। আব্বা আবার রুগী-দেখা শুরু করার কথা চিন্তা করলেন। আম্মা বলেন, তিনি এ ব্যাপারে আমার কাছেও পরামর্শ চাইলেন। আমি খুব জোরালোভাবে তা সমর্থন করলাম। বাস্, তিনি 'চেম্বার' খুলে বসলেন। রুগী দেখা শুরু করলেন। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আমাদের পেরেশানি দূর হয়ে গেলো। আয়-রোযগার ক্রমেই বাড়তে লাগলো। আল্লাহর কী মেহেরবানি, কয়েকদিনের মধ্যেই এমন বরকত শুরু হলো যে, ঘরের চিত্রই বদলে গেলো! আম্মা সাহস করে আমাদের 'জীর্ণ' ঘরটাতেই হাত দিয়ে বসলেন, যার প্রায় পুরাটাই মাটির ছিলো। দেখতে দেখতে তা একটা পাকা হাবেলীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। আমার মায়ের পরশে শুধু ঘর নয়, অনেক কিছুই বদলে গেলো।

আমার দুই ফুপুও পেয়েছিলো মায়ের পরশ। স্নেহছায়া। একজন হলেন সায়্যিদা শামসুননেসা, তাঁর স্বামী ছিলেন মাওলানা সায়্যিদ তালহা রহ.। অপরজন ছিলেন সায়্যিদা ফাতেমা, তাঁর স্বামী ছিলেন সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ হাসানী রহ.। সবচে' বেশী পরশ পেয়েছিলেন আমার বড় ভাইজান ড. সায়্যিদ মাওলানা আবদুল আলী রহ.। তাঁকে মা এমন নিবিড় স্নেহমমতায় লালন-প্রতিপালন করতে লাগলেন যে তিনি (আপন) মায়ের কথা ভুলে গেলেন।[১] আমার আম্মার আদরে, স্নেহে, ভালোবাসায় আর আপ্যায়নে আমাদের আগের সেই খাঁ-খাঁ শূন্য বাড়িটা ক্রমেই কলরবমুখর হয়ে উঠতে লাগলো। তাঁর স্নেহপরশে এসে তাঁকেই সবাই মা বলে মেনে নিলেন। আগে যে ঘরের বাসিন্দারাই কখনো কখনো না খেয়ে বেলা কাটাতেন, এখন সে ঘরেই মেহমানের মুবারক সিলসিলা লেগে থাকে। রায়বেরেলি, লখনৌ'র কাছের ও দূরের আত্মীয়দের এটাই এখন আশ্রয়স্থল—আদুরে ঠিকানা!

এ-বাড়িতেই ১৩২৪ হিজরীতে/১৯০৬ ইংরেজির জুনে জন্ম গ্রহণ করেন আমার বড় বোন সায়্যিদা আমাতুল্লাহ তাসনীম (সায়্যিদ মাহমুদ হাসান,

---

১. ভাইজানের আম্মার যখন ইন্তেকাল হয় তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র আট। আর আমার আম্মা যখন এ-বাড়িতে আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো এগার।

সায়্যিদ মুহাম্মদ সানী রহ. এবং সায়্যিদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী ও সায়্যিদ মুহাম্মদ ওয়াজেহ রশীদ এর মা)। আর ১৩২৫ হিজরী/ ১৯০৭ ইংরেজিতে আমার দ্বিতীয় বড় বোন জন্ম গ্রহণ করেন। আমারও জন্ম হয় এখানে ১৩৩৩ হিজরী/১৯১৪ ইংরেজিতে।

দায়েরায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্ বা তাকিয়াকেলাঁ

আমার স্মৃতিজড়ানো শৈশবের কথা এবং তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতির কথা আলোচনা করার আগে আমি এখন একটু আলোচনা করতে চাই তাকিয়াকিলাঁ নিয়ে। তাকিয়াকিলাঁ ছোট্ট এক বস্তি—গ্রাম, যার ভিত্তি রচিত হয়েছিলো আরিফবিল্লাহ পীরে কামেল সায়্যিদ আলামুল্লাহ হাসানী নকশবন্দী—খলীফা শায়খ সায়্যিদ আদম বিন্নুরী রহ.-এর হাতে। কেনো চোখ পড়লো তাঁর এই বিরান এলাকায়? শহর-বিচ্ছিন্ন এই অজপারাগাঁয়? সে কথাই আসল কথা। যে উদ্দেশ্যে মক্কার বিরান এলাকা আবাদ করতে ছুটে এসেছিলেন তাঁর মহান পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ঠিক সে একই উদ্দেশ্যে তিনিও এখানে এসে পা রাখলেন। যে মহান উদ্দেশ্যটা পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে বরং শত ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে পবিত্র আয়াতের এই অংশে (ربنا ليقيموا الصلوة)! কেননা, এই ছোট্ট বস্তি এমন সব বড় বড় আলেম বুযুর্গ ও মুজাহিদ জন্ম দিয়েছে, যাঁরা সব বিচারেই ছিলেন অনেক বড়। সবার মাঝে যে নামটি সবচে' বেশি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ধ্রুব তারার মতো তা হলো ইমাম আহমদ ইবনে ইরফান আশ শহীদ রহ.-এর নামটি!

আপনি রায়বেরেলি শহর থেকে সোজা পূর্ব-উত্তর দিকে চলে আসুন, এক মাইল বা আরো কম, দেখতে পাবেন ছোট্ট একটা আবাদি—বস্তি—গাঁ। কুতবী সায়্যিদ বংশের হাতে-গোনা কয়েক পরিবারের বসবাস এখানে। একেবারে 'সাঈ নদী'র কোল ঘেঁষে। শহরের সাথে কোনো সংযোগ সড়ক নেই। আছে শুধু ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে-যাওয়া একটা চিকন সরু পায়ে-চলা পথ, একটুখানি বৃষ্টি হলেই কাদায় কাদায় সারা। চলাই হয়ে যায় দায়।[১]

এ ছোট গাঁয়ে সব মিলিয়ে আট ঘরের বাস ছিলো। এঘরগুলোর পশ্চিম-দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই ঐতিহাসিক বরকতময় মসজিদটি, যার

১. এখন অবশ্য শহরের সাথে যোগাযোগের পাকা সড়ক হয়েছে। কিন্তু আগের সেই মেঠো পথটা এখনও আছে।

নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিলো ১০৮৩ হিজরীতে শায়খ সায়্যিদ আলামুল্লাহ রহ.-এর মুবারক হাতে। এর ভিত্তিমূলে জমজমের পানি ঢালা হয়েছে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় কা'বার আকৃতিতে বানানো হয়েছে। শুধু কা'বার চেয়ে কয়েক আঙুল নিচু রাখা হয়েছে, আদব রক্ষার্থে। কোনো মিনার নেই, কোনো গম্বুজও নেই। এ মসজিদই ছিলো মাদরাসা, মুসাফিরখানা। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর যুগে এই মসজিদই ছিলো মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ শিবির, তাদের বিশ্রামস্থল। এ ছাড়া তাদের আর জায়গাও ছিলো না। মসজিদের পাশেই বেষ্টনীর ভিতরে খানদানের মাকবারা। কিন্তু সেখানে কোনো কবরই পাকা নয়। এমনকি কারো নাম-পরিচয়ও লেখা নেই।

মসজিদের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ঐতিহাসিক সাঈ নদী। দেখতে মনে হয় ছোট্ট ও অতি সাধারণ। মোটেই বিপজ্জনক না। কিন্তু বৃষ্টির পানিতে যখন বন্যাময় যৌবন ফিরে পায় তখন এই ছোট্ট নদীটাই একেবারে ফুঁসে ওঠে। বানের পানিতে দু'কূল ছাপিয়ে স্রোতধারা বয়ে যায়। গরমের সময় বিকেলে মসজিদের দক্ষিণ পাশ এবং সাঈ নদীর তীরে এসে গাঁয়ের সবাই ভীড় করতো। নদীর শীতল পানির উপর দিয়ে বয়ে চলা হিমেল হাওয়ায় গা জুড়াতো। বয়স্করা ছাড়া সবাই এখানে এসে বসতো একটা ছায়াময় ফুল গাছের নিচে। কেউ-বা আবার মেতে উঠতো গোসলে। সাঁতারুরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনে মরিয়া হয়ে উঠতো। অন্যদেরকে 'ফি সাবীলিল্লাহ' সাঁতার শেখাতে তাদের আগ্রহের কোনো সীমা ছিলো না, যেনো এ এক বিরাট সওয়াবের কাজ। কেউ শিখতে না-চাইলে এবং 'পালিয়ে' গেলে তাকে গিয়ে ধরে আনা হতো এবং সাঁতার শেখানোর কসরত চালানো হতো।

অবশ্য সাঈ নদীতে যেহেতু বন্যা হয়, তাই সাঁতারটা শিখে রাখতে পারলে খুবই ভালো। এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে ওদের সাঁতার শেখানোর কাজটা খুবই ভালো ছিলো। এখানে সবারই কম-বেশি সাঁতার জানা উচিত। সাঁতার শেখানোর প্রতিযোগিতায় বেশি এগিয়ে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাইজান সায়্যিদ হাবীবুর রহমান। সন্ধ্যা পর্যন্ত সাঈ নদীর তীরে এ ভীড় লেগে থাকতো। এরপর যে যার কাজে ঘরে ফিরে যেতো। নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে ছিলো আমবাগান। এটি ছিলো দাদাজান ও তার সন্তানদের মালিকানায়। আমের মওসুমে নদী টইটম্বুর থাকতো। তখন নদীটি অনেক বড় ও প্রশস্ত দেখাতো। সাঁতারুরা ওপারে আমবাগানে গিয়ে উঠতো। আর আচ্ছামতো আম খেয়ে ফিরতো।

গাঁয়ের পশ্চিম দিকে ছিলো একের পর এক বাগিচা। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো দু'টি খেজুর গাছ মাথা উঁচু করে। যেনো ওরা জানান দিচ্ছিলো এ-খানদানের আরব শিকড়ের কথা, যে খানদান খেজুর গাছের ছায়ায় বেড়ে ওঠে। খেজুর গাছ মিশে আছে তাদের চেতনার অনেক গভীরে। এ ছাড়া পূর্ব ও উত্তর দিকে ছিলো সবুজ ফসলের ক্ষেত অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সবুজের মাঝে এ ছোট্ট গাঁ'টাকে মনে হতো যেনো সবুজ সমুদ্রে একটা ছোট্ট দ্বীপ ভাসছে। বৃষ্টির দিনে এ শোভা আরো বর্ণিল ও রূপময় হয়ে উঠতো। কিন্তু কিছুদিন পর পর ধেয়ে আসা বন্যা সব মাটি করে দিতো—এ-মনোরম ও ঈর্ষণীয় জায়গার এবং এ-দৃষ্টিকাড়া ও মনোলোভা প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের কর—খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় উসূল করে নিতো! তখন অধিকাংশ বাসিন্দাকেই এ-প্রিয় আবাসভূমি ছেড়ে শহরে কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো উঁচু গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে হতো। গ্রামের বাসিন্দারা কখনো কখনো এমন চিন্তাও করেছেন যে, এ-গ্রাম ছেড়ে একেবারেই তারা চলে যাবেন নিরাপদ কোনো উঁচু এলাকায়। কেননা, বন্যাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি এবং বন্যা এলেই বাধ্য হয়ে অন্য জায়গায় ছোটাছুটি—এ বড় বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক। কিন্তু এ-গ্রামের 'মাটিপ্রেম' মসজিদ ও কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। এ ছাড়া এ-জায়গাটার এমন কিছু বাড়তি সুবিধে আছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

এভাবেই এখানে—এই প্রিয় বস্তিতে এ-খানদান ইতিমধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে ৩০০ বছর। ভবিষ্যতে কী হবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

তাকিয়াকিলাঁ'য় আমার শৈশবের দিনগুলো

কিছু ঘটনা, কিছু মানুষের মুখ

আমার জন্মের পর সবচে' বেশি আলোচিত ঘটনা হলো ১৯১৫ সালের ভয়াবহ বন্যা। তিনশ বছরের ইতিহাসে এরকম বন্যা আর হয় নি। ভয়াবহতার দিক থেকে এ বন্যা ছিলো নূহ আলাইহিস সালাম-এর বন্যার একটা ছোট্ট রূপ। আমি তখন অনেক ছোট, মাত্র এক বছর ক' মাস। এ-বন্যাটা যে এতো ভয়াবহ রূপ নেবে কেউ বুঝতে পারে নি। বন্যার বাঁধভাঙা পানি দেখে সবাই আঁতকে উঠেছিলো। ঘর-দোর সব সয়লাব। করুণ অবস্থা। এখানে থাকার কোনো উপায় নেই। কোমর পানি ভেঙে বেরুতে হলো সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সবচে' বেশি কষ্ট হচ্ছিলো নারী ও শিশুদের। এ-খানদানের নারীরা তো বাড়ির বাইরে বেরই হয় না। সেখানে

এমন এক অবস্থা যে, এখন শুধু বের হলেই চলবে না, কোমর পানি ভেঙে যেতে হবে বেশ দূরে, নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। পর্দা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। অনেক চেষ্টা করে দু'টি পালকির ব্যবস্থা করা গিয়েছিলো। সেখানে দুধশিশুদের নিয়ে 'আশ্রয়' নিলেন কয়েকজন মহিলা। এই দুধশিশুদের একজন ছিলাম আমি। শুয়ে ছিলাম আমার ছোট ফুপুর কোলে। ফুপুর বিবাহ হয়েছে এই ক' মাস আগে। আমি শুনেছি; এ-করুণ অবস্থা দেখে খানদানের মুরুব্বীরা বিশেষত সায়্যিদ খলীলুদ্দীন এবং সায়্যিদ আমীনুদ্দীন চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি, তাঁরা এটিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'কর্মফল' ও সতর্কবার্তা হিসাবে বিবেচনা করছিলেন।

আল-হামদুলিল্লাহ! জান-মালের বিশেষ কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। শুধু আমাদের আধপাকা ঘরটি ধ্বসে পড়েছিলো। আরেকটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, খানদানের বড়রা এ কঠিন মুহূর্তেও অস্থির হয়ে যান নি, বরং সচেতনতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন। তাঁরা এ-লবেজান অবস্থায়ও ভুলে যান নি সেই আবাদ কুতুবখানার কথা ভুলেন নি, যেখানে ছিলো অনেক মূল্যবান হস্তলিপি, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন ফরমান, নথিপত্র, ফতওয়া— যার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাবে না। এ-সব সঙ্গে করে নিয়ে যেতে তাঁরা ভুলেন নি। তাঁরা এসব সংরক্ষণ করাকে জীবন-বাঁচানোর চিন্তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপির গায়ে এখনো দৃশ্যমান সেই বন্যার ছাপ।

অবশ্য ১৯২১ সালে এরচে' একটু কম ভয়াবহ আরেকটা বন্যা তাকিয়াকিলাঁয় আঘাত হেনেছিলো। তখন আমি ছয়/সাত বছরের বালক। তখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমরা পার্শ্ববর্তী ময়দানপুরে গিয়ে উঠেছিলাম। আব্বা যান নি কোথাও, তাকিয়াতেই থেকে গিয়েছিলেন। আব্বার ওফাতের পূর্বে তাকিয়াকিলার শুরু-শৈশবের কথা আমার মনে পড়ে না। স্বপ্নের মতো আবছা-আবছা মনে পড়ে সে মহিলার কথা, যে আমাকে খাইয়ে দিতো, আদর করে করে। ওর নাম ছিলো চিপরাসন। রায়বেরেলিতেই ওদের বাড়ি ছিলো। ওর কবর হোক সার্বক্ষণিক 'ফুলশয্যা'। ও বড়ো স্নেহময়ী ছিলো, সোহাগে ছিলো। আমাকে হাসিখুশি ও আনন্দিত রাখা যেনো ওর একটা বিরাট দায়িত্ব ছিলো।

আমার আরো মনে পড়ে, সে সময় আমার চোখের ও চুলকানির সমস্যা ছিলো। বিভিন্ন 'চাকসু' এবং 'সাফিদা' ঢেলে আমার চোখের চিকিৎসা করতে গিয়ে গুরুজন আমাকে-যে কী কষ্টে ফেলতেন, সে কথা এখনো মনে পড়ে।

আরো মনে পড়ে আমার সেই খালার কথা, যিনি আমাকে এক বুড়ির কাছ থেকে সন্ধ্যাবেলায় রুটি ও কাবাব কিনে খেতে দিতেন। আমাদের ঘরের মেরামত চলছিলো, তখন আমরা ছোট মামা সায়্যিদ উবায়দুল্লাহ্ সাহেবের ঘরে থাকতাম। মামা আম্মাকে খুব স্নেহ করতন। আমার মামাত ভাই ছিলো আমার মতো ছোট। কিন্তু মনে পড়ে, মামা আমাকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। ভাইটির নাম ছিলো সায়্যিদ মুস্তফা। মামীও আমাকে ভীষণ আদর করতেন।

আমার মামা সায়্যিদ উবায়দুল্লাহ্ রহ.-এর কথা আরেকটু খুলে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, নইলে আমার কলম সামনে চলবে না। আমার কিতাব 'পুরানে চেরাগ'-এ তাঁকে নিয়ে মন ভরে লিখেছি। সেখান থেকে একটু উদ্ধৃতি টানছি। তাকিয়কিলাঁয় সবার কাছেই তিনি ছিলেন আপন মানুষ। প্রিয় ব্যক্তিত্ব। স্নেহ-কাতর নিঃস্বার্থ অভিভাবক। আমার মানসিক ও নৈতিক তারবিয়তে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। তাঁকে নিয়ে আমি যতোই বলি বা লিখি, তাঁর ঋণ সহজে শোধ হবে না। এমন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ স্নেহশীল অভিভাবক পাওয়া সত্যি সৌভাগ্য, মহা সৌভাগ্য।

'আমার মামা হাফেজ উবায়দুল্লাহ্ ছিলেন সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। বিস্ময়কর মুগ্ধতা ছড়িয়ে অল্পক্ষণেই তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিতেন। তাঁর যোগ্যতা ও গুণ ছিলো অনেক। বরং তাঁর সম্পর্কে বড়দের মন্তব্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন ইসলামী যিন্দেগীর এক চলন্ত নমুনা। কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিলেন, ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে চিত্তাকর্ষকভাবে তিলাওয়াত করতেন। হিফজ পড়েছিলেন তিনি জৈনপুরে, মাওলানা আবুল খায়র মক্কী সাহেবের কাছে। আরবী পড়েছেন লখনৌতে। নাহু-ছরফে খুব দক্ষ ছিলেন। আজীবন পাঠ-অনুরাগী ছিলেন। আরবী-ইংরেজি উভয় ভাষায় যোগ্যতা ছিলো। উভয় ভাষার কিতাব অভিধানের সাহায্য নিয়ে পড়তে পারতেন। হাতের লেখা ছিলো দেখার মতো, যেনো সাজানো মোতি। লেনদেন ছিলো ভীষণ পরিচ্ছন্ন। আমানতদারি ও আচরণিক স্বচ্ছতার কারণে পরিবারে তাঁর অনেক খ্যাতি ও সুনাম ছিলো। এ জন্যে মানুষ নির্দ্বিধায় তাঁর কাছে আমানত রাখতো, অর্থ-সম্পদ ও মূল্যবান জিনিস গচ্ছিত রাখতো। অলসতা ও কর্ম-উদাসীনতার হাওয়াও তাঁর গায়ে লাগে নি। অনেক ভূ-সম্পদ ও জেলার মধ্যে অন্যতম জমিদার হওয়া সত্ত্বেও বড়ো কর্মঠ পরিশ্রমী সময়ানুবর্তী ও উদ্যমী ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে নিজের কাজ তদারক করতেন। মহল্লার

মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াতেন। কেউ তাঁকে মসজিদে দেখলে ভাবতো, দুনিয়ার সাথে মনে হয় এই ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক নেই। আবার যখন কেউ তাঁকে নিজের বিষয়-সম্পত্তি তদারক করতে দেখতো .. সেখানে কর্মমুখর দেখেতে পেতো, তখন সে ভাবতে বাধ্য হতো, এই ব্যক্তির যে অবস্থা, মনে ঠিকমতো নামাজও পরতে পারে না। অথচ বাস্তবতা হলো, তিনি কোনোটিতেই অবহেলা করতেন না।

তিনি সীমাহীন বিনয়ী ছিলেন। উন্নত নৈতিকতা মিশে ছিলো তাঁর প্রতিটি আচরণে। ছোট-বড় সবাইকে তিনি মুগ্ধ করতেন নিজের অমায়িক ব্যবহারের পরশে। নমুনা দেখুন, যখন ছোটরা তাঁর কাছে আসতো, যাদেরকে তিনি নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতেন .. ভালোবাসতেন, তখন তিনি শোয়া থাকলে পা গুটিয়ে নিতেন, উঠে বসে যেতেন। কামলাদের সাথেও কখনো শক্ত ভাষায় কথা বলতেন না। কারো মনে কষ্টে দেয়া— সে ছিলো অকল্পনীয়। সম্ভবত এটা তাঁর ধাঁচেই ছিলো না। তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম-অমুসলিম, কৃষক-মজুর সবার মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছিলো। আমার বেশ মনে আছে, যখন তাঁকে সমাহিত করা হলো, তখন অমুসলিম মজুর ও কৃষকেরা লজ্জা-জড়িত পায়ে ভয়-কাতর কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলো, আমরা কি তাঁর কবরের পাশে একটু দাঁড়াতে পারবো? এটা ছিলো আসলে তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। ৩রা মে ১৯৩৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। খানদান এবং আশপাশ এক বরকতময় মানুষের ছায়া হারায় চিরতরে।'[১]

পরিবারের আরেকজন সম্মানিত ও ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন আমার চাচাজান। তাঁর নাম মাওলানা সায়্যিদ খলীলুদ্দীন। ভাতিজা-ভাগ্নে-নাতি-নাতনি সবাই তাঁকে আব্বাজী বলতো। তাঁর অনেক গুণ ছিলো। তিনি ছিলেন ভাবগম্ভীর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। স্নেহশীল ও সদাচারী। দক্ষ ব্যবস্থাপক। নিজের আদর্শে সদা অবিচল। পারিবারিক সুন্নী আদর্শ ও ঐতিহ্যের দৃঢ় অনুসারী। ১৩১২ হিজরীতে (১৮৯৫) তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গূহী রহ.-এর কাছে গমন করেন এবং তাঁর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আজীবন সে সিলসিলার উপরই তিনি অটল ছিলেন। রায়বেরেলি শহরের মানুষ তাঁকে খুব জানতো। আমাদের গাঁ তাকিয়াকিলাঁ তাদের কাছে পরিচিত ছিলো 'খলীল সাহেবের তাকিয়া' হিসাবে।

---

১. পুরানে চেরাগ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩২১-৩২৩

আমি যে সময়ের আলোচনা করছি তখন পরিবারের মহিলাদের ভিতর কুরআনুল কারীম হিফজ করার একটা ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। আমার ছেলেবেলায় পাঁচজন মহিলা হাফেজা ছিলেন। আমার বড় খালা। আমার আম্মা। আমার মামানি (হাফেজ সায়্যিদ উবায়দুল্লাহ রহ.-এর স্ত্রী এবং সায়্যিদ আবুল খায়র রহ.-এর আম্মা)। আমার এক ফুপু, বন্যার সময় যিনি আমাকে পাল্কীতে কোলে নিয়েছিলেন। আমার এক আপন খালাত বোন (সায়্যিদ মুহাম্মদ মুসলিম হাসানী রহ.-এর আম্মা)। এরা সবাই ভালো হাফেজা ছিলেন। সুন্দর তিলাওয়াত করতেন। ফেরেঙ্গি মহলের ফতোয়া অনুযায়ী এরা তারাবীর জামাতও করতেন। একজন ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন আর বাকিরা তার ইক্তিদা করতেন। খানদানের বিশিষ্ট বুযুর্গ মাওলানা সায়্যিদ খলীলুদ্দীন সাহেব মহিলাদের তারাবী'র ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতেন। সবাই এক পারা করে তারাবীতে তিলাওয়াত করতেন। সে সময় আমি বেশ ছোট, এই সম্মিলিত তারাবীর কথা আমার মনে পড়ে না। তবে আমার সে সময় আমার আম্মার তিলাওয়াতের কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমি দরোজায় দাঁড়িয়ে তাঁর তিলাওয়াত শুনতাম তন্ময়চিত্তে। তখন মনে হতো, আকাশ থেকে যেনো রিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ধীর স্থির ও সাবলীল গতি। সাথে আছে নারীকণ্ঠের স্নিগ্ধ কোমলতা। নূরুন আলা নূর।

পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন

আমি তখন বেশ বড়, অনেক কিছু বুঝতে শুরু করেছি। তখনই লক্ষ্য করেছি, অনেক দিন থেকে চলে-আসা পারিবারিক দ্বন্দ্বটার অবসান ঘটেছে আমার আব্বার প্রাজ্ঞ মধ্যস্থতায়। এ দ্বন্দ্বটা এতোদূর গড়িয়েছিলো যে, একে অপরকে বয়কট করা শুরু হয়েছিলো। এর জন্যে আমার আব্বা ভীষণ অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর এটাই ছিলো স্বাভাবিক। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত কলহ তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। কেননা, তিনি ছিলেন একজন দীনি আলেম, সম্পর্ক ছিলো গভীরভাবে কুরআন-সুন্নাহর সাথে। আর তাঁর স্বভাব গড়া ছিলো ভালোবাসা ও হৃদ্যতায়, কোমল আচরণ ও সহমর্মিতায়। তাই এ সব দেখতে ও সইতে পারতেন না তিনি। এর সংশোধনের জন্যে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। বিবাদ ও কলহ-জড়িতদের মাঝে সদ্ভাব ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা চালালেন এবং তিনি এতে সফল হলেন। তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন পরিবারের একজন মান্যবর মুরুব্বী।

তিনি হলেন সায়্যিদ কুতবুদ্দীন। এ দু'জনের প্রয়াসে বিবদমান দু'টি শাখা আবার ফিরে এলো হৃদ্যতা ও ভালোবাসায়, দরদ-হামদরদিতে।

এরা দূরের কেউ ছিলেন না, চাচাত ভাই, এক দাদার নাতি। সায়্যিদ আয়াতুল্লাহ বিন শায়খ সায়্যিদ আলামুল্লাহ রহ.। আমার আব্বা এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেছেন 'ইসলাহ' নামে। পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে দীন ও দুনিয়ার কী ক্ষতি হয়, তাই তিনি এ কিতাবে বর্ণনা করেছেন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে। পাশাপাশি সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন পারিবারিক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির উপর অনেক হাদীস, হৃদয়স্পর্শী অনেক ঘটনা ও কাহিনী। বিষয়ের উপর এমন উপকারী কিতাব আমার জানামতে আর নেই, না উর্দূতে না আরবীতে। এ কিতাবটি আমাদের পরিবারের ঐ বিবদমান অংশকে সংশোধনমুখী হতে বিরাট বড় মুসলিহ বা সংশোধনকারীর ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আরো পরের দিকে এ পরিবারে আরেকবার বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। তখন আমি বেশ বড়। এ বিবাদের উৎস ছিলো জায়গা-জমি অথবা কারো কারো জীবনধারা। এ বিবাদটা সীমাবদ্ধ ছিলো নানার বাড়ির কয়েক ঘর এবং খানদানের আরেক বুযুর্গ সায়্যিদ নাযির আহমদ ও তাঁর ছেলেদের মধ্যে। এ বিবাদও চরম আকার ধারণ করেছিলো। বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো পরস্পরের মুখ দেখাদেখি। শিশু-কিশোরদের মধ্যেও এ বিবাদকে টেনে আনা হয়েছিলো। কিন্তু ওরা ওসব মানে নি, এ সঙ্গে ওরা জড়ো হলে পরস্পরে হাসি-আনন্দে মেতে উঠতো। বিশেষত, খেলার মাঠে এ বিবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিলো। অবশ্য এ বিবাদ কিছুদিন পর এমনিতেই মিটে গিয়েছিলো, এর জন্যে কোনো কাঠ-খড় পোড়াতে হয় নি।

তোংক-এ অবস্থিত এ-খানদানের অন্য শাখা এবং তার বৈশিষ্ট্য

আমি এখানে আরেকটা বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। তা হলো আমাদের খানদান মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। এক ভাগ তো এখানে দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ বা তাকিয়াকিরাঁতে বসবাস করছে। আরেক ভাগ সায়্যিদ আহমদ আহমদ শহীদ রহ.-এর শাহাদাতের পর এখান থেকে তোংক চলে যায়, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে। খানদানের এ শাখার সাথে তাঁরাও মিলিত হয়েছিলেন, যারা সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। এর মধ্যে আছেন বালাকোট বা সিন্ধু

ফেরত মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা। আরো আছেন ইউরোপের কিছু দেশ থেকে ফিরে-আসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রায়বেরেলিতে যারা বাস করছেন, তাদের যেমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক তেমনি তোংকে যারা বাস করছেন, তাদেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বিশুদ্ধ আক্বিদা, ফরজ-ওয়াজিবের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান, বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ধর্মীয় নীতি-আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীনতা— এ-সবই রায়বেরেলির শাখার দেদীপ্যমান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ-সব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তোংকের শাখার আরো কিছু উজ্জ্বল বৈশিষ্ট আছে। তা হলো, তারা ভীষণ বন্ধুবৎসল। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তারা মানুষকে কাছে টেনে নেন বড়ো মায়াবি আকর্ষণে। পারস্পরিক সাম্য, আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখা, বিনয়-নম্রতা, সারল্য, অধীনস্ত খাদেম ও মজুরদের সাথে সুন্দর ও অমায়িক ব্যবহার এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ— এ সব দিক দিয়ে তারা বেশ এগিয়ে। আর এমন তো হবেই। কেননা, তাঁরা লাভ করেছেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর গভীর সান্নিধ্য-পরশ। সে পরশে তারা এমন 'সোনা' হয়ে গেলে যেতেই পারেন!

আমরা ছোটরা বেশ লক্ষ্য করেছি, যখন তোংক থেকে তারা রায়বেরেলিতে বেড়াতে আসতেন তখন দুই শাখার ব্যবহারে অনেক পার্থক্য। বিশেষ করে যখন তোংক থেকে তাদেরকে এখানে রায়বেরেলিতে চলে আসতে হয়েছিলো, তখন এ পার্থক্য আরো স্পষ্ট করে আমাদের চোখে ধরা পড়েছিলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈশবের কিছু স্মরণীয় ঘটনা, লখনৌ অবস্থান, কিতাবের দুনিয়ার সাথে প্রথম পরিচয় ও খেলাফত আন্দোলন

শৈশবের কিছু স্মরণীয় ঘটনা

আমার এক খালাত ভাই ১৯১৫ সালের ভয়াবহ বন্যার কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারি এবং দর্শনে এম.এ. পাস করে ফিরে এসেছেন। তখন তো আমি দুধশিশু। কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর শুনেছিলাম, ওখান থেকে তার এ-সব ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসার মুহূর্তটা কী জমকালো ছিলো, এবং আমাদের খানদান ও পুরা বস্তি কী বিস্ময়কর মুগ্ধতায় তাকে স্বাগত জানাতে দল বেঁধে ছুটে গিয়েছিলো। তখন তাকে নিয়ে সবাই রীতিমত মেতে উঠেছিলো। সম্ভবত পুরো জেলায় এমন উচ্চ পর্যায়ের বিদেশী 'ডিগ্রিধারী' মানুষ আর ছিলেন না।

ভারত উপমহাদেশে তখন ইংরেজ শাসন। ইংরেজ সভ্যতা ও দাপটের কাছে মানুষ 'অসহায়'। এ-শাসনের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর দিকেই তাকানো হতো ভয়-কাতর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। ইংল্যাণ্ডকে তখন মানুষ বিলাত বলতো। বলতো অমুক 'বিলাত ফেরত'। 'বিলাত পাস'। এ আওয়াজ এখনো আমার কানে বাড়ি খাচ্ছে, চাকর দরোজায় দাড়িয়ে বলতো, সাহেব এটা চাচ্ছেন! সাহেব এটা বলছেন! ওদের কুকুর নিয়ে শিকারে যাওয়ার দৃশ্য এখনো আমার চোখে লেগে আছে। ইংরেজ শাসনের এ-ভয়ানক শ্রদ্ধা ও প্রভাবকাল বহাল ছিলো খেলাফত আন্দোলনের এবং আযাদির লড়াইয়ের সূচনাকাল পর্যন্ত।

আমাদের পরিবারের দ্বিতীয় যে জন বাইরে গিয়েছিলো, তিনি হলেন আমার মামাতো ভাই সায়্যিদ সিরাজুন্নবী হাসানী। তিনি ১৯২১ সালে আমেরিকা গিয়ে বড় ডিগ্রি নিয়ে আসেন। সে-সময় হিন্দুস্তানে ছাত্ররা আমেরিকা যেতো না কেউ। কেননা সেখানকার সার্টিফিকেট ভারতের কোনো

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত ছিলো না। এখানে স্বীকৃতি ছিলো কেবল ইংল্যাণ্ডের সার্টিফিকেটের। চাকরি-বাকরিও মিলতো কেবল এই সুবাদেই। আমি জানি না, তবুও কেমন করে আমেরিকা যাওয়ার চিন্তা তার মাথায় ঢুকে পড়েছিলো। তার কিছুদিন আগে আমাদের আরেক আত্মীয় গিয়েছিলো জার্মানিতে, তারপর জাপানে। প্রকৌশল বিজ্ঞানে তিনি ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তোংকে থাকতেন। তার বিদেশ সফরের ব্যাপারে বেশিকিছু জানতে পারি নি। কিন্তু সায়্যিদ সিরাজুদ্দীন হাসানী ভাইয়ের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। যাওয়ার সময় লোকজন দল বেঁধে তাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলো। আমরা শিশুরা বড়দের সঙ্গে কিছুটা পথ গিয়েছিলাম। তিনি পড়াশুনা শেষ করার পর সেখানেই কিছুদিন কর্মরত ছিলেন।

পারিবারের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা

একদম ছোটবেলায় যখন কিছুই বুঝতাম না তখনকার কথা জানি না, কিন্তু একটু বয়স হওয়ার পর আমি দেখেছি, জমিদারি প্রথা (যেটিকে বিহার ও উত্তর প্রদেশে বেশ সম্মানের চোখে দেখা হতো) একটি ব্যর্থ ও অসফল প্রথা। এতে জীবন জীবিকার পথও তেমন একটা প্রশস্ত হয় না। এতে লাভ ও উপকার যতোটা, তারচে' অনেক বেশি পেরেশানি ও সমস্যা। জমিদারির সুবাদে কাউকে সচ্ছল হয়ে উঠতে আমি দেখি নি। শুধু জেলায় একটু সম্মান ও দাপট নিয়ে চলা যেতো— এই যা। খাজনা উসুল করা ছিলো এক মহা কঠিন কাজ। সহজে কেউ দিতেই চাইতো না। সবচে' বড় বিপদ হলো, এই জমিদারদেরকে যা তুলে দিতে হয় সরকারকে, তার পরিমাণ ছিলো এই খাজনার চেয়ে বেশি। ফলে এ জন্যে মাঝে-মধ্যে ঋণ করে সরকারকে কর দিতে হতো। আর জমিদারদের জন্যে এরচে' বেদনাদায়ক ও বিব্রতকর আর কী হতে পারে?

সম্ভবত এ জটিল পরিস্থিতিই আমাদের খানদানের কাউকে কাউকে রুটি-রোজগারের জন্যে অন্য কোনো ভালো চিন্তা করতে বাধ্য করেছিলো। সবাই মিলে আরো ভাবছিলেন, সামনে যা কিছু করা হবে তাতে খানদানের সব সদস্যদেরকে অংশিদারিত্ব দেয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনতে হবে। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে স্থির হলো যে, একটা ইটভাটা চালু করা হবে, তাই হলো। মোটামুটি বড় আকারে একটা ইটভাটা শুরু হয়ে

গেলো। এর ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হলো আমার এক চাচা ও উস্তায সায়্যিদ আযিযুর রহমান নদভীকে। আমার মনে আছে, তখন আমি নাহু-সরফের প্রাথমিক কিতাবগুলো পড়ছিলাম। প্রতিদিন নয়া সবক নেয়ার জন্যে আমি সকাল সকাল তাঁর কাছে চলে যেতাম। আসা-যাওয়ার সময় দেখতাম তাঁর কর্ম-পদ্ধতি। এই ইটভাটায় খানদানের লোকদের অংশ (Shares) ছিলো। আব্বা আমাদের জন্যে নগদ কোনো অর্থ রেখে যান নি, রাজা প্রতাপ নায়ার সাহেবের কাছে আব্বার কিছু পাওনা ছিলো, বড় ভাইজান তাই দিয়েই এখানে কিছু 'শেয়ার' কিনে রাখেন। আমার মনে পড়ে, আমি এই ইটভাটার আয় থেকে নিজের জন্যে একটা ইয়ারগান আর একটা ঘড়ি কিনেছিলাম।

কিছুদির পর এই ইটভাটাটি বন্ধ হয়ে যায় ক্রমবর্ধমান লোকসানের কারণে। আমি যতোটুকু জানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে যে মানসিক যোগ্যতা ও বাস্তব অবিজ্ঞতা থাকা দরকার, তা এই খানদানে কম ছিলো।

লখনৌ'র পরিবেশ ও সেখানকার শৈশব ॥ কিতাবের প্রতি আগ্রহ, জীবনের প্রথম বক্তৃতা

এখন ফিরে যাচ্ছি প্রিয় শহর লখনৌতে, রায়বেরেলি থেকে এর দূরত্ব মাত্র আশি কিলোমিটার। রেলভাড়া মাত্র চৌদ্দ আনা। মানে এক রুপিরও কম।[১] তৃতীয় শ্রেণীতে বেশ আরামের সাথেই মানুষ সফর করে। গাড়িও সময় মতোই ছেড়ে যায়। জমিদার ও অভিজাত লোকেরা সফর করে ইন্টারক্লাসে করে।[২] দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে সফর করতো ইংরেজ ও তালুকদারেরা। রায়বেরেলি-লখনৌ সফরে যদিও সময় লাগে মাত্র আড়াই ঘন্টা, কিন্তু যাত্রীদের কাছে এ সফরের গুরুত্ব আছে অনেক। গাড়িতে উঠলেই সাথে থাকতে হবে নাশতা। লকনৌ-রায়বেরেলিতে আমাদের প্রায়ই আসা-যাওয়া হতো। বিশেষত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেহেতু রায়বেরেলিতেই হতো, সেহেতু রায়বেরেলিতে যেতেই হতো। এখন আমি আমার আরেকটি লেখা থেকে সহযোগিতা নিয়ে লখনৌ'য় অবস্থিত আমাদের ঘরের একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করবো। আমার বোন সায়্যিদা আমাতুল্লাহ তাসনীম-এর ওফাতের পর আমি পুরানে চেরাগে যে লেখাটা লিখেছি তা থেকে একটু উদ্ধৃতি টানছি :

'লখনৌতে আমার আব্বার যে বাড়িটি ছিলো, তা আমিনাবাদ এলাকায় অবস্থিত। আমিনাবাদ লখনৌ'র প্রাণকেন্দ্র। সড়কের সাথে লাগোয়াই ছিলো

১. এ ছিলো তখনকার ভাড়া। একন তো তৃতীয় শ্রেণীতে গেলেও গুণতে হয় ৭ রুপি।
২. বর্তমানে এ শ্রেণীটি নেই। এখন শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনী।

বাড়িটি। বাড়ির সামনের দিকেই ছিলো আব্বার রুগী দেখার জায়গা—'চেম্বার'। এ বাড়িতেই বাস করতো আমাদের পরিবার। বাবা-মা, দুই ভাই, দুই বোন। আমার বড় ভাই, পরবর্তীতে ডা. সায়্যিদ আবদুল আলী হাসানী (নদওয়াতুল উলামা'র মহাপরিচালক) হয়েছিলেন। তাঁর ছোট হলেন বোন আমাতুল আযিয, তার ঔরষেই জন্ম নিয়েছে আমার প্রিয় এই চার ভাগ্নে—মাহমুদ হাসান, মুহাম্মদ সানী, মুহাম্মদ রাবে ও মুহাম্মদ ওয়াজেহ। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন! তিনিই এখন আমাদের ছোট্ট পরিবারের বরকত। তার ছোট হলেন আমাতুল্লাহ তাসনীম, পরিবারে যাকে 'সায়্যিদা আয়েশা' নামেও ডাকা হয়। সবার ছোট ছিলাম আমি, তখন আমার বয়স মাত্র ছয়। আমাদের ঘরে খাঁ-খাঁ শূন্যতা ছিলো না, ঘর গমগম করে রাখতো পরিবারের একান্ত সদস্যরা। অন্য দিকে সব সময় আনা-গোনা ছিলো দূরের ও কাছের মেহমানদের। সব মিলিয়ে সজীব ও কলরবমুখর পরিবেশ। ওদিকে রায়বেরেলি আমাদের মাতৃভূমি। সেখান থেকেও আত্মীয়রা সব সময়ই আসছেন। দূরত্বও খুব বেশি না। এ ছাড়া লখনৌ শহরেও রয়েছে অনেক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত খানদানের সাথেও আমাদের আমাদের সুসম্পর্ক। বিশেষত, ভুপালের শাসনকর্তা সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান খান এর বড় ছেলে আমীর সায়্যিদ নূরুল হাসান ভুপালী'র খানদানের সাথে রয়েছে আমার গভীর যোগাযোগ ও প্রিয় সম্পর্ক। সব সময় আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। তবুও আমরা কিন্তু চারজনই। দুইভাই-দুইবোন। এক বাবার সন্তান।

আব্বা বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন লেখালেখিতে, রুগী দেখায়। নদওয়াতুল উলামার পরিচালনা-কার্যে। তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবেই ভীষণ কর্মমগ্ন মানুষ। যখন যে কাজ করতেন সে কাজে ডুবে যেতেন। কথা বলতেন কম। কাজ করতেন বেশি। একাকীত্ব ও নির্জনতাপ্রিয়। নিজের কামরায় একাকী বসে কেটে যেতো তাঁর কর্মপ্রহর লেখালেখিতে, কিতাব-মুতালায়। এর মানে এই না যে, তিনি পরিবারবিমুখ ছিলেন। আমাদের সবাইকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তবুও আমরা তাঁর কাছে খুব একটা ঘেঁষতাম না। খোলামেলাভাবে তাঁর কাছে গিয়ে বসতে ও কথা বলতে পারতাম না। হ্যাঁ, কখনো খানদানের বড় কোনো মেহমান বা শায়খ তাঁর কাছে এলে অধিকাংশ সময় আমরা ভাই-বোনেরা তাঁর কাছে গিয়ে জড়ো হতাম। অপলক তাকিয়ে দেখতাম তাঁর সুন্দর হাসি, তন্ময়চিত্তে শুনতাম তাঁর সুন্দর কথা। বড় ভাই তখন লখনৌ মেডিকেল কলেজের ছাত্র। কঠিন (বিশেষত সে যুগে)

চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনার কারণে এর পেছনে তাঁকে প্রচুর শ্রম ও মেধা খরচ করতে হতো। হাতে তিনি খুব একটা সময়ই পেতেন না। এখন পড়াশুনার চাপ, তখন পরীক্ষার চাপ। কখনো মগ্ন হয়ে গেছেন পাঠ-প্রস্তুত করায়। এই ছুটে যাচ্ছেন কলেজে, এসেই আবার নাকে-মুখে কিছু দিয়ে পড়াশুনায় ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন— এভাবেই তাঁর সময় কেটে যেতো।

একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি, আমাদের পরিবারে আরেকজন মানুষ আছেন, একান্ত আপন। তিনি আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী। বড় ভালো মানুষ তিনি। তাঁর প্রিয় আচরণে, উদার মানসিকতায় মনেই হতো না তিনি আমার ভিতরের কেউ নন, বরং ভাই-বউ বা ভাবী, বরং মনে হতো তিনি আমাদের আরেক সহোদরা। কী মায়বতী! কী স্নেহময়ী! কী সোহাগিনী! আমার বড় বোন ছিলেন বিবাহিতা। অধিকাংশ সময় থাকতেন তিনি রায়বেরেলিতে—স্বামীগৃহে। আর ভাবীও মাঝে-মধ্যে চলে যেতেন কয়েক মাসের জন্যে পিত্রালয়ে, ফতেহপুরে। আমি কাছে পেতাম শুধু আমার দ্বিতীয় বোন সায়্যিদা আয়েশা আমাতুল্লাহকে।

আমাদের পরিবার— লেখক পরিবার। আমার আব্বা তখনকার একজন বড় মাপের লেখক ছিলেন। পরিবেশ ও পারিবারিক উত্তরাধিকার ভীষণ প্রভাবশালী। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে— এর প্রভাব চলতে থাকে। ছোটকেও তা প্রভাবিত করে, বড়কেও তা প্রভাবিত করে, ছেলেকেও তা প্রভাবিত করে, মেয়েকেও তা প্রভাবিত করে। বেশি কিংবা কম। তাই পূর্বপুরুষের এই উত্তরাধিকার, আমার আব্বার জ্ঞান-গবেষণা ও কিতাবের প্রতি, লেখালেখির প্রতি এই অনুরাগ— একটা বড় মেঘখণ্ডের মতো আমাদের পারিবারিক আবহ ও পরিম-লকে ঘিরে নিয়েছিলো। সব সময় ছায়া দিচ্ছিলো। আর তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলো যে, আমাদের বাড়িতে নতুন কোনো ছাপা কিতাব এলে তা পড়ার জন্যে আমরা অস্থির হয়ে যাই। আমাদের সামান্য যা কিছু হাতখরচা মিলতো কিংবা আত্মীয়রা আমাদের ঘরে বেড়াতে এলে যাওয়ার সময় যে সামান্য রুপী দিয়ে যেতেন —তখন এর বেশ প্রচলন ছিলো— তা খরচের জন্যে আমাদের নিকট সবচে' প্রিয় খাত হয়ে উঠতো এই কিতাব ক্রয়!

এখানে একটা মধুময় স্মৃতি মনে পড়ছে। কিতাবের প্রতি ভালোবাসার স্মৃতি। আমার হাতে এভাবে কিছু পয়সা জমা হয়ে গেলো। নতুন কিতাব কেনার জন্যে মনটা আঁকু-পাঁকু শুরু করে দিলো। অগত্যা ছুটে গেলাম আমিনাবাদে। বয়স এতোটাই কম ছিলো যে, আমি জানতাম না যে কিতাব

পাওয়া যায় কেবল কিতাব বিক্রেতা বা কিতাববিক্রয়কেন্দ্রেই, অন্য কোথাও নয়। সব জিনিসের জন্যে আছে আলাদা আলাদা দোকান।

ফলে আমি গিয়ে হাজির হলাম আমিনাবাদের এক বড় ওষুধের দোকানে! গিয়েই একজনের হাতে পয়সাটা তুলে দিয়ে বললামঃ আমাকে কিতাব দিন, আমি কিতাব কিনবো! দোকানের মালিক বুঝে ফেললেন, এ বাচ্চা সম্ভ্রান্ত ঘরের এক আলাভোলা বাচ্চা। ওষুধের দোকোনে কি আর কিতাব বিক্রি হয়! তিনি আমার আবেগের মূল্য দিলেন। তাঁর কাছে ওষুধের নাম লেখা যে তালিকা ছিলো, দেখতে ছোট্ট পুস্তিকার মতো, তা-ই আমার হাতে তুলে দিলেন। পাশাপাশি আমার পয়সাও ফেরত দিলেন। তাই নিয়েই আমি বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলাম। মনে ভীষণ আনন্দ! ফুরফুরে মনটা যেনো হাওয়ায় ভাসছিলো। কী দারুণ ব্যাপার! কিতাবের কিতাবও পেলাম, আবার মূল্যও দিতে হলো না! এরপর আমি এ-কিতাব দিয়েই সাজালাম আমার ছোট্ট কুতুবখানা, যে কিতাবের কোনো মূল্য নেই আমার আব্বার কাছে! এমনকি কখনো কখনো তিনি তা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেন! একই অবস্থা ছিলো আমার অপর দু'বোনেরও, কিতাব এবং কিতাব সংগ্রহের অনুরাগের ক্ষেত্রে! নতুন নতুন কিতাব হাতে না পেলে ওদের ভালোই লাগতো না।

সেকালে আমাদের বাড়ির গলিতে এক ফেরিওয়ালা কিতাব বিক্রি করতে আসতো। বিভিন্ন কিতাবের নাম ধরে ও সুর করে কবিতা বলতো। ওর আওয়াজ কানে আসতেই আমার দু'বোন আমাকে পাঠিয়ে দিতেন কিতাব আনতে। আমাদের পরিবারে কঠোরভাবে সায়্যিদ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর মাসলক অনুসরণ করা হতো। অর্থাৎ কোনো নষ্ট আক্বিদা ও বিদআতি আমলের সুযোগ ছিলো না। তাই সব কিতাব আমরা ছোটরাও কিনতাম না। কেবল সে সব কিতাবই আমরা সংগ্রহ করতাম যা আকিদা-বিধ্বংসী নয় কিংবা ক্ষতিকর নয়। এ ব্যাপারে মহিলারা আরো বেশি কঠোর ও সাবধান ছিলেন। সে হিসাবে আমরা পড়তাম বড়দের জীবনকাহিনী, অক্ষতিকর আকর্ষণীয় কিতাব, যেগুলো কখনো হতো গদ্যে কখনো-বা পদ্যে। একজনের পড়া শেষ না হতেই আরেকজন 'হাত' বাড়িয়ে দিতো। এ সব কিতাবের মূল্য বেশি ছিলো না। দু'পয়সা, চার পয়সা। বেশির পক্ষে দু'আনা-চার আনা। কিতাব সংগ্রহের পর বড় মজা করে আমরা পড়তাম। কখনো কখনো আমার কোনো বোন সুর করে তা পড়তেন। আমরা তন্ময়চিত্তে তা শুনে যেতাম। চলছে তো চলছেই, কিতাব শেষ না করে আর

ওঠাই হতো না। হযরত হালিমা সা'দিয়ার ছন্দোবদ্ধ কাহিনী এখনো গেঁথে আছে আমার মনে। ঐ কিতাবের প্রথম চারটি পঙক্তি হলো এই—

ایک عاشق تھی حلیمہ دائی = جسنے گھر بیٹھے یہ دولت پائی

وہ کچھ اس رمز سے آگاہ نہ تھی = اس کی قسمت میں یہ دولت ملی

نور اللہ کولائی گھر میں = یعنی اس شاہ کولائی گھر میں

وہ کیا طالع بیدار ملے = جسکو کونین کے سردار ملے

নবীপ্রেমিক দাঈ-মা হালিমার কথা কে-না জানে?
যিনি কী সহজে পেয়ে গেলেন এ শ্রেষ্ঠ সম্পদ!
এ-যে এক মহা সম্পদ— এ রহস্য তাঁর জানাই ছিলো না!
আসলে এ-সম্পদ-যে তাঁর ভাগ্যেই লেখা ছিলো!
ঘরে যেনো নূর নিয়ে এলেন!
অর্থাৎ সেই 'রাজা'কেই নিয়ে এলেন!
হায় হায়! কী সৌভাগ্য এসে তাঁর জীর্ণ কুটিরে লুটিয়ে পড়লো!
এ-যে উভয় জাহানের সরদারকেই তিনি পেয়ে গেলেন!!

কী সরল-সোজা ছন্দ! অজানা ছন্দকারের নামটা পর্যন্ত! তবুও তখনই আমার হৃদয়ের পেলব জমিনে নবীপ্রেমের বীজ বোনা হয়ে গেলো! পরবর্তীতে আমি যখন সীরাতে ইবনে হিশাম পড়ি এবং সেখানে এ-ঘটনার প্রিয় ও মজাদার লম্বা বিস্তারিত বিবরণ পড়ি, তখন সেই মাসুম শৈশব —যার উপর আল্লাহর হাজারো রহমত বর্ষিত হয়— আবারো নতুন করে আমার মনে পড়ে গেলো! আশ্চর্য! ইবনে হিশাম তো এতো লম্বা করে কাহিনী বলেন না? তবে এখানে কেনো এতোটা লম্বা করলেন? তিনি আমার হৃদয়ের কথা শুনতে পেয়েছিলেন সেই সুদূরে বসে, অনেক দিন আগে? নাকি আমার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এই ফারসি কবি—?

لذیذ بود حکایت، دراز تر گفتم

জানো না বুঝি, কাহিনী-যে মজাদার?
তাইতো লম্বা করে বললাম!

সীরাতের প্রতি এভাবেই তৈরী হয়ে গেলো আমার মনে গভীর মমতা। এক সময় মনে ইচ্ছে জাগলো প্রচলন অনুযায়ী একটি সীরাত অনুষ্ঠান করার।

যোগাযোগ করলাম আমার বয়সী শিশু-কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে এ অনুষ্ঠানের কথা ওদেরকে বললাম। ওরা আমায় সঙ্গ দিলো, আমার ডাকে সাড়া দিলো। এক বোন আমার মাথায় তখন একটা পাগড়ি জড়িয়ে দিলো। আমার বয়সটা তখন এ-সব কাজের বয়স না, মাত্র আট। সীরাত সম্পর্কে যতো কিতাব আমার আয়ত্বে ছিলো, তার মধ্য থেকে এর কটা কিতাব আমি নিয়ে এলাম অনুষ্ঠানে পড়ে শোনাতে। এবার দেখুন, আমার বিদ্যার বাহার কতো ছিলো! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদাজানের নাম এলো। যেখানে আমার পড়া উচিত ছিলো আবদুল মুত্তালিব, সেখানে আমি পড়লাম আবদুল মাতলাব! মজলিসের আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আব্বা! তিনিও শুনছিলেন তাঁর পুত্রের সীরাতপ্রেম-নির্গত কাঁচা-কাঁচা শব্দমালা! আমার বিশ্বাস, তিনি ভীষণ আপ্লুত ছিলেন। সীমাহীন আনন্দিত ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিশ্চয়ই তিনি আনন্দোদ্বেল মনে ভাবছিলেন, আল্লাহ্ তোমার কী শোকর আদায় করবো? তুমি আমাকে কতো দিয়েছো! এই-যে তুমি আমাকে সীরাত-প্রেমের নমুনা দান করেছো।

এমনটা তিনি ভাবতেই পারেন! এমন খুশি তিনি হতেই পারেন! তাঁর লেখনির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিলো এই সীরাতে নববী। শিল্প-সাহিত্যের সবটুকু রস ঢেলে দিয়ে তিনি লিখেছেন সীরাতে নববীর বিভিন্ন দিক। তাই এখন আট বছরের প্রিয় ছোট্টটির মুখে সেই প্রিয় নবীর কথা শুনলে আনন্দ-উদ্বেল তো হবেনই! প্রিয় নবী-ই যে সব মঙ্গল ও কল্যাণের আধার! তাঁর অনুসরণ ও ভালোবাসাতেই রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। এই ছোট্ট প্রয়াসের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে আগামী দিনের মহা সৌভাগ্যের উর্বর বীজ! এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটাই তো বলে দিচ্ছে, সীরাত চর্চায় নিবেদিত মহান যাঁরা, এ-ও হতে যাচ্ছে সে-ই মহানদের একজন!

মহল্লার পরিবেশ

আমাদের মহল্লা অন্য মহল্লার তুলনায় অনেক দিক দিয়েই ব্যতিক্রম। এখানে যারা বসবাস করেন, সবাই বিশুদ্ধ আক্বিদা-বিশ্বাসের অধিকারী। শিয়া মতবাদ ও বিদ'আতিদের রুসুম-রেওয়াজ এ মহল্লায় ছিলো না। এর প্রথম কারণ হলো, এখানে অধিকাংশ বাসিন্দাই, যারা কোরায়শী হিসাবে পরিচিত, সম্পর্কিত ছিলেন বড় বড় উলামায়ে কেরামের সাথে, যারা বিদ'আত ও ধর্মহীন কাজকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। সমাজের মাঝে সত্যিকারের

ইসলাম ও আচার ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। ঐ মহল্লায় থাকতেন মুন্সী আবদুল গনি সাহেব, যিনি আব্বার ভীষণ কাছের বন্ধু ছিলেন। মহল্লায় তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন আল্লামা আবদুল হাই লখনৌভী রহ.-এর বয়ান ও ইসলাহী মজলিসে। তারও প্রভাব পড়েছিলো মহল্লায়।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো, এ মহল্লায় দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করছেন আমার আব্বা। তাঁর কাছে উলামায়ে কেরামের নিরন্তর আসা-যাওয়া। তা ছাড়া দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামাও ছিলো তখন এ মহল্লার একেবারে কাছে। পাশাপাশি আমাদের ঘরের অদূরেই একটি মসজিদ, জুমার নামাজের পর আব্বা সে মসজিদে নিয়মিত বয়ান করতেন, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দীনি বিষয় নিয়ে কথা বলতেন। যখনই কোনো আলেম ও বুযুর্গ আব্বার সাথে দেখা করতে আসতেন কিংবা নদওয়াতুল উলামা পরিদর্শনে আসতেন, তিনি এ মসজিদে হাজির হতেন, কখনো কখনো নামাজ পড়াতেন। আমাদের খানদানের বড় বড় উলামায়ে কেরাম এ মসজিদে নামাজ পড়াতেন। মূলত এর ইমামতির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো আমার আব্বার উপর। পরবর্তীতে দারুল উলুম দেওবন্দে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আমার বড় ভাইয়ের উপর। এ ছাড়া এ মসজিদে ইমামতি করেছেন ইয়েমেনের দু' শায়খ অনেক দিন। একজন হলেন শায়খ মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী। আরেকজন হলেন তাঁরই ছেলে এবং আমার প্রিয় উস্তায শায়খ খলীল বিন মুহাম্মদ বিন হোসাইন আল-ইয়ামানী।

মুন্সী আবদুল গণি সাহেব সম্পর্কে আরো কিছু কথা

মুন্সী সাহেবের প্রসঙ্গ যখন চলেই এলো তখন তার সম্পর্কে আরো কিছু না বললেই নয়। তিনি নিজের আদর্শে ছিলেন অবিচল। তার আক্বিদা ছিলো বিশুদ্ধ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা, সুখী-সচ্ছল এক বুযুর্গ ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বিদ্যা তার ছিলো না, অনেক কষ্টে হয়তো নিজের নামটা লিখতে পারতেন। কিন্তু বিভিন্ন দীনি বিষয় বিশেষত হাদীসের কিতাব শোনার অভ্যাস ছিলো সব সময়ের। এ কারণে তার ধর্মীয় জ্ঞান বেশ জমা হয়ে গিয়েছিলো। এ দিক থেকে তাকে একজন ছোটখাটো মাদরাসা-পড়ুয়া মৌলভীই বলা যায়। মাদরাসার সদ্য-ফারেগ কেউ তার সামনে টিকতে পারতো না।

আমার মনে পড়ে, একবার ঐ মসজিদে সদ্য-ফারেগ এক আলেম এলেন। তখন একটা মাসআলা নিয়ে মুন্সী সাহেবের তার সাথে বিতর্ক বেধে যায়। মাওলানা আবু দাউদের কথা উল্লেখ করলে মুন্সী সাহেব উল্লেখ করেন তিরমিযীর কথা। ওদিক থেকে মুসলিমের বরাত দেয়া হলে এদিক থেকে টেনে আনা হলো বুখারী। শেষ পর্যন্ত এ লড়াইয়ে মুন্সী সাহেবই জিতে গেলেন। নিজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, একবার আমি রামপুর সফরে গিয়েছিলাম। ওখানে মাওলানা মুহাম্মদ শাহ্ সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। মাওলানা আমাকে পেয়ে ভাবলেন যে, মাওলানা হাকীম আবদুল হাই সাহেবের সহপাঠী। আমার বেশ-ভূষাও ছিলো সে রকম। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন, সম্মান দিলেন। নিজের বিশাল কুতুবখানা দেখালেন। বিভিন্ন কিতাবের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি আমার আসল অবস্থা (উম্মি পরিচয়) প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত মাওলানা বুঝতেই পারলেন না যে, আমি তাঁর বলা কোনো কিতাব সম্পর্কেই অবগত নই।

মুন্সী সাহেবের হাদীসের কিতাব ছাড়াও আরো কিছু প্রিয় কিতাব আছে। সেগুলোও তিনি অন্যকে দিয়ে পড়াতেন আর তন্ময়চিত্তে শুনতেন। নওয়াব কুতবুদ্দীন খাঁ রচিত 'মাশারিকুল আনওয়ার'। মাওলানা খুররম আলী বিল্লুরী রচিত 'হারিকুল আশরার'। 'নাসিহাতুল মুসলিমীন'। তাকবীরে তাহরিমা তার ফওত হতো না বললেই চলে। নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজারও ছিলেন তিনি। তার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিলো এই যে, আব্বার 'চেম্বারে' এসে তিনি বসতেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কাছে বসেই থাকতেন আর তাঁর মুখের মূল্যবান কথা শুনতেন। আব্বার ওফাতের পরও তিনি এখানে এসে ভাইজানের কাছে বসতেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। পরিবারের প্রতি , প্রিয়জনের প্রতি বড়ো আন্তরিক ছিলেন তিনি। সারা মহল্লায় তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রদ্ধার পাশাপাশি সবাই তাকে ভয়ও করতো, মান্যও করতো। কেউ সাহস পেতো না তার মতের বিরুদ্ধে যেতে। তাঁর পরিবারের অন্যরাও তার মতোই বিশুদ্ধ আক্বিদা ও উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন।

ঐ মসজিদের সাথে লাগোয়া এক কামরায় থাকতেন হাফেজ মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব। তিনি প্রথমে মুআজ্জিন ছিলেন। পরবর্তীতে ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফজরের পর বাচ্চাদেরকে মসজিদে পড়াতেন। এটাই ছিলো মহল্লার মক্তব। এর আগেই রায়বেরেলিতে আমার

বিসমিল্লাহখানি হয়েছিলো আমার চাচা মাওলানা সায়্যিদ আযিযুর রহমান নদভী রহ.এর কাছে। এখন আমি ভর্তি হয়ে গেলাম এ মক্তবে, যেটি আমাদের ঘরের একেবারেই নিকটে ছিলো।

শৈশবের স্মৃতি

কোন্ দিনগুলো শ্রেষ্ঠ? রায়বেরেলির না লখনৌ'র? আমি বলবো, আমার লখনৌ'র দিনগুলোই শ্রেষ্ঠ। কেননা, আব্বাকে এখানে সব সময় কাছে পাই। এখানেই কাটে তাঁর ভীষণ ব্যস্ত সময়। কখনো দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আবার কখনো তাঁর 'চেম্বারে' বসে রুগী দেখে। লখনৌ থেকে রায়বেরেলি তাঁর যাওয়াই পড়ে না। হ্যাঁ, আম্মা মাঝে-মধ্যে কয়েকদিন ওখানে গিয়ে থেকে আসেন পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে। অনুষ্ঠান শেষে আবার তিনি ফিরে আসেন এখানে।

আমাদের বেড়ানোর আরেকটা জায়গা ছিলো রায়বেরেলি ছাড়া। সেটি হলো 'হানসাওয়া'। ফতেহপুর জেলায় এর অবস্থান। সেখানে আমার আব্বা এবং আমার বড় ভাইয়ের মামার বাড়ি আবার উভয়ের শ্বশুর বাড়ি। সেখানে আমাদের খানদানের হোসাইনী শাখা অনেক দিন থেকেই বসবাস করে আসছেন। সেখানে তাঁদের অনেক সম্মান ও মর্যাদা ছিলো, সুউচ্চ অবস্থান ছিলো, ধর্মীয় নেতৃত্ব ছিলো। আর এ সবই ছিলো সেখানকার শ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, মহান বুযুর্গ মাওলানা সায়্যিদ আবদুস সালাম রহ.-এর বরকতে যিনি ছিলেন শায়খে রাব্বানী আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেদী রহ.-এর অন্যতম খলীফা। তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা অনুধাবনের জন্যে একটা ঘটনা বলি। দিল্লীর খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া যখন মাওলানা শাহ আহমদ সাঈদ এবং শাহ আবদুল গনি রহ. উভয়ে সেখান থেকে হিজরত করে হারামাইন চলে গেলেন, তখন তা 'বিরান' হয়ে গেলো। মুরব্বী-শূন্য হয়ে গেলো। সালেকিনরা শাহ আবদুল গনি সাহেবের কাছে লিখে পাঠালো যে, এখানে খানকাহ অনাবাদি ও বিরান হয়ে পড়েছে, আবার আবাদ হওয়া দরকার। তখন শাহ আবদুল গণি সাহেব তাদেরকে লিখে পাঠালেন যে, এখানে মাওলানা সায়্যিদ আবদুস সালাম সাহেবকে এনে বসিয়ে দাও!

আল্লাহ তাঁকে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যও দান করেছিলেন। এলাকার বড় জমিদার ছিলেন তিনি। এ জমিদারির প্রকৃত মালিক ছিলেন তাঁর আপন চাচাতো ভাই সায়্যিদ আবদুল আযিয সাহেব (আমার আব্বার আপন মামা)। দীন ও দুনিয়ার মান-মর্যাদার কারণে এলাকায় তাঁর ভীষণ প্রভাব ছিলো।

সম্মান ছিলো। ভালোবাসা ছিলো। আর আমার আব্বার ঐ পরিবারের সাথে একাধিক সূত্রে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তাদের চোখে ছিলেন যেনো আপন সন্তান, চোখের মণি। সেখানকার সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন। তাই ওখানে গেলে আব্বা ভীষণ উৎফুল্ল বোধ করতেন। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি এখনো আমার চোখে ভাসে। একদিন আমি আমার ছোট্ট মনের কৌতূহল মেটাতে আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা! 'হানসাওয়া' এলে আপনাকে এতো খুশি খুশি লাগে কেনো? তিনি বললেন, উবায়েদ এবং আহমদ সাঈদ তোমার কে? আমি বললাম, মামা! তিনি বললেন, মামাদের বাড়ি গেলে তুমি খুশি হও না? বললাম, জ্বী, অবশ্যই খুশি হই! তখন তিনি বললেন, তাকিয়া হলো তোমার মামাবাড়ি আর হানসাওয়া হলো আমার মামাবাড়ি!

তাঁর সাথে হানসাওয়া সফরের কথা এখনো মনে পড়ে। রেলগাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীতে সফর। যেতে যেতে কতো-কী চোখে পড়তো! ষ্টেশনের ছবি এখনো আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। আব্বার সাথে দু'একবার হানসাওয়া যাওয়ার স্মৃতি মনে আছে। অবশ্য আম্মার সাথে পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একাধিকবার যাওয়া হয়েছে। এ সফরে সাধারণত মামা মাওলানা সায়্যিদ আযিযুর রহমান সঙ্গে যেতেন। আমরা প্রথমে গিয়ে উঠতাম ফতেহপুর। ওখানে তখন আমার এক আপন খালাতো বোন ছিলেন। ওখান থেকে হানসাওয়ার দূরত্ব ৭/৮ মাইল ছিলো। সে-সময় খানদানের দু'জন বিশিষ্ট বুযুর্গ জীবিত ছিলেন। একজন চাচাজান হাফেজ সায়্যিদ আবদুল মুগনি (হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবদুস সালাম রহ.-এর ছেলে)। আরেকজন হলেন হাফেজ সায়্যিদ যোবায়ের আহমদ সাহেব, যিনি আমাদের চাচাতো ভাই ছিলেন। তার ছিলো তিন ভাই। সায়্যিদ মুহাম্মদ, সায়্যিদ আহমদ, সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ। শেষোক্ত দু'ভাই নদওয়াতুল উলামায় তখন পড়তেন।

তখনকার একটা স্মৃতি আমার খুব মনে পড়ে। আব্বার সাথে লোকজনের সীমাহীন সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকার কারণে আমাকেও তারা ভীষণ আদর করতো, সম্মান করতো, গুরু-মর্যাদা দিতো। নমুনা দেখুন, আমার আব্বা একজন বড় আলেম। পাশাপাশি তিনি একজন অভিজ্ঞ হাকীম। তাই কেউ এসে আমাকে বলতো, ওয়াজ করো, বয়ান করো, নসীহত করো! কেউ-বা বলতো, আমার শিরাটা একটু দেখে দাও না! কেউ বলতো, আমাকে ওষুধ বলে দাও, ব্যবস্থাপত্র লিখে দাও! আর এ-সবই তারা বলতো আন্তরিকতার

সাথে, একনিষ্ঠভাবে। তখন আমার বয়স ছিলো মাত্র ৬ কিংবা ৭। আমার কাছে ওয়াজের কথা বললে আমি এই আয়াত তিলাওয়াত করতাম—

'হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে বাঁচাও, পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে।'[১]

উর্দূ তরজমাও আমি বলে দিতাম। আর যে আমাকে হাত দেখাতে আসতো ও ওষুধ লিখে দিতে বলতো তাকে ওষুধ লিখে দিতাম। যেমন করে আব্বা লিখে দিতেন, ঠিক তেমন করে লিখে দিতাম, যেনো আমি কোনো বড় হাকীম! ওষুধের নাম পর্যন্ত লিখে দিতাম। কী কী বর্জনীয় তাও বলে দিতাম। কী কী খেতে হবে তাও বলতে ভুলতাম না। আমি জানি না, এই অল্প বয়সে কেমন করে আমি এটা করতাম। কে আমাকে এটা শেখালো। আমি কি আব্বার কাছ থেকেই এটা আয়ত্ত করেছিলাম, যখন তিনি আমার সামনে রুগীকে সব শুনে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতেন! না-কি এতে অন্য কারো দখল আছে? কিছুই এখন মনে করতে পারছি না। বর্তমানে আমি যখন দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের কোনো সেমিনারে এ আয়াত পড়ি, আমার অজান্তেই আমি ফিরে যাই শৈশবের সেই মধুময় স্মৃতির কাছে! মনটা তখন আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে! আল্লাহ কতো মেহেরবান! আল্লাহ কতো ক্ষমতাবান!

আব্বার সঙ্গে

আব্বার মূল ব্যস্ততা ছিলো লেখালেখি। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার পরিচালনা এবং রুগী দেখার পর যতোটুকু সময় বাঁচতো পুরোটাই তিনি ব্যয় করতেন এই লেখালেখির পেছনে। তখন তাঁর লেখালেখি কেন্দ্রীভূত ছিলো 'নুযহাতুল কাওয়াতির' লেখায়। আমার বেশ মনে আছে; আমাদের ঘরের দোতালার দক্ষিণ-পশ্চিমে যে কামরা রাস্তার দিকে মুখ করে ছিলো, সেখানে আব্বার একটা খাট পাতা ছিলো। খাটের পাশেই একটা আরাম কেদারা ছিলো। আব্বা এই আরাম কেদারায় বসেই লিখতেন, পান্ডুলিপি তৈরী করতেন, সংকলন করতেন। বয়সে ভীষণ ছোট হলেও আব্বার সাথে খেতে বসা আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। খাবার সময় হলেই আমি অপেক্ষায় থাকতাম কখন আব্বা কাজ থেকে অবসর হবেন। মাঝে মাঝে এ অপেক্ষার প্রহর বেশ লম্বা হয়ে যেতো। তবুও আমি খেতাম না, অপেক্ষাই করতাম। আব্বা খুব অল্প খেতেন। কিন্তু খুব ভালো খেতেন। আমি সকাল বেলার

১. সূরা তাহরিম

নাস্তায়ও তাঁর সাথে বসতাম। তেমন কিছু খেতেন না তিনি। এককাপ চা। একটি কি দু'টি বিস্কুট। সাথে একটু মাখন। কখনো কোনো পুরোনো বন্ধু নাস্তায় চলে এলে আব্বা বেশ আয়োজন করতেন। এটা-ওটার ব্যবস্থা করতেন। আকাশ-উদারতায় তার মেহ্‌মানদারি করতেন। তখন আমাদের খুব আনন্দ হতো, ঈদ-ঈদ লাগতো।

আর নিত্য-নতুন ও মজাদার খাবার তৈরীতে আমার আম্মার কোনো ক্লান্তি ছিলো না। বরং নানা রকম খাবার নিজেই তিনি আবিস্কার করে করে আমাদেরকে পরিবেশন করতেন, যার মজা অনেকক্ষণ জিহ্বায় লেগে থাকতো। আব্বা যেখানে যেতেন সেখানেই আমি যেতে চাইতাম এবং যেতে উন্মুখ হয়ে থাকতাম। জানি না এ-আগ্রহ কোত্থেকে কীভাবে জন্ম নিয়েছে। মাঝে মাঝে এমন হতো যে, তিনি রুগী দেখতে টাংগায় উঠে বসেছেন, টাংগা ছেড়েও দিয়েছে। আমি তখন দৌড়ে গিয়ে আব্বার হাত ধরে টাংগায় উঠে যেতাম। অনুরূপভাবে আব্বা যখন নদওয়াতুল উলামা'র সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিশিষ্ট কারো কাছে যেতেন কিংবা শহরের কোনো গন্যমান্য ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যেতেন, তখনো আমার যাওয়া চাই, চাই-ই। কখনো কখনো পরনের জামাটা পর্যন্ত বদলানো হয় না। আব্বাও এ ব্যাপারে কোনো কঠোরতা করতেন না। আমার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আতিশয্যের কারণে আমার ইচ্ছাকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন, যেতে চাইলেই নিয়ে যেতেন, যেখানে যেতেন সেখানেই। (বাহ্যিকতা ও রঙিন লৌকিকতা থেকে তিনি সব সময় দূরে ছিলেন।

শহরের যে-'বাড়িটি'তে সবচে' বেশি যাতায়াত ছিলো আমাদের, সেটি হলো সায়্যিদ নূরুল হাসান খান সাহেবের জমকালো প্রাসাদ। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে লেখা 'ভুপাল হাউস'। লখনৌ'র অভিজাত এলাকা 'ঘিস্ইয়ারিমন্ডি'তে তা অবস্থিত। আমার আব্বার সাথে নওয়াব সাহেবের সম্পর্ক ছিলো খুবই চমৎকার, গভীর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক কেবল বন্ধুত্বের সম্পর্কই নয়, বরং ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক। আমাদের বাড়ির ছোট-বড় সবাই তাকে নূর মিয়া বলে ডাকতো। আমার মনে পড়ে, সপ্তাহে কম করে হলেও একবার সেখানে যেতেন আব্বা কিংবা আম্মা। কখনো কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, কখনো অন্য কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে। নওয়াব সাহেবের স্ত্রী আমাদেরকে আপন ফুপু কিংবা খালার মতো ভালোবাসতেন।[১]

---

১. এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

নূর মিয়া'র প্রাসাদের কাছেই ছিলো আমার আপন খালাতো ভাই ব্যারিষ্টার সায়্যিদ মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের হাবেলী। সেখানেও আমাদের আসা-যাওয়া ছিলো। এই অল্প বয়সে—৬/৭ বছর বয়সে ফুলের প্রতি ভালোবাসা পেয়ে বসেছিলো। গোলাপসহ অনেক ফুলকেই আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। সুযোগ পেলেই কুড়িয়ে নিতাম। নূর মিয়ার ফুলবাগান থেকে কতো ফুল আমি কুড়িয়েছি। ফুলহাতে আমি খুব আনন্দিত বোধ করতাম।

একবার আমি আব্বার সাথে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় গিয়েছিলাম সীরাত মাহফিলে। প্রতি বছর খুব গুরুত্বের সাথে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো, মিষ্টান্নও বিতরণ করা হতো। এ ছাড়া ওই সময় আরো যেতাম নদওয়াতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে। যেমন বড় শীর্ষস্থানীয় কোনো আলেম ও বুযুর্গের আগমন। বিশেষ করে আমীর সায়্যিদ হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর সম্মানে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা বেশ মনে আছে।

একবার আব্বার সাথে হানসাওয়া যাওয়ার সময় বিশিষ্ট আল্লাহর ওলী মাওলানা সায়্যিদ নাজমুদ্দীন শাহ সাহেব রহ.-এর খানকায় গিয়েছিলাম, ফতেহপুরে। তাঁর খানকাহ ছিলো একটা পাহাড়ি টিলায়। আমার মনে আছে; তখন তিনি আমাকে অনেক আদর করেছেন। আমাতে মিষ্টান্ন দিয়ে তিনি আপ্যায়িত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে মিষ্টান্ন তখন এক ঘরে তালাবদ্ধ ছিলো! চাবী যার কাছে তাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। হযরত এ জন্যে বড়ো অস্থির ও পেরেশান হয়ে উঠেছিলেন, আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো যেনো তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। শেষ পর্যন্ত চাবীওয়ালাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো না যায় নি, তা এখন মনে পড়ছে না। যাহোক, মিষ্টি খাওয়ার আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দ ছিলো আমার এক মহান বুযুর্গের সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ বসতে পারা।

এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, সে সময় বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ আমার লেগেই থাকতো। এ জন্যে বুযুর্গানে দীনের অনেক পানিপড়া খেয়েছি। বিশেষ করে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আলী আল কুযাত নকশবন্দি মুজাদ্দেদি রহ.-এর কাছ থেকে অনেক পানিপড়া এনে খেয়েছি।

আব্বা সব সময় ডুবে থাকতেন জ্ঞান-গবেষণা ও লেখালেখিতে। এ জন্যে তাঁর অসংখ্য কিতাবের প্রয়োজন হতো। অনেক কিতাব তাঁকে কিনতে হতো। পাশাপাশি বন্ধু মহল থেকেও প্রচুর কিতাব সংগ্রহ করতেন তিনি। কেউ তাঁকে কিতাব দিতে কার্পণ্য করতেন না। অনেক কিতাব ও পত্র-পত্রিকা এমন

থাকতো যে, তার উপর এক নজর বুলিয়েই তিনি তা এক পাশে রেখে দিতেন। আমি তখন সেখানে থেকে তাঁর অপ্রয়োজনীয় আর আমার 'প্রয়োজনীয়' পত্র-পত্রিকা, কিতাবের তালিকা ইত্যাদি এনে সাজিয়ে রাখতাম ঘরের বাইরের একটা খোলা আলমারিতে। আলমারির গায়ে একটা ছোট্ট বোর্ডে আমি লিখে রেখেছিলাম— 'আবুল হাসান আলী গ্রন্থাগার'।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন আমি কাঁদছিলাম। কী নিয়ে যেনো রাগ করেছিলাম। আব্বা তাঁর পেশকারকে (ম্যানেজার, সহকারী কোন কাজে ডেকেছেন। তিনি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আব্বা তাকে সদ্য সমাপ্ত گل رعنا (নজরকাড়া গোলাপ)-এর পাণ্ডুলিপি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যেনো সত্ত্বর তা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.-এর কাছে পাঠিয়ে দেন আজমগড়ে। তারপর আব্বা আমার উদ্দেশে বললেন, 'কান্না থামাও। এ কিতাবে তোমার নাম ছাপাবো!' আল্লাহর কী শান! আব্বার ওফাতের প্রায় ষাট বছর পর گل رعنا (নজরকাড়া গোলাপ)-এর পঞ্চম সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে এবং আমার মুকাদ্দিমা বা ভূমিকাসহ।

আব্বার 'চেম্বারে' তাঁর কোনো বিশেষ দোস্ত আসলে অথবা বিশিষ্ট উলামা-মাশায়েখ আসলে তাঁদের ইচ্ছায় অথবা আব্বার ইচ্ছায় আমাকে ডেকে পাঠানো হতো। একবার এখানে এলেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ তাজাম্মুল হোসাইন সাহেব, যিনি হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদি রহ.-এর ভক্ত ও সে সিলসিলার একজন শায়খ ছিলেন। সম্ভবত তিনি নিজেই আমাকে ডেকে আনতে বললেন। তারপর তাঁর নিজ হাতে রেখা একটি কুরআন শরীফ আমাকে প্রদান করলেন। এখনো সেটি আমাদের পারিবারিক কুতুবখানায় বিদ্যমান।

১৩৩৯ হিজরী/ ১৯২১ সালে আব্বার জোড়ার হাড্ডির ব্যথায় আক্রান্ত হন। ব্যথা কিছুটা কমে এলে তিনি দুর্বলতা সত্ত্বেও নওয়াব সাহেবের বালাখানায় গিয়ে কখনো রাত্রি যাপন করতেন। তখন আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। সেখানে যাওয়া এবং সেখানকার প্রাসাদজীবনের ছবি আমার চোখে খুব ভাসে। ওই সময়টাতেই তিনি گل رعنا (নজরকাড়া গোলাপ) লিখেছিলেন।

নিয়মিত শিক্ষার সূচনা

আমার আলি বা তা শুরু হয়ে গিয়েছিলো রায়বেরেলিতেই। যখন আমি রায়বেরেলি-লখনৌ আসা-যাওয়া করছিলাম, তখন ছোট ছোট উর্দূ কিতাবও

পড়তে শুরু করেছিলাম। তবে লখনৌ এসেই আমি নাজেরা শেষ করি। কুরআনে কারীম শেষ করার পর আব্বা খুশি হয়ে একটা দু'আ অনুষ্ঠান ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানের কথা আমার একটু একটু মনে আছে।

এভাবে স্থানীয় মক্তবে কুরআন শরীফ শেষ করার পর আমার চাচা সায়্যিদ আযিযুর রহমান নদভীর নিকট যাতায়াত শুরু করলাম। তিনি তখন নদওয়াতুল উলামায় প্রশাসনিক বিভাগে দায়িত্বরত ছিলেন। আমার বয়স হিসাবে আমাদের মহল্লা থেকে নদওয়ার দূরত্ব বেশিই ছিলো। ঝাউলাল পুল এর নিচ দিয়ে একটা সরু পথ ধরে অগ্রসর হলে 'খাতুন মঞ্জিল' পড়ে। তার পাশেই একটা ভবনে ছিলো নদওয়াতুল উলামার দফতর ও কুতুবখানা। সেখানেই থাকতেন আমার আরেকজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি হলেন হযরত মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ শিমলাভী। আমাকে বড়ো আদর করতেন তিনি। ডেকে ডেকে কাছে বসাতেন। তারপর শিমলাহ থেকে আনা মিষ্টান্ন ও ফলফলাদি খেতে দিতেন। আব্বার ওফাতের পরও এ-স্নেহ-আদরে কোনো ভাটা পড়ে নি। নদওয়াতুল উলামার ভাগ্যে কতো খাদেমই তো জুটেছে। কিন্তু তাঁর মতো এমন সুযোগ্য, একনিষ্ঠ, কর্ম-পাগল, সুভাষী ও মহৎ ব্যক্তিত্ব সম্ভবত আর জোটে নি। আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিন!

প্রয়োজনীয় উর্দূ কিতাব পড়ার পর সামনে এলো ফারসী পড়ার পালা। আঞ্জুমানে হিমায়াতে ইসলাম লাহোর কর্তৃক প্রণীত ফারসী ১ ও ২ দিয়ে শুরু হলো ফারসী পাঠ। এ বিষয়টি যাঁর কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো, তিনি হলেন এ শহরের এক প্রাচীন আলেম পরিবারের কৃতী সন্তান শায়খ মাহমুদ আলী। এ পরিবারে বড় বড় আলেম ও সুদক্ষ হস্তলিপিকার জন্ম নিয়েছেন। তিনি অনেক ভালো শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিলো কোমল ও মধুর। তাঁর আচরণ ছিলো সভ্য ও মার্জিত। শিক্ষকতায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ। এ সময়টাতে আমি আমার আব্বার রচিত শিশুতোষ কিতাবও পড়ে ফেলি। যেমন 'তা'লিমুল ইসলাম' ও 'নূরুল ঈমান'। পাশাপাশি হাতের লেখার উপরও প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। কখনো স্লেটে কখনো কাগজে। এই হাতের লেখাটা সে সময়ের সিলেবাসের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো।

ভাইজানের প্রসঙ্গে একটু ফিরে আসি। সে সময় ভাইজান পড়ালেখায় 'ভীষণ ব্যস্ত' ছিলেন বললে কম বলা হয়ে যায়। তিনি বরং তখন পড়াশুনায় একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ডুবে ছিলেন।

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা এবং দারুল উলুম দেওবন্দে উলুমে শরীয়া ও আরাবিয়্যাহ শেষ করার পর তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার দিকে, পাশাপাশি মেডিকেলের পড়াশুনার দিকে। তখন তিনি মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। মেডিকেল কলেজ তখন ইংরেজ প্রিন্সিপাল পরিচালিত ছিলো। এমনকি একাধিক শিক্ষক ছিলেন ইংরেজ। তাই এ প্রেক্ষাপটে ভাইজানের উপর পড়াশুনার চাপটা একটু বেশিই ছিলো। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মনোযোগী ও পরিশ্রমী ছাত্র। উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিশে ছিলো তাঁর মন-মানসিকতায়। তাই সবকিছুর পর ভাইজানের কাছে অতিরিক্ত কোনো সময় ছিলো না। সব সময় দেখতাম তিনি পড়ালেখায় ব্যস্ত। কখনো তাঁর কামরায় চলে যেতাম। কিন্তু তখনো তাঁর কোনো বিশেষ সাড়া পেতাম না। মনে হতো, তাঁর হৃদয়ে বুঝি স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার বড়ো আকাল। কিন্তু একদিন আব্বা যখন চিরতরে চলে গেলেন, তখন দেখলাম কেমন করে আমার এই 'নিস্প্রাণ' ভাইটাই আমার জন্যে হয়ে উঠেছিলেন স্নেহময় পিতা এমনকি কখনো কখনো স্নেহময়ী মাতা! আব্বার ওফাতের পর সত্যি কী বিশাল পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি তাঁর মাঝে!

আব্বা কথা বলতেন কম আর কাজ করতেন বেশি। সব সময় তাঁর চেহারায় ছেয়ে থাকতো প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের ছায়া। এর প্রভাবে পুরো বাড়িটাই ছেয়ে থাকতো শান্ত-সমাহিত এক নীরবতায়। এ নীরবতায় কোনো ছেদ পড়তো না। ছেদ পড়তো তখনই যখন ছুটি উপলক্ষে লাহোর থেকে ছুটে আসতেন আমার চাচা সায়্যিদ তালহা অথবা ভুপাল থেকে সায়্যিদ আবদুল্লাহ, যিনি আমাদের সম্পর্কে দাদা হন এবং যিনি পূর্বোক্ত মহান বুযুর্গ হযরত মাওলানা সায়্যিদ খাজা আহমদ নাসিরাবাদী'র ছেলে। তখন বাড়িটা একটু কলকলিয়ে উঠতো। আব্বা এদের বসাতেন, কথা বলতেন। বাড়িময় একটা গুঞ্জরন ও প্রাণময়তা ফুটে উঠতো। বাড়ির নিচতলায় রাস্তার পাশের কামরায় থাকতেন আমার মামাতো ভাই সায়্যিদ হাবীবুর রহমান এবং হানসাওয়া'র কয়েকজন চাচাতো ভাই। তারা পড়ালেখা করতেন শহরের কোনো স্কুলে কিংবা নদওয়ায়। তাদের বদৌলতে বাইরের পরিবেশে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে আমি তার কিছুটা খবর জানতে পারতাম। শহরের বিভিন্ন ঘটনার কথা জানতে পারতাম।

খেলাফত আন্দোলন

আমি তখন আট বছরের বালক। অনেক কিছুই বুঝতে শুরু করেছি। খেলাফত আন্দোলনের তপ্ত লু-হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দুস্তানে। মুসলমানের

ঘর তো বটেই, শিক্ষিত ও সচেতন হিন্দুদের ঘরও খেলাফত আন্দোলনের চেতনায় শাণিত, তার গুঞ্জনে গুঞ্জরিত। সারা হিন্দুস্তান যেনো জ্বলছে, টগবগ করছে, ইংরেজবিরোধী চেতনায় ফুঁসছে। মসজিদে-দোকানে-বৈঠকে-ঘরে-বাইরে— সর্বত্র এই একই আলোচনা, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন! আমাদের শহর লখনৌ সব সময় রাজনৈতিক বিষয়ের ও আন্দোলনের সূতিকাগার, প্রাণকেন্দ্র, অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী।

এ আন্দোলনের এক প্রাণপুরুষ ছিলেন আমাদের শহর লখনৌতে। তিনি হলেন হযরত মাওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লী। তাঁর বাসভবন ফিরিঙ্গিমহল এ আন্দোলনের নেতাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো। গান্ধী নিজেও ওই বাড়িতে উঠতেন, তাঁর মেহমান হতেন। খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুহাম্মদ আলী শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ও ছিলেন তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত। খেলাফত আন্দোলনের তারানা তখন মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

শহরের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে গেলো যে, যে কেউ ভাবতো যে, ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটেছে! শাসন চলবে এখন শুধু গান্ধীজি আর আলী-ভ্রাতৃদ্বয়ের! সে সময়েই লখনৌ এসেছিলেন বৃটেনের যুবরাজ—প্রিন্স অব ওয়েলস। সে স্মৃতিও মনে পড়ে। আমি একটা কী প্রয়োজনে যেনো ঘরের বাইরে এসেছিলাম, এসে দেখি সারা শহরে সুনসান নীরবতা। ভীড় ঠেলে ঠেলে হাঁটতে হয় যে বাজারে সেখানে এখন মানুষ নেই। গিজগিজ করা রাস্তাঘাটও নির্জনতায় খাঁ-খাঁ করছে।

আমিনুদ্দৌলা পার্কে ইউরোপিয়ান বস্ত্র পোড়ানো হচ্ছিলো। যাদের গায়ে ইউরোপিয়ান পোশাক তারা ভয়ে মূল সড়কে চলাচল করতো না। তখনই আমি মাওলানা মুহাম্মদ আলী এবং গান্ধীজিকে দেখেছিলাম। মামাতো ভাই সায়্যিদ হাবীবুর রহমান তখন ইংরেজ প্রভাবিত আমিনাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তেন। পরিস্থিতির কারণে সে বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য অন্য আরেকটা জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ইংরেজপ্রদত্ত সব কিছুই বর্জন শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ইংরেজদের নাম লেখা কোনে ক্রেস্ট ইত্যাদি পাওয়া গেলেই পদদলিত করা হতো। প্রিয়জনকে, এলাকাবাসীকে নিজের চোখে দেখেছি ইংরেজদের তৈরী পোশাক ও সংস্কৃতি বর্জন করে দেশী পোশাক পরতে এবং দেশী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে। সবার জীবনে এক বিরাট ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হলো।

আমাদের খানদান খেলাফত আন্দোলনের পরিপূর্ণ সমর্থক ছিলেন, সহায়তা দানকারী ছিলেন। এটাই ছিলো পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের দাবি। আমার আব্বা এমনিতে তো বেশ চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু কেলাফত আন্দোলনের বেলায় তিনি নীরব বসে থাকতে পারেন নি, বরং এর পক্ষে এক আবেদন লিখে সবার মাঝে প্রচার করে দেন এবং সবাইকে খেলাফত আন্দোলনকে জোরদার করার আবেদন জানান। ছোট্টবেলায় আমি নিজেও দেখেছিলাম তাঁর সেই আবেগমাখা আবেদন! খেলাফত আন্দোলনের প্রতি তাঁর এই বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই তিনি ইংরেজ প্রশাসনের সাহায্য নেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

একবার মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ.-এর মা রায়বেরেলি এসেছিলেন এক সফরে। তখন আম্মাকে সান্ত্বনা দিতে তিনি আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন। কিছুদিন আগেই আব্বার ইন্তেকাল হয়েছিলো। আম্মা স্বামীর ওফাতপরবর্তী ইদ্দত ও শোক পালন করছিলেন।

খেলাফত বাতিল করার সেই দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত

খেলাফত আন্দোলন সম্পর্কে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা সঠিক ছিলো, ন্যায়ানুগ ছিলো, সময়ের অপরিহার্য দাবি ছিলো। 'খেলাফত' তো ছিলো ইসলামের সোনালী ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য পুণ্যধারা। খেলাফতের সংরক্ষণ মুসলমানদের এক মহাধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের যে গৌরবের ইতিহাস আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সে পুণ্য শতাব্দিসমূহের কোন্ সময়টি খেলাফত ও খলীফাবিহীন ছিলো? 'খলীফাতুল মুসলিমীন' ছাড়া মুসলমানদের বেঁচে থাকাটাই ছিলো অকল্পনীয়। আব্বাসীয়দের খেলাফত কালে এক যুদ্ধে তৎকালীন খলীফা নিখোঁজ হয়ে গেলে এবং পরবর্তীতে খলীফা মু'তাসিমবিল্লাহ শহীদ হয়ে গেলে বেশ ক'বছরের জন্যে খেলাফতের মসনদে কোনো খলীফা ছিলেন না। আল্লামা ইবনে কাসির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় সে সময়ের নতুন বছরের সূচনায় লিখেছেন—

استهلت سنة والمسلمون بلا خلافة

বছরটির সূচনা হলো এমন এক সময়ে, যখন মুসলমানদের কোনো খলীফা নেই! আল্লামা শিবলি নু'মানী তাঁর বিখ্যাত কাসীদায় – যা 'বলকান-দুর্গতি' নামে পরিচিত – বলেছেন,

زوال دولت عثمان زوال ملک وملت ہے

عزیزو! فکر فرزند وعیال خانماں کب تک

উসমানী সালতানাতের বিলুপ্তি সে-যে মুলক ও মিল্লাতের
বিলুপ্তি।
প্রিয় বন্ধু! আর কতো সন্তান, পরিবার আর ঘরের চিন্তা?
জেগে উঠতে আর কতো দেরী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্গ আর রক্ষা করা গেলো না। মহান সেই খেলাফতের উপর নেমে এলো বিলুপ্তির কালো পর্দা, যা এতোদিন বাকি ছিলো পূর্ণ-অবয়বে না হলেও কোনা-না-কোনো আকৃতিতে। তুর্কীর উসমানী সুলতানেরা যে খেলাফতের মহিমা ও শান-শওকত আঁকড়ে রেখেছিলেন নিজেদের সকল দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ইউরোপীয়ানদেরকে ভয়-কাতর করে রেখেছিলেন। আরো যে কাজটি তারা করছিলেন তা হলো হারামাইন শরীফাইনের দেখভাল ও সংরক্ষণ। কামাল আতাতুর্কের মুখের কথায় আর কলমের খোঁচায় হারিয়ে গেলো সেই মহান খেলাফত, যে কামাল আতাতুর্ককে অনেক দিন যাবত মুসলমানেরা প্রশংসা করেছে তার প্রকৃত স্বরূপ না জেনে।

খেলাফত বাতিল করার সিদ্ধান্তটা হয়েছিলো যে কালো দিনে, সেটা হলো ৩০ সে মার্চ ১৯২৪/ ১৩৪১ হিজরী। কনষ্টন্টিনোপলে বসে জাতীয় পরিষদ খেলাফত বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তর কারণে শুধু ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোই হুমকির মুখে পড়লো না, বরং মুসলমানদের ইয্যত-আব্রুর দেয়ালটাও ধ্বসে পড়লো, যা অনেক ত্যাগ ও কুরবানির বিনিময়ে এবং শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও এই খেলাফতের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার উপর তুর্কীরা গড়ে তুলেছিলো।

এ সিদ্ধান্ত হয়েছে পাশ্চাত্যের বিশেষত বৃটেনের ইশারায় এবং ওদের ক্রমবর্ধমান পীড়াপীড়িতে। تاريخ الدولة العثمانية (উসমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস)-এর বিজ্ঞ লেখক আলী হাসসূন এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন—

'এ ঘোষণার পরই ইংল্যান্ড তুর্কীকে একটি আলাদা স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো, তাদের প্রধান 'বন্ধু' ও 'মিত্র' কামাল আতাতুর্কের সম্মানার্থে। ইংরেজ বাহিনীও তুর্কী সীমান্ত থেকে সরে আসে। এক সংসদ সদস্য সাধারণ পরিষদ (House of Commns)-এ এর প্রতিবাদ করলে উত্তরে বলা হয়, 'আসল ব্যাপার হলো আমরা তুর্কীকে শেষ করে দিয়েছি।

এখন আর কোনোদিন তুর্কী উঠে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা তুর্কীর রুহানী ও মানসিক শক্তি (ইসলামী খেলাফত) শেষ করে দিয়েছি।"[১]

এও এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, লোরান সেমিনারে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের প্রধান লর্ড ক্রিজেন তুর্কীকে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে চারটি শর্ত আরোপ করেছিলোঃ

১. ইসলামী খেলাফতের অবলুপ্তি
২. খলীফাকে দেশান্তর
৩. তার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
৪. তুর্কীকে একটি ধর্মনিরেপক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দেওয়া

ওই সেমিনারে তুর্কী প্রতিনিধি দল এ শর্তাবলী না মানলেও পরবর্তীতে কামাল আতাতুর্ক-এর চেষ্টায় ও পীড়াপীড়িতে তুর্কী পার্লামেন্ট শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হয় পাশ্চাত্যের (বিশেষত বৃটেনের) সেই স্বপ্ন, যা তারা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছিলো। আরো বেদনাদায়ক হলো এই যে, তা সম্পন্ন হয়েছে তুর্কী নেতা কামাল আতাতুর্কের হাতে, যাকে ভাবা হতো তুর্কীর মুহাফিজ ও ত্রাতা হিসাবে। আল্লামা ইকবাল তাই বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তাঁর এক কবিতায় বলেছেন—

چاک کردی ترک ناداں نے خلافت کی قبا
سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ

তুর্কীর ওই নাদানটা খেলাফতের জুব্বাটা ছিদ্র করে দিয়েছে!
দেখো, মুসলমানের সারল্য দেখো, অপরদিকে ওদের (পশ্চিমাদের) কূট-কৌশল ও ধোঁকাবাজিও দেখো!

আমার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। এ জন্যে এ ঘটনার ভয়াবহতা ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক ফলাফল তখন আমি অনুভব করতে পারি নি। কিন্তু এক আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন মুসলমান হিসাবে খেলাফত আন্দোলনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সে যেনো এই গতকালেরই (কিছুদিন আগে ঘটে-যাওয়া) ঘটনা! তাই আমার কলম সেই আবেগ ও বাস্তবতা প্রকাশ না করে পারে নি। যদিও বিষয়টির অনুধাবন, তার গভীরতা যাচাই আমার বয়স ও অনুভবের বাইরে, অনেক উপরে।

---

১. تاريخ الدولة العثمانية পৃষ্ঠা- ২৭৩, প্রকাশক- মাকতাবা ইসলামিয়া দামেস্ক, বৈরুত

তৃতীয় অধ্যায়

আব্বার ওফাত, গৃহশিক্ষা, শায়খ খলীল বিন মুহাম্মদ আলইয়ামানী'র কাছে আরবী শেখার সূচনা উর্দূ শিক্ষা, পরিবেশ, আঁকুপাঁকু মনের বাসনা আরবী পাঠের পূর্ণতা

আব্বার ওফাত

জুমাদাল উলা'র ১৫ তারিখ ১৩৪১ হিজরী, ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ ১৯২৩ সাল শুক্রবার দিন। আমার শান্ত জীবনের নিরবধি বয়ে-চলা 'ছোট্ট নদীটি' হঠাৎ বাঁক হারিয়ে ফেললো এবং আমাদের ছোট্ট পরিবারটিই হঠাৎ বদলে গেলো। মাত্র কয়েক ঘন্টার অসুস্থতার পর আব্বা চলে গেলেন! চলে গেলেন তাঁর রবের কাছে! আল্লাহর কী লীলা! তখন দশ ছুঁইছুঁই এই ছোট্ট আমি ছাড়া তাঁর কাছে আর কেউ ছিলেন না! [1] আল্লাহর কী মর্জি, ছোট হওয়া সত্ত্বেও আমি কারো বলা ছাড়াই কিংবা আব্বার ইশারায় তাঁর পা টিপে দিতে লাগলাম। তাঁর যবানে যিকির জারি ছিলো। হঠাৎ আব্বা নীরব হয়ে গেলেন। আমার বোনেরা পেরেশান হয়ে গেলেন। আমার উস্তায মাওলানা মাহমুদ আলী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। একজন হাকীম সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আব্বাজানের একজন দোস্তও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কারোই বুঝতে বাকি রইলো না যে, আব্বাজান চলে গেছেন! মুহূর্তেই তাঁর ওফাতের খবর

---

১. এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! আগামী দিনের আবুল হাসান আলী নদভীর জীবনে অমন ঘটতেই পারে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার একটা মন্তব্য করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাই বেছে নিলাম আমার জন্যে নিরাপদ জায়গা এই 'হাশিয়া'। আমার মন্তব্য হলো কিংবা আমার আবেগের স্বচ্ছ সাবলীল প্রকাশ হলো, হে আগামী দিনের আবুল হাসান! সেদিন শুধু তুমিই ছিলে তোমার বাবার শিয়রে, কেনো জানো? তোমার কানে কানে একেবারে একাকী তিনি যেনো বলে যেতে পারেন: আলী! তোমাকেই আমি দিয়ে গেলাম আমার 'সামান্য' ইলমের উত্তরাধিকার! -অনুবাদক

তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে ছুটে আসতে লাগলেন তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা। সবাই এসে নিচে দাওয়াখানায় এসে বসলেন। তাঁদের শোকদীপ্ত সমবেদনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো অল্প বয়সের এক বালক, যে উপস্থিত কাউকেই বোঝাতে পারছিলো না— হঠাৎ করে কী ঘটে গেছে! উপস্থিত সমবেদনা প্রকাশকারীরা কোন্ স্তরের ও অবস্থানের ছিলেন? কেমন করে তাঁদের প্রতি-উত্তর করা উচিত ছিলো? সেই ছোট্ট বালক কিছুই বুঝতে পারছিলো না। কেউ তাকে বুকে চেপে ধরছিলো। কেউ তাকে পাশে এনে বসাচ্ছিলো। কেউ তার মাথায় স্নেহ-পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিলো। দৃষ্টি তার ছলোছলো। মন তার শোকপ্লাবিত। তাঁদের সমবেদনা গ্রহণের এবং তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সবচে' বেশি উপযুক্ত যিনি, তিনি নেই। তিনি তখন হাজার মাইল দূরে সেই মাদ্রাজে। এইমাত্র ঘটে-যাওয়া এই শোক সংবাদের কিছুই তাঁর জানা হয় নি! এরপর কেমন করে কী হলো তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 'হায়াতে আবদুল হাই' কিতাবে।

ভাইজানের স্নেহ-মমতা ও অভিভাবকত্বকাল

ভাইজান আব্বার ইন্তেকালের খবর পেলেন বোম্বেতে বসে, আব্বার এক বন্ধুর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে এলেন লখনৌতে। তারপর ছুটে গেলেন রায়বেরেলিতে। পৌঁছেই সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন আব্বার কবরে। আমিও সঙ্গে গেলাম। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিলেন! সে কান্নার দর্শ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে, মনে হয়, যেনো সেদিনের কথা! তখন থেকেই আমরা লক্ষ্য করলাম— ভাইজান বদলে গেছেন। বিশাল এক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাঁর জীবনে। এখন আর তিনি আগের মতো ভীষণ ব্যস্ত নন। 'পরিবার-বিচ্ছিন্ন' একাগ্রচিত্ত ছাত্র নন। এখন তিনি আমাদের—ভাইবোনদের পিতা হয়ে গেলেন, স্নেহশীল পিতা! মায়ের সৌভাগ্যবান এক ছেলে বা খাদেম হয়ে গেলেন! আমি তাঁর কাছ থেকে শুধু পিতৃস্নেহ-ই পাই নি, পেয়েছি মায়ের অগাধ ভালোবাসাও!

আব্বার ইন্তিকালের পর অনেক শোকবার্তা ও সান্ত্বনাপত্র আমরা পেয়েছি। সে সব এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই। শুধু একটি চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি, যা আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন নওয়াব সায়্যিদ আলী হাসান খান (নওয়াব নূরুল হাসান আব্বার ইন্তেকালের ৫ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন), যাতে তিনি আমার চিন্তা মানসিকতা ও বয়সের দিকে বেশ লক্ষ্য রেখেছিলেন।

লক্ষ্য করুন :

> 'তোমরা অমন ভাববে না কক্খনো যে, বাবা তো চলে গেছেন! এখন আমরা কেমন করে কীভাবে পড়ালেখা করবো? আমি জানতে পেরেছি, তুমি নিজের পড়ালেখা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে মানুষের কাছে অমন কথা বলেছো! কিন্তু তোমার বড় ভাইজানের কথা ভুলে যেয়ো না! তিনি তোমাদের সুশিক্ষার আয়োজন করবেনই! তিনি বড়োই যোগ্য মানুষ! আমি পরিস্কার করে বলতে চাই, তোমাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখার মানুষের অভাব হবে না! সুতরাং তুমি একেবারেই ঘাবড়াবে না! আল্লাহ্ চাইলে তোমরা সবাই খুব ভালোভাবেই এবং খুব আরাম ও স্বস্তির সাথে পড়ালেখা করে যেতে পারবে! আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেনো তোমার হায়াত দারাজ করেন, যাতে তুমি পরিবারের জন্যে সুনাম খ্যাতি ও গেওরব বয়ে আনতে পারো!'

তাকিয়ায় আরো কিছুদিন, আম্মার তারবিয়াত

বাবা'র ইন্তেকালের পর লখনৌ অবস্থানের কোনো কারণ ছিলো না। বাবা'র চেম্বার এবং নদওয়াতুল উলামা'র দায়িত্ব— কোনোটিই এখন নেই। ভাইজান মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। এদিকে বাড়িতে ছিলো না কোনো সম্পত্তি কিংবা আয়ের উৎস। তাই লখনৌতে থেকে ভাইজানের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এ কঠিন অবস্থায় আমাদের সহযোগিতায় বিশেষত ভাইজানের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন যে মহয়িসী নারী, তিনি হলেন নওয়াব সায়্যিদ নুরুল হাসান খানের স্ত্রী এবং তাঁর দুই ছেলে সায়্যিদ জহুরুল হাসান ও সায়্যিদ নাজমুল হাসান। আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! তাঁদের কবরকে নূরে-রহমতে ভরে দিন! তাঁরা নিজেদের অমায়িক ব্যবহারে ও স্নেহ-ভালোবাসায় আত্মীয়দের চাইতেও বড় আত্মীয় হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন! তাঁরা তাঁদের আলিশান মহলে গিয়ে উঠতে আমাদেরকে প্রস্তাব দিলেন!

আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, তা শুরু থেকেই ভাড়া ছিলো, যা ইতিমধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়াও

ভাইজানের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, খরচ অনেক। তাই ভাইজান এ আন্তরিকতাপূর্ণ প্রস্তাবকে গনিমত মনে করলেন, ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করার উপযোগী মহলের একটা আলাদা অংশ ভাইজানের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। ভাইজান সেখানে চলে গেলেন। ভাড়া বাসায় থেকে-যাওয়া বাবার প্রিয় ও সমৃদ্ধ 'লাইব্রেরি'টিও ভাইজান সে মহলে নিজের কাছে স্থানান্তরিত করে নিলেন। বাবার অনেক দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের সমষ্টি ছিলো সে লাইব্রেরিটি। ভাইজান সেখানে কেমন ছিলেন? মেহমানের মতো ছিলেন এবং সে পরিবারের এক সন্তানের মতো ছিলেন। এভাবে ভাইজান নিজের পড়ালেখা শেষ করা পর্যন্ত এখানে ছিলেন। এদিকে আমি, বোনেরা ও আম্মা— আব্বার ইন্তেকালের রাতেই রায়বেরেলি চলে গিয়েছিলাম।

আমার ফারসি ভাষা অধ্যয়ন চলছিলো। যে উস্তাযের কাছে আমি ফারসি পড়তাম তিনি লখনৌতে থাকতেন। কিন্তু রায়বেরেলি আসার পর আমার ফারসি পড়া বন্ধ হয় নি। ভাইজানের পরামর্শে আমার এক চাচা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসমাঈল রহ.-এর কাছে এখানে আমি বুসতাঁ পড়তাম। তিনি খুব ভালো ফারসি জানতেন। অংক ও উর্দূ হস্তলিপি শিখতাম আরেকজন উস্তাযের কাছে, তিনি আসতেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম লোহানিপুর থেকে। তাঁর নাম মাস্টার জামান খান। আমার মামাতো ভাইও তাঁর কাছে পড়তে বসতেন। আমার মামা মাওলানা হাফেজ উবায়দুল্লাহ সাহেব তাঁর কাছে পড়ার এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমাদের ঘরে কোনো পুরুষ মুরুব্বী ছিলেন না। তাই আম্মাই আমার পড়াশুনা থেকে শুরু করে সার্বিক তত্ত্বাবধান করতেন। সঠিক সময়ে সঠিক তারবিয়াত দিতেন। তখন তিনি আমাকে কুরআনের বড় বড় সূরা মুখস্থ করিয়েছিলেন।

খানদানে তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য স্নেহশীলা ও মমতাময়ী। বাবা চলে যাওয়ার পর আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। অন্য মায়েদের তুলনায় তা একটু বেশিই ছিলো। কিন্তু দু'টি বিষয়ে তিনি ছিলেন আমার প্রতি ভীষণ কঠোর—কোনো রকম ছাড় দিতেন না। প্রথমত, তিনি নামাজের ব্যাপারে আমার কোনো গাফিলতি ও অলসতা সহ্য করতেন না। ঈশার আগে নামাজ না-পড়ে শুয়ে পড়লে যে-কোনোভাবেই তিনি আমাকে জাগিয়ে নামাজ পড়াতেন। গভীর ঘুমে থাকলেও ছাড় দিতেন না। অনুরূপ

ফজরে জাগিয়ে দিতেন এবং মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর কুরআন তিলাওয়াতে বসিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয়, যে বিষয়টিতে তিনি আমাকে একদম ছাড় দিতেন না, তা হলো কখনো যদি আমি প্রতিবেশী ছেলেদের সাথে কিংবা দরিদ্রদের বা কাজের লোকের ছেলেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে ফেলতাম কিংবা অহঙ্কারী আচরণ করতাম, তখন তিনি আমাকে শুধু মাফ চাইয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বরং হাত জোড় করে মাফ চাইতে বাধ্য করতেন। এতে যতোই আমি অপমানিত বোধ করতাম এবং নিজেকে ছোট ভাবতাম। প্রয়োজনে তিনি শাস্তিও দিতেন। এতে আমার ভীষণ উপকার হয়েছে। কেননা, এতে অহঙ্কার, আত্মগর্ব, সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির প্রতি আমার মনে একটা ঘৃণা জন্ম নিয়েছে। এ খারাপ গুণগুলোকে আমি সে থেকেই ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। ভাবতাম, এসব কবীরা গোনাহ্। তা ছাড়া ভুল করে তা স্বীকার করার সহজ একটা মানসিকতাও এ থেকে আমার তৈরী হয়েছিলো।

আমার আম্মা এমন করে আমাকে তারবিয়াত করেছেন। এখানে মানুষ গড়ার কারিগর অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আমার এ অভিজ্ঞতা থেকে একটি পরামর্শ দিতে চাই। শিশুদের নৈতিকতাবোধ ও ধর্মীয় মানস গঠনে এবং ভবিষ্যতে শিশুর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের দীনের ও ইলমের খিদমত করার তাওফিক হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের বিরাট ও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এক. কখনো সে জুলুম করবে না। সীমালংঘন করবে না। কারো মনে কষ্ট দেবে না। কেননা, কাউকে আঘাত দিলে তার ক্ষত-বিক্ষত মন এবং কারো প্রতি জুলুম করলে মাজলুমের আহময় বদদু'আ ঐ শিশুর জীবনে বিরাট ও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দুই. শিশু যে খাদ্য খাবে, অবশ্যই তা হতে হবে হালাল খাদ্য। তাতে থাকতে পারবে না কোনো ভেজাল, কোনো সন্দেহ। হারাম মাল তো শিশুর পেটে যাওয়া একেবারেই অকল্পনীয়। আল্লাহ আমার মতো দুর্বলের জন্যে এ দু'টি জিনিসই সহজ করে দিয়েছিলেন। আমাদের পূর্ব-পুরুষের যুগ-যুগান্তরে ভূ-সম্পদ, অঢেল ধন-সম্পদ, অংশিদারভিত্তিক সম্পত্তি ছিলো না। আমার আব্বার আয়ের একমাত্র উৎস ছিলো চিকিৎসা বা রোগী দেখা। আমাকে আল্লাহ্ শুধু সন্দেহযুক্ত সম্পদ থেকেই রক্ষা করেন নি, বরং হিন্দুস্তানে ব্যাপক প্রচলিত বিদ'আতি রুসুম-রেওয়াজের কোনো খাবার খাওয়ান নি। যেমন– কেউ মারা গেলে নিকটাত্মীয়দের পাকানো খাবার, যা খেতে ধনী-দরিদ্র সবাইকেই দাওয়াত দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো। একবার আমি আমাদের বাড়ির বৃদ্ধা ঝিয়ের সাথে ফুপুর কাছে 'খালেস হাট'[১] যাচ্ছিলাম। পথে এক জায়গায় গরিবদের খাওয়ানো হচ্ছিলো (চল্লিশা কিংবা সদকার খাবার হবে)। ঝি গিয়ে ওখান থেকে খানা নিলো এবং খেতে বসে গেলো। আমি ছোট্ট ছিলাম। আমার মুখেও পানি এসে গেলো। আমিও তার সাথে বসতে চাইলাম। তখন ঝি বললোঃ বেটা! এ তোমার খাবার নয়! সে আমাকে খেতে দিলো না। এ ছিলো আমাদের ঘরের পরিবেশ এবং খাবার-দাবারের ব্যাপারে আমাদের সতর্কতার স্বাভাবিক ফলাফল, যা সে লক্ষ্য করেছে।

সে সময় আমাদের খানদানের একটা উত্তম নিয়ম ছিলো এই যে, কোনো বিয়োগান্তক দুর্ঘটনা ঘটলে, হৃদয়ে শোকের প্লাবন বয়ে গেলে, কিংবা কোনো অস্থিরতার কারণ ঘটলে, পরিবারের লোকেরা এক সাথে জমা হতেন এবং আল্লামা ওয়াকিদী রচিত ও আব্বার ফুফা সায়্যিদ আবদুর রায্যাক কালামী অনূদিত 'সিমসামুল ইসলাম' (ইসলামের ধারালো তলোয়ার) পড়ে পড়ে সবাইকে শোনানো হতো। এটি 'পুতুহুশ শাম' বা সিরিয়া (ইসলামের) বিজয়ধারা নিয়ে পঁচিশ হাজার আরবী কবিতার অনবদ্য এক কাব্যানুবাদ। ইসলামের বিজয়ধারা শক্তি ও বীরত্বগাথাকে এখানে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মনে হয় তা চোখের সামনে ভাসছে। তখন চেতনায় সৃষ্টি হয় আবেগমিশ্রিত বীরত্ব-জাগরণ। আর শাহাদতের কথা এমন চিত্তাকর্ষক ভঙিমায় বলা হয়েছে যে, মনে সৃষ্টি হয় দোল্ এবং শাহাদত লাভের ব্যাকুল তামান্না। সাহাবায়ে কেরামের রক্তক্ষয়ী ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদানের সামনে তখন ম্লান হয়ে যায় নিজেদের কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদের সকল ঘনঘটা।

আমার বড় খালা সায়্যিদা সালেহা বিনতে যিয়াউন্নবী আল হাসানী —যিনি কুরআনে হাফেজা ছিলেন— এ কবিতাগুলো পড়ে শুনাতেন সুন্দর সুরের মূর্ছনা সৃষ্টি করে করে। অবলীলায় আবৃত্তি করে যেতেন তিনি, কোনো বেগ পেতে হতো না! পড়তে পড়তে, আবৃত্তি করতে করতে মুখস্থের মতো হয়ে গিয়েছিলো। সাধারণত আসরের পরই এ আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হতো। তাই খেলতে খেলতে বা কোনো আবদার নিয়ে বাচ্চারাও মায়েদের কাছে এখানে চলে আসতো। বাচ্চাদের তো মায়েদের কাছে আবদারের কোনো সময় সীমা নেই। মায়েরা যেখানে-সেখানেই বাচ্চারা। অনিচ্ছায়ও কিছুটা সময় ওরাও এখানে বসতো। বসে থাকতো। কখনো বা মায়েরাই ওদেরকে বসিয়ে

---

১. রায়বেরেলির একটা মহল্লা।

রাখতেন নিজেদের কাছে, কবিতা শুনতে। ওরা বেশ বসে থাকতো, মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকতো।

শৈশবে জেঁকে-বসা হতাশার কথা

স্পষ্ট করে এখানে বলে দিই, আমার শৈশব মোটেই আশা-জাগানিয়া ছিলো না। বড় কোনো আশার দিক আমার শৈশবে প্রত্যাশিত ছিলো না। বরং আমার শৈশবটা ছিলো হতাশায় ছাওয়া। যে শৈশবে সুন্দর ভবিষ্যতের .. সমৃদ্ধ ও প্রতিভার দ্যুতিছড়ানো সেই ভবিষ্যতের কোনো ছটা পরিলক্ষিত ছিলো না। বরং আমার অনেক সমবয়সী .. আমাদের পরিবারের অনেক শিশুই ভাবনায় মেধায় প্রতিভায় আমাকে ছাড়িয়ে অনেক অনেক উপরে বসা ছিলো। আমার মা স্বাভাবিকভাবেই এ জন্যে একটু বিচলিত ছিলেন। খানদানের অনেক নারী ও পুরুষ আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে মায়ের এ দুঃখবোধ আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

কিন্তু অপরদিকে এর একটা ভালো উপকারী দিকও সামনে এলো। আমার মা দুঃখভারাক্রান্ত মনে হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চিত সব অস্ত্র (অর্থাৎ দু'আ-মুনাজাত, বিনয়-বিগলিত প্রার্থনা ও আহাজারি) নিয়ে আল্লাহর সকাশে হাজির হতেন আমার ভবিষ্যত যেনো উজ্জ্বল হয়, আমি যেনো বড় আলেম হতে পারি, আমি যেনো আদর্শ বাবার আদর্শ ছেলে হতে পারি, আমি যেনো খানদানের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি, আমি যেন মানুষের কাছে সর্বোপরি আল্লাহর কাছে মাকবুল হতে পারি, আমি যেন সব ক্ষেত্রে .. সব ময়দানে সফল হতে পারি। এই আবেগভরা, এই উষ্ণতাঘেরা দু'আ ও মুনাজাতই হয়ে দাঁড়ালো মায়ের সার্বক্ষণিক ওযিফা। এ সব শুধু তাঁর মুখের ভাষাতেই আর সীমাবদ্ধ থাকে নি, কলমের ভাষায়ও একে একে প্রকাশ পেতে লাগলো। গদ্যের ভাষায় .. পদ্যের ভাষায়। মায়ের অমন কান্না-ব্যাকুল ও আবেগ-আকুল দু'আ ও মুনাজাত খুব কমই দেখা যায়। ইতিহাসেও এর নজির খুব কম। একবার মা আমাকে বলছিলেন— আমাকে নিয়ে তিনি যখন এই মানসিক সঙ্কটকাল অতিক্রম করছিলেন, তখন স্বপ্নে তিনি তাঁর বাবাকে দেখলেন। নানা আম্মাকে মনে করিয়ে দিলেন আগের সেই স্বপ্নটির কথা, যে স্বপ্নে একজন লোক তাঁকে এ আয়াত পড়ে শুনাচ্ছিলেন— (আগের মতো)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

কেউ বলতে পারে না, তাদের জন্যে কী-যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, চোখ জুড়ানো, মন ভরানো—নয়নপ্রীতিকর, তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে।[১]

তারপর নানা মাকে বললেন— এতো পেরেশান কেনো তুমি? কেনো এতো ভয় পাচ্ছো? আমার মনে হয়, আমি যা কিছু শিখেছি, আল্লাহর নৈকট্যধন্য প্রিয় বান্দাগণের যে অপার দু'আ ও বিপুল সান্নিধ্য পেয়েছি—সবই মায়ের ঐ অসহায়ত্বগাথা—দু'আরই বরকত! সত্যি বলেছেন আল্লাহ :

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)

আমি যখন লিখতে-বলতে শুরু করলাম, তখন আমার মা আমাকে খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন, আমি যেনো সব লেখাই শুরু করি এই দু'আ করে :

اللّٰهُمَّ آتِنِي بِفَضْلِكَ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

'হে আল্লাহ! তোমার পুণ্যবান বান্দাগণকে যা যা দান করেছো, অনুগ্রহ করে আমাকে তারচে' আরো উত্তম উত্তম জিনিস দান করো!'

অনেক দিন এ দু'আ লেখার অভ্যাস আমার চালু ছিলো। এখনো দু'আ করার সময় এ দু'আ মুখে চলে আসে!

একটি ঐতিহাসিক দিন

ছোট্ট গ্রাম তাকিয়াকিলাঁয় কেমন ছিলাম আমি, আমরা? যে পরিবেশে আমি বেড়ে উঠছিলাম, সে পরিবেশের একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা হলো, আমার মামাতো ভাই সায়্যিদ সিরাজুন্নবী'র আমেরিকা থেকে ব্যরিস্টারি শেষ করে আমাদের গ্রামে ফিরে আসার ঘটনা। সময়টা ছিলো ১৯২৫। তাঁর আগমন উপলক্ষে আমার মামাতো ও চাচাতো ভাইয়েরা বেশ মেতে উঠেছিলো। তাঁকে স্বাগত জানানোর ব্যাপক প্রস্তুতি তারা নিয়েছিলো। তারা কয়েকদিন ধরে অনেক পতাকা বানালো, ফটক তেরী করলো। খানদানের অনেকেই এমনকি ছোটরাও অনেকে ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলো তাঁকে স্বাগত জানাতে। সে দিনটি ছিলো আমাদের খানদানের একটি ঐতিহাসিক দিন। আমরা ছোটরা ছিলাম আনন্দে মাতোয়ারা।

---

১. সূরা সেজদা

আনন্দের ও গৌরবের বিষয় হলো এই যে, আমাদের খালাতো ভাই সায়্যিদ মুহাম্মদ আহমদ আল হাসানী (যার আলোচনা পূর্বে গিয়েছে) এবং মামাতো ভাই সায়্যিদ সিরাজুন্নবী— উভয়েই ইংল্যান্ড-আমেরিকা থেকে নিরাপদে ফিরতে পেরেছেন নিজেদের দীন ও আক্বিদা নিয়ে। সেখানে সব সময় তারা নামাজ পড়েছেন গুরুত্ব দিয়ে, রোযাও রেখেছেন এবং কুরআন তিলাওয়াতও করেছেন নিয়মিত আর ফিরে এসে গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধাও করেছেন যথাযথভাবে, সম্মান করেছেন দীনকে, দীনের ধারক-বাহক— সবাইকে।

আমরা জানতে পেরেছি— এরা দু'জনই মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি রহ.-এর ভাষায় 'ইয়াজুজি সভ্যতা'র দেশে থেকেও নামাজ-রোযায় কোনো ক্রটি করেন নি। যাহোক; সায়্যিদ সিরাজুন্নবী ভাইয়ের আগমন উপলক্ষে খানদানের ছেলেরা খেলাধুলাসহ নানা বিষয় নিয়ে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিলো। কয়েকটা দিন বেশ আনন্দে কেটেছিলো।

আমীর নওয়াব নুরুল হাসান মহলে অবস্থান

বড় ভাইজান যখন নওয়াব মহলে বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে লাগলেন, তখন আমাকেও তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে আমি ফারসি পড়া আবার শুরু করলাম চাচাজান সায়্যিদ আবদুর রহমান রহ.-এর কাছে, যিনি ঐ মহলেই থাকতেন। ঐ মহলে আমার ভালোই সময় কাটতে লাগলো। সায়্যিদ জহুরুর হাসান ও সায়্যিদ নাজমুল হাসান (যারা নওয়াব সায়্যিদ নুরুল হাসান সাহেবের পুত্র ছিলেন)-এর ছেলেরা আমার ভালো সঙ্গী হয়ে উঠলো। একসাথে খেলতাম, একসাথেই খেতে বসতাম। কখনো আমাদের মাঝে 'লড়াই'ও হয়ে যেতো। ওদের দাদীজান আমাদের সবাইকে এক নজরে দেখতেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আমাকে এবং হাবীব ভাইকে —যিনি ঠিক আমার বয়সী ছিলেন— গ্রীষ্মকালে নিয়ে যেতেন বাগানে পানি-থৈথৈ হাউজের কাছে। সেখানে বসে তিনি শীতল হাওয়ার পরশ নিতেন। বিশ্রামের একটা জায়গা ছিলো। সেখানে কখনো কখনো শুয়েও থাকতেন। আমাকে আর হাবীব ভাইকে পাশেই শোয়াতেন।

আমার বেশ মনে পড়ে, আমি এবং আমার এ ভাইয়েরা একদিন নাশতা করছিলাম। তখন দাদী এসে আমাকে বললেন: আলী! আমি যখন আগে তোমাদের কাছে বেড়াতে যেতাম তখন দেখতাম প্রায়ই তুমি তোমার মাকে

বলছে— 'বিবি! (আমি ছোটবেলায় মাকে 'বিবি' বলতাম) ঐ-যে বাইরে একটা জিনিস বিক্রি হচ্ছে, দেবে পয়সা!' কিন্তু এখন তো তুমি এখানে এসে আমার কাছে কিছুই চাইছো না?! আমি কোনো উত্তর করলাম না, নীরবে বসে রইলাম। এরপর তিনি বাটা খুলে আমার হাতে পাঁচ রুপি'র একটা 'কাঁচা নোট' তুলে দিলেন (তখনকার পাঁচ রুপি এখনকার পঞ্চাশ রুপি বরাবর হবে)! বললেনঃ যাও! তোমার যা মনে চায় কিনে খাও!

এভাবেই আরেকদিন তিনি এসে আমাকে হাসতে হাসতে বলছিলেনঃ আলী! তুমি তো একন বেশ বড় হয়ে গেছো! তোমার সাথে যে এবার পর্দা করতে হবে! আমি তাঁর কথাকে ঠাট্টা মনে করি নি, বরং সত্যি ভেবেছিলাম! এবং নিজেকে বেশ গুটিয়ে নিলাম! তখন তিনি মিষ্টি করে হেসে বললেনঃ বোকা ছেলে! তোমার সাথেও আমাকে পর্দা করে চলতে হবে?! তাহলে-যে নাতি হাবীবের সাথেও আমাকে পর্দা করতে হবে! আনোয়ারের সাথেও পর্দা করতে হবে!

তাঁর এ স্নেহ-মমতাগাথা আজ অনেক মনে পড়ে! সত্যি আমি ছিলাম সেখানে মায়ের আদরে .. দাদীর স্নেহে! তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা শুধু আমাকেই নয়, আমার অন্য ভাইবোনকেও সিক্ত করেছিলো!

সে 'রাজমহলে' থাকার কারণে আমার অনেক উপকার হয়েছিলো। আমার চোখের পর্দা সরে গিয়েছিলো। ধন-দৌলত আর নেতৃত্বের ঝলকানিতে তাই কখনো আমার দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায় নি! মনে হয়; দেখা-জিনিস দেখছি! খো-জিনিস দেখলে না চোখ হয় ছানাবড়া, না মনে সৃষ্টি হয় কোনো আক্ষেপ। আমার দেখা সে রাজমহলে , আমার থাকা সে আলিশান প্রাসাদে আমি সব দেখেছি। দেখেছি, সম্পদ-শোভার চমৎকারিত্বের জ্বলজ্বলে প্রকাশ। এ অভিজাত নওয়াব পরিবারের সবই ছিলো। বংশে তাঁরা সেরা, ইলমেও তাঁরা অগ্রগামী আর নেতৃত্বে তাঁরা সমুজ্জ্বল। দাদা নওয়াব সায়্যিদ হায়দার হাসান খান যখন ভুপাল শাসন করতেন, তখন সবই ছিলো তাঁর। ছিলো অনুচর ও পরিচারকবর্গ, ছিলো সম্পদ-শোভা, ছিলো রাজকীয় খানা-দানা ও বিলাস-উপকরণ, বড় বড় শাসনকর্তাদের এবং ছোটখাট রাজা-বাদশাদের মহলে যা যা থাকতো, তার সবই ছিলো সেখানে। সে সবের জৌলুস বাকি ছিলো আমার সময়েও। তাই আমি দু'চোখভরে সে সব দেখেছি। এভাবে রাজকীয় বিলাস-উপকরণ, নেতৃত্বের শান-শওকত কক্‌খনোই আমার চোখে বিস্ময়ের কিংবা মুগ্ধতার ছায়া ফেলতে পারে নি!

এ পরিবেশে থেকে আমি অমন করে উপকৃত হতে পেরেছি আমার বড় ভাইয়ের সতর্ক তত্ত্বাবধান ও প্রাজ্ঞ দিক-নির্দেশনার কারণে। ভাইজান এখানে দু'টি বিষয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। এ দু'টি বিষয়ে আমার কোনো গাফিলতি হচ্ছে কি না— এ ব্যাপারে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। এর একটি হলো— জামায়াতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়া। মেডিকেল কলেজ থেকে ফিরেই তিনি আমার কাছে প্রথমেই জানতে চাইতেন— আলী! জোহর-আসর-মাগরিব ঠিকমত পড়েছো? আমি 'হ্যাঁ' বলতাম। কখনো তিনি আমার এ-'হ্যাঁ'তে দুর্বলতা লক্ষ্য করলে বলতেন— আমার সামনে জোহর-আসর-মাগরিব (আবার) পড়ো! দ্বিতীয় যে বিষয়টিতেও তিনি আমাকে কোনো ছাড় দিতেন না, তা হলো— ঐ প্রাসাদের অনুচর-পরিচারক ও খাদেম-খোদ্দামদের সাথে যেনো আমি একদম না-মিশি। আর ওদের সংখ্যাটা নেহাত কম ছিলো না। পাশাপাশি এও তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, যেনো আমি নিজের ইচ্ছায় কোনো গল্প-উপন্যাসের বই না-পড়ি। এমন কি তাঁকে না-জানিয়ে কোনো কিতাবও যেনো পড়ি। তাই হয়েছিলো। আমি অক্ষরে অক্ষরে তাঁর সব নির্দেশ ও চাওয়া মেনে চলেছি! ভাইজানই আমাকে বাবা'র ঐ মাকতাবা থেকে কিতাব নির্বাচন করে দিতেন। আমাকে সর্ব প্রথম যে কিতাবটি তিনি হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তা ছিলো সীরাতুন্নবী। নাম— সীরাতে খায়রুল বাশার। এরপর আমি যেটি পড়েছি সেটিও ছিলো সীরাতের কিতাব। নাম— রহমাতুল-লিল-আলামিন।

ফারসি পড়া ও চর্চা করা আমাদের অন্যতম পারিবারিক রেওয়াজ ও ঐতিহ্য ছিলো। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই আমারও ফারসির ময়দানে বেশ এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। ফারসি সাহিত্য ও কবিতার 'শেষ কিতাব— ইউসুফ যুলায়খা', 'সিকান্দারনামা' ইত্যাদি পড়ে ফেলার কথা ছিলো। পাশাপাশি ফারসি হস্তলিপিটাও একটু ভালো করে শিখে নেয়ার কথা ছিলো। আমার বড় ভাই পর্যন্ত এ ধারাই চলে এসেছে। বাবা অনেক দিন পর্যন্ত ভাইজানকে ফারসিতেই চিঠিপত্র লিখেছেন। কাবুলের বিখ্যাত কবি মুহাম্মদ সারওয়ার খান-এর সাথে ভাইজানকে ফারসিতে সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতেও আমি দেখেছি, অনেক পরের দিকে, যখন আমার নিয়মিত পড়ালেখা শেষ। এ সব কিছুরই দাবি ছিলো আমার ফারসি শেখা আরো চলবে। কিন্তু আমার ভাই ছিলেন দু' সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়ক। দীনি সংস্কৃতি ও আধুনিক সংস্কৃতি। কালের নদী-স্রোত কখন কোন্ দিকে যাচ্ছে বা যাবে, তিনি তা আঁচ

করে ফেলতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন— ফারসি ভাষার দিন শেষ, অচিরেই তা হিন্দুস্তান থেকে 'বিদায়' নেবে। সামনে বিভা ছড়াবে শুধুই আরবী ভাষা—কুরআন-সুন্নাহর ভাষা। তাই তিনি মাধ্যমিক স্তরেই আমার ফারসি শেখা থামিয়ে দিলেন। মনোযোগ দিলেন পরিপূর্ণরূপে আরবীর দিকে।

যতোটুকু পড়েছিলাম তাতে সব বিষয়েই মুতালা'আ বা পাঠোধ্যয়ন চালিয়ে যেতে আমার কোনো অসুবিধা হতো না। মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইমাম আহমদ ইবনে আবদুল আহাদ সারহান্দির মাকতুবাত বা পত্রাবলী অনায়াসেই পড়তে পারতাম। ইমাম শাহ ওয়ারিউল্লাহ দেহলভী রহ.-এর ইযালাতুল খাফাও পড়তে পারতাম।

এবার তাঁর নির্দেশে আমার শুরু হলো একদিকে ইংরেজি শেখা আরেকদিকে আরবী শেখা। আরবী শেখার জন্যে ভাইজান আমাকে অর্পণ করলেন তাঁর এক আরব বন্ধুর নিকট। তিনি হলেন আবরী ভাষার এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শায়খ খলীল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী রহ.। এ ইয়েমেনী খানদানের কাছে আমাদের খানদানের অনেকেই পড়েছেন। আমার আব্বা ছিলেন তাঁর দাদা শায়খ হোসাইন ইবনে মুহসিন-এর হাদীসের ছাত্র এবং তাঁর ছেলে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন-এর আরবী সাহিত্যের ছাত্র।

আরবী ভাষা শেখার সূচনা

আমার আরবী ভাষা শেখার সূচনা হয়েছিলো ১৯২৪ সালের শেষ দিকে। ভাইজান তাঁর হাতে আমাকে তুলে দিলেন আরবী পড়াতে। তিনি প্রথমেই আমাকে সরফের (আরবী শব্দতত্ত্ব) প্রাথমিক বিষয়গুলো খাতায় লিখে লিখে মুখস্থ করালেন। এরপর শুরু করলেন আরবী ভাষার উপর তাঁর একটি সুনির্বাচিত কিতাব— المطالعة العربي—আরবী পাঠ।

শায়খ খলীল আরব মূলত লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উস্তায ছিলেন। আমাকে তিনি পড়াতেন তাঁর বাসায়। আমার একজন সহপাঠী ছিলো, তাঁর ছোট ভাই হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ। দু'জন হওয়াতে বেশ উপকার হয়েছে আমাদের। উস্তাযের শিক্ষাদান-মনোযোগকে আমরা দুভাগে ভাগ করে নিলাম। অর্ধেক আমার, অর্ধেক মুহাম্মদের। উস্তাযকে বেশি করে পাওয়া, তাঁর মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করতে পারা এ

ছাত্রের জন্যে এক বিরাট সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্য বেশি ছাত্র হলে অনেক খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যায়। অনেক ছাত্র বেশি সহপাঠী পেলে খুশি হয়। কিন্তু আমরা দু'জন শুধু দু'জন হওয়াতে ভীষণ খুশি ও আনন্দিত ছিলাম। মাত্র দু'জন হওয়ার কারণে তিনি আমাদের রগ-রেশা সম্পর্কেও জানতেন। কার কোন্‌খানে দুর্বলতা আছে সহজেই ধরতে পারতেন। সে হিসাবে পদক্ষেপ নিতেন। কে কোন্ বিষয়টায় অগ্রগামী তাও তাঁর সামনে পরিষ্কার থাকতো।

তাঁর কাছে আমার আরবী পড়া ধাপে ধাপে চলতে লাগলো। শায়খ থাকতেন আমাদের আগের ভাড়া বাসা 'বাজার ঝাউলাল' এলাকায় আর আমি ভাইজানের সঙ্গে থাকতাম নওয়াব কুঠিরে ঘিসইয়ারিমন্ডিতে। প্রতিদিনই আমি পায়ে হেঁটে ঘিসইয়ারিমন্ডি থেকে 'বাজার ঝাউলাল' যেতাম এমন সময়ে যখন গিয়ে দেখতাম, শায়খ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফিরে এসেছেন। তারপর মাগরিবের আগে আগেই আবার ঘিসইয়ারিমন্ডিতে ফিরে আসতাম। কখনো কখনো এমন হতো, আমি পৌঁছতে দেরী করে ফেলেছি। ভাইজান মেডিকেল কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখতেন আমি তখনো ফিরি নি। তখন তিনি আমার খোঁজে বেরিয়ে যেতেন, খুঁজতে খুঁজতে চলে যেতেন শায়খের বাসা পর্যন্ত। এদিকে আমিও ঘিসইয়ারিমন্ডি পৌঁছে গেছি, ওদিকে ভাইজানও শায়খের ওখানে পৌঁছে দেখতেন, আমি বেরিয়ে গেছি।

তখন আমি ইংরেজি পড়ছিলাম বটে, কিন্তু নামকা ওয়াস্তে। মূলত আরবী ভাষাটাই শিখছিলাম পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। আরবী যে সিলেবাস শায়খ আমাদের জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন, তা এক বিশেষ সিলেবাস। এটি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন অনেক অনেক অভিজ্ঞতার আলোকে। এটি ছিলো একটি সুচয়নিকা। এর কিছু কিতাব ছিলো মিশরের জাতীয় সিলেবাস থেকে। যেমন الطريقة المبتكرة(١-٤) ও مدارج القراءة) এবং كليلة ودمنة এছাড়া مجموعات من النظم والنثر للحفظ والتسميع।

কয়েকদিন পরই শায়খ আমাদের উপর আরবীতে কথা বলা অপরিহার্য করে দিলেন। উর্দূতে কথা বললে দু' পয়সা থেকে চার পয়সা জরিমানা দিতে হতো। আমাদেরকে এ জরিমানার মুখোমুখি হতে হয়েছে বেশ ক'বার। সবচে' বেশি গুরুত্ব ছিলো—

নাহু-সরফের তামরিন বা অনুশীলনী, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল 'ইবারত' পড়া, যের-যবর-পেশ কোথায় কেনো হবে তা বুঝতে ও বোঝাতে পারা, 'ইনশা ও তা'বীর' তথা রচনা ও ভাবপ্রকাশভিত্তিক লেখার নিয়মিত অনুশীলনী।

সবক পড়ার পন্থা ছিলো এই— আমরদেরকেই প্রস্তুত করে আনতে হতো পুরো সবক। অতঃপর তাঁকে সেটা শোনাতে হতো। এ ধারা অবলম্বন করা হতো বেশি 'কালিলা ওয়া দিমনা'র ক্ষেত্রে। আমার পাঠ-প্রস্তুতির খাতায় অনেক ভুল থাকতো। ভুল ঠিক করে পরে আবার পাঠ তৈরী করতে হতো।

নাহ্ বা আরবী ব্যাকরণের জন্যে তিনি নির্বাচন করেছিলেন আবুল হাসান আলী আল-দরির লিখিত কিতাব— الضريري। এ কিতাবের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা আরবী ব্যাকরণের জরুরী নিয়মগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। এখানে সাবলীলভাবেই মুল বিষয়গুলো বলে দেয়া হয়েছে, কোনো ব্যাকরণিক জটিল ও তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে নেই। আরবী নাহ্-সরফের আরো কিছু কিতাব আমি পড়েছি রায়বেরেলিতে আমার চাচা সায়্যিদ আযিযুর রহমান সাহেবের কাছে। যেমন মিযান মুনশাইব, সরফেমীর, নাহবেমীর, পানজেগাঞ্জ। চাচাজান খুব মেহনত করে এবং আমাকে অনেক সময় দিয়ে এ কিতাবগুলো পড়িয়েছেন। তাঁর কাছে ঠিকমতো পড়তে হতো, কোনো রকম অলসতা ও অবহেলার সুযোগ ছিলো না। রায়বেরেলিতে বেশিদিনের জন্যে এলে খলীল আরব সাহেবের কাছে পড়া আরবী কিতাবগুলোও চাচার কাছে পড়তাম। مجموعات من النظم والنثر এর মধ্যে পদ্য তো মুখস্থ করতেই হতো, পাশাপাশি গদ্যও মুখস্থ করতে হতো এবং তা শোনাতেও হতো।

আরবী ভাষার এ সব প্রাথমিক কিতাব পড়ার পর এবার সময় হলো আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার। আরেকটু 'বড়' কিতাব পড়ার। সুতরাং আমার সামনে এলো এবার আরবী ভাষার প্রাচীন ও মৌলিক কিতাব نهج البلاغة, مقامات الحريري , دلائل الإعجاز এবং القصائد العشر।

শায়খ খলীল আরব ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। নিজের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার সাথে মিশে যেতে ছাত্রদেরকে বাধ্য করতেন তিনি। মোটেই জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে নয়— তাঁর অদ্ভুত বিস্ময়কর যোগ্যতাবলে। যে কিতাবই তিনি পড়াতেন, তা পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের মন-মানসের গভীরে মিশে যেতেন একেবারে রক্ত-মাংসের ন্যায়। কিতাবের প্রতিটি বর্ণ, ছত্র সর্বোপরি তার মর্মের গভীরে চলে যেতেন তিনি। একাকী নয়— ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে। ফলে কিতাবের বিষয়বস্তু ও মর্ম এবং কিতাব লেখার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য— সবই ছাত্রদের সামনে পরিস্কার হয়ে যেতো। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া আসলেই কঠিন। হয়ত সেরা সেরা শিক্ষকদের হাজার সংখ্যার ভিতরে দু' একজন পাওয়া যেতে পারে। এ প্রতিভা অর্জন করা যায় না— এ আল্লাহ্‌র এক বিশেষ দান। আরবী ভাষা ও

সাহিত্যের সঠিক স্বাদ আস্বাদনের এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যোগ্যতা আমি তাঁর মাঝে দেখেছি। তাঁর মনীষা সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। তাঁর সম্পর্কে 'পুরানে চেরাগে' আরেকটু বিশদ আলোচনা আমি করেছি।

আল্লাহর তাওফিক

শায়খ খলীল আরবের কাছে পড়ার সময় একবার একটি সঙ্কটে পড়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিলো বিষয়টা সহজ ও অগুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পড়ে দেখলাম বিষয়টা সীমাহীন নাজুক। এ কারণে আমার আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যান্য কিতাবাদী পড়ে সফল হওয়া-না-হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলো। ঘটনা হলো এই যে, আমার ইংরেজি শিক্ষক খলীলুদ্দীন সাহেব এর কাছে ছুটি নিতে গিয়ে বললাম, 'আজ বিশেষ ওজরের কারণে সবক পড়া মুশকিল' এই বলে আমি বেরিয়ে আসার সময় কামরার দরোজাটা একটু জোরে লাগিয়েছিলাম। আমার ইংরেজি শিক্ষক আমার 'এ আচরণ' ভালোভাবে নিলেন না। মূলত এ ছিলো ভুল বোঝাবুঝির কারণে। তিনি নালিশ করলেন গিয়ে শায়খ খলীল আরবের কাছে। শায়খের সাথে আমার ইংরেজি শিক্ষকের ভীষণ আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। তাই এ নালিশ শুনে শায়খ ভীষণ কষ্ট পেলেন এবং আমার খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ভাইজানের অনুমতি নিলেন আমাকে এ ব্যাপারে উপযুক্ত শাসন করার। উল্লেখ্য যে, শায়খ খলীল আরবের মাঝে সময়ে সময়ে কঠোরতাও আমি দেখেছি। তারপর শায়খ খলীল আরব আমাকে এ জন্যে খুব মারলেন। শাস্তির মাত্রাটা অপরাধের তুলনায় অনেকটাই বেশি হয়ে গিয়েছিলো। এ জন্যে শায়খ নিজেও আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এদিকে এ-কান ও-কান করে কথাটা রায়বেরেলিতে আম্মার কানেও গিয়ে পৌঁছে গেলো। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন: 'আলী! আমি জানতে পারলাম, তোমাকে নাকি শায়খ খলীল আরব মাত্রাতিরিক্ত মেরেছেন!' আল্লাহ তা'আলা তখন আমার মনে আমার উস্তাযে মুহতারামের প্রতি অদ্ভুত এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন! খুব স্বাভাবিক ছিলো এমন মুহূর্তে আমার কণ্ঠে আমার শিক্ষকের বিরুদ্ধে আমি আমার মায়ের কাছে অভিযোগের ভাষায় কিছু বলবো! কিন্তু না, 'সে সদ্য-সৃষ্ট' বিস্ময়কর ভালোবাসার কারণে আমি আমার উস্তাযের পক্ষে কথা বললাম! তাঁর জোরদার ওকালতি করলাম! বললাম: 'না মা! তিনি আমাকে মোটেই বেশি মারেন নি! সামান্যই মেরেছেন!' শুনে মা আশ্বস্ত হলেন।

এরপর শায়খের কাছে আমার পড়ালেখায় কোনো ছেদ পড়ে নি। আমার মনে হয়; সেদিন আমি যদি আমার শিক্ষকের বিরুদ্ধে আমার মায়ের কাছে অভিযোগ করতাম কিংবা মাত্রাতিরিক্ত শাস্তির নালিশ করতাম, তাহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুবাদে ইলম ও দীনের যে খিদমত আমি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি, তা সেদিনই বন্ধ হয়ে যেতো! কিন্তু আল্লাহর কী মেহেরবানী! তিনি সেদিন আমার মনে শিক্ষকের ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে কথা বলার জন্যে আমার মনকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

'এ আমার রব-এর অনুগ্রহ, (তা দিয়ে) তিনি আমাকে পরীক্ষা করবেন— আমি কি শোকর আদায় করি না না-শোকরি করি।'

বাকি পয়সা ফেরৎ দাও!

একদিন আমি ও আমার একমাত্র সহপাঠী সবক পড়ছিলাম। 'কালিলা ওয়া দিমনা' পড়া হচ্ছিলো। আরব সাহেব একটু আগেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছেন। তিনি চা দিতে বললেন। জানানো হলো, চিনি নেই। তখন আরব সাবে এক রুপি দিয়ে হোসাইন ভাইকে বললেন: চিনি নিয়ে এসো। তখন হোসাইন ভাই দ্রুতই হেঁটে গিয়ে চিনি নিয়ে এলেন। তখন দুইআনা-আড়াইআনাতেই চিনি পাওয়া যেতো। বাকী পয়সা তিনি ফেরৎ দিলেন। একটু পর আরব সাহেব বললেন: 'হোসাইন! তুমি পয়সা তো ফেরত দিলে না!' হোসাইন ভাই বললেন: 'ভাইজান! আমি তো এইমাত্র রেজগি ফেরত দিলাম!' শায়খ বললেন: 'তাহলে তা কোথায় গেলো? কোথাও তো দেখছি না!' আরব সাহেব ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন! বললেন: 'বলো, কোথায় যাবে পয়সা? হয় তুমি নিয়েছো, নয় আলী নিয়েছে! মনে হচ্ছে তোমার অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে!' এদিকে হোসাইন ভাই বারবার বলছিলেন একই কথা: 'আমি তো আপনাকে ফেরত দিয়েছি!' এরপর সবক শুরু হলো। সবকের পর আমি ফিরে গেলাম!

একদিন আমি কিতাব খুললাম। 'কালিলা ওয়া দিমনা' যে কিতাবটি আমি পড়তাম তা ছিলো বড় সাইজের এবং তার বাঁধাইটাও ঢিলেঢালা। আবিস্কার করলাম সেলাইয়ের মাঝখানে রেজগিগুলো সারিবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে! মনে হচ্ছে; হোসাইন ভাই আমার কিতাবের উপর এগুলো ভুলে রেখে দিয়েছিলেন

কিংবা আরব সাহেবই তা এখানে রেখে দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়াতে তখন তা আর খুঁজে পাওয়া যায় নি! আমি ভাবতে লাগলাম— কী করবো? ভয় হয়, যদি আরব সাহেব আমাকে সন্দেহ করেন? কিন্তু আল্লাহ আমাকে শক্তি দিলেন! দ্বিধা ও ভয় কাটিয়ে আমি সব ঘটনা খলীল আরব সাহেবকে বললাম এবং পয়সা ফিরিয়ে দিলাম! জানি না, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন কি না। বাকি মুখে তিনি কিছুই বলেন নি, আমার হাত থেকে পয়সাগুলো নিয়ে রেখে দিলেন। আল্লাহর যে আমাকে নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে তা ফিরিয়ে দেয়ার তাওফিক দিয়েছেন, সে জন্যে তাঁর শোকর আদায় করছি! এখনো সে ঘটনাটা আমার মনে পড়ে, হাসিও পায়!

উর্দূ ভাষা ও সাহিত্য এবং কিছু উপকারী কিতাব অধ্যয়ন

আমার সৌভাগ্য, অল্প বয়সেই আরবী পড়ার শুরুতেই আমি উর্দূ ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কিতাবগুলো পড়ে নিয়েছিলাম। দীনের বড় বড় দাঈ ও উলামায়ে কেরাম অল্প বয়সে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সাধারণত মনোযোগ দেন না। সুযোগ পান না। কিংবা বড় হয়ে তাঁরা স্বভাষা ও সাহিত্য যখন পড়তে শুরু করেন, তখন আকর্ষণীয় ভাষায় দীনের দাওয়াত পেশ করতে, দীনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এবং আধুনিক তবকার কাছে নিজের বক্তব্যকে বোধগম্য করে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের লেখা ও রচনা-ক্ষমতাও সময়ের দাবি পূরণে সক্ষম হয় না।

রায়বেরেলিতে থাকাকালীন —যা কখনো কখনো একটু লম্বা হয়ে যেতো— একবার আমার হাতে এলো আল্লামা শিবলি নু'মানী রচিত 'আর-ফারূক' কিতাবটি। পড়লাম। একবার, দুবার, বারবার। প্রিয় চাচাজান সায়্যিদ তালহা সাহেবের মজলিসে পরিচয় হলো 'আবে হায়াত' কিতাবটির সাথে। তাঁর মুখে শুনেছি, নিজেও তা বারবার পড়েছি। এমন কি 'আবে হায়াত'-এর অনেক বিষয় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, কবি ও তাঁদের কবিতা আমার স্মৃতিভাণ্ডারে শিশুস্মৃতির মতো অক্ষয় হয়ে গেঁথে গিয়েছিলো। 'গুলে রা'না' তো আমার আব্বার লেখা ঘরের কিতাব। তাও আমি অনেকবার পড়েছি। পড়তে পড়তে বিষয়বস্তুর সাথে এতোটাই সখ্যতা হয়ে গেলো যে, উর্দূ সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে আলোচনা করার মতোও প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিলো।

আমার এক মামাত ভাই দিল্লি জামিয়া মিল্লিয়াতে পড়াশুনা করতেন। তিনি উর্দূ কবি ও কবিতার বড়ো প্রেমিক ছিলেন। তাঁর একটা সুন্দর অভ্যাস

ছিলো। তিনি প্রায়ই আমাদের মতো বাচ্চাদেরকেও বড় বড় উর্দূ কবির কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করতেন। তা ছাড়া কখনো কখনো শিশু-কিশোরদের মাঝে লেখা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। তাঁর মুখ থেকে কবিতা ও তার ব্যাখ্যা শুনে শুনে কবিতার অর্থ মর্ম ও সূক্ষ্মার্থ বোঝার একটা শক্তি আমার মাঝে তৈরী হয়েছিলো। তাঁর বড় ভাই সায়্যিদ আবুল খায়ের সাহেবেরও অনেক অবদান আছে আমার উপরে। কবিতা বুঝতে, কবিতার প্রতি মমতা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে এবং কবিতা থেকে ফলাফল বের করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ভুলবার নয়। ভাষাভাষীদের বিভিন্ন ভঙ্গি ও ধারা কথা অনেক জানতেন তিনি। বিভিন্ন পরিভাষা বিশেষত উর্দূ ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 'তাযকির-তানিস'(কোন্ শব্দটি পুরুষ লিঙ্গ এবং কোন্ শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ) নির্ণয়ে তাঁর ব্যাপক জানাশোনা ছিলো। এক কথায়, তিনি একজন ভাষাপণ্ডিত ছিলেন। নিজে কবিতা লিখতেন এবং খুব ভালো লিখতেন।

তখনকার সময়ে কবিতা আবৃত্তি মাহফিল হতো অনেক। আমাদের ছোট্ট গ্রাম রায়বেরেলিতেও অনেক মাহফিল হয়েছে। সে সব মাহফিল আমার ভেতরেও কবিতা লেখার একটা চেতনা সৃষ্টি করেছিলো। কিছু ছন্দবদ্ধ কবিতা লেখার চেষ্টাও করেছিলাম। আল্লাহ্ আমার বড় ভাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন! তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাকে 'না' করে দিলেন! এরপর আমি আর সময় নষ্ট করার সে পথে পা রাখি নি!

রায়বেরেলিতে প্রিয়জনদের অনেক কিতাব ছিলো। মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ সাহেবের কিতাব نیرنگ خیال ছিলো। জীবনের এ সূচনায় .. সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের এ প্রারম্ভলগ্নে তাঁর শিল্পখচিত গদ্য আমার মনে অনেক প্রভাব ফেলেছে। অনেক দিন পর্যন্ত نیرنگ خیال ও آب حیات এর অনুসরণে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করেছি! উপকার যে হয় নি— বলবো না। অনেক উপকার হয়েছে। বয়সটা ছিলো সুন্দর ছাপানো জিনিস পড়ার ঝুঁকের বয়স। হাতের কাছে পাওয়া সবকিছুই পড়ছিলাম। মাওলানা শিবলী নু'মানী, মাওলানা হালী, মৌলভী নাজির আহমদসহ আরো অনেকের কিতাবই তখন পড়েছি। আমার মামা মৌলভী হাফেজ সায়্যিদ উবায়দুল্লাহ সাহেবের কাছে রাখা ছিলো মাওলানা আযাদের খ্যাতির শীর্ষে থাকা পত্রিকা 'আল হেলাল'-এর কয়েক বছরের ভলিয়ম, সে গুলোও সাগ্রহে পড়েছি। তাঁর শক্তিশালী কলমের আবেগমথিত বর্ণনা খুব উপভোগ করেছি। অভিজ্ঞরা বলেছেন, মানুষ ভালো-মন্দ যা-ই পড়ে তা হৃদয়ে একটা দাগ রেখেই যায়। এ কথা কেউ

বলতে পারবে না যে, শুধু চোখের পড়া পড়েছি। আমার অবশ্য এ মুহূর্তে বিশেষ কোনো রেখাপাতের কথা মনে পড়ছে না।

উর্দূ লেখালেখির সূচনায় আমার লেখায় সবচে' বেশি ছায়া পড়েছিলো আব্বা'র লেখা 'ইয়াদে আইয়্যাম' এর ধারা বর্ণনার। এ ধারা বর্ণনায় ঐতিহাসিক বর্ণনাভঙ্গির মাঝে আছে সাহিত্যের সুষমাময় মিশেল। সব মিলিয়ে দৃঢ়মূল ও হৃদয়স্পর্শী লেখার এক অনুপম নমুনা। এ ধারায় আমি লিখেছিলাম আমার জীবনের প্রথম উর্দূ লেখাটি। শিরোনাম ছিলো— আন্দালুস।

সে সময়ের একটা মধুময় স্মৃতির কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। লখনৌ'র প্রখ্যাত মাকতাবা শিবলী বুকডিপো'র একটি গ্রন্থ-তালিকায় ষরিাতে নববী'র একটি কিতাবের উপর আমার চোখ পড়ে। নামটিও আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে– 'রহমাতাল-লিল-আলামীন'। লিখেছেন কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান মানসুরপুরী। কিতাব ও লেখকের নাম পড়তেই মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। আমি কিতাবটি চেয়ে পাঠালাম ডাকযোগে। এক সময় কিতাব চলেও এলো। কিন্তু মায়ের কাছে তখন মূল্য পরিশোধের টাকা ছিলো না। তিনি কিতাব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করলেন। ডাক বিভাগের লোকটিকে 'না' করে দিতে বললেন। আমার সেই ব্যাকুলতা দিনে দিনে কেবরই বেড়েছিলো। কখন আসবে কিতাব? কখন আমি পড়তে পারবো? এ চিন্তায় কেটে যাচ্ছিলো আমার সকাল-সন্ধ্যা। এখন মায়ের মুখে 'না' শুনে আমার ব্যাকুলতা অশ্রু হয়ে ঝরঝর করে পড়তে লাগলো। আমার অশ্রু মায়ের অপারগতা বুঝলো না। আমার শিশুমন 'মূল্য নেই' কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলো না।

আমার ব্যাকুল শিশুমন আশ্রয় নিলো শেষ আশ্রয়স্থল এ অশ্রুর কাছে। অশ্রুই এমন সুপারিশকারী, যার সুপারিশ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না! মা বাধ্য হয়ে কারো কাছ থেকে 'মূল্য'-এর ব্যবস্থা করলেন! অবশেষে কিতাব পেলাম! আমি পড়তে বসলাম সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে, অন্তহীন আবেগ নিয়ে! আমার হৃদয়-মনে এমন গভীর রেখাপাত আর কোনো কিতাব করতে পারে নি! লেখকের একনিষ্ঠ সীরাত প্রেম, তাঁর ঈমানের দুর্বার শক্তি এবং দাওয়াত ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর আকর্ষণীয় ও প্রাজ্ঞ উপস্থাপনা, পাশাপাশি সীরাতের ঘটনাবলীর হৃদয়-ছোঁয়া নান্দনিক সুপসির বর্ণনা— সব আমার মাঝে এক বিদ্যুত প্রবাহ বইয়ে দিলো! আমার উপর এ কিতাবের অনুগ্রহ ও অবদান

অনেক, যা কোনোদিন ভোলবার নয়! আমি সব সময় এর লেখকের উঁচু মাকামের জন্যে দু'আ করি! এ কিতাবের বরিত সমাদৃতির জন্যে দু'আ করি। অনেক কিতাবের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু এ কিতাবের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ।

বাজার ঝাউলালে ফিরে আসা

১৯২৫ সাল। ভাইজান মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের পরীক্ষা সমাপ্ত করেছেন এবং পাস করেছেন। ১৯২৫ সালের নভেম্বরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে M B B S সার্টিফিকেটও পেয়ে গেলেন। এখন চিকিৎসা সেবা দিতে .. চেম্বার খুলে বসতে আর কোনো বাধা নেই। ১৯২৬ সালে তিনি আব্বা আগে যেখানে রুগী দেখতেন, তার পাশেই একটি ঘর ভাড়া নিয়ে চেম্বার শুরু করে দিলেন। আর পাশেই সেই বাজার ঝাউলাল রোডে একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া নিলেন। এ বাসাটা খলীল আরব সাহেবের বাসার একেবারে কাছে ছিলো। এখানেই তাঁর মাদরাসা, আমি ও হোসাইন ভাই এখানেই পড়ি। এখন আমার জন্যে অনেক সুবিধা হয়ে গেলো। যাতায়াতের কষ্ট দূর হয়ে গেলো।

নদওয়াতুল উলামা'র কানপুর সম্মেলন

কানপুরে ৫-৭ নভেম্বর ১৯২৬ সালে নদওয়াতুল উলামার বার্ষিক যে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, তা সব দিক দিয়েই ছিলো এক ঐতিহাসিক ও শানদার সম্মেলন। ভাইজান তখন নদওয়াতুল উলামার সহকারী মহাপরিচালক। এ সুবাদে সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমাকেও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্মেলনে মেহমানগণ যেখানে অবস্থান করতেন, সেখানে আমাকে রেখে তিনি আবার প্রতিদিনই ফিরে আসতেন লখনৌতে রুগী দেখতে। তারপর আবার ফিরে আসতেন সম্মেলনে। তিন চারদিন আমাকে কানপুরই থাকতে হয়েছে। সে উসিলায় অনেক দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামকে দেখার এবং তাদের বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। হাকীম আজমল খান সাহেব রহ. তো সম্মেলনের সভাপতিই ছিলেন। এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহার, মাওলানা জা'ফর আলী খান, মাওলানা শাহ সোলায়মান ফুলওয়ারাভী, কাজী সুলায়মান মানসুরপুরী (রহমাতুল-লিল-আলামীন কিতাবের লেখক), মাওলানা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ সূরতী ও ড. জাকির হোসাইন খান (যিনি পরবর্তীতে ভারতের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন)। এ ছাড়া আরো অনেক উলামা, লেখক-সাহিত্যিক-

কবিকে আমি এক নজর দেখার সুযোগ লাভ করেছি। কারো কারো কথাও শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। শায়খ খলীল আরব সাহেবের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তখন আমি আরবীতে কথা বলতে শুরু করেছিলাম।

আরবীতে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শুধু আমি একাই কথা বলছিলাম না, আমার গায়ে জড়ানো কেতাদুরুস্ত শেরওয়ানিটিও কথা বলছিলো আরবীতে। কেননা সারা শেরওয়ানির গায়ে লেখা ছিলো আরবীতে ملبوس العافية লেখা ছাপ![1] এ কারণে আমি অনেকেরই চোখে পড়ে গেলাম। এ সম্মেলনে মদীনা মুনাওয়ারার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি শায়খ সা'দুদ্দীন বাররাদাহও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একজন কথাসঙ্গী দরকার হতো মাঝে মাঝে। যেমন পথটা কোন্ দিকে? এ ছাড়া এটা-ওটা তিনি জানতে চাইতেন। আমিই হয়ে গেলাম তাঁর সেই কথাসঙ্গী। ভাঙা-ভাঙা আরবীতে আমি তাঁকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে বেশ জানাজানি হয়ে গেলো যে, এখানে ১২/১৩ বছরের একটা ছেলে বেশ কথা বলে আরবীতে। ড. জাকির হোসাইন যিনি জার্মানি থেকে সদ্য ফিরেছেন তিনি এবং অন্যরা আমাকে দেখতে চাইলেন। আমার ডাক পড়লো তাঁদের কামরায়। আমি গেলে তাঁরা আমার একটা পরীক্ষাও নিয়ে নিলেন, বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি সাধ্যমতো উত্তর দিলাম!

হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.সহ এ সম্মেলনে আরো অনেক শীর্ষ সারির উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন, যা আমি পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলাম।

তখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি এবং আমার প্রিয় শখ

১৯২৬-১৯২৭ সালে আমি যখন লখনৌ শহরের আমাদের সেই পুরোনো এলাকা বাজার ঝাউলাল-এ দ্বিতীয়বার থাকা শুরু করলাম তখন হকি খেলার প্রতি বেশ আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। পাশেই বড়সড় খেলার একটা মাঠ ছিলো। মাঠটা ছিলো রওশনৌদ্দলা কাচারির পেছনে রাজা নওয়াব আলী রোড় সংলগ্ন। ওখানে একটা ক্রীড়াসংঘ ছিলো। সেখানে আমি এবং ভাই আবু বকর[2] খেলতে যেতাম। আবু বকর শুরু থেকেই একজন ভালো হকি-

---

১. শেরওয়ানির কাপড়টি বাগদাদের তৈরী, যা আব্বাকে সূরাতের কেউ উপহার দিয়েছিলেন।

২. আমার সমবয়সী চাচাত ভাই। পুরো নাম– সায়্যিদ আবু বকর আল হাসানী, নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

খেলোয়াড় ছিলেন। পরবর্তীতে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে হকি খেলায় বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু আমি এ পথে বেশিদূর আগাতে পারি নি। মধ্যম সারির এক খেলোয়াড় ছিলাম। তার কারণ হলো, খেলাধুলা নিয়ে উত্তেজনায় আলোড়িত হওয়ার মতো মানসিকতা ও অভিরুচি তখন আমার ছিলো না। গোল হলো কি হলো না, জিতলাম কি জিতলাম না— এটা আমার মাঝে কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। এ জিনিসটিই আমাকে এ প্রতিযোগিতায় সামনে আরো এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে।

এ ক্রীড়াসংঘে যাতায়াত করে আমি (যে-আমি এই কিছুদিন আগে রায়বেরেলিতে তারপর 'ভুপাল হাউজ'-এ সময় কাটিয়ে এসেছি এবং বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার ঝুলিটা একটু হলেও ভরে এসেছি) বুঝতে পেরেছিলাম, স্কুল-কলেজ ও পাড়া-মহল্লার পরিবেশ বিগড়ে গেছে, পচে গেছে। তখনকার মুসলিম সমাজ জীবনেও নেমে এসেছে নষ্টচিন্তা। নষ্ট সংস্কৃতি। এ ক্রীড়াসংঘে যে সব তরুণ-যুবকেরা আসতো, তারা পার্শ্ববর্তী মহল্লা পীরজলিল ও গোলাগঞ্জ থেকে আসতো, কেউ সুন্নি, কেউ শিয়া, কেউ আবার খৃষ্টান। তাদের মুখে উচ্চারিত এমন এমন শব্দ আমি শুনেছি, যা চরম নৈতিক অবক্ষয় ও সমাজ জীবনে ফাসাদ নেমে আসার এবং সমাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদ বহন করে। কখনো কখনো আমাদের আসতে দেখলো ওরা কথা বন্ধ করে দিতো, চুপ হয়ে যেতো। তবুও ওদের কথা আমাদের কানে চলে আসতো।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার বয়সটা ছিলো বড়ো বিপজ্জনক। আরবী পরিভাষায় এ বয়সটাকে বলা হয় سن المراهقة—বয়ঃসন্ধিকাল। পদে পদে পরীক্ষা, কোথাও কোথাও অন্ধকার। এ সময়ে একটু অসাবধান হলেই বিপদ। আল্লামা ইকবালের ভাষায়—

খাজা আবদুল হাই ফারূকী সাহেবের সান্নিধ্যে তাফসীরের প্রথম পাঠ

খাজা আবদুল হাই ফারূকী সাহেব ভাইজানের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ভাইজানের দাওয়াতে লখনৌ এলেন এবং আমাদের বাড়িতেই উঠলেন। ভাইজান তাঁকে অনুরোধ করলেন আমাকে একটু পড়াতে। তিনি তখন আমাকে ত্রিশ পারার কয়েকটি সূরার তাফসীর পড়ালেন। আমার পরিচয় হলো মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. এর তাফসীরের ধারার সাথে। তিনি

মাওলানা সিন্ধীর সান্নিধ্যধন্য ছিলেন। ফলে চার বছর পর মাওলানা আহমদ আলী লাহুরীর কাছে আমার তাফসীর অধ্যয়ন শুরু হলে আমার কোনো সমস্যাই হয় নি, কোনো রকম দুর্বোধ্যতার আঁধারে পড়তে হয় নি।

খাজা আবদুল হাই ফারূকী সাহেব এক মশহুর ব্যক্তি ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর নাম অনেক আসতো। সে সময় মাওলানা জা'ফর আলী খান সাহেবের ব্যাপক প্রচারিত সাপ্তাহিকী 'জমিদার' পত্রিকার রবি-সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় খাজা সাহেবের কবিতা থাকতো। আমি সারা সপ্তাহ রবি'র অপেক্ষায় প্রহর গুণতাম। সংখ্যাটি হাতে পেলেই ভীষণ মজা নিয়ে তাঁর কবিতা পড়তাম! তাঁর কবিতার গাঁথুনি কী মজবুত! লেখার ধারা-বিন্যাস কী সুন্দর! আবেগমথিত শব্দমালায় যেনো লুকিয়ে আছে যাদু!

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা সাহেবের নিকট অধ্যয়ন

প্রিয় চাচাজান মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা সাহেবের কথায় আবার ফিরে আসি। রায়বেরেলিতে এলে চাচাজানের কাছে পড়তাম নাহু-সরফ। তিনি নাহু-সরফের শুধু উস্তাযই ছিলেন না, বরং ইমাম ছিলেন। বিশেষ করে ছাত্রদেরকে অনুশীলনীর মাধ্যমে তিনি কঠিন বিষয়কেও হাতে-কলমে সহজে বুঝিয়ে দিতেন। নাহু-সরফের জরুরী নিয়ম-কানুনগুলো আমি বেশ ভালো করেই তাঁর কাছে রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। নাহু-সরফের ভুল তিনি ক্ষমা করতেন না। ইবারত পড়ায় ভুল করলেও তিনি ছাড়তেন না। ভুল হয়ে গেলে আর রক্ষে ছিলো না, খুব শরম দিতেন। কখনো রসিকতা কখনো তিরস্কার মিশ্রিত বাক্যবাণ সইতে হতো। এ জন্যে খুব সতর্ক থাকতে হতো। আরবী ভাষা ও নাহু-সরফের বাইরে আমি তাঁর কাছে আরো অনেক কিছু শিখেছি। আমার চিন্তা-চেতনা ও মানস গঠনে, ইতিহাসের প্রতি মমতা সৃষ্টির পেছনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সুচারুতায় পুষ্ট হওয়ার আড়ালে তিনিই রেখেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ও অবদান। মাওলানা ছিলেন এ সব বিষয়েই সমকালীন ও সঙ্গীদের মাঝে উজ্জ্বল। 'পুরানে চেরাগে' তাঁর সম্পর্কে আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাঁকে নিয়ে।

আমি যে কালের কথা বলছি, সে কালে আমার কোনো নির্দিষ্ট ও বিশেষ দীনি জযবা ও ঝোঁক ছিলো না। কোনো বুযুর্গের সুহবত ও সান্নিধ্যও পাই নি। আমার দুনিয়া তখন সীমাবদ্ধ ছিলো কেবল আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে ঘিরে। কখনো কখনো টানতো আমাকে খেলা। না, তখন শহরে কোনো আন্দোলন চোখে পড়ে নি, কানে পড়ে নি। এমন কোনো দীনি দাওয়াত ও

ইসলাহী তৎপরতাও লক্ষ্য করি নি। সুতরাং সে সব থেকে আমার উপকৃত হওয়ারও অবকাশ ছিলো না। মাঝে মধ্যে শুধু জাতীয় ও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। কখনো মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর সাহেবকে কেন্দ্র করে, কখনো মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেবকে কেন্দ্র করে। আমি তাঁদেরকে তখন দেখেছি, তাঁদের বক্তব্যও শুনেছি।

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

১৯২৭ আগস্ট মাসের শেষ দিকে আমি রায়বেরেলিতে এসেছিলাম। সেখানে শায়খ খলীল আরব নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী চাচাজান সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা সাহেবের কাছে পড়ছিলাম। সকাল ১১টা কিংবা ১২টার দিকে হঠাৎ করেই ভাইজান লখনৌ থেকে এলেন। আম্মা ও ফুফাকে বললেন: 'আলীকে লখনৌ নিয়ে যেতে এসেছি। ও লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হবে।' আমার বয়স তখন সবে চৌদ্দ। আমি ছিলাম তেমনি, যেমনটা আরবী প্রবাদে বলা হয় كالميت في يد الغسال । স্নেহশীল ভাই আর 'শফিক উস্তায' খলীল আরব সাহেব মিলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাতে 'কী ও কেনো' বলার কোনো সুযোগ ছিলো না, বিরোধিতার তো প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মূলত ভাইজানের অনিচ্ছায় ও শায়খ খলীল আরব সাহেবের পীড়াপীড়িতে হয়েছিলো। ভাইজান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে গিয়ে সেখানে ঐ পাশ্চাত্য ধাঁচের পরীক্ষাতে আমার অংশ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। অপরদিকে (সম্পর্কের (নাজুকতার) কারণে) তাঁর ইচ্ছাকে ফেলতেও পারেন নি। আরব সাহেব লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ও এম.এ ক্লাসে আরবী সাহিত্য পড়াতেন। তিনি মনে করতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ফায়দা আছে। যাহোক; পরের দিন ভাইজান আমাকে নিয়ে লখনৌ রওয়ানা হয়ে গেলেন। ভাইজান আমাকে এর মধ্যে একটি শেরওয়ানী বানিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত ১৯২৭ সালের ৮ই আগস্ট আমি গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে। (আমার হকি খেলার সঙ্গী) আবু বকর ভাইও আর সঙ্গে আছেন। তিনিও এখানে ভর্তি হতে এসেছেন। আমার বেশ মনে পড়ে, সেদিন ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের সবার মধ্যে আমার বয়সই ছিলো সবচে' কম। সবার মুখেই দাড়ি ছিলো আমি ছাড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুবক তো আমাকে ঠাট্টা করে বলেই বসলো, 'এই ছেলে! তোমাকে তোমার মা কেমন করে এখানে আসতে দিলেন?!'

পরীক্ষাবোর্ডে উপস্থিত ছিলেন বড় বড় উলামায়ে কেরাম। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন শামসুল উলামা হযরত মাওলানা হাফীজুল্লাহ সাহেব, মুহতামিম দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা। ড. যোবয়ের সিদ্দীকি, চেয়ারম্যান আরবী বিভাগ। মৌলভী আলী আসগর সাহেব, শিক্ষক আরবী বিভাগ। বোর্ডের সামনে বসতেই আমাকে رسائل ابی بکر الخوارزمی থেকে পড়তে বলা হলো। আমি বেশ সাচ্ছন্দেই ইবারত পড়ে গেলাম, অর্থ বললাম। বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দিলাম। আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি করে নেয়া হলো। কিন্তু আরব সাহেবের কাছে আগে যেভাবে পড়তাম সেভাবেই পড়তে লাগলাম। আগের সূচীতে কোনো পরিবর্তন হলো না। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে পড়ার চেয়ে আরব সাহেবের বাসায় গিয়ে পড়তেই আমার ভালো লাগতো, অনেক ভালো। সে-ই ছিলো আমার কাছে অনেক বেশি উপকারী, অনেক বেশি রুচিকর, অনেক বেশি মজাদার ও বোধগম্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্য বিভাগের সিলেবাস আমার কাছে অজানা ও অপ্রিয় ছিলো না। কেননা, এ সিলেবাসের পরিকল্পনা ও বিন্যাস ছিলো শায়খ খলীল আরবের দিক-নির্দেশনায় প্রণীত। আরবী বিভাগে শায়খের প্রভাব ও অবস্থান ছিলো সমাদৃত। এ বিভাগের অমুসলিম দায়িত্বশীলরাও তাঁকে সমীহ করতেন। এ বিভাগের প্রধান পর্যন্ত শায়খের কাছ থেকে উপকৃত হতেন। দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। এ ক্লাসের সিলেবাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। সিলেবাসের বেশ ক'টি কিতাব আমার পূর্ব থেকেই পড়া ছিলো। আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ছিলো দু'টি। এক. علم العروض ছন্দোবিজ্ঞান, محيط الدائرة কিতাবটি এ বিষয়ে পড়ানো হতো। এ বিষয়ে কখনোই আমার কোনো ধারণা ছিলো না। দুই. আরবী ব্যাকরণের জটিল কঠিন ও সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুন। এ বিষয়েও আমি আগে অতি জরুরী নিয়ম-কানুন ছাড়া তেমন কিছুই পড়ি নি। ফলে তা বুঝতে ও অনুশীলন করতে আমার খুব কষ্ট হতো।

১৯২৮ সালের এপ্রিলে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। সব বিষয়েই ভালো পরীক্ষা দিলাম। বিশেষত রচনা ও লেখায় বেশ ভালো করেছিলাম। উর্দূ ও আরবী হস্তাক্ষর আমার সুন্দর ও স্পষ্ট ছিলো। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর আমার সাথে অন্য সবাইও অবাক হয়ে গেলেন! আমি পাশ করতে পারি নি, অকৃতকার্য হয়েছি! খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, 'হামাসা'য় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে! এ কিতাবে এমন কিছু কঠিন ব্যাকরণিক প্রশ্ন করা হয়েছিলো যা

আমার আয়ত্ত ও ক্ষমতার বাইরে ছিলো। বিভাগের লোকজন কর্তৃপক্ষ আমাকে বলেছেন, শুধু হামাসায় পাস নাম্বার পেলেই আমি এক নাম্বার হতে পারতাম। এ ফলাফলে আমি ব্যথিত হলাম নিজে। আরো ব্যথিত হলেন ভাইজান ও খলীল আরব সাহেব। এমন কি এ ব্যথা গিয়ে স্পর্শ করলো আমার মায়ের মনকেও। কিন্তু পরীক্ষায় এমন ফেল করাতেও ছিলো আল্লাহ্র হিকমত। তিনি আমাকে দেখিয়েছেন ফেল করলে কেমন লাগে। দুঃখ-দুঃখ মেঘে মনটা কেমন ছেয়ে যায় এবং কীভাবে তা সইতে হয়, মেনে নিতে হয়। তারপর সামনের প্রস্তুতিতে কীভাবে তা কাজে লাগাতে হয়।

দ্বিতীয় বছর ১৯২৯ সালে আবার বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নিলাম। আগের পরীক্ষা থেকে আমি ভালোই শিক্ষা নিয়েছিলাম। তাই এ পরীক্ষায় ছিলাম ভীষণ সতর্ক। ফলাফল বের হলে দেখা গেলো আমি আশার চাইতেও ভালো ফলাফল করেছি। বৃত্তি ও স্বর্ণের মেডেল-এর অধিকারী হয়েছি। বৃত্তির জন্যে শর্ত ছিলো, এ বিভাগের অন্য যে কোনো ক্লাসে ভর্তি হওয়া। আমি সব বিবেচনায় তাখাসসুস ফিল হাদীসকে বেছে নিলাম। এ বিষয়ে আমি পূর্ণ এক বছর পড়াশুনা করলাম এবং বৃত্তিও গ্রহণ করলাম। পাঠকের জন্যে এর পরিমাণটা উল্লেখ করে দিলে তাঁরা কি একে বেশি মনে করবেন? প্রতি মাসে আট রুপি! না, স্বর্ণের মেডেলটা পেলাম না। কেননা, সে বছর কোনো বিত্তবান মেডেলের ফান্ডে কোনো অর্থ জমা দেন নি। স্বর্ণের মেডেল না-পাওয়ার আফসোসটা বুকের ভিতরে রয়েই গেলো। সম্ভবত সেটির মূল্য তখনকার একশ রুপির চেয়ে বেশি হবে না। যদি তখন আমার কানে এসে তখন কেউ বলতো, আলী! কিসের এতো দুঃখ? সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তুমি পৃথিবীর একটি মর্যাদাশীল দেশের (সউদি আরবের) পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার পেতে যাচ্ছো, যার মূল্যমানের কাছে এ মডেলের কোনো মূল্যই নেই! তাহলে কি তা আমার বিশ্বাস হতো? কেউ বিশ্বাস করতেন? কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই তো হয়, তা-ই তো তিনি বাস্তবায়িত করে দেখান!

سَتُبدِي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً ويأتِيكَ بالأخبارِ مَن لم تُزَوِّد

ويأتِيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تَبِعْ له بَتاتاً، ولم تَضرِبْ له وقْتَ مَوعد

দিন আসবে আর জানতে পারবে কতো অজানা! এ সব অজানা খবর নিয়ে আসবে তোমার কাছে এমন মানুষ, যাকে খবর দেয়ার কোনো রসদই তুমি যোগাও নি!

তোমার কাছে পরিবেশিত হবে একের পর এক সংবাদ এমন মানুষের মুখে, যার জন্যে তোমাকে কিছুই ব্যয় করতে হয় নি! কোনো পাথেয় ক্রয় করতে হয় নি! এমন কি তোমার কাছে সংবাদ পরিবেশনের সময়টা পর্যন্ত যাকে স্পষ্ট বলে দাও নি! (অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করো! সংবাদ পৌঁছবেই না, এ জন্যে তোমাকে কষ্টও করতে হবে না, জানতে চাওয়ার জন্যে ব্যাকুলও হতে হবে না, বিনা কষ্টে বিনা চাওয়াতেই সব জানতে পারবে।)

সে বছরই অর্থাৎ ১৯২৯ সালে উত্তর প্রদেশের ইংরেজ প্রশাসক স্যার উইলিয়াম ম্যালকম হ্যালি (Sir William Malcolm Hailey) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উপস্থিত থেকে ছাত্রদেরকে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। আমি এবং আমার সহপাঠীরা সেদিন সনদ করেছিলাম। আমার চাচাতো ভাই আবু বকরও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। অবশ্য মনে বড়ো ব্যথা অনুভব হচ্ছিলো এই ভেবে যে, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সনদ নিতে হচ্ছে এক ইংরেজ গভর্নরের হাত থেকে, যারা মুসলিম বিরোধী। ইসলাম বিদ্বেষী। কিন্তু স্থান-কাল বিবেচনায় কোনো উপায় ছিলো না। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন এটিকে দোষও মনে করা হতো না। এতো ছিলো আমার আরবী বিভাগের সনদের কথা। হাদীস বিভাগে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে পাস করার পরও সে সনদ গ্রহণের কোনো ইচ্ছাই আমার ভিতরে কাজ করে নি। অথচ এর মাঝে পেরিয়ে গেছে পঞ্চাশটা বছর।

একটি আক্ষেপ

তখন আমাদের খানদানে সালহে সালেহীনের জীবন্ত নমুনা অনেক বড় এক বুযুর্গ ছিলেন, নাম— শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মদ আমীন আল হাসানী নাসিরাবাদী। তিনি ছিলেন আমাদের নাসিরাবাদ খানদানের দাদাদের শাখা-বংশের মানুষ। তিনি বাইয়াত হয়েছিলেন সে যুগের বিশিষ্ট বুযুর্গ সায়্যিদ খাজা আহমদ নাসিরাবাদীর হাতে শৈশবেই। অবশ্য তাঁর মৌলিক আধ্যাত্মিক শায়খ ছিলেন আমার নানা শায়খ সায়্যিদ যিয়াউন্নবী আল হাসানী। তিনি সুন্নতের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। সুন্নতের পক্ষে একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রতিরোধ-যোদ্ধাও ছিলেন তিনি। বিদ'আত ও ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন কাজ বন্ধ করায়ও তিনি ছিলেন অনড় অবিচল এক যোদ্ধা। তিনি হাদীসে নববীর তিনটি বিষয়ের প্রথমটিকেই প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন—

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

'তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় কর্ম সংঘটিত হতে দেখবে, সে যেনো হাতে তা প্রতিরোধ করে, না পারলে মুখে। তাও না পারলে মনে মনে যেনো সে ঐ কাজটাকে ঘৃণা করে। শেষোক্তটিই ভিতরে ঈমান থাকার 'দুর্বল আলামত।'[১]

যে কোনো অন্যায় কর্ম হতে দেখলেই তিনি তা শক্তি দিয়ে ঠেকাতেন। খুব কমই তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে হাদীসের শেষ দু' অংশের। আল্লাহ এ জন্যেই তাঁর মাধ্যমে অনেক সুন্নতকে যিন্দা করেছেন, তাঁর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহেও ন্যায় সততা ও অটল-অবিচলতা। তাঁর হাতে তাওবা করেছে কতো পাপী-তাপী। তারপর নিজেদের জীবন রাঙিয়েছে সুন্নতের রঙে। মানুষের মনের অনেক ভিতরে ছিলো তাঁর বসবাস। তিনি নিজের ভুবনে সবাইকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক সুন্দর রাষ্ট্র, যেখানে চলতো শুধুই ইসলামের আইন ও নীতিমালা।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, মাওলানা ইন্তেকাল করেছেন ১৩৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৩১ সালে। তখন তো আমি বেশ বড়। আরবী ভাষা পড়ছিলাম! নাসিরাবাদও রায়বেরেলি থেকে অনেক দূরে ছিলো না, মাত্র ২০ মাইল! নাসিরাবাদ কোনো অজানা এলাকাও ছিলো না, আমাদেরই পিতৃপুরুষের স্মৃতিধন্য ভূখণ্ড! তবুও আমি কেনো তাঁর কাছে গেলাম না, যেতে পারলাম না? জানি না, আমার অভিভাবকরা কেনো এ-দিকটি নিয়ে একটুও ভাবলেন না, চিন্তা করলেন না। তাঁর কাছে আমাকে একটু পাঠালে কী দারুণ হতো! আমি তাঁর অনেক দু'আ নিয়ে আসতে পারতাম! অনেক ভালোবাসা নিয়ে আসতে পারতাম! আমার আব্বাকে তিনি কতো ভালোবাসতেন, কতো প্রশংসা করতেন! তাঁর সাথে দেখা করতে না-পারার স্মৃতিটা যখনই আমার মনে উদয় হয়, খুব কষ্ট হয়! কেনো আমি এমন বঞ্চিত হলাম?

---

১. মুসলিম

চতুর্থ অধ্যায়

লাহোরে ঐতিহাসিক সফর, আল্লামা তাকিউদ্দীন হিলালীর আগমন নদওয়াতুল উলামায়, ভাইজানের দিক-নির্দেশনা, ইলমী ও যিহনী ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ঝোঁক এবং মুক্তি, লাহোর ও দেওবন্দের সফর

লাহোরে ঐতিহাসিক সফর

আমার ফুপু থাকেন লাহোরে। ওখানে বসেই শুনেছেন তিনি আমার কথা—আমার সাফল্যের কথা। তিনি আমাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। তাই লাহোরে ডেকে পাঠালেন। মাকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন, 'আলীর সাফল্যে আমি ভীষণ খুশি! ওকে অনেক মুবারকবাদ! ওকে জলদি আমার কাছে লাহোর পাঠিয়ে দিন!' মা এবং ভাইজান আমাকে লাহোর যাওয়ার সবুজ-সঙ্কেত দিলেন। সুতরাং আমি সম্ভবত মে'-এর শেষে অথবা জুন' ১৯২৯ সালে লাহোর রওয়ানা হয়ে গেলাম। সঙ্গে আছেন মৌলভী সায়্যিদ ইবরাহীম নদভী, যিনি হায়দারাবাদে একটি অনুবাদ কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন।

সে সময় লাহোর ছিলো ভারত উপমহাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতার প্রাণকেন্দ্র। সেখান থেকে বের হতো অনেক উর্দূ পত্রিকা। 'জমিনদার' পত্রিকাটি ছিলো সবচে' বেশি আলোচিত ও সমাদৃত। এ ছাড়া আরো প্রকাশিত হতো نیرنگ خیال ও ہمایوں সহ আরো অনেক সাহিত্য ম্যাগাজিন। সবচে' বড় কথা হলো, লাহোর ইসলামের কবি ড. মুহাম্মদ ইকবালের শহর ছিলো।

এ ছিলো আমার জীবনের প্রথম দূরের সফর। এ সফরকালে মনে আনন্দানুভূতির যে শিহরণ মনে বয়ে গিয়েছিলো, সে কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। স্বদেশভূমি পেছনে ফেলে লাহোরের যতো কাছে যাচ্ছিলাম, আমার আনন্দ ততো বাড়ছিলো। এ সফর আমার জীবনে এক

গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক হয়ে থাকবে। মাওলানা সায়্যিদ তালহা সাহেব শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার বয়স তখন পনের কি ষোল। লাহোরের বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে তিনি আমায় পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। আল্লামা ইকবালের কাছেও তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। এমনকি তিনি আমাকে সেকালের বড় পাহলোয়ান 'সময়ের রুস্তম' গামা পাহলোয়ানের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রখ্যাত কবি ও ছন্দকার হাফিজ জালেন্ধরী সাহেবের মজলিসেও আমরা হাজির হয়েছিলাম। একসঙ্গে বসে খাবারও খেয়েছি। আমার অনুরোধে তিনি নিজের কিছু কবিতাও আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন।

তখন লাহোরের সাহিত্যিক মহলে 'গুলে রাইনা'—'নজরকাড়া গোলাপ' ব্যাপক সমাদৃতি লাভ করেছিলো। অধিকাংশ জায়গায় তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন 'গুলে রাইনা'—'নজরকাড়া গোলাপ'-এর লেখকের ছেলে হিসাবে! কোথাও বা গিয়ে বলছিলেন, এ ছেলে আরবী বেশ বলতে পারে, লিখতে পারে।' আল্লামা ইকবালের কাছে তিনি আমায় পেশ করলেন এই বলে, এ 'গুলে রাইনা'—'নজরকাড়া গোলাপ'-এর লেখকের ছাহেবজাদা! আপনার কবিতার অনুবাদ করে এনেছে আরবী গদ্যে![১] মাওলানা সায়্যিদ তালহা সাহেব বেশ আগ্রহ ও প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে আমাকে শীর্ষ সারির ব্যক্তিত্বদের কাছে নিয়ে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। কখনো নিয়ে যাচ্ছিলেন ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শনের জন্যে। তিনি নিজেই এ কাজের জন্যে ষোল আনা প্রস্তুত হয়ে আমাকে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। তাঁর জানাশোনার পরিধিও ছিলো ব্যাপক বিস্তৃত। তাই এ সফরকে তিনি আমার কাছে বেশ উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। আমি এ সফরে তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শিখেছি এবং যা যা দেখেছি, তা কখনো ভুলি নি, ভুলতে পারি নি। সারা জীবনই সে ঐতিহাসিক সফর থেকে আমি শিখেছি, এখনো শিখে চলেছি। তাঁর অনুগ্রহের কথা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর কাছেও।

মাওলানার সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক রচনায় তিনি ছিলেন সেতুবন্ধন। যার ফলে আমি লাভ করেছিলাম হযরত মাওলানার বিশেষ দৃষ্টি

---

১. কবির قصيدةالقمر (কাসিদাতুল কামার বা চাঁদ-কবিতা) এর গদ্যানুবাদ করেছিলাম আমি।

ও অপার স্নেহ-মমতা, এক সীমাহীন হিতাকাঙ্ক্ষির দিক-নির্দেশনা, আমার জীবনে যা ভীষণ প্রভাব ফেলেছিলো। এর উপর ভিত্তি করেই আমি পরের বছর তাঁর ছাত্র হতে ছুটে এসেছিলাম লাহোরে। তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখার ও বরণ করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আরো অনেক বেশি করে তাঁর ইলমী খাযানা থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।

একটি সঠিক পরামর্শ

মাওলানা সায়্যিদ তালহা সাহেব লাহোরের বিখ্যাত কলেজ 'ওরিয়েন্টাল কলেজ'-এর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে (এ-সফরের আরেকটি চমক হিসাবে) নিয়ে গেলেন কলেজের প্রিন্সিপাল মৌলভী মুহাম্মদ শফি সাহেবের নিকট। শুরুতে সবাই তাঁকে মাস্টার শফি বলে ডাকলেও পরবর্তীতে ইনিই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন খান বাহাদুর প্রফেসর ড. মৌলভী মুহাম্মদ শফি নামে। পাকিস্তানে আসার পর তিনি তিনি অর্জন করেছিলেন 'সিতারায়ে পাকিস্তান' খেতাব। বৃটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং উলুমে শরিয়া পড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন মৌলভী মুহাম্মদ শফি। আরবী ভাষা ও সাহিত্য ভালোই জানতেন তিনি।

সম্ভবত এ যোগ্যতার মূল ভিত্তি ছিলো শুরুতে দীনি মাদরাসায় পড়া। খুব নীতিবান ছিলেন। সহকর্মী ও অধীনস্ত আমলাদের মাঝে তিনি একটু কঠোর ও অমিশুক প্রকৃতির ছিলেন। ফুফা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ ছেলের আরবী রেখা একটু দেখবেন কি? ও কেমনে পড়ালেখা করবে সে ব্যাপারে একটু দিক-নির্দেশনা দিলে ভালো হয়! কোন্ পন্থায় পড়ালেখা করলে ওর ভালো হবে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো।' জবাবে তিনি তিনি বললেন, 'এভাবে তো হবে না! এক কাজ করেন, রাতে আমার বাসায় আসেন একে নিয়ে! আমার সাথে এসে রাতের খাবার খান! তখন ধীরে সুস্থে ওর লেখা দেখতে পারবো! মতামত দিতে পারবো!'

সবাই বেশ অবাক হয়ে শুনলেন কঠোর ডক্টর শফি সাহেবের নরম কথা! সাধারণত এতোটা নরম ব্যবহার তিনি কারো সাথেই বুঝি করেন না!

রাতে আমরা তাঁর বাসায় গেলাম যথাসময়ে। তিনি বেশ আগ্রহভরে আমার লেখাগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমার মন্তব্য হলো— ও আরবীকেই ওর বিষয় বানাবে! আরবীতেই ব্যাপক দক্ষতা ও

পরিপক্কতা অর্জন করবে! হ্যাঁ, ফারসী একটু-আধটু শিখতে পারে, ঐ ভাষায় ইসলামের অনেক কিছুই লেখা হয়েছে! কিন্তু ওর ভাষা চর্চার মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে শুধুই আরবী ভাষা!'

তাঁর এ পরামর্শ ছিলো তখনকার স্রোত-বিরুদ্ধ। কেননা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত এর উল্টো ছিলো। তাঁরা চাইছিলেন আমি যেনো ইংরেজি শিক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিই এবং সরকারি চাকরি-বাকরির চেষ্টা করি। সে কালে এ চাকরির অনেক কদর ও মূল্য ছিলো। এ অন্য পেশার তুলনায় এ পেশার লোকদের দিকে মানুষও সম্মানের চোখেই তাকাতো। এ পেশা ছিলো রীতিমত ঈর্ষণীয় এক পেশা। কিন্তু আল্লাহ যা চাইলেন তা-ই হলো। আমি আরবী ভাষাকেই আমার সাধনার কেন্দ্রবিন্দু বানালাম, ইংরেজির দিকে অনেকের ইচ্ছেমতো আমি ঝুঁকে পড়তে পারলাম না।

পরবর্তীতে আমি যখন আমার ইলমী সফর আগের মতোই অব্যাহত রাখলাম এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হলাম আর এদিকে পাকিস্তানও স্বাধীন হয়ে গেলো, তখন আবার আমি লাহোর গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি দেখা করলাম আমার এ 'মুহসিন' পরামর্শদাতার সাথে। তিনি তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে 'ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম'-এর পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পারন করছিলেন। তিনি نزهة الخواطر বিষয়ে আমার কাছে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার প্রথম কিতাব 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ'-এর সুবাদেও দূর থেকে আমাকে জেনেছিলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি বিশেষভাবে। তিনি তখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে 'ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম'-এর অফিসে বসে কাজ করছিলেন। আলাপে আলাপে আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেই অতীতের সেই পরামর্শের কথা। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই এতে ভীষণ খুশি হলেন এবং তাঁর পরামর্শ-যে যথাযথ ছিলো তার সত্যায়নও করলেন! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর!

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র দরসে হাদীসে

লাহোর থেকে ফিরে এসে 'শায়খুল হাদীস আল্লামা হায়দার হাসান খান রহ. এর কাছে 'নদভী ছাত্র'দের সাথে আমিও মিশে গেলাম। তিনি তখন দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র শায়খুল হাদীস ছিলেন। তাঁর কাছে আমি

বোখারী-মুসলিমসহ আবু দাউদ, তিরমিযী অক্ষরে-অক্ষরে পড়েছি। তা ছাড়া তাফসীরে বায়যাবীও কিছুটা পড়েছি। এমন কি মানতেকও কিছুদিন পড়ালেন। আমি পূর্ণ দু'বছর মাওলানার কামরায় থাকলাম। এ কামরাটিই দারুল হাদীসের কামরা ছিলো। শায়খ আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। এর কারণ অনেক। প্রথম কারণ হলো, আমি রাত-দিন তাঁর কাছে ছিলাম। দ্বিতীয় কারণ হলো, তুংকের পুরোনো পারিবারিক সম্পর্ক। তৃতীয় কারণ হলো, আব্বার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক। তাঁরা দু'জনই ছিলেন যুগের ইমামুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা হোসাইন ইবনে মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী রহ.-এর প্রিয় ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া আব্বার বিশেষ অনুরোধেই তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় আসতে সম্মত হয়েছেন। এ সব কারণেই তিনি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। আমি তাঁর সাথেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। তাঁর সব হিসাব-নিকাশও হতো আমার হাতে। কোথাও গেলে আমিই হতাম তাঁর সঙ্গী ও সহযাত্রী।

হাদীস পড়াতেন তিনি একজন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হিসাবে। ইয়ামেনের মুহাদ্দিসীনের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন মণ্ডিত। দরসে ছাত্রদেরকে সঙ্গে রাখতেন। তাদের কাছ থেকেও কাজ নিতেন। হাদীসের উৎস ও বরাত গ্রন্থ তালাশে এবং রাবী ও বর্ণনাকারীদের পরিচয় খুঁজে বের করার কাজে ব্যস্ত রাখতেন, কখনো দিতেন বিভিন্ন লেখা তৈরীর কাজ। তাদেরকে শুধু শ্রোতা বানিয়ে বসিয়ে রাখতেন না। সব মিলিয়ে ছাত্রদের অনেক ফায়দা হতো। গবেষণা কীভাবে করতে হবে, ইলমের গভীরে কেমন করে প্রবেশ করতে হবে— সে ব্যাপারে তারা দক্ষ হয়ে উঠতো।

তিনি ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা। নামাজে দাঁড়ালে অঝোরে কাঁদতে থাকতেন। রাতের নির্জন প্রহরে নফল নামাজে ডুবে যেতেন। লম্বা লম্বা কিরাত। লম্বা লম্বা সিজদা। সেই সাথে হৃদয়-নিংড়ানো কান্না। ছাত্রদের এবং সঙ্গীদের সাথে বড়ো ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতেন। যে-কোনো সম্মিলিত কাজে নিজে অংশ নিতেনই। না নিয়ে পারতেন না। তাঁর রক্তে মিশে ছিলো একদিকে আফগানী রক্তধারা, আরেকদিকে তুংকের সমাজ জীবনের প্রভাবধারা। আমার হাদীসের তালিম এর আগাগোড়া পুরোটাই ছিলো তাঁর স্নেহ-মমতা ও বিষয়-দক্ষতার কাছে পূর্ণ ঋণী। মাওলানা তাঁর হাদীসের ছাত্রদেরকে লিখিতভাবে সনদ প্রদান করতেন, নিজে লিখে দিতেন না, যাদের হস্তলিপি সুন্দর তারাই লিখতেন। তারপর

মাওলানা শেষে দস্তখত করে দিতেন। আমিও কখনো কখনো সনদ লেখার কাজ করেছি। কিন্তু আমার বেলায় ঘটলো ভিন্নতা। আমাকে যখন সনদ দিতে চাইলেন তখন নিজেই কলম তুলে নিলেন। লিখতে দেরী হওয়া সত্ত্বেও দিনভর নিজেই সনদ লিখলেন। তারপর প্রদান করলেন! আল্লাহু আকবার! কী মায়াময় স্নেহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর!

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র সাথে আমার সম্পর্ক যদিও পরিবার ও উত্তরাধিকারভিত্তিক ছিলো এবং আমার চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতি সেখানকার ধাঁচেই গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে যখন আমার পড়াশুনা শুরু হয়েছিলো, তখন ফিক্হ-এর কিছু কিতাব পড়েছি বিশিষ্ট মুফতি মাওলানা শিবলি জয়রাজাপুরী আজমীর নিকটে। তারপর এ-ধারাবাহিকতায় পরিপক্কতা অর্জিত হলো তখনই, যখন আমি নিয়মিত ছাত্র হিসাবে পড়তে শুরু করলাম হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান তুংকী রহ.-এর কাছে। আমার অধিকাংশ নদভী সাথী ও সহকর্মী মাওলানার হালকার সহপাঠী ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা মাসউদ আলম নদভী (যার আলোচনা বিস্তারিত আসছে আরেকটু পরের দিকে)। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী (বর্তমানে করাচিতে অবস্থানরত)। মাসউদ আলম নদভী ভাইয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন আরবী পত্র-পত্রিকা নিয়ে পড়তাম। এ জগতের সাথে তাঁর মাধ্যমেই আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক দিনে দিনে কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। আমরা ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুর মতো কিংবা দুই ভাইয়ের মতো হয়ে গেলাম। এ ছাড়া আমার সে সময়ের আরো কয়েকজন সহপাঠী হলেন এঁরা:

মাওলানা আবদুস সালাম কুদওয়াই নদভী, মাওলানা নাজেম সাহেব নদভী (সাবেক মুহতামিম দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা এবং শায়খুল হাদীস জামিআ আব্বাসিয়া ভাওলপুর), মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব নদভী (মুহতামিম দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা), মাওলানা মুস্তফা করীম সাহেব, মাওলানা হাবীব আহমদ নদভী রহ., হাফেজ আবদুশ শাকুর সাহেব সেওয়ানী, মৌলভী বিদা'আত হোসাইন রহ., মৌলভী আবু ইউসুফ সাহেব রহ., মৌলভী মাতলুবুর রহমান নেগরামি রহ., মাওলানা সায়্যিদ মুম্মদ আবদুল গাফফার সাহেব নদভী নেগরামি (বর্তমান উস্তায, দারুল উলুম), মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস সাহেব নদভী নেগরামি রহ., মাওলানা হাফেজ ইমরান খান সাহেব নদভী, মৌলভী সায়্যিদ রাঈস আহমদ সাহেব জা'ফরী নদভী, সায়্যিদ আবু বকর হাসানীসহ আরো অনেকে।

পারিবারিক কুতুবখানার গভীরে প্রবেশ

আমাদের পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে দুর্লভ ও মূল্যবান কিতাবের একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার সংরক্ষিত হয়ে আসছিলো। যেখানে ছিলো পারিবারিক ইতিহাস লেখা পাণ্ডুলিপি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি, বড়দের পাঠানো চিঠি-পত্র এবং নথি-সনদ-ফতোয়ার বিরাট সংগ্রহ, যা সচরাচর কোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় থাকে না। কিন্তু আমাদের খানদান এ-ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। যে-কোনো মূল্যে তাঁরা এটিকে সংরক্ষণ করে এসেছেন। বারবার বন্যা ও সয়লাব এসেছে, বারবার জায়গা বদলের প্রশ্ন এসেছে, তখন সবকিছুর উপর তাঁরা এটিকে 'বুকে আগলে রেখেছেন' এবং সুসংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। ভাইজান সব সময় আমাকে এ অমূল্য ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ ও দেখভালের উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলতেন। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো আমাকে খানদানের ঐতিহ্যভাণ্ডার সম্পর্কে, তাঁদের রেখে-যাওয়া কীর্তি ও অবদান সম্পর্কে, তাঁদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কিতাব সম্পর্কে সচেতন ও অনুরাগী করে তোলা, যাতে আমি তার মূল্য বুঝতে পারি এবং সংরক্ষণে যত্নবান হই।

কিন্তু যৌবনে সাহিত্য-রুচির 'জলতরঙ্গে' ভাসতে ভাসতে যখন সাহিত্যের নিত্য-নতুন বইয়ের সন্ধান করছিলাম, তখন স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক এ-ঐতিহ্যের প্রতি আমার অনাগ্রহ ফুটে উঠছিলো এবং এর মাঝে সংরক্ষিত কিতাবের হলদে ধূসর পৃষ্ঠায় চোখ বুলাতে অপ্রস্তুত ছিলাম। বিষয়টা ভাইজানের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি সরাসরি আমাকে কিছু বলা ঠিক মনে করলেন না। আমাকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। আম্মা দেরী করলেন না। আমাকে এ-ব্যাপারে সতর্ক করে, উপদেশ দিয়ে এক চিঠি লিখে পাঠালেন। এ চিঠির পূর্ণ বিবরণ আমি মায়ের জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছি। অংশ বিশেষ এখানেও উল্লেখ করছি। মা বলছেন :

> 'আলী! আরেকটা উপদেশ তোমাকে দেবো, শর্ত হলো তোমাকে তা মানতে হবে! পূর্ব-পুরুষের কিতাব কাজে লাগাও! এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক ও সচেতন থাকো! কোনে কিতাব সেখানে না-থাকলে আবদুকে[১] জানিয়ে তাও সংগ্রহ করো! বাকি এখানে যা আছে তা-ই তোমার জন্যে যথেষ্ট!

---

১. ভাইজানের পারিবারিক ডাকনাম।

এর সংরক্ষণ ও মূল্যায়নে তোমার সৌভাগ্য প্রকাশ পাবেই,
কিতাবও 'নষ্ট' হবে না! কবরে বসে শান্তি পাবেন তোমার
পূর্ব-পুরুষ! তুমি এ-কিতাবের খিদমত করো, এতেই
তোমার সৌভাগ্য, আমিও হবো সীমাহীন আনন্দিত!'

উর্দূতে বিখ্যাত একটি প্রবাদ আছে— 'কয়লার দালালি করতে গিয়ে হাত কালো!' আমার অবস্থাও তাই! ঐ কিতাবগুলো নাড়াচাড়া করে আমার সাধারণ জ্ঞান যেমন বাড়লো, খানদানের রুচিবোধ, সালফে সালেহীনের দীনি ও ইলমী খিদমতের সাথেও বেশ পরিচিত হলাম!

প্রকাশিত কিতাবের মধ্যে হিন্দুস্তানের ইতিহাস, এখানকার উলামায়ে কেরামের জীবনচরিতই বেশি ছিলো। এর কারণ আছে, 'নুযহাতুল খাওয়াতির' লিখতে গিয়ে আব্বার এ-সব কিতাব প্রয়োজন ছিলো। যাঁরা আব্বার এ-ব্যস্ততার কথা জানতেন, তাঁরাও বিভিন্ন সময়ে আব্বাকে এমন সব কিতাব পাঠিয়ে দিতেন, যার সাথে 'নুযহাতুল খাওয়াতির' কিতাবের বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। এ-সব কিতাবে চোখ বুলানেতেও আমার অনেক উপকার হয়েছে। হিন্দুস্তানের ইসলাম ও দীনের ইতিহাসের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে, পরে যা আমার সীমাহীন কাজে লেগেছে।

জীবনের মোড়-বদলানো একটি অনুভব

তখন রমজান মাস। সময়টা ছিলো ১৯৩০ সাল। রায়বেরেলিতে আমি ছুটি কাটাচ্ছিলাম। আর মনোযোগ দিয়ে হাদীস অধ্যয়ন করছিলাম। তখন আমার এক ভাগ্নে সায়্যিদ মাহমুদ হাসান (সায়্যিদ রশিদ আহমদ সাহেব রহ.-এর বড় ছেলে এবং প্রিয় মুহাম্মদ সানী, মুহাম্মদ রাবে ও মুহাম্মদ ওয়াজেহ রশিদ'দের ভাই) -এর কিডনীতে প্রচণ্ড ব্যথা ব্যথা দেখা দিলো। আমার বড় ভাই সংবাদ পেয়ে দ্রুত তাকে নিয়ে আমার বোনকে লখনৌ যেতে বললেন। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে কিং জর্জ আমেরিকান মেডিকেল কলেজের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে ভর্তি করে দিলেন। অপারেশনের ব্যবস্থা করলেন। অপারেশন ছিলো বড়। একজন দক্ষ সার্জন অপারেশন করলেন। আমি এবং আমার এক আত্মীয় রুগীর কাছে হাসপাতালে থাকতাম। ওর বয়স অল্প, মাত্র ন' বছর। ও আমাকে বেশ পছন্দ করতো। তাই সমস্যা হলেই আমাকে ডাকতো। এ জন্যে আমাকে এক রকম নির্ঘুমই রাত কাটাতে হতো। কখনো ডেকে আনতে হতো কর্তব্যরত নার্সকে। হাসপাতালের জীবন

এক অন্য রকম জীবন। এখানে ফুটে ওঠে মানুষের সীমাহীন দুর্বলতা। সুস্বাস্থ্য এখানে মানুষের সাথে 'পরিহাস'[১] করে। এখানে জীবনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যু। হাসপাতালের ভিতরে এসে আমি এ-সব নিজের চোখেলাম, অনুভব করলাম। হাসপাতালের এ-জগত আমার চিরচেনা জগতের চেয়ে ভিন্ন। আমার চেনা জগতে আমি ছিলাম ছাত্র, শুধু পড়াই ছিলো আমার কাজ। সাহিত্যের নয়া নয়া দিগন্ত উন্মোচনই ছিলো আমার কাজ। কিন্তু এখানে এসে সব দেখে আমার মনে সৃষ্টি হলো এক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনকে 'ইনাবাত' (আল্লাহর দিকে ফিরে আসা) শব্দ দিয়েও ব্যক্ত করা যায়। হাসপাতালের এ অবস্থান কোনো খানকার আধ্যাত্মিক আবহে সাধনামগ্ন হয়ে সময় কাটানোর মতোই আমার উপকার করেছে।

নিজের আত্মশুদ্ধির জন্যে, আল্লাহর সাথে আরো গভীরভাবে পরিচিত—সম্পর্কিত হওয়ার জন্যে আমার মনে একটু তাগিদ অনুভব হলো। মনের যখন এ অবস্থা, তখনই এলো ঈদ। হাসপাতালে বসে এবং তার উপর এ অনুভূতি বুকে নিয়ে ভিনদেশী মুসাফিরের মতোই ঈদ কাটাতে হলো। সব মিলিয়ে হাসপাতালে ঢোকার আগের আমি আর পরের আমিতে অনেক অমিল ও পার্থক্য মনে হলো, চিন্তা-চেতনায় বিরাট এক প্রভাব পড়লো।

আল-হামদুলিল্লাহ, আমার ভাগ্নে সুস্থ হয়েই হাসপাতাল ছাড়লো। হাসপাতালে আমি এসেছিলাম রুগীর সাথে তাকে সেবা দিতে। এখন আমার জন্যেও খোদ হাসপাতাল হয়ে গেলো 'হাসপাতাল'—আরোগ্যালয়।

পরে আরো দুবার আমাকে এ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো, যখন আম্মার চোখে পানিপড়ার সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। তখন আমি মনভরে আমার মায়ের খিদমত করেছি। পাশাপাশি আগের সেই অনুভূতিও আমার মনকে বারবার আলোড়িত করেছে, একটু আগে যে অনুভূতির কথা আমি বলে এসেছি।

আল্লামা তাকিউদ্দীন হিলালীর আগমন

সে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বরং ঐতিহাসিক ঘটনা হলো, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় ড. মুহাম্মদ তাকি উদ্দীন ইবনে আবদুল কাদের আল-হিলালী আল-মাগরিবী'র আগমন। তিনি ছিলেন মরক্কো'র অধিবাসী। আরবী

---

১. এখানে উর্দূ শব্দটা হযরত মাওলানা 'বে-ওয়াফায়ী' ব্যবহার করেছেন, আমি তার তরজমা করলাম 'পরিহাস' দিয়ে।

ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সফল একজন শিক্ষক। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মানদণ্ড এবং শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচিত হতো যাদের কথায়, শায়খ ছিলেন সেই তাঁদেরই অন্যতম। এ ব্যাপারে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। আল্লামা সায়্যিদ রশিদ রেজা ও আল্লামা শাকিব আরসালান। প্রথমজন 'আল-মানার' পত্রিকার সম্পাদক আর দ্বিতীয়জন ভাষা-সাহিত্যের কিংবদন্তি ও حاضر العالم الإسلامي কিতাবের লেখক। একবার এ দু'জনের মাঝে আরবী ভাষার কিছু বিষয় নিয়ে ভীষণ মতবিরোধ দেখা দিলো। এখন এ মতবিরোধ মেটাবেন কে? কে বলবেন শেষ কথা? কার কথাই হবে তাঁদের উভয়ের কথা? তিনি হলেন ড. তাকিউদ্দীন হিলালী!

ড. মুহাম্মদ তাকি উদ্দীন ইবনে আবদুল কাদের আল-হিলালী সৌদি বাদশা আবদুল আযীয বিন সউদ-এর সাথে একটা ভুল-বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে সেখান থেকে চলে আসেন হিন্দুস্তানে। এসে ওঠেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু শায়খ আবদুল মজিদ সাহেবের কাছে বেনারসের মদনপুরায়। শায়খ খলীল আরব তাঁকে জানতেন। তাই ভাইজান ও আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.কে তাঁর ব্যাপারে তিনি অবগত করলেন। পাশাপাশি তাঁকে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র উস্তায হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ দিলেন। শায়খ খলীল আরবের পরামর্শকে তাঁরা গনিমত মনে করে উভয়েই একমত হলেন। এর আগে এখানে অন্যান্য আরব উস্তাযও শিক্ষকতা করেছেন। যেমন শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ তয়্যিব মক্কী এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইয়ামানী। যাহোক, ভাইজান ও আল্লামা নদভী ড. হিলারীকে নদওয়ার উস্তায ও আরবী বিভাগের প্রধানের পদ গ্রহণ করতে লিখিত আবেদন পাঠিয়ে দিলেন। শায়খ হিলালী আবেদন ফিরিয়ে দিলেন না, বরং আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় চলে এলেন। তাঁর আগমনে এবং পড়ানোতে দারুল উলুম এবং ছাত্রদের মাঝে যেনো ঋতুরাজ বসন্ত নেমে এলো।

জুমা'র দিন আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম 'আরবীয় কণ্ঠে' খুতবা হচ্ছে। নামাজের পর মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা সাহেব আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। আরবীতেই কথা বলছিলেন। শুধু কি বলছিলেন? মুখে যেনো ফুল ঝরে ঝরে পড়ছিলো! আমি তাঁর মুখে শুনেছিলাম الأغاني (ابو الفرج الاصفهاني) ও الإمامة والسياسة (ابن قتيبة) -এর ধারার আরবী! সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা সাহেব এবং আবদুর রহমান কাশগরি সাহেব (যিনি তখন দারুল

ইলুমের প্রধান উস্তায ছিলেন) ড. হিলালী সাহেবের কাছে জানতে চাইতেন ভাষা সংক্রান্ত অনেক খুঁটিনাটি, কখনো-বা ব্যাকরণ সম্পর্কে, কখনো বা শব্দার্থ, তখন দেখেছি জানা না-থাকলে ড. হিলালী সাহেব কী অকপটে বলে দিচ্ছেন— لا أدري— জানি না! তিনি নিয়মিতই পড়ানো শুরু করে দিলেন। উস্তায হিসাবে শিক্ষক হাজিরা বহিতেও সাক্ষর করতে ভুলতেন না।

সত্যি কথা হলো, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দূর দিগন্তকে স্পর্শ করার জন্যে আমি যে-সফর শুরু করেছিলাম— আমার উস্তায শায়খ খলীল আরব আল-ইয়ামেনী রহ.-এর হাত ধরে, তা-ই ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করে ড. তাকিউদ্দীন আল-হিলালী রহ. এর হাতে। দরসের সময়টা ছাড়াও সুযোগ খোঁজে-খোঁজে আমি হাজির হয়ে যেতাম তাঁর কাছে প্রতিদিনই। তাঁর সান্নিধ্য-পরশ আমার পিপাসার্ত মনকে অনেক দিয়েছে—তৃপ্ত করেছে। দরসে বসে আমি তাঁর কাছে পড়েছি ديوان النابغة (নাবিগা আয-যুবইয়ানি'র কাব্য-সঙ্কলন)[১] তাঁর বলা প্রতিটি ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমি খাতায় লিখে রেখেছিলাম। شذور الذهب এর দরসেও আমি তাঁর বাসায় উপস্থিত থাকতাম। তিনি একটি তাফসির লেখা শুরু করেছিলেন, তা সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। আমি তাঁর কাছে সেই অসমাপ্ত তাফসিরও পড়ার সুযোগ লাভ করেছি। বড় ভাইজানের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এবং শায়খ খলীল আল-ইয়ামেনী'র পরিচয়ে তিনি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে আমি যতো ইস্তিফাদা করতে চাইতাম, তিনি ততোই আমাকে সুযোগ দিতেন। তবুও তাঁর কাছ থেকে যিনি সবচে' বেশি ইস্তিফাদা হাসিল করেছিলেন তিনি কিন্তু আমি নই, আমার বন্ধু আফতাব আলম নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ নাজিম নদভী![২]

১৯৩১ সালে ড. আল্লামা তাকিউদ্দীন হিলালী সাহেব বেনারস, আজমগর, মুবারকপুর এক সফরে বের হন। এ সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিলো সেখানকার বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়া। সঙ্গী ও সহযাত্রী হিসাবে তিনি আমাকে নির্বাচন করলেন। আমার জন্যে এ ছিলো এক বিরাট সৌভাগ্য। আমি এ সফরে তাঁর সান্নিধ্য পরশে ধন্য হয়েছি। সীমাহীন ইস্তিফাদা হাসিল করেছি। এ সফরেই

১. তিনি জাহিলী যুগের একজন বিশিষ্ট কবি।

২. সে জন্যে নিশ্চয়ই আপনার মনে ঈর্ষা জন্ম নিয়েছিলো, ঐ মিষ্টি অনুভূতির কথাটা শুনতেও আমার একটু ইচ্ছে হচ্ছিলো! কিন্তু আপনি তো বলেন নি! - ই. ই. ন.

আজমগরে দারুল মুসান্নিফিন-এ[1] আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.-এর উপস্থিতিতে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে الضياء নামে একটি আরবী পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পৃষ্ঠপোষক ও তত্ত্বধায়ক থাকবেন সায়্যিদ সাহেব ও হিলালী সাহেব। আর সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন আমাদের প্রিয় বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভী।

মুহাররম ১৩৫১ হিজরি মোতাবেক ১৯৩২ সালে এ পত্রিকার সূচনা হয়। এ পত্রিকার মাধ্যমে একদিকে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার পরিচিতি অবদান ও কীর্তি যেমন আরব জাহানে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো, অপরদিকে এর মাধ্যমে তৈরী হযেছিলো একদল আরবী কলম-সৈনিক। হিন্দুস্তানের বুকে জন্ম লাভ করলো আরব সাংবাকিতার স্বচ্ছ এক প্রবাহ। الضياء আলো ছড়িয়েছিলো মাত্র তিন বছর। কিন্তু الضياء ই ছিলো البعث الإسلامي এর বীজ! এমনকি الرائد এরও বীজ! বীজ থেকেই তো গাছ হয়!

আমার তালিম-তারবিয়তের ব্যাপারে ভাইজানের প্রাজ্ঞোচিত পন্থা, লেখালেখির সূচনা

আমার ভাইকে আল্লাহ্ দান করেছিলেন পাঠন-প্রশিক্ষণের এক বিশেষ যোগ্যতা। এ ক্ষেত্রে তিনি বৈচিত্রময় সব পন্থা নিয়ে ভাবতেন, একটার চেয়ে আরেকটা উপকারী। ভাইজান চাইতেন আমি যেনো শিকড় ধরে থাকি—পূর্ব-পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন না-হই। এ জন্যেই তাঁর সার্বক্ষণিক ইচ্ছে ছিলো, আমি যেনো মহান পূর্বপুরুষ ইমাম আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ.কে, তাঁর দাওয়াত ও মিশনকে গভীর করে চিনি জানি। আমাদের বাপ-দাদারা তাঁর সাথেই জড়িয়ে আছে চিন্তায়-চেতনায়, রক্তে-মাংসে, আদর্শে -অনুভবে। বিশেষত আমাদের দাদাদের সম্পর্ক ছিলো তাঁর সাথে সুগভীর।

তখন 'তাওহিদ' নামে একটি উর্দূ পত্রিকা প্রকাশ পেতো অমৃতসর থেকে মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ দাউদ গজনভী সাহেবের সম্পাদনায়। সেখানে মাওলানা মহিউদ্দীন কুিসওয়ারি সাহেবের একটা ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ

---

১. দারুল মুসান্নিফীন' আজমগড়ে অবস্থিত। এশিয়া মহাদেশের অন্যতম সেরা ও দুর্লভ এবং বিষয়-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত একটি লাইব্রেরী। সুদূর আরব মুলুক থেকেও এখানে গবেষণার জন্যে ছুটে আসেন আরব দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম।

পেতো مجاهد الهند الأعظم নামে। সেখানে তিনি ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর জীবন ও দাওয়াতকে বড়ো সময়োপযোগী ভাষা ও নতুন পন্থায় এবং সাবলীল উপস্থাপনায় তুলে ধরতেন। এ পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন চাচা মাওলানা সায়্যিদ খলীলুদ্দীন সাহেব। ভাইজান আমাকে তা আরবীতে তরজমা করতে বললেন। আর পরামর্শ দিলেন, তরজমার কাজে হাত দেওয়ার আগে আমি যেনো জীবনচরিতভিত্তিক কোনো নির্ভরযোগ্য সহজ-সাবলীল কিতাব পড়ে নিই এবং প্রয়োজনীয় শব্দ ও বিশেষ বিশেষ পরিভাষা টুকে রাখি, যে-কোনো জীবনী লেখার ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হয়। আমি এ জন্যে বেছে নিলাম আল্লামা ইবনুল আসির রহ.-এর 'আল-কামিল'।

'আল-কামিল' পড়তে বসে গেলাম। পড়তে পড়তে যেখানে যা আমাকে মুগ্ধ করছিলো কিংবা ভাবছিলাম যা আমার কাজে লাগতে পারে, তা টুকে যেতে লাগলাম। এরপর যখন তরজমা শুরু করলাম দেখলাম তা অনেক সহজ হয়ে গেছে! আমি যখন এ লেখাটি প্রস্তুত করছিলাম তখনই নদওয়াতুল উলামায় আগমন করেন ড. শায়খ তাকিউদ্দীন হিলালী। লেখা শেষ করে আমি একদিন তাঁকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। কিছু জায়গা তিনি দেখে 'কাটাকুটি' করে দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি চাইলে আমি লেখাটা মিশরে আল্লামা রশিদ রেজা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি— আল-মানার-এ ছাপার জন্যে! কিন্তু মনে রাখবে; তিনি ভুল ধরতে কাউকেই ছাড়েন না! বড় বড় লেখকদের লেখায়ও তিনি ভুল বের করে ফেলেন! তাঁর সমালোচনা-দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ ও প্রখর! তাঁর মানদণ্ডে উতরানো অনেক কঠিন!' আমি খুশিতে কাঁপতে কাঁপতে মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বললাম! তারপর তিনি আমার ছোট্ট একটা পরিচিতিসহ তরজমাটা পাঠিয়ে দিলেন! কয়েকদিন পর জবাব এলো! আল্লামা রশিদ রেজা নিবন্ধটি শুধু আল-মানারে ছাপতেই সম্মত হলেন না, বরং তিনি এও বলে পাঠালেন যে, অনুবাদক চাইলে আমি এটিকে আলাদা পুস্তিকা হিসাবেও ছাপবো!

এরচে' বড় সৌভাগ্য ও সম্মান আর কী হতে পারে যে, হিন্দুস্তানী এক নওজোয়ান তালিবে ইলমের লেখা ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করছেন মিশরের আল্লামা সায়্যিদ রশিদ রেজা!

অপেক্ষার 'কষ্টকর' প্রহরগুলো বেশি লম্বা হলো না! কিছুদিন পরই 'আমার কিতাব' ছেপে চলে এলো মিশর থেকে! তিনি এর নাম দিয়েছেন— ترجمة

الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد (ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনকথা)! সে ছিলো টুকরো-টুকরো আনন্দের এক মহা-মিলনের দিন! এ-আনন্দের কোনো সীমা আমার জানা নেই! তখন বয়স আমার ছিলো ১৬! ষোল বছরের এক কিশোর যুবকের লেখা কিতাব বের হবে তাও স্বদেশভূমি হিন্দুস্তান থেকে নয়— সুদূর আরব মুলুক মিশর থেকে, একজন শীর্ষসারির লেখক-সাহিত্যিক-সমালোচক-গবেষক-আলেম-মুফাসসির-এর ব্যবস্থাপনায়, এতে কি আনন্দরা মিছিল করবে না?! করতেই পারে! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! তিনিই দিয়েছেন আমাকে এ সম্মান!

বলছিলাম, ভাইজানের প্রতিভাগুণ ও প্রশিক্ষণ-দক্ষতার কথা। এ প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করার আগে একটা মজার ঘটনা বলি। এর আগে ভাইজান আমাকে ১৯২৭ কিংবা ১৯২৮ সালে আরেকটা এ ধরনের কাজ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সউদি আরব থেকে প্রকাশিত আরবী পত্রিকা 'উম্মুল কুরা'র একটি সংখ্যা দিলেন। তখন সউদি আরবে নতুন বাদশা হয়েছেন আবদুল আযিয বিন সউদ। সে সংখ্যাটিতে বাইরের দেশের হজ্বব্রত পালনকারীদের উদ্দেশে অনেক দিক-নির্দেশনা ছিলো। যেমন সেখানে বলে দেয়া হয়েছিলো, তারা যেনো ঠিকমত টিকা ও ইনজেকশন দিয়ে আসে। ইত্যাদি। ভাইজান আমাকে পত্রিকাটা হাতে দিয়ে বললেন: 'আলী! এ বিষয়টা উর্দূতে তরজমা করে 'জমিনদার' পত্রিকায় পাঠিয়ে দাও!' আমি অল্প সময়েই তরজমা করে পাঠিয়ে দিলাম। লেখাটি প্রকাশ পেলো।

লেখক-পরিচয়টা এমন ছিলো— আবুল হাসান আলী, ছাহেবজাদা, মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী, সাবেক নাজেম, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা। আমি সে সময় পাঞ্জাব মেইলে (যা সে সময়ের একটি ঐতিহ্যবাহী পুরোনো রেলগাড়ি ছিলো, বর্তমানে এটি 'অমৃতসর মেইল' নামে পরিচিত) মৌলভী আবু বকরের সাথে রায়বেরেলি থেকে লখনৌ যাচ্ছিলাম। বয়স তেরো ছুঁইছুঁই। হঠাৎ একজন টি.টি.আই. এলো। আমাদের টিকেট চেক করলো। আমার টিকেট 'হাফ' ছিলো। টি.টি.আই. ভদ্রলোক আমার বয়স জানার পর বললেন, তোমার তো 'ফুল টিকেট' কাটা উচিত ছিলো! তোমাকে এতো জরিমানা দিতে হবে! আমি বললাম, 'আমি একটু পরামর্শ করে নিই' বলে আমি 'জমিনদার' পত্রিকাটা বের করলাম! বেকার বসে না-থেকে পত্রিকার উপর চোখ বুলাতে লাগলাম। একটু পর টি.টি.আই. বগিতে ঢুকলেন। তিনিও কী যেনো একটা পত্রিকার উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। আমি

আমার 'জমিনদার' নিয়ে তার কাছে গেলাম! বললাম, 'এ-লেখাটি আমার!' ঘটনাক্রমে তিনি মুসলমান ছিলেন! গায়ে বিশেষ উর্দি থাকায় তার ধর্ম-পরিচয় বোঝা যাচ্ছিলো না! তিনি একটু চোখ বুলিয়ে আমার কাছে ছোট ছোট চোখে জানতে চাইলেন, 'তুমি কি তাহলে মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই সাহেবের ছেলে? আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলাম! তিনি বললেন, 'আমি নদওয়াতুল উলামার পুরোনো ছাত্র! আমাদের সময়ে তোমার পিতাই ছিলেন মহাপরিচালক! যাও বেটা, তোমাকে কিচ্ছু দিতে হবে না!' এভাবেই তের বছরের 'লেখক' নিজের লেখার কারণে 'জরিমানা' থেকে বেঁচে গেলো!

ইংরেজির প্রতি ঝোঁক, মায়ের পেরেশানি

আমার ইংরেজি পড়া ধীরে ধীরে চলছিলো আরবীর পাশাপাশি। আমাদের মহল্লাতেই থাকতেন খলীলুদ্দীন সাহেব (যার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে) হানসাভী। আমার ভাই এবং তার মাঝে ভালো সম্পর্ক ছিলো। তিনি ডাক বিভাগের একজন কর্মচারি হলেও ইংরেজি বেশ জানতেন। পড়ানোর ধরনও ভালো ছিলো। এ ছিলো মূলত ইংরেজির রমরমা যুগে ইংরেজি শিক্ষার ফল। তিনি আমাকে ইংরেজি পড়ানোর জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় বের করেছিলেন। এদিকে যখন রায়বেরেলিতে যেতাম, তখন ইংরেজি পড়তাম বড় মামা—সায়্যিদ সাঈদ সাহেবের কাছে। তিনি ইংরেজিতে ছিলেন ভীষণ দক্ষ। কেননা, ইংরেজি শিখেছেন তিনি সরাসরি ইংরেজদের কাছে। আর যখন দারুল উলুমে থাকি তখন ইংরেজি পড়ি সেখানকার বিশিষ্ট ইংরেজি শিক্ষক মাস্টার সামি সিদ্দিকী সাহেবের কাছে। এছাড়া ১৯২৯ সালে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মদ আল-ফারুকী সাহেবের কাছেও পড়েছি। তিনি পরবর্তীতে সালে শিতাপুর সরকারি স্কুলে চলে গিয়েছিলেন।

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শেষ করার পর মেট্রিক পাস করে ফেলার চিন্তা আমার মাথায় ঢুকলো, যা সে সময়ের পরিবেশ ও চাহিদার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি বিদ্যার তখন খুবই কদর ছিলো। এই তো কিছুদিন আগে আমাদের খানদানের হাফেজ সায়্যিদ ইসহাক হাসানী ইন্ডিয়ান সোল সার্ভিসে (I. C. S.) নির্বাচিত হয়েছেন! তিনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করে লন্ডন থেকে ফিরে এসেছেন। আমাদের খানদানে তার আগমনকে কেন্দ্র করে ধুম পড়ে গিয়েছিলো। আমি এবং সায়্যিদ আবু বকর ভাই (যিনি আমার সাথে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে

আরবী ভাষা ও সাহিত্য পড়ে তারপর ইংরেজিতে ভর্তি হয়েছিলেন) ছাড়া সবাই ইংরেজি পড়াশুনা করেছেন। আমাদের শায়খ খলীল আরব সাহেবও ইংরেজি শিক্ষাকে যথেষ্ট হিসাব করতেন। তিনি চাইতেন ছেলেরা যেনো আরবী পড়ার পর ইংরেজিতেও দক্ষতা অর্জন করে এবং এর মাধ্যমে সুপরিসর পরিমণ্ডলে দীনের খিদমত করে।

আমার গায়ে যখন ইংরেজির জ্বর উঠলো, তখন এই ছিলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা। মেট্রিকের 'বইপত্র'ও কিনে ফেললাম। গণিত পড়া শুরু করলাম মহল্লার এক শিক্ষকের কাছে। আর ইংরেজির জন্যে ছুটে যাচ্ছিলাম মুহাম্মদ আল-ফারুকী সাহেবের কাছে। তিনি যখন রখনৌ ছেড়ে চলে গেলেন, তখন আমি 'নিজেই নিজর মাস্টার হয়ে গেলাম' (একা একাই পড়তে শুরু করে দিলাম) এবং আগ্রহের আতিশয্যে 'ইন্টারমিডিয়েট'-এর সিলেবাসও সংগ্রহ করে ফেললাম। সম্ভবত বর্তমানে তা বি.এ মানের হবে। ডিকশনারির সহযোগিতায় পড়াও শুরু করে দিলাম। পরীক্ষার সময় আসতে না আসতেই আমার বিচলিতা মায়ের চিঠি এলো। (সম্ভবত ভাইজানই তাঁকে আমার অবস্থা জানিয়েছিলেন।) তিনি আমার এ ঝোঁকের খবর জেনে ফেললেন। চিঠির ভাষা বড়োই আবেগঘন, দরদপূর্ণ। 'যিকরে খায়রে' আমি তা উল্লেখ করেছি। এখানেও একটু নমুনা পেশ করছি। মা লিখেছেন—

'আলী!

কারো কথায় কান দেবে না! যদি চাও আল্লাহকে খুশি করতে, আমাকে খুশি করতে, তাহলে তাকাও সেই তাদের দিকে, যাঁরা ইলমে দীন হাসিল করার জন্যে জীবনের সকল সাধনা বিলিয়ে দিয়েছেন! ভাবো, কী ছিলো তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা! শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ., শাহ আবদুল আযিয রহ., শাহ আবদুল কাদের রহ., মৌলভী মুহাম্মদ ইবরাহিম রহ. এবং তোমার খানদানের (গর্বিত) পূর্বপুরুষ খাজা আহমদ রহ.— এরাঁ সব কারা ছিলেন?! জীবনে-মরণে এঁরা কি ঈর্ষণীয় নন? আহা! কী শান-শওকতে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন! কতো সব গুণ-বাহারের সুসমা ছড়িয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন! এ সম্মান ও মর্যাদা কেমন করে হাসিল হতে পারে? চিন্তা করে দেখেছো কখনো? ইংরেজি বিদ্যার বড় বড় বিদ্বান তোমার খানদানে কম নেই, আরো হবেন! কিন্তু এ-সম্মান ও মর্যাদার ক'জন আছে?

> আলী! আমার শত সন্তানের ভাগ্য হলে সব সন্তানকেই আমি ইলমে দীনের শিক্ষায় উৎসর্গ করতাম! এখন তো শুধু তুমিই আছো, একা! আল্লাহ্ আমার নেক নিয়তের বদলা অবশ্যই এভাবে দান করবেন যে, একা তোমার মধ্যেই তিনি শত সন্তানের গুণ দান করে দেবেন! ইহকাল-পরকালে আমি হবো 'শত গুণী'র মা! আমীন! আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!!'

আমার মায়ের কাতর প্রার্থনা ও অশ্রুময় দু'আর বরকতেই হবে, হঠাৎ দেখলাম— যে জন্যে উন্মুখ ছিলাম সে-থেকে এখন একেবারেই বিমুখ হয়ে গেলাম! যে সব বই কিনেছিলাম সব মানুষকে জোর করে দিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রচণ্ড রকমের এ-মোড় ও বাঁক আমাকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয় নি। যে ক'দিন এ-ঝোঁকের ভিতরে বসবাস করেছিলাম সে ক'দিনে প্রয়োজন পুরা করার মতো বেশ কিছুটা ইংরেজি শেখা হয়ে গেছে! যা আমার লেখালেখিতে এবং ইউরোপ-আমেরিকা সফরকালীন সময়ে বেশ কাজে লেগেছে। ইংরেজি-ভাষা-জ্ঞান যতটা অর্জিত হয়েছিলো, তাতে আমি সহজেই ইসলামী বিষয়বস্তুনির্ভর ইংরেজি বইপুস্তক পড়তে ও বুঝতে কোনো অসুবিধা বোধ করতাম না। আমি এখনো 'সেই জ্ঞান' থেকে উপকৃত হয়ে চলেছি।

আমাদের এখানে শায়খ মাদানী'র অবস্থান

গলির ভিতরের ছোট্ট বাসাটায় চার বছর কেটে গেলো। এর মধ্যে ভাইজান হজ্বব্রত পালন করে সহি-সালামতে ফিরে এসেছেন। এ ছিলো ১৯২৬ সালে। এদিকে শায়খ খলীল আরব সাহেবের কাছেও আমি পড়ালেখা শেষ করেছি। ভাইজানের চিকিৎসালয় এখন ভালো চলছে। আয়-রোজগারও বেড়েছে। পারিবারিক সদস্যসংখ্যাও বেড়েছে। আমাদের দৃষ্টি ঐ বাড়িটির দিকে, যেখানে আমাদের শৈশব ও ভাইজানের যৌবন কেটেছে, যেখানে আব্বা জীবনের একটা লম্বা সময় অতিবাহিত করেছেন। ঐ বাড়িটিতে চোখ পড়লো কতো স্মৃতি ভেসে ওঠে! শৈশবের কতো 'কলরব' শব্দময় হয়ে ওঠে! মজার বিষয় হলো, বর্তমানে ঐ বাড়িটি খালি হয়েছে! ভাইজান সুযোগটা কাজে লাগাতে দেরী করলেন না, তা ভাড়া নিয়ে সবাইকে নিয়ে সেখানেই উঠে গেলেন।

সে সময়েই ভাইজান হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর হাতে বায়আত হন। খুব অল্প সময়ের ভিতরে ভাইজান শায়খ মাদানী'র স্নেহ

ও আস্থাভাজনে পরিণত হলেন। ভাইজানের সাথে তাঁর সম্পর্ক এতোটাই কাছের হয়ে গেলো যে, লখনৌ এলেই (যেখানে তাঁকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা সেমিনার উপলক্ষে অনেক সময় তাঁকে আসতে হতো) তিনি আমাদের এখানে অবস্থান করতেন। এমনটি সব সময়ই হতো। পরিস্থিতি যাই হোক না কেনো, এর আগে আমি শায়খকে দেখেছি লখনৌ'র এক রাজনৈতিক সাধারণ সমাবেশে, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সব দলের ডাকে ১৯২৮ সালে।

আমাদের এখানে হযরতের অবস্থানের কারণে —যা বারবার হচ্ছিলো এবং যা কখনো কখনো কয়েকদিন পর্যন্ত প্রলম্বিতও হতো— আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলাম। ঘরের সমঝদার ছোট ছোট্ট সদস্য হওয়ার সুবাদে তাঁর খিদমতেরও অনেক সুযোগ হয়েছে আমার। 'বাতেনি কামাল' (আত্মিক পূর্ণতা) ও 'রুহানী মরতবা' (আত্মার ধাপোন্নতি)র ব্যাপারে সেই ছোট্ট বয়সে আমি আর কী বুঝবো (এখনই-বা কী আর বুঝি!), কিন্তু লক্ষ্য করতাম, তিনি এলেই আমাদের ঘরের পরিবেশ বদলে যেতো! ঘরময় ছেয়ে থাকতো নুরানি আভা! বরকতের ছায়া! তখন আমাদের ঘরের সাদাসিধে খাবারই (যার ব্যাপারে তিনি খুবই তাকিদ করতেন এবং অন্যথা হলে 'প্রতিবাদ'ও জানাতেন!) হয়ে উঠতো অন্য রকম উপাদেয়—আশ্চর্য মজাদার! আমাকে মাওলানা স্নেহ করতেন। তিনি আমার অগোচরে ভাইজানকে অনুরোধ করেছিলেন, আমার প্রতি তিনি যেনো বিশেষ খেয়াল রাখেন। শায়খ মাদানীই ছিলেন আমার দেখা প্রথম কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ। আমি তাঁর নৈকট্যে ব্যক্তিত্বে সীমাহীন প্রভাবিত হয়েছিলাম। তাঁর প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দিনে দিনে বৃদ্ধিই পেয়েছে, এখনো তা অব্যাহত আছে।

আমার যতোটুকু মনে হয়, তাঁর প্রতি আমার এ-আকর্ষন তাঁর বক্তব্য ও কথা শুনে তৈরী হয় নি। আর তা সম্ভবও ছিলো না। তখন আমি ভাষণ-বক্তৃতা কী আর বুঝতাম! আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে ছিলো আকর্ষণ-শক্তি! সে আকর্ষণ হৃদয়-মনকে এতোই টানতো যে, মনে চাইতো— তাঁর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি! তাঁর হাতে চুমু খাই! পরবর্তীতে আমি যখন তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য ও গৌরব অর্জন করি, তখন এ সম্পর্কে এসেছিলো আরো গভীরতা ও দৃঢ়তা।

আরবী পত্র-পত্রিকা পাঠ শুরু রচনা ও লেখালেখির চর্চা আরম্ভ

ভাইজান আরবী পত্র-পত্রিকা বেশ উৎসাহ নিয়ে পড়তেন। সে সময় হিন্দুস্তানের স্বল্পসংখ্যক মানুষেরই আরব জাহানের পত্র-পত্রিকার সাথে সম্পর্ক

ছিলো। তিনি ১৯২৬ সালে হজ্ব থেকে ফিরে এলেন। তখন থেকেই তিনি 'উম্মুল কুরা' পত্রিকাটির গ্রাহক, যা মক্কা মুকাররমা থেকে প্রকাশ হতো। এ ছাড়া তাঁর হাতে আরো আরবী পত্রিকা আসতো। তিনি আমাদের সেই পুরোনো বাড়িতে আসার পর নদওয়াতুল উলামা'র এক নদভী সায়্যিদ সাঈদ আশরাফকে —যিনি নামকরা উর্দূ পত্রিকা 'হামদম'-এ আরবী থেকে উর্দূ অনুবাদের দায়িত্ব পালন করতেন এবং এ সুবাদে তাঁর কাছে বিভিন্ন আরবী পত্রিকা আসতো— দায়িত্ব দিলেন, তিনি যেনো তরজমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরবী পত্রিকাগুলো নিয়মিত ভাইজানের কাছে পৌঁছে দেন। মৌলভী সাঈদ আশরাফের মাধ্যমে যে সব পত্রিকা ভাইজানের হস্তগত হতো, তার মধ্যে দামেস্ক থেকে প্রকাশিত فتى العرب ছিলো।

ফিলিস্তিন থেকে প্রকাশিত الجامعة الإسلامية ছিলো (যেটি মুফতি আমিন আল হোসাইনি সাহেবের মুখপাত্র ছিলো)। আমার মনে আছে, এ-দু'টি পত্রিকা বিশেষত الجامعة الإسلامية-র ভাষা ও ভঙ্গি খুবই চমৎকার ছিলো। কোনো লেখা এতোই তেজস্বী ছিলো যে মনে হতো তা থেকে আবেগ ও চেতনার ফুলকি বের হচ্ছে! এর সম্পদকীয়গুলো আমাকে মনে করিয়ে দিতো মাওলানা আবুল কালাম আযাদ লিখিত 'আল-হিলাল' পত্রিকার চেতনা-বিধৌত অগ্নিঝরা সম্পাদকীয়-এর কথা!

যদিও আমি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনেক উপরের কিতাবও তখন পড়ে ফেলেছিলাম, তবুও এ-সব পত্র-পত্রিকার সবকিছু আমি বুঝতে পারছিলাম না ঠিকমত। কিন্তু ভাইজান আমাকে পথ দেখিয়ে দিতেন, সহযোগিতা করতেন। কঠিন কঠিন পরিভাষা ও প্রকাশভঙ্গি ধরিয়ে দিলেন। ফলে আমি ধীরে ধীরে তা বুঝতে শুরু করলাম। রচনা ও লেখা তৈরীতেও আমি এ সব পত্রিকা থেকে বিপুল সহযোগিতা পেলাম। পত্র-পত্রিকায় যেমন বৈচিত্র থাকে তেমনি থাকে পুনরাবৃত্তি। এ দু'টি পত্রিকার সম্পাদকই ছিলেন অনুসরণীয় পর্যায়ের ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক-আলঙ্কারিক — সংবাদপত্রের ময়দানের দিকপাল।

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার جمعية الإصلاح (ছাত্রদের ঐক্যসংঘ) পাঠাগারেও আসতো অনেক পত্রিকা। যেমন 'আল-মানার', 'আল-হিলাল', 'আল-মুকতাতিফ', 'আয-যাহরা', আল-মাজমাউল ইলমী' ও 'আল-ইরফান'। جمعية الإصلاح -এর নাজেম বা ব্যবস্থাপক ছিলেন তখন প্রিয় বন্ধু শায়খ মাসউদ আলম নদভী। এ সুবাদে আমি ওখান থেকে অনেক আরবী পত্র-

পত্রিকা পড়তাম, উপকৃত হতাম। আল্লামা তাকিউদ্দিন হিলালী সাহেব আসার পর আরো পরিচিত হলাম নতুন নতুন পত্রিকার সাথে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল খতিব সম্পাদিত পত্রিকা 'আল-ফাত্হ'। শায়খ আমাদেরকে এ পত্রিকাটির গ্রাহক হয়ে নিয়মিত পড়ার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহিত করেছেন। কেননা, তাতে তখন যাঁরা লিখতেন, তাঁরা ছিলেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাদ-পুরুষ। যেমন আল্লামা শাকিব আরসালানসহ অন্যান্যরা। এ পত্রিকাটি পড়াতে আমাদের সীমাহীন ফায়দা হয়েছে। কেননা এটি ছিলো ইসলামের সঠিক চেতনা-দর্শন ও উচ্চাঙ্গের নান্দনিক ও শিকড়ভিত্তিক আরবী সাহিত্যের ঝলমলে ও ঝরঝরে এক নমুনা। আমি এবং শায়খ মাসউদ সেখানে লেখা পাঠাতে শুরু করলাম। কয়েক কিস্তিতে আমার একটা প্রবন্ধ সেখানে প্রকাশ পেলো। শিরোনাম ছিলো— কবি আকবর এলাহাবাদীর চোখে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা। কবিতার ভাষায় পাশ্চাত্যের জীবনধারা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে কবির তীব্র সমালোচনার তরজমা তুলে ধরা হয়েছে।[১] এ ছাড়াও অন্যান্য লেখা মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগলো।

তখন আমাদের পাঠ ও লেখালেখির ঝোঁক সীমাবদ্ধ ছিলো শুধু ইসলামী ভাবধারাকেন্দ্রিক সাহিত্যের গন্ডিতে। কলমের লাগাম তখনো দাওয়াতী ভঙ্গির দিকে ঘুরানো হয় নি। দাওয়াত সম্পর্কিত ব্যাপক পড়াশুনা ও জানাশুনাও বলতে গেলে ছিলো না। চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারায় তেমন গভীরতাও অর্জিত হয় নি। তারপর الضياء এসে আমাদের রুচি ও লেখালেখির ধরনের মধ্যে পরিবর্তন আনলো এবং তা শাণিতও করলো। আমাদেরকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে লাগলো। الضياء আলো ছড়ালো আমাদের আমাদের কলমের গতিতে, প্রতিভা ও চেতনা বিকাশে। কাছের দিগন্তকে আরো সুবিস্তৃতকরণে। তবুও আমাদের কলম দাওয়াতী প্রাণ ও দর্শনের সাথে তখনো পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে নি। এ-সব ১৯৪০ সালের পরের কথা। বিস্তারিত আসছে আরেকটু সামনে।

الضياء হিন্দুস্তানের সীমানা পেরিয়ে আলো ছড়ালো আরব বিশ্বেই বেশি। الضياء পৌঁছে গেলো মিশরে, লেবাননে, ইরাকে, সিরিয়ায়। এ দেশগুলো

---

১. এ লেখাটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ পেয়েছে এই শিরোনামে الثقافة الغربية الوافدة وأثرها في الجيل المثقف (জেঁকে-বসা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং আধুনিক প্রজন্মের উপর তার ক্ষতিকর প্রভাব)

থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকাও আসতে লাগলো আমাদের কাছে সংবাদপত্র-বিনিময় হিসাবে। পাশাপাশি বড় বড় লেখকদের সদ্য প্রকাশিত কিতাবও আসতো আমাদের কাছে, الضياء পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগের জন্যে। বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলম নদভী, প্রিয় সহপাঠী মাওলানা মুহাম্মদ নাজেম নদভী ও আমি মিলে এ সব 'অতিথি পত্রিকা ও দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদের তাজা তাজা কিতাব' খুব মজা করে আগ্রহ নিয়ে পড়তাম, একজনের আগে আরেকজন।

মিশর ও শামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রতিভা এবং বড় বড় কলম-শিল্পীদের পরিচয় আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে লাগলো একের পর এক। আর এ-সবই প্রিয় উস্তায ড. আল্লামা তাকিউদ্দীন আল হিলালীর সান্নিধ্যের বরকতে এবং আরব জাহানের পত্র-পত্রিকা ও কিতাবাতি পাঠ করার মাধ্যমে। এমনভাবেই আমরা তাঁদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠলাম যে মনে হচ্ছিলো, আমরা যেনো তাঁদেরকে দেখতে পাচ্ছি, বসে আছেন আমাদের একেবারে সামনে কিংবা আশপাশে, হিন্দুস্তানের লেখক-সাহিত্যিক ও উলামায়ে কেরামের মতোই। তাঁদেরকে নিয়ে আমরা একে অপরের সাথে ব্যাপক আলোচনা করতাম এবং মত বিনিময় করতাম। তাঁরা কে কোন্ পর্যায়ের, সে নিয়েও চলতো চুলচেরা বিশ্লেষণ।

এর ফলে আমরা তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে থেকেও অনেক কাছে চলে গিয়েছিলাম। এ জন্যেই আমি যখন ১৯৫১ সালে মিশর সফর করি, তখন আমার সামনে নতুন কিছুই আবিস্কৃত হয় নি, নতুন কোনো তথ্যও উদ্ঘাটিত হয় নি। চোখে কোনো ধাঁধাও লাগে নি। কারো সামনে নতশিরও হতে হয় নি। হিন্দুস্তানের এক যুবকের প্রথম মিশর সফরকে একেবারেই প্রথম লাগে নি। মনে হয়েছে, সবই তো আমার চেনাজানা, আগে থেকেই! এটা সম্ভব হয়েছে সেই পরিবেশে আমার বেড়ে ওঠার কারণে, যে পরিবেশ পূর্ব থেকেই ইসলামী রঙ্গে রঙিন ছিলো এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকেন্দ্র ছিলো। মহান আল্লাহ তা'আলাই পূর্ব থেকেই আমার জন্যে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

লাহোর ও দেওবন্দে

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর সান্নিধ্যে থেকে তাফসির পড়ার জন্যে আমি লাহোর সফর করেছি দুবার। একবার ১৯৩০ সালে,

আরেকবার ১৯৩১ সালে। ১৯৩০ সালে যখন গিয়েছিলাম তখন নিয়মতান্ত্রিক দরসের সময় ছিলো না। নিয়মতান্ত্রিক দরস শুরু হতো শা'বান থেকে আর চলতো জিলকদ পর্যন্ত, যেখানে ফারেগীন উলামায়ে কেরামসহ মাদরাসার ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করতেন এবং দরস সমাপ্ত হওয়ার পর গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হতো। তবে শায়খ আমাকে সময় দিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁর কাছে সূরা বাকারার শুরুর অংশ পড়িয়েছিলেন। এ দরসে শুধুমাত্র একজন সহপাঠী ছিলো আমার—সায়্যিদ আহমদ আল-হাসানী। পরের বছর আমি আবার এলাম লাহোরে, حجة الله البالغة এর দরসে অংশ গ্রহণ করতে। আল-হামদুলিল্লাহ, অংশ নিয়ে পরীক্ষাও দিয়েছিলাম, সফলও হয়েছিলাম।

তখন আমি মাওলানার কাছে বাইআত হওয়ার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু মাওলানা আমাকে ফিরিয়ে না-দিলেও একটি পরিচিতিমূলক চিঠি লিখে নিজের শায়খ ও মুর্শিদ হযরত খলীফা গোলাম মুহাম্মদ ভাওলপুরী নিকট খানপুর জেলার দীনপুরে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন (বিনয় ও ইখলাসের কারণেই তিনি তা করলেন। আমাদের বড়রা এমনই ছিলেন)। চিঠির বিষয়বস্তু সম্ভবত আমাদের খানদানের পরিচিতি ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সম্পর্কে আলোচনা ছিলো। খলীফা ছাহেবের বয়স তখন নব্বইয়ের উপরে ছিলো। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের পীর-মাশায়েখের চোখে (যাঁদের মধ্যে হযরত থানভী, মাওলানা মাদানী ও হযরত রায়পুরীও শামিল ছিলেন) তিনি ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের শায়খ ও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ। মাওলানা মাদানীও তাঁর মুজায ছিলেন (যা তিনি নিজে আমাকে বলেছেন)। আমার মনে পড়ে না, আরব-আজমে হযরত খলীফা ছাহেবের মতো নূরানি চেহারার মানুষ আর দেখেছি কি না! তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন না, বাইআত করে নিলেন। কিছু যিকরে ক্বালবী'র আমলও দিয়ে দিলেন। এ ছিলো ১৯৩১ সালের ঘটনা। পরের বছর (১৯৩২ সালে) আমি হযরত মাওলানা মাদানী'র নিকট দেওবন্দে পাড়ি জমালাম।

দেওবন্দে

১৯৩২ সালের কথা। আমাদের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন মাওলানা মাদানী। ভাইজান আমাকে এবার বিশেষভাবে পেশ করলেন মাওলানার সামনে। আমি তাঁকে জানালাম আমার পড়াশুনার অবস্থা। তখন শায়খ মাদানী ভাইজানকে পরামর্শ দিলেন আমাকে দেওবন্দে তাঁর কাছে পাঠিয়ে

দিতে। দেওবন্দসহ হিন্দুস্তানের মাদরাসাগুলোর শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় শাওয়াল থেকে। ছয় মাস এর মধ্যে চলে গেছে। অবশ্য আমার বেলায় মাওলানা মাদানীর পক্ষ থেকে এ সব নিয়ম-কানুন বিবেচ্য ছিলো না। কিছুদিন আমি তাঁর সান্নিধ্যে থাকবো— এই ছিলো উদ্দেশ্য। আমি ১৯৩২ সালে জুলাই-আগস্টের দিকে দেওবন্দে পৌঁছে গেলাম। মাওলানা মাদানী আমাকে নিজের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে সময় দেওবন্দে দরসে হাদীস ছিলো শান-শওকত ও পূর্ণতার শীর্ষে। শায়খ মাদানী দরস দিতেন বুখারী ও তিরমিযী শরীফ। আমি নিয়মিত তাঁর দরসে উপস্থিত হতে লাগলাম। এদিকে ভাইজানের পক্ষ থেকে নতুন দিক-নির্দেশনা এলো। তিনি নির্দেশ দিলেন, যেহেতু দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমাকে দেওবন্দে মাওলানা মাদানীর সুহবতে থাকতে হবে, তাই নিয়মিতভাবে খাবারের ব্যবস্থা যেনো মাতবাখ থেকেই করে নিই। আমি মাওলানা মাদানীর কাছ থেকে অনুমতি চাইলে অনেক কষ্টে অনুমতি মিললো। কিন্তু নাশতা যেনো সব সময় তাঁর সঙ্গেই করি, সে ব্যাপারে খুব শকাত করে বলে দিলেন। আমি হযরতের বাড়ি ছেড়ে এসে উঠলাম 'দারুশ শিফা'র এক কামরায় থাকতে লাগলাম, যা হযরতের বাড়ির কাছাকাছিই ছিলো।

দেওবন্দে যাওয়ার পরপরই মাওলানা মাদানী আমাকে হযরত কাসেন নানুতুভী লিখিত একটি পুস্তিকা দিলেন, পড়ার জন্যে। নামটা সম্ভবত تقریر دل پذیر ছিলো। এ ছাড়া মৌলভী সায়্যিদ তোফায়েল আহমদ বেঙলুরী সাহেবের حکومت خود اختیاری নামে একটি কিতাবও পড়তে দিয়েছিলেন। দেওবন্দে দারুল হাদীসের পরিবেশে ছেয়ে থাকতো অদ্ভুত এক ঐশীধারা ও আধ্যাত্মিকতা! আজো আমার কানে বাড়ি খায় শায়খ মাদানী'র সুমিষ্ট আওয়াজ, তাঁর আরবীয় কণ্ঠ-লহরী! আমি হযরত মাদানীর কাছে কুরআনের কিছু মুশকিল জায়গা বোঝার জন্যে প্রশ্ন করার সুযোগ চাইলাম। দরসের বাইরের সীমাহীন রাজনৈতিক ব্যস্ততার ভিতরেও তিনি আমাকে জুমার দিন এ জন্যে বরাদ্দ দিলেন। সব জুমায় তাঁকে না পেলেও অনেক ইস্তেফাদার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তখন উপলব্ধি করেছি তাঁর কুরআন-সমুদ্রের গভীরতা।

হযরত মাদানী'র দস্তরখান তখনকার সারা হিদুস্তানের সবচে' প্রশস্ত দস্তরখান না হলেও অনেক অনেক দস্তরখানের ভিতরে সেরা ও প্রশস্ত দস্তরখান অবশ্যই ছিলো। সেখানে উপস্থিত হতো দূরের ও কাছের মানুষ। এমনকি পরিচিত-অপরিচিত ও বন্ধু-শত্রু— সবাই।

তাঁর কাছে মেহমান আসার ধারাবাহিকতা লেগেই থাকতো। আসতেন শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামা, আসতেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, হিন্দুস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। এর মধ্যে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে বিহার প্রদেশের আবুল মাহাসিন মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ সাহেবের কথা । তিনি এলে বেশ ক'দিন থাকতেন।

হযরত মাদানী বছরের শেষ দিকে অনেক পড়াতেন। (নিয়মিত ঘণ্টার পর) আসরের পরেও দরস। এশার পরেও দরস, যা রাতের অনেক প্রহর পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো, ফজরের পরেও দরস। সহপাঠীদের মধ্যে মাওলানা মি'রাজুল হক সাহেব যিনি বর্তমানে দারুল উলুমের সাদরুল মুদাররিসীন এবং মাওলানা সিবগাতুল্লাহ সাহেব বখতিয়ারী'র সঙ্গে বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ পরিচয় ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। ইতিহাসের তথ্যকণিকায় সংরক্ষিত থাকার জন্যে জানাতে চাই, তখন দেওবন্দে দু'বেলা খাওয়ার জন্যে দিতে হতো প্রতি মাসে পাঁচ রুপি। ঘটনাক্রমে তখন দেওবন্দে পড়তে এসেছিলেন হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী ছাহেবের ছেলেও। প্রিয় উস্তাযের ছেলে হিসাবে তাঁর সাথেও আমার সুসম্পর্ক ছিলো।

দারুল উলুম দেওবন্দে চার মাস থাকার পর শা'বানের শুরুতে চলে এলাম। আমার হৃদয়ের সকল সত্তা জুড়ে বিরাজমান ছিলেন প্রধানত শায়খ মাদানীই। তিনিই ছিলেন আমার আকর্ষণ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। আমার মনে আছে, ফজরের পর তিনি নিজস্ব আওয়াজে প্রিয় স্বরধ্বনি ফুটিয়ে বলতেন, 'বলুন তো মৌলভী আলী মিয়া! আজ পত্রিকায় কী কী খবর পড়েছেন?' সারাটা দিন তাঁর এ কণ্ঠধ্বনির স্বাদ অনুভব করতাম! সে অনুভবে ভাসতে ভাসতেই সারাটা দিন আমি বিভোর হয়ে বরং আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম!

بہر تسکین دل نے رکھ لی غنیمت جان کر

جو بوقت ناز کچھ جنبش تری ابرو میں تھی

বেশ ক' বছর পর আমি যখন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার শিক্ষক তখন দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত একটি আরবী পত্রিকায় হযরত মাদানীকে নিয়ে একটা লেখা দিয়েছিলাম। শিরোনাম ছিলো— صلتي بمولانا حسين أحمد المدني، أو صفحة من صفحات حياتي (হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী'র সাথে আমার সম্পর্ক অথবা জীবনের পাতা থেকে)। সেখানে আমি আমার অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেছি।[১]

---

১. বর্তমানে লেখাটি کتب وشخصیات গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

দেওবন্দে পৌঁছার পরপর শায়খ মাদানী আমাকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দারুল উলুমের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব শায়খ মাওলানা ইজাজ আলী সাহেবের সাথে। তখন মাওলানার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ মোল্লা আলী ক্বারী রহ.-এর 'শরহে নেকায়া' কেবল বেরিয়েছে। মাওলানা ছাত্রদের একটি বিশেষ জামাতকে বিশেষভাবে উক্ত কিতাবটি পাঠদানের সময় দিয়েছিলেন। স্নেহবশত আমাকেও খুসুসী জামাতে শরিক থাকার অনুমতি দান করলেন। মাওলানার ঐ দরসে বসে আমার সীমাহীন উপকার হয়েছে। মাওলানা সে সময় থেকেই বরাবর আমাকে ভীষণ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন। এ স্নেহ অবশিষ্ট ছিলো একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত। যখন আমার কিতাব 'মুখতারাত' প্রকাশিত হয়ে তাঁর হাতে পৌঁছে, তখন তিনি অত্যন্ত উঁচু শব্দে সংকলকের পরিচয় দান করেছিলেন, যা তার জন্যে সনদ মূল্যায়নপত্রের মর্যাদা রাখে। মাওলানা ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ছাত্রদেরকে ভীষণ ভালোবাসতেন, খুব পরিশ্রম করে পড়াতেন ও সময়ের বড়ো কদর করতেন। সম্মান মর্যাদা স্থিরতায় সম্ভবত তিনিই ছিলেন সালাফ ও আকাবির কাফেলার শেষ নমুনা!

আমার দেওবন্দে থাকাকালিন সময়েই হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী সাহেব রহ. ডাভিল থেকে আগমন করলেন এবং নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ভাইজানের নির্দেশ ছিলো, আমি যেনো অবশ্যই তাঁর সাথে দেখা করে দু'আ নিই এবং ভাইজানের সালাম পৌঁছে দিই। আমি হাজির হয়ে তাঁকে ভাইজানের সালাম বলতেই তিনি চিনতে পারলেন এবং অনেক দু'আ করলেন। দু' তিনবার তাঁর আসরের মজলিসে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে।

দেওবন্দ থেকে আবার লাহোর

১৩৫১ হিজরীর শা'বানের শেষে অথবা রমজানের শুরুতে (সম্ভবত ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে) লাহোরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছে মাদরাসা কাসেমুল উলুমের নিয়মিত ছাত্র হয়ে গেলাম। পুরো কুরআনই পড়ানো হতো। ছাত্ররাও 'ফারেগ' হয়ে আসতো, কেউ শেষ দিকের জামাত থেকে আসতো। দরসের নাম ছিলো— 'উলামা ক্লাস'। শা'বানের শুরুতে শুরু হতো জিলকদ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতো। আমি যখন ভর্তি হলাম, তখন ছাত্র সংখ্যা ছিলো পঞ্চাশের কাছাকাছি। অধিকাংশই এসেছে দারুল

উলুম দেওবন্দ থেকে। এদের মধ্যে দেওবন্দে আমার হাদীসের সহপাঠী মাওলানা সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারীও ছিলেন। এ দরস দু'টি জিনিস চাইছিলো আমাদের কাছে। এক. ভীষণ পরিশ্রম। দুই. ভালো মুখস্থশক্তি। প্রত্যেক রুকুর খোলাসা ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হতো। পরের দরস শুরু হওয়ার আগেই আগের দরসের পরীক্ষা দিতে হতো। যার ভাগে যে রুকু আসতো তাকে সেই রুকুর খোলাসা পেশ করতে হতো, তাও আবার নিজের (বানানো) শব্দে নয়— উস্তাযের বলা নির্দিষ্ট শব্দে ও ব্যাখ্যায়। আমি কখনোই মেধাবী ও ভালো মুখস্থশক্তির অধিকারী ছিলাম না। তাই আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। পাশাপাশি আছে লাহোরের হাড়-ঠাণ্ডা-করা শীত। এদিকে শরীরও আমার দুর্বল। হোস্টেলে খেয়ে অভ্যাস নেই, সব সময় খেয়েছি ঘরে রান্না-করা-খাবার। সত্যি কথা হলো, লাহোরের জীবনটা খুব কষ্টের ভিতরে অনেক সাধনাঘেরা ছিলো। কিন্তু আল্লাহ সাহায্য করেছেন। তাঁর দয়ার চাদরে আমাকে সব সময় ঢেকে রেখেছেন। ১৯৩৩ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে খাজা আবদুল হাই ফারুকী সাহেব দিল্লী থেকে পরীক্ষার খাতা দেখতে এলেন। ভাগ্যের ব্যাপার হলো এই যে, তিনি আমাকে সবচে' বেশি নাম্বার দিলেন! ৭০ অথবা আরেকটু বেশি। সহপাঠিরা ছিলেন বড় ছাত্র—ফারিগীন! তারা বিষয়টা মেনে নিতে পারলো না, তারা প্রতিবাদ করলো, মাওলানা খাজা সাহেবের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনলো! ফলে খোদ মাওলানা নিজেই আবার খাতা দেখার ঘোষণা দিলেন! আবারো ভাগ্য আমাকে সহযোগিতা করলো! তিনি খাতার দেখার পর সবাইকে নাম্বার একটু একটু করে বাড়িয়ে দিলেন! আর আমাকে দিলেন ৯৮ নাম্বার! সবার উপরে সবচে' বেশি! এভাবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো!

তারপর ১৩৫১ হিজরীর জিলকদে মোতাবেক ১৯৩৩ সালের ১২ই মার্চে মাদরাসা কাসেমুল উলুমে, যেখানে আমরা থাকতাম, এক সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সাহেব এর দাওয়াতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন হযরত মাদানী। তিনি আমাদের হাতে হাতে সনদ তুলে দিলেন! সনদের আরবী বিন্যস্ত করেছিলেন হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী! সনদের শেষে অনেক দস্তখত! মুবারক সব হাত এখানে বুলিয়ে দিয়েছে স্বীকৃতির দু'আ-পরশ! হযরত মাদানী! হযরত শিব্বীর আহমদ উসমানী! হযরত লাহোরী!

আবার এলাম লাহোরে

১৯৩৪ সালের সম্ভবত এপ্রিল মাসে আমি আবার ছুটে এলাম লাহোরে, মাওলানার কাছে। এবার এলাম 'সালিক' হিসাবে। মাওলানার সুহবতে থেকে যিকির-আযকার ও আত্মশুদ্ধি-সাধনায় কিছুদিন কাটানোর জন্যে এখানে উপস্থিত হলাম। মাওলানা আমার কাছে এমনটা আশা করছিলেন। এ জন্যে তিনি আমাকে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। আমার ফুফু ও ফুফার (মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ তালহা) বাড়ি খুব দূরে ছিলো না। তাঁদের বাড়ি আমার নিজেরই বাড়ি। ফুফু আমাকে মায়ের মতো আদর করতেন। কিন্তু মাওলানা লাহোরী আমাকে শাহী মসজিদের একটা কামরায় একাকী থাকারই নির্দেশ দিলেন। এমনকি খাবার পৌঁছে দেয়ার কথা জানিয়ে আমাকে বললেন, এ-কামরাতেই খাবেন! পড়াশুনা থেকেও যতোটা সম্ভব নিজেকে মুক্ত রাখবেন! হাজী আবদুল ওয়াহা সাহেবকে শুধু অনুরোধ করলেন আমাকে আরবী এক ঘন্টা পড়িয়ে দিতে, যিনি মাওলানার কাছেই বাই'আত ছিলেন।

আমি লাহোরে প্রায় তিন মাস ছিলাম। সেখান থেকে জুনের শেষ দিকে ফিরে এসে দেখি, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় গরমের ছুটি চলছে। এদিকে দারুল উলুমে আমার শিক্ষকতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৩৪ সালের আগস্ট থেকে আমি শিক্ষক জীবন শুরু করলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতার সূতোয় গেঁথে যাওয়া শিক্ষা ও পাঠদানের সেই দশ বছর

আমি যখন দারুল উলূমের শিক্ষক

১৯৩৪ সালে আমার বিশ বছর পূর্ণ হলো। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষজীবনের সমাপ্তি ঘটলো। এবার শুরু হলো ব্যক্তিগত পাঠ ও মুতালা, যার কোনো সীমা নেই, নেই কোনো চৌহদ্দি। নেই কোনো ধরাবাঁধা সময় ও নিয়ম-কানুন। সত্যি কথা হলো, নিয়মতান্ত্রিক ছাত্রজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাসের কিতাব হলো আগামী দিনের পাঠ গবেষণা ও মুতালা'র বিস্তৃত দিগন্তে প্রবেশের এক সূচনাদ্বার, পূর্ববর্তীদের রেখে-যাওয়া নববী-উত্তরাধিকার অর্জনে গভীর ও নিবিড় চিন্তা-গবেষণায় প্রবেশের একটি প্রস্তুতি। ইলমে নববীর ছায়া-সুনিবিড় উদ্যান থেকে ইলম আহরনের একটি প্রবেশদ্বার। আরো পরিস্কার করে বলি, মাদরাসা থেকে 'ফারিগ' হওয়া উদ্দেশ্য-অর্জন নয়— একটি মাধ্যম। অর্থাৎ ইলম অন্বেষণের সুদূর-বিস্তৃত ভুবনে প্রবেশের যে-দীর্ঘ সফর, তার একটি প্রাথমিক সূচনা। এ জন্যেই আমাদের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গানে দীন মনে করেন, নিয়মতান্ত্রিক পড়ালেখা শেষ করার সময় ছাত্রদের ক্ষেত্রে 'ফারাগাত' শব্দের ব্যবহার একটি ভুল ও অপপ্রয়োগ।

আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন বিশেষত যৌবনে পদার্পণকালে শুধু খাওয়া-পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না এবং সে 'অন্য-নির্ভর' জীবনোপকরণে সন্তুষ্ট হতে চয় না। এ কথা ঠিক যে, আমি ভাইজানের স্নেহশীতল ও পিতৃতুল্য অভিভাবকত্বে এবং আম্মার মমতাভরা পরশে থেকে আমার জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজনগুলো পূরণ করা সাচ্ছন্দেই পূরণ করা সম্ভব ছিলো। তা ছাড়া আমার আম্মার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিলো, নানা'র কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি অনেক জমিজামা। ফতেহপুরেও তাঁর একটা জায়গা ছিলো। কিন্তু তারপরেও দু'তিন বছর ধরে 'বেকার' থাকার কারণে এবং সম্মানজনক ও স্বাধীন কোনো কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় ক্রমেই আমি ভেতরে

ভিতরে একটা চাপ অনুভব করছিলাম। এদিকে মানুষের মুখেও লাগাম পরানো সম্ভব নয়। আমার এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা একটার পর একটা সমালোচনা করেই চলেছে। আসলে এ থেকে কোনো অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত খানদানও বেঁচে থাকতে পারে না বুঝি। আমার কোনো কোনো প্রিয় আত্মীয়ও আমাকে ছাড়েন নি, তাঁদের মুখ থেকে শুনতে হয়েছে খোঁচা ও বিদ্রূপ। এ সব আমাকে আরো বেশি কষ্ট দিতো যে কারণে তা হলো আর তিন অথবা ৪ মাস পরেই আসছে শীত মওসুমে আমার বিবাহ! সব মিলিয়ে ভীষণ প্রয়োজন অনুভব করছিলাম নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এবং সুন্দর একটা কর্মসংস্থানের।

১৯৩১ সালের কথা। আমি তখন শায়খ তাকিউদ্দীন হিলালী সাহেবের সফরসঙ্গী হিসাবে আজমগড়ে। কয়েকদিন ধরেই আছি সেখানকার 'দারুল মুসান্নিফীন'-এ। 'দারুল মুসান্নিফীন'-এর 'ইলমী মা-হাউল' (জ্ঞানচর্চার অনুকুল পরিবেশ) আমাকে এতোটাই মুগ্ধ ও পিপাসাকাতর করে তুললো যে, আমার জিভে পানি এসে গেলো। আমি মনে প্রাণে কামনা করতে লাগলাম, এখানেই যদি আমার বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম! মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে লেখালেখি করবো! কম বেতনেও এখানে থাকতে আমার কোনো আপত্তি নেই (আমার ধারণা অনুযায়ী কম বেতনের সে পরিমাণটা ছিলো তখনকার জীবনযাত্রার চাহিদা ও মান অনুসারে ২০-২৫ রুপি)! আমি আমার এ অনুভূতির কথা জানালাম শায়খ হিলালী সাহেবকে! তিনি আমাকে ভালো করেই জানতেন।

তাঁর কাছে আমার আরবী যোগ্যতা কতোটুকু সেটাও অস্পষ্ট ছিলো না। সম্ভবত শায়খ সায়্যিদ সাহেবকে আমার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। সায়্যিদ সাহেব জবাবে কী বলেছিলেন, তা শায়খ আমাকে তা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, 'তোমার জন্যে দারুল উরলুম নদওয়াতুল উলামাই উপযুক্ত জায়গা!' আমি তাঁর কথা থেকে আঁচ করে নিয়েছিলাম যে, সায়্যিদ সাহেব আমাকে এখানে রাখতে রাজি হন নি, অপারগতা প্রকাশ করেছেন! আর এটা হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক! কেননা, তখনো আমি উল্লেখযোগ্য কিছুই লিখি নি। লেখালেখির ময়দানে কোনো যোগ্যতাই আমার প্রকাশ পায় নি। দারুল মুসান্নিফীন তো এক উচ্চ পর্যায়ের লেখালেখি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিলো। কিন্তু সত্যি কথা হলো, আল্লাহই আমার সে মনোনয়ন ও নিয়োগ চান নি!

দারুল মুসান্নিফীন সেদিন আমাকে 'হ্যাঁ' বললে আমার জীবনের গতি-প্রবাহ একমুখী ধারায়তেই প্রবাহিত হতো। আমার জীবনের তৎপরতা ও কর্ম-বৈচিত্র্য এবং আমার 'ভাঙাচোরা যোগ্যতা' শুধু লেখালেখির নির্দিষ্ট গন্ডিতেই আবদ্ধ হয়ে যেতো।

দারুল মুসান্নিফীন অবস্থানকালেই সায়্যিদ সাহেবের মাথায় দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে একটি আরবী পত্রিকা বের করার চিন্তা আসে। তখন হিন্দুস্তানে আরবী পত্রিকার ময়দান একেবারেই খালি ছিলো। এমন পত্রিকার ব্যাপক চাহিদা ছিলো। পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর এর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হলো সুযোগ্য বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভী'র কাঁধে। মূলত তিনিই ছিলেন এর জন্যে যোগ্য মানুষ। শুধু আমাদের মহলেই নন বরং পুরো হিন্দুস্তানেই। ১৩৫১ হিজরির মুহাররমে মোতাবেক ১৯৩২ সালের মে মাসে الضياء নামে এ পত্রিকার সফর শুরু হয়ে গেলো। আর আমি এ পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক হয়ে গেলাম। পাশাপাশি সহকারী সম্পাদকের ভূমিকাও পালন করতে লাগলাম। এ পত্রিকার সুবাদে আমার আরবী ও লেখালেখির সামান্য যোগ্যতা এবং শায়খ খলীল আরব ও শায়খ হিলালী সাহেবের সান্নিধ্য-পরশের কিছু ছায়া ফুটে উঠতে লাগলো— দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র সুযোগ্য সদস্যবৃন্দ ও রুচিশীল দায়িত্বশীলদের চোখে। কিন্তু পত্রিকায় আমার অংশগ্রহণ ও লেখালেখি ছিলো নির্দিষ্ট বিষয়ে ও নির্দিষ্ট সময়ে। এখানে আমার নিয়মতান্ত্রিক কোনো দায়-দায়িত্ব ছিলো না। তখন الضياء পত্রিকায় প্রকাশিত দু'টি শিরোনাম ছিলো এই— الأدب النبوي ও لسان العصر الشاعر الأكبر أكبر حسين إله بادي। শেষোক্ত বিষয়টি الضياء ছাড়াও আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব সাহেবের পত্রিকা الفتح -এ ছাপা হয়।

এ ধারা হয়তো আরো অনেক দিন চলতো। অবৈতনিক প্রক্রিয়ায় এ পত্রিকার সাথে আমি আরো অনেকদিন জড়িয়ে থাকতাম এবং আল্লাহ অন্যভাবে আমার জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় বের করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটলো এক মজার ঘটনা। তখন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার সাথে আমি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়লাম! আরেকটু খুলে বলি—

১৯৩৪ সালের শুরুর দিকে আল্লামা তাকিউদ্দীন হিলালী সাহেব দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা ছেড়ে ইরাক চলে যান। এতে মাসউদ আলম নদভী বেশ ভেঙে পড়েন। তাঁর আরো কতো কী শেখার ছিলো শায়খের কাছে।

তিনি শায়খের বিরহ মেনে নিতে পারলেন না, সিদ্ধান্ত নিলেন নিজেই ইরাক ছুটে যাবেন বলে। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে ছুটি নেবেন। শায়খের কাছে অবস্থান করে আরো অনেক কিছু শিখবেন। আমি তখন লাহোরে অবস্থান করছিলাম। আগে যেমন বলে এসেছি, হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সাহেবের নির্দেশে লাহোর জামে মসজিদের এক কামরায় ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল সময় কাটাচ্ছিলাম। তখনই হঠাৎ করে বন্ধুবর মাসউদ আলম নদভী'র চিঠি পেলাম। তারিখ লেখা ছিলো চিঠির গায়ে ৭ই মুহাররাম, ১৩৫৩ হিজরি। চিঠির বক্তব্য হলো এই—

'হিলালী সাহেব চলে গেছেন। এখন ইরাকের যোবায়র-এ অবস্থান করছেন। আমার ইচ্ছা, আমি এক বছরের জন্যে সেখানে থেকে আসবো। সায়্যিদ আবদুল আলী সাহেব আমার এ সিদ্ধান্তে রাজি আছেন। মাওলানা মাসউদ আলী নদভী সাহেব প্রথমে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি রাজিই। তবে তাঁর শর্ত হলো, মাওলানা আলী মিয়াঁকে লাহোর থেকে ডেকে পাঠাও, তারপর الضياء তার সোপর্দ করে তুমি যেতে পারো। এদিকে আমি সায়্যিদ সোলাইমান নদভী সাহেবকে চিঠি লিখেছি। জওয়াবে তিনি কী বলেন, এখন সেই অপেক্ষায় আছি। আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁর ইজাযত পেয়ে গেলে আমার সফর তখন হওয়া না-হওয়া নির্ভর করবে শুধু আপনার উপর। সুতরাং সম্পাদনার দায়িত্বটা আপনি নিয়ে নিন! দৌড়-ঝাঁপ করবে অন্য আরেকজন!'

এখনো সেই তাড়াহুড়ার জন্যে আমার ভীষণ আক্ষেপ হয়! এতোটা বে-সবর কেনো হতে গেলাম আমি? কী লজ্জার বিষয়! ইতিহাসের অংশ হিসাবে এবং বাস্তবতা তুলে ধরার জন্যে বলছি, আমি চিঠি পেয়ে মাসুদ আলম নদভীকে (যিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন) লিখলাম— 'আমার অবস্থা এখন এমন নয় যে, আমি বিনা বেতনে কাজ করবো! এ বিষয়টাও সামনে আসলে ভালো হয়!' জবাবে তিনি আমাকে বলে পাঠালেন যে, 'আশ্বস্ত থাকুন! এ খিদমতের বিনিময় অবশ্যই আপনি পেয়ে যাবেন!' আল্লাহর হিকমত ও রহস্য বোঝে কার সাধ্য? উত্তর প্রদেশ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে মাসউদ সাহেব পাসপোর্ট পেলেন না! তবে এ ঘটনা আমাকে الضياء -এর সম্পাদক হতে বাধা দিলেও দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার আরো কাছে নিয়ে গেলো! মাওলানা মাসউদ আলী নদভী —যিনি একদিকে আজমগড়ে দারুল মুসান্নিফীন-এর মহাপরিচালক ছিলেন, অপরদিকে দারুল

উলুম নদওয়াতুল উলামা'র ব্যবস্থাপনা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন— মসজিদ নির্মাণ কাজ দেকভাল করার জন্যে বেশ কিছুদিন ধরে নদওয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি নদওয়ার সবকিছু নিয়েই ভাবতেন, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র ফারেগীন আসাতিযা ও কর্তৃপক্ষের সাথে গভীর মতবিনিময়ও করতেন। তাঁর সচেতন ও জাগ্রত পর্যবেক্ষণ-প্রতিভা, ব্যবস্থাপনায় যোগ্যতার উজ্জ্বল অবদান ও সাক্ষর এবং ধীরে ধীরে অর্জিত অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার তাঁকে ভাবতে বাধ্য করতো এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে। নদওয়ার সুযোগ্য প্রবীনেরা চলে গেলে কে হাল ধরবে সুযোগ্য নবীনেরা না হলে? 'পৃথিবীর সবকিছুই তো ধ্বংসশীল!'-এর কানুন তো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তিনি মনে-প্রাণে চাইছিলেন, প্রবীনদের পাশাপাশি নবীনরা এগিয়ে আসুক। এ নবীন কাফেলায় যাদের উপর তাঁর নজর ছিলো, তাদের মধ্যে আমি অধমও ছিলাম।[১] সুতরাং ১৯৩৪ সালের ১৫ জুলাইতে অনুষ্ঠিত কমিটির এক সভায় তিনি শিক্ষক হিসাবে আমার নাম প্রস্তাব করলেন! ভাইজান (আমার আপন ভাই হওয়ার কারণে) নীরব থাকলেন! কিন্তু সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেব সম্মতি প্রকাশ করলেন! অন্যান্য সদস্যরাও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানালেন! এভাবে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো! বেতন ঠিক হলো ৪০ রুপি![২] ১৯৩৪ সালের ১লা আগস্ট থেকে আমি আদব ও তাফসীরের উস্তায হিসাবে কাজ শুরু করে দিলাম!

চিন্তা ও বুদ্ধির ভারসাম্য

শিক্ষাপদ্ধতি ও সিলেবাস সংস্কার এবং শিক্ষার ধারা ও মানকে উন্নত করা, যুগ-চাহিদার আলোকে ঢেলে সাজানোর যে-আন্দোলন নদওয়াতুল উলামা শুরু করেছে, তা কোনো সীমাবদ্ধ, আঞ্চলিক ও সাময়িক আন্দোলন ছিলো না। বরং এ ছিলো চিন্তা-দর্শনভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা, বিশুদ্ধ আক্বিদা, সঠিক শিক্ষাদর্শন, সঠিক ও অবিকৃত ইতিহাসের নির্দিষ্ট ধারণা দান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-সাহিত্যের সঙ্গতিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড যার অন্যতম অঙ্গীকার।

---

১. এ ছাড়া আরো যাদের উপর তাঁর নজর ছিলো, তারা হলেন, মাওলানা হাফেজ ইমরান খান নদভী, মাওলানা আবদুস সালাম কুদওয়াঈ নদভী, মাওলানা নাজেম নদভী, মৌলভী হাবীব আহমদ নদভীসহ আরো অনেকে।

২. তখন মধ্যম সারির শিক্ষকদের বেতন এ পরিমাণই ছিলো। সবচে' বেশি বেতন ছিলো মুহতামিম সাহেবের, ১৫০ রুপি।

১৯৭৫ সালে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় পঁচাশিসালা যে শিক্ষা সম্মেলনটি হয়েছিলো, সেখানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিরা। আরব জাহানের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ। সংখ্যায় তাঁরা এতো বেশি ছিলেন যে, এ উপমহাদেশে এর আগে এমন সম্মেলন আর কখনো হয় নি। সে ছিলো এক ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় সম্মেলন। সে সম্মেলনে যে প্রয়োজনটি সবার আগে সামনে উঠে এসেছিলো তা হলো, সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত মেহমানদের উদ্দেশে নদওয়াতুল উলামার আদর্শ ও শিক্ষাদর্শনকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। আগামী প্রজন্মের সামনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, যাতে কোনো রকমের সংশয়-সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

এ জন্যেই আমি নদওয়াতুল উলামার প্রথম পুরুষ (অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. ও তাঁর আলোকিত চিন্তার অধিকারী সহ-যোদ্ধাদের (সহকর্মীবৃন্দ), নদওয়াতুল উলামার অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের লেখা ও বক্তৃতা, তাঁদের মতাদর্শ, তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আবেগ, অনুভূতি—এ-সবকিছু সামনে রেখে আমি আমার শব্দে নদওয়াতুল উলামার এ আন্দোলনের চিন্তা-দর্শনের ভিত্তিকে, এর বিশ্বাস ও চিন্তার চারটি মূলনীতিকে এবং এর মৌলিক সীমারেখাকে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। উল্লেখ্য যে, নদওয়াতুল উলামার এ পরিচিতিমূলক বক্তব্য মূল প্রবেশদ্বারে খোদাই করে লিখে দেয়া হয়েছে, যা এখনো অবশিষ্ট আছে। যেহেতু প্রিয় পাঠককেও লেখকের সাথে অন্তত আরো কয়েক বছর দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার এ ঐতিহাসিক দীর্ঘ সফরের বিভিন্ন আলোচনায় সঙ্গে থাকতে হবে, এ জন্যে এখানেই তাঁদেরকে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে ধারণা লাভ করাটা জরুরী। তাই নিচে আমি তা হুবহু পেশ করলাম :

'দীন ও আকিদার ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামা'র ভিত্তি হলো— খালিস দীন, যা সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে অনেক দূরে। বাতিলপন্থীদের বর্ণচুরি থেকে সুরক্ষিত, অজ্ঞদের অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যাখ্যা থেকে পরিচ্ছন্ন। এ-দীন অর্জনে ও অনুধাবনে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামা সব সময় দীনের প্রথম যুগের স্বচ্ছ ঝরনাধারামুখী, তার মূল ও বিশুদ্ধ উৎস সন্ধানী।

আর আমল ও আখলাকের ক্ষেত্রে এর নমুনা ও আদর্শ হলো দীনের মৌলিকত্বকে আকড়ে ধরা, তার বিধি-বিধানের উপর আমল করা, দীনের হাকীকত ও রুহ দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করা এবং স্বচ্ছ ও আলোকিত রাব্বানিয়াত দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া।

আর ইতিহাসের ব্যাপারে নদওয়াতুল উলামার অবস্থান হলো এই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো সেই যুগ, যে যুগে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হলো সেই প্রজন্ম, যাঁরা নবুওতের ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, শিক্ষা লাভ করেছে কুরআন ও ঈমানের সর্ব প্রথম মাদরাসায়। সৌভাগ্য ও সফলতা শুধু সেই আলোকিত প্রজন্মের দিকে ফিরে যাওয়া এবং তাঁদের আদর্শকে আকড়ে ধরার মধ্যেই।

আর নদওয়াতুল উলামার জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা-দর্শন হলো, ইলম একটাই, নেই কোনো বিভাজন। যেমন– প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-নির্ভর। ইলম যদি বিভাজিত হয়ই, তাহলে বিভাজিত হবে এ হিসাবে যে, একটি সঠিক, আরেকটি ভুল। একটি উপকারী আরেকটি ক্ষতিকর। একটি মূল, আরেকটি শাখা। একটি মাধ্যম, আরেকটি উদ্দেশ্য। আর ইলম গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে নদওয়াতুল উলামার অবস্থান হলো হাদীসে নববীর আলোকে এই—

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

'জ্ঞানের কথা হলো মুসলমানের হারানো সম্পদ, যেখানেই সে তা পাবে লুফে নেবে।'

অনুরূপভাবে প্রাচীনকালের এ-প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি—

خذ ما صفا دع ما كدر

'যা কিছু স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তাই কেবল গ্রহণ করো আর যা অপরিচ্ছন্ন ও আবিলতাঘেরা, তা প্রত্যাখ্যান করো।'

আর ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নদওয়াতুল উলামার অবস্থান হলো এই আয়াত :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

'তাদের মোকাবেলায় তোমরা প্রস্তুতি নাও, সব ধরনের প্রস্তুতি।'

আর ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে, ইসলামের সৌন্দর্য ও নৈতিকতাকে সবার সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে, যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে মানুষের কাছে ইসলামের ন্যায় ও সততাকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এর নীতি হলো এই প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি—

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

'মানুষের সাথে কথা বলো তার মান মর্যাদা অবস্থান ও যোগ্যতা বিবেচনা করে, তোমরা কি চাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মিথ্যা প্রতিপন্ন হোন!'

আর আকিদা ও মূলনীতিতে আহ্লে সুন্নাত-এর অনুসরণ করা, সালফে সালেহীনের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা। শাখা-বিষয়ে এবং ফিকহি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে এর নীতি হলো এই যে, যতোটুকু সম্ভব তা থেকে বেঁচে থাকা। এমন সব কর্মধারা এড়িয়ে চলা, যা উম্মতকে একতাবদ্ধ করার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, ইসলামের সমাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। মোটকথা, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা হলো হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী রহ.-এর ফিকরি মাদরাসার একটি নিকটতম আদর্শ প্রতিকৃতি। সুতরাং নদওয়াতুল উলামা হলো একটি ব্যাপকভিত্তিক আদর্শ চিন্তা-দর্শন লালনকারী মাদরাসা, যা শুধু কিতাব, ইলম ও ভাষা পঠন-পাঠনের উপর নির্ভরশীল নয়— এক প্রজন্মের কাছ থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে, এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীর কাছে।

মুসলমানদের অবদানে হিন্দুস্তানের বুকে যে ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে, তা এক বর্ণিল সভ্যতা। এ সভ্যতা রূপময় ও নান্দনিক। বিনয়ঘেরা ও সাদাসিধে, সহজ ও সুদৃঢ়, গভীর ও প্রশস্ত। রেশম-কোমল নরম আবার পর্বত-অবিচলতায় শক্ত। একদিকে অনড় নিরাপস অপরদিকে চির দয়াময়—আকাশ-উদার। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি নানা মাত্রিক এক সমষ্টি। এর ভিতরে আছে হিকমত-ফালসাফা-শরিয়ত (প্রজ্ঞা-দর্শন-ধর্ম), আরো আছে শিল্প-সাহিত্য— গদ্য ও পদ্যে, আছে ফিকাহ্ ও তাসাওউফ, আছে সুরুচি ও সুক্ষানুভূতি। এ সভ্যতার বিস্তৃত ভুবনে আছে দুর্ভেদ্য সব কেল্লা যেমন, তেমনি আছে কিতাবে-কিতাবে 'সয়লাব' গ্রন্থাগার। এ সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ যেমন অযুত-নিযুত মাদ্রাসা, তেমনি খানক্বাহ ও গবেষণাকেন্দ্রও এর অংশ। কবিতা ও সাহিত্যের সুন্দর চর্চায় আয়োজিত অনুষ্ঠানও এর গর্ব। এ সভ্যতা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, উদ্যম ও সাধনায় ভাস্বর। কখনো নির্দোষ চটুলতায় প্রাণময়, বাঙ্ময়। এ সভ্যতা সহজ-কঠিনের এক ভারসাম্যপূর্ণ মিশেল। এখানে প্রয়োজনে ঝলসে ওঠে দৃঢ়তা, নম্রতাও এর পুষ্পমাল্য। এ সভ্যতার বিকাশে ব্যবহৃত হয় কতো ভাষা ছলছল প্রবাহে প্রবহমান– আরবী, ফারসী, উর্দূ, হিন্দী।

আমার বুদ্ধিবৃত্তিক মানস গঠনে প্রধানত অবদান ছিলো আমার বাবাও মা'র। তারপর আমার পারিবারিক পরিবেশ ও তার রীতিনীতি, সাহিত্য ও লেখালেখির চর্চা ও রুচি, যা পরপর তিনপুরুষ ধরে চলে আসছিলো। তারপর মানসিক উদারতা ও ব্যাপ্তি। দীনের পক্ষে লড়াই ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের সহজাত চেতনা ও স্পৃহা, আর তা ইমাম আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ রহ.-এর পরিবারের সাথে রক্তের সম্পর্ক থাকার কারণেই। সর্বোপরি, আমার বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-মানস গড়ে উঠেছে আমার প্রিয় বড় ভাই হাকীম মাওলানা ডা. আবদুল আলী সাহেবের সান্নিধ্যে ও দিক-দর্শনে। আমার ভাই ছিলেন প্রাচীনধারা ও আধুনিকধারা— উভয় শিক্ষার সার্থক সমন্বয়ক। খুব ভালো করেই তিনি এ-দু' বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। সত্যি তিনি ছিলেন উভয় শিক্ষার এক মিলনস্থল। তাঁর ব্যাপারে বলতেই পারি আমি এ আয়াত—

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠)

'তিনি পাশাপাশি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।'

তখন ঐ বয়সে স্বাভাবিকভাবেই আমি ছিলাম স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। আমার ছিলো না উল্লেখ করার মতো কোনো অবস্থা। তবুও নদওয়াতুল উলামার সাথে আমার মিল ও পরিচয় গড়ে উঠেছিলো, সব দিক দিয়েই, চিন্তার দিক দিয়ে, ধর্মীয় দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে, যার সফল প্রতিনিধিত্বের পতাকা ধরে ছিলো নদওয়া শক্ত হাতে। এ জন্যেই নদওয়াতুল উলামার সাথে মিশে যেতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি, সমস্যা হয় নি। নিজেকে মানিয়ে নেয়ার বা প্রস্তুত করার দীর্ঘ কেনো পথও মাড়াতে হয় নি। বরং আমার কাছে মনে হয়েছে, আমি যেনো ঘরের এক কামরা থেকে আরেক কামরায় কিংবা এক কোণ থেকে আরেক কোণে স্থানান্তরিত হয়েছি মাত্র। এর অনেক কারণের ভিতরে এটাও একটি কারণ যে, ছোট্ট বেলা থেকেই আমি নদওয়াতুল উলামার পরিবেশ দেখে আসছিলাম। এখান থেকে বের হওয়া বা ফারেগ হওয়া ব্যক্তিদের সাথে সঘনিষ্ঠ চলাফেরা করছিলাম। তাঁদের ছায়ায় থেকে থেকে বেড়ে উঠছিলাম। বোঝার বয়স থেকেই শুনে আসছিলাম নদওয়াতুল উলামার কথা, এর ইতিহাসকেন্দ্রিক বিবিন্ন কথা ও বর্ণনা। এর প্রতিষ্ঠাতাদের দৌড়ঝাঁপ ও ত্যাগ-সাধনার কথা, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার কথা। আমার অভিভাবক ছিলেন আমার বড় ভাই এবং প্রিয় উস্তায শায়খ খলীল আরব। আরেক অবিভাবক ছিলেন আমার ফুপা সায়্যিদ

মুহাম্মদ তালহা আল-হাসানী, যার অনেক অবদান রয়েছে আমার চিন্তা-মানস গঠনে। এরা সবাই ছিলেন নদওয়ার কৃতি সন্তান। নদওয়ার বাগানের ফুল আহরণকারী।

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র সাথে আমার চিন্তা ও জ্ঞানের এ সামঞ্জস্য এবং পাশাপাশি এর সাথে আমার পুরোনো সম্পর্কের বাইরে এখন এখানে আমার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া ছিলো আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। কেননা, এখানে যেভাবে আমি স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ পাবো এবং আমার টোটা-ফাটা যোগ্যতাকে ব্যবহার করতে পারবো, ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবো, তা অন্য কোনো মাদরাসায় সম্ভব হতো না। এখানে ছিলো আমার জন্যে সার্বিক আনুকূল্য। ভাইজান ছিলেন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র মহাপরিচালক। আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী আমার আব্বার ছাত্র হিসাবে এবং ভাইজানের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও চিন্তা-চেতনায় মিল থাকার কারণে আমাদের খান্দানেরই এক সদস্যের মতো। তিনি নদওয়ার নাজেমে তা'লিমাত (শিক্ষাসচিব)। আর আমার প্রিয় উস্তায হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান ছিলেন মুহতামিম এবং শাইকুল হাদীস। আমার সহপাঠী ও বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান কান নদভী ছিলেন নায়েবে মুহতামিম এবং দফতর পরিচালক। শিক্ষকদের মধ্যে আরো ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভী, মাওলানা নাজেম নদভী, শায়খ মুহাম্মদ আল আরাবী, শায়ক আবদুস সালাম কিদওয়াঈ নদভী, আবুল লাইস ইসলাহী নদভী, মাওলানা উয়াইস নেজরামী নদভী। সুতরাং দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা নতুন হলেও পুরোনো। এখানে শিক্ষকতায়, ছাত্রদের সাথে সম্পর্কে, শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সিলেবাস সংক্রান্ত কোনো বিষয়েও অধমের মত প্রকাশে ও পরামর্শ দানে কোনো ধরনের সমস্রায় পড়তে হয় নি।

শিক্ষকতার সূচনা, ছাত্রদের মুখোমখি

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষক হিসাবে আমার সফর শুরু হয়ে গেলো। প্রথমেই আমাকে পড়াতে দেয়া হলো মাঝের ও উপরের দিকের কিছু কিতাব। এর অধিকাংশই পড়িয়েছেন হযরত মাওলানা আবদুর রহমান কাশগরি নদভী, যিনি দারুল উলুমের এক কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও কবি। এখন যতোটুকু মনে পড়ছে, প্রথম বছর ষষ্ঠ বর্ষে (বর্তমানে আলিয়া সালেসা শরিয়াহ) পেয়েছিলাম কুরআন তরজমা,

তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খন্ড, মুহাম্মদ খিদরি বেক সাহেবের تاريخ الأمم الإسلامية -এর প্রথম অংশ, দিওয়ানে হামাসা'র বাবুল আদব, মিশরের القراءة الرشيدة অথবা কামেল কিলানী'র حكايات الأطفال -এর কোনো অংশ। শেষোক্ত দু'টি কিতাবই তখন পড়ানো হতো।

দারুল উলুম-এর মূল ভবনের পশ্চিম-দক্ষিণের একটা কামরায় আমার থাকার জায়গা ঠিক করা হলো। এখানে এর আগে থেকে গেছেন দারুল উলুমের নামকরা মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব বান্দুলী, যিনি আল্লামা আবদুল হাই লখনোভী ফিরিঙ্গিমহল্লী রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। এ কামরায় এখন আমার সাথে থাকেন আমার সুহৃদ বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভীও। সুতরাং এ কারণে এ কামরাটি একদিকে আমাদের বাসস্থান অন্যদিকে আমাদের পত্রিকার কার্যালয়। আমাদের মাঝে ছিলো পুরোনো সম্পর্ক, সুদৃঢ় বন্ধুত্ব, একসঙ্গেই আমাদের থাকা-খাওয়া, চলাফেরা ও ভাব-বিনিময়। আমরা যেনো দুই ভাই কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধু অথবা সহমর্মী দুই আলাপসঙ্গী।

ষষ্ঠ বর্ষে অনেক মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলো। অনেকেই ছিলো আমার চেয়ে বয়সে বড় অথবা প্রায় সমান সমান। আগেই যেমনটা উল্লেখ করেছি, এরা এর আগে আল্লামা আবদুর রহমান কাশগরী নদভী সাহেবের কাছে প্রথম ১০ পারা তরজমা ও তাফসির পড়ছিলো। এ অংশে আয়াতুল আহকাম বেশি, ফিকহি বিধান বেশি। তাই নিজেকে যোগ্য প্রমাণের জন্যে আমাকে প্রচুর মুতালা করতে হতো। সীমাহীন পরিশ্রম করতে হতো। বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলম নদভী আমার পাঠদান সম্পর্কে ছাত্রদের অনুভূতি জানতে চেয়েছেন ওদের কাছে। তিনি এ কাজটি করেছেন আমাকে ভালোবাসেন বলেই। আমি যেনো একজন ব্যর্থ শিক্ষকে পরিণত না হই—তা তিনি মনে-প্রাণে চাইছিলেন। ছাত্ররা ব্যাপকভাবে আমার প্রশংসা করেছে। ওদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে। কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিতে এ আবেদনও পেশ করেছে যে, উস্তায যদি মুতালা'র গন্ডি আরেকটু বাড়ান এবং একাধিক তাফসির দেখে আসেন তাহলে ভালো হয়। বন্ধুবর মাসউদ আমাকে অকপটে ছাত্রদের এ অনুভূতির কথা এবং ওদের চাহিদার কথা জানিয়েছেন। আমি ভীষণ কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। মাকতাবা থেকে তাফসিরের বড় বড় কিতাব সংগ্রহ করলাম, গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও বরাত গ্রন্থও নিয়ে এলাম, বসে গেলাম গভীর মুতালায়।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পড়লাম 'কাশশাফ', 'মা'আলিমুত তানযিল' ও 'আল-মাদারিক'। এ ছাড়া 'তাফসিরুল মানার' ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'তারজুমানুল কুরআন' থেকেও সীমাহীন ইস্তিফাদা হাসিল করলাম। তাফসির সম্পর্কে ছাত্রদের নানা জিজ্ঞাসার জওয়াব দেওয়ার জন্যে দেখলাম আল্লামা আলূসী'র 'রুহুল মা'আনী'। এদিকে সমকালিন বিভিন্ন বিষয়ে নানা কিছু জানতে চেয়ে পত্র-যোগাযোগ শুরু করলাম হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.-এর সাথে। মাওলানা তখন ইংরেজিতে 'তাফসিরে মাজেদী' লেখার কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানার ক্ষেত্রেও তাঁর সহযোগিতা নিতে দরিয়াদ হাজির হলাম একাধিকবার তাঁর সান্নিধ্যে। সেখানে ছিলো নতুন-পুরান কিতাবের এক মহা সমষ্টি। অনেক ইস্তিফাদা হলো। এরপর নিবিষ্টচিত্তে পাঠদানপূর্ব মুতালায় লেগে গেলাম। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিয়ে ছাত্রদেরকে পড়াতে লাগলাম। আল-হামদুলিল্লাহ, বছর শেষ হওয়ার আগেই আমি ছাত্রদের মাঝে পূর্ণ 'আস্থা' ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলাম।

দারুল উলুমের সাধারণ পরিবেশ

দারুল উলুম নদওয়াতুর উলামায় তখন আল্লামা ড. তাকিউদ্দীন হিলালী সাহেব অবস্থান করছিলেন। তাঁর অবস্থানের বরকতে, الضياء পত্রিকা প্রকাশ পাওয়ার কারণে এবং তরুণ শিক্ষকদের কারণে, যারা ছাত্রদেরকে স্নেহ করতেন, সরাসরি তাদেরকে তত্ত্বাবধান করতেন। ছাত্রদের মাঝে ছিলো তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এক কথায়, তাঁরা ছিলেন ছাত্রদের মনস্পর্শকারী হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষক। সব মিলিয়ে দারুল উলুমের পড়াশুনার পরিবেশ ছিলো চমৎকার। সবকিছু ছাপিয়ে যে-বিষয়টি পড়াশুনা চর্চা ও মুতালায় বেশি স্থান পেতো, তা হলো আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী লেখালেখি ও রচনা, আরবী বক্তৃতা, উর্দূ সাহিত্য চর্চা ও ইতিহাস। এ-সব বিষয়ের প্রতিই ছিলো ছাত্রদের ঝোঁক। এদিকে الضياء -এর বিনিময়ে আরব দেশ থেকে আমাদের এখানে আসতো অনেক পত্রিকা, মিশর থেকে আসতো 'আল-মানার' ও 'আল-ফাত্হ', সিরিয়া থেকে আসতো 'আল-ইরফান'। লেবানন থেকে আসতো 'আস সফা'। এ ছাড়া শায়খ আহমদ হাসান আয-যাইয়্যাত-এর 'আর রিসালাহ' ও ড. আহমদ আমীনের 'আস সাক্বাফাহ'ও আসতো। শেষোক্ত পত্রিকা দু'টিতে মিশরের বড় বড় লেখক-সাহিত্যিকগণ লেখা দিতেন।

হিন্দুস্তানের বুকে একমাত্র আরবী পত্রিকা হওয়ার কারণে الضياء পত্রিকা অফিসে আরব দেশের একাধিক বড় লেখকের কিতাব আসতো 'গ্রন্থ সমালোচনা'র জন্যে। এভাবে তখন আমাদের ছোট্ট কামরাটি ও সীমাবদ্ধ জায়গাটি হয়ে উঠেছিলো 'হিন্দুস্তানের সমুদ্রের এক আরব-বদ্বীপ'। আরব দেশের পত্র-পত্রিকা ও বড় বড় লেখকদের পাঠানো কিতাব পড়ে পড়ে এবং দারুল উলম নদওয়াতুল উলামার অনুকূল পরিবেশের কারণে আমরা পরিচিত হতে পেরেছিলাম আরব জাহানের খ্যাতিমান লেখক-সাহিত্যিক ও শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সাথে। শিল্পমণ্ডিত ভঙ্গি ও ধারার লেখকদের সাথে। তাঁদের লেখা ও চিন্তার সাথে আমি এমনভাবে পরিচিত হয়ে উঠলাম যে, মনে হতো এরা আমাদের এই হিন্দুস্তানেরই কবি-সাহিত্যিক-গবেষক-সাহিত্যসমালোচক ও ইসলামী চিন্তাবিদ কিংবা আরো বেশি কাছের, আরো বেশি পরিচিত। আমরা তাঁদের পাঠানো কিতাবাদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে الضياء -য় আমাদের সমালোচনা ও মন্তব্য ছাপতাম। এমনকি তাঁদের লেখার ভালোমন্দ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতাম। লেখার ভিতরে অনেকের চিন্তাগত ও ধর্মীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতেও ছাড়তাম না। আমরা আমাদের মন্তব্য-সমালোচনায় তাঁদের একটা স্তর-বিন্যাসেরও চেষ্টা করতাম। এখানে বসে এই-যে আমি আরব দেশের লেখক-সাহিত্যিকদের কিতাবে-গবেষণায় ডুবে ছিলাম অনেক দিন ধরে, এর আসল ফায়দাটা প্রকাশ পেলো তখন, যখন আমি ১৯৫১ সালে মিশর সফর করি। সেখানে যাওয়ার পর কাউকেই আমার এমন নতুন মনে হয় নি, যাঁকে দেখে—যাঁর কথা শুনে আমাকে 'যাদুমুগ্ধ' কিংবা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়েছিলো, অথবা তাঁর ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য-দ্যুতিতে আমাকে হকচকিয়ে যেতে হয়েছিলো। কোনো কিছুই আমার কাছে সেখানে নতুন করে আবিস্কৃত হয় নি। বাইরের দুনিয়ায় বিশেষত সে সব দেশে, যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং উন্নয়ন ও শিক্ষার উৎকর্ষ চমকে দেবার মতো সেখানে সফরের আগে, সেখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা এবং সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা দীনের এক দাঈ ও আলেমের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী।

সে সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র ছাত্রসংঘ 'জামইয়্যাতুল ইসলাহ' একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত ছিলো 'ইসলামী বিশ্বে সবচে' বড় ব্যক্তিত্ব কে?' তরুণরা আলোচনায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায়

অংশ নিয়ে এমন জোরালো প্রাণময় ও ভাবগম্ভীরতা-পুষ্ট অনড় বক্তব্য দিয়েছে যে, মনে হচ্ছিলো এক্ষুণি পৃথিবীর সেরা ব্যক্তিত্ব তারা নির্বাচন করে ফেলবে! তার মাথায় পরিয়ে দেবে মহান খেলাফতের সর্বোচ্চ মুকুট। এ আলোচনা অনুষ্ঠান আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো সিরিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহমুদ খাইরুদ্দীনের উপস্থিতির কারণে! তিনি ক'দিন আগেই এসেছেন নদওয়াতুল উলামায়! বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলম নদভী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি —লেখক— ঝুঁকে পড়লেন কথাসাহিত্যিক আমীর শাকিব আরসালান-এর দিকে! অধিকাংশ উপস্থিতিও তাই! তারা মিশরের এ কথা শিল্পীর পক্ষেই ভোট দিলেন! আমরা তখন লেখকের তাজা তাজা মন্তব্য পড়ছিলাম আমেরিকান লেখক Stoddard রচিত حاضر العالم الإسلامي (সমুসলিম জাহানের বর্তমান) কিতাবে। এ ছাড়া 'আ-ফাত্হ' পত্রিকায় পড়ছিলাম তাঁর ইসলামী প্রবন্ধমালা, যা ভরপুর ছিলো ভাব ও শিল্প-প্রাচুর্যে এবং ঈমানী চেতনায়।

আমাদের এ অনুষ্ঠানের আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছিলো হিন্দুস্তানের গন্ডি পেরিয়ে সুদূর মিশরেও, যখন মুহাম্মদ তাহের সাহেব শায়খ রশিদ রেজা'র ইচ্ছায় অনুষ্ঠানের খোলাসা আরবীতে প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং এ সুবাদে আমীর শাকিব আরসালান সাহেব পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে গেলো। তিনি ভীষণ আপ্লুত হয়েছিলেন। নিজের এ আবেগের কথা জানিয়ে মাওলানা মাসউদ আলম নদভীকে এক কৃতজ্ঞতা-বার্তাও তিনি পাঠিয়েছেন। সে চিঠিতে তিনি এও উল্লেখ করে দিয়েছিলেন যে, আপনারা আমাকে যে সম্মান আজ দিলেন, তা আমি মাথায় পেতে নিলেও এর প্রকৃত অধিকারী আমি নই, বরং এর এর প্রকৃত অধিকারী হলেন মহান মুজাহিদ গাজী আবদুল করীম রিফী, যিনি নিজের যোগ্যতা প্রতিভা অভিজ্ঞতা ও রণ-নৈপুণ্যে স্পেন ও ফ্রান্সকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন।

আমীর আমাদের এ অনুষ্ঠানের কথা السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে সে সময়ে আমাদের মানসিকতা ও রুচি এবং পাঠ-গবেষণা ও চিন্তাধারা কেমন ছিলো।

বিবাহ

১৯৩৪ সালে আমার বিবাহ সম্পন্ন হলো আমার মামা সায়্যিদ আহমদ সাঈদ হাসানী'র মেয়ে, সায়্যিদ জিয়াউন্নবী হাসানী রহ.-এর পৌত্রী এবং

সায়্যিদ আবদুর রাজেক কালামী'র মেয়ের মেয়ের সাথে। সায়্যিদ আবদুর রাজেক কালামী একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। صمصام الإسلام (ইসলামের ধারালো তলোয়ার) তাঁর লেখা একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এটি মূলত ইমাম আল-ওয়াকিদী'র সাড়া জাগানো কিতাব: فتوح الشام (সিরিয়া বিজয়ধারা)-এর চমৎকার কাব্যানুবাদ। বিবাহের খুতবা পড়েছিলেন শাইখুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান। আর ভাইজান আমার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় এবং বাবা বেঁচে নেই এই অনুভূতিতে আয়োজন করেছিলেন এক বিশালায়োজন এক ওলিমা অনুষ্ঠানের।

আরবী পাঠদানে এক নতুন অভিজ্ঞতা

আরবী ভাষার সুন্দর অনুকূল পরিবেশ, শায়খ হিলালীর শিক্ষাদানের নির্বাচিত পন্থা, যিনি কোনো ভাষা শিক্ষাদানকালে এর জন্যে আরেক ভাষার সহযোগিতা নেয়াকে একটি মৌলিক ভুল মনে করতেন এবং শায়খ মুহাম্মদ আল-আরাবী'র দিন-রাতের সান্নিধ্যের কারণে আমাদের মনে সরাসরি পদ্ধতিতে (Direct Method) আরবী ভাষা শেখানোর চিন্তা। প্রথম বর্ষের একদল ছাত্রকে আমার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলো, ভাইজানের অনুমতিক্রমে ও উৎসাহে। আর কিছু ছাত্রকে ন্যস্ত করা হলো অন্য উস্তাযগণের দায়িত্বে, প্রাচীন পদ্ধতিতে ওদেরকে পড়ানোর জন্যে। আবার কিছু ছাত্রকে পাঠানো হলো মাওলানা আবুল লাইস সাহেবের কাছে, আল্লামা হামিদুদ্দীন সাহেবের শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্যে। তারপর বছরের শেষে ভাইজান নিজেই তিন দলেরই পরীক্ষা নিলেন। এতে আমার জামাত শীর্ষস্থান অধিকার করলো। আমার আবিস্কৃত পন্থায় ছাত্ররা অনেক উপকৃত হলো। আমরা শিক্ষকরা এ পদ্ধতি থেকে আরো বেশি উপকৃত হয়েছি। আরবী ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলার ও বোঝানোর বেশ ভালো একটা চর্চা ও প্রশিক্ষণ হয়ে গেলো, যা পরবর্তীতে দাওয়াতের ময়দানে আমার সামান্য যে খেদমত আল্লাহ্ কবুল করেছেন, তার একটা ভিত্তি হয়েছিলো।

স্বভাবগত কারণে .. কিছুটা দারুল উলুমের অনুকুল পরিবেশের কারণে আমি ক্লাসের ছাত্রদের সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। এ ঘনিষ্ঠতা ও গভীর সম্পর্কের কারণে —যা ইফাদা ও ইস্তিফাদার (উপকৃত করা ও হওয়া'র) পূর্বশর্ত— ছাত্রদেরকে এ-ইলম (আরবী ভাষা) একেবারে গুলিয়ে পান করিয়ে দেওয়ার যজবা ও চেতনা আমার ভিতরে কাজ করছিলো, যা আমি

উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলাম আমার প্রিয় উস্তায মায়খ খলীল আরবের কাছ থেকে। নেই ধরা-বাধা কোনো নিয়ম, নেই সময়ের সীমাবদ্ধ শৃঙ্খলা-বন্ধনি, নেই মাদরাসার সময়ানুবর্তিতার বাধ্য-বাধকতা। সারাক্ষণ কেবলই এক চিন্তা .. এক ধ্যান .. এক সাধনা—

আমাকে শিখতেই হবে!

আমাকে বুঝতেই হবে!!

আমাকে জানতেই হবে!!

আমাকে পারতেই হবে!!

নতুন নতুন পন্থা আবিস্কার করে ছাত্রদেরকে অনুশীলনীর ভিতরে ব্যস্ত রাখার কাজে আমরা ব্যস্ত থাকতাম, বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম। এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন শায়খ হিলালীর ছোট ভাই শায়খ মুহাম্মদ আর-আরাবী।

অন্যান্য বিষয়ের কিতাব ও ঘন্টা

আলহামদুলিল্লাহ, আরবী ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয় যেমন হাদীস, মানতেক ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েও আল্লাহ আমাকে সাহায্য করলেন। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেব তিরমিযী'র ছাত্রদের কাছে অনুভূতি ও মতামত জানতে চাইতেন প্রায়ই, ওদের কেমন লাগছে—আমি কেমন পড়াচ্ছি। একবার তিনি ওদের মতামত ও অনুভূতি জেনে আমাকে ডেকে নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন, নিজের সন্তির কথা জানালেন। এক ক্লাসে মানতেকের দরসও আমাকে পড়াতে হতো। মানতেকের নতুন পুরোনো বিভিন্ন পরিভাষার মেসাল বা দৃষ্টান্ত দিতাম আমি পরিচিত ও দৈনন্দিন জীবনে দেখা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে। এতে পাঠোদ্ধার বেশ সহজ হতো। মানতেকের উপর লেখা বিভিন্ন নতুন কিতাব থেকেও আমি সহযোগিতা নিয়েছি।

সম্ভবত পরের বছরেই আমাকে দেয়া হলো আরবী সাহিত্যের ইতিহাস। এ বিষয়ে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো শায়খ আহমদ হাসান আয যাইয়্যাতের মশহুর কিতাব تاريخ الأدب العربي। এ-বিষয়টি পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো। কেননা এটি ছিলো আমার একটি পছন্দের বিষয়। আমি বেশ ক-বছর কিতাবটি আমি পড়িয়েছি। শিক্ষকতার শেষ দিকে বুখারী শরীফের কিতাবুল ওহী, কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল ইলম পড়ানোর সুযোগ হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, বড়ো ভালো লেগেছে। মনে চাচ্ছিলো, সময় বের করে ভালো করে মুতালা দেখে খুব ভালো করে পূর্ণ বুখারী পড়াবো। কিছুদিন পর সুযোগ পেলাম, পূর্ণ বুখারী পড়ালাম! অবশ্য ক্রমবর্ধমান সফরের কারণে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে আসার কারণে তা বিঘ্নিত হয়েছে। বুখারী শরীফের ছোট ছোট অক্ষরে লেখা হাশিয়া ও অনুরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতালা করার সময় বুঝতে পেরেছিলাম। এ-সব কারণে শেষ পর্যন্ত আমি বুখারী পড়ানোর পুণ্য ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারি নি বলে ভীষণ আফসোস হয়। এক বছর হাকীমুল ইসলাম শায়খ আহমদ ইবনে আবদুর রহীম ওরফে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. রচিত حجة الله البالغة পড়ানোরও সৌভাগ্য হয়েছিলো।

দারুল উলুম-এর পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টাদের সাথে পরিচিতি

আফসোসের বিষয় হলো, তখন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় দাওয়াতি মেজাজ অনুপস্থিত ছিলো। তার মূল কারণটা ছিলো এই যে, আমরা শিক্ষকরাই দাওয়াতি মেজাজের ছিলাম না। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকদের প্রভাব ছাত্রদের উপর পড়বেই, পড়েছিলোও। আমাদের দু'একজনের ভিতর এ মেজাজ যা-ও বা খানিটা ছিলো, সেও ছাত্রদেরকে প্রভাবিত করার মতো ছিলো না। পুরো পরিবেশ জুড়েই তখন বিরাজমান ছিলো কেবল পড়াশুনা, সাহিত্যচর্চা, লেখালেখি ও বক্তৃতার ছায়া। দারুল উলুমে যাঁকে সবচে' বেশি অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তি মনে করা হয়, তিনি হলেন আল্লামা শিবলী নু'মানী। তাঁকেই দারুল উলুমের মূল প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নদওয়ার পড়াশুনা ও চিন্তা-চেতনার অবগঠনে আল্লামা শিবলী'র রয়েছে অনেক বড় ভুমিকা। তাঁর লেখার ধরন ও ভঙ্গি তখন পর্যন্ত ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। এমনকি এখনও তা আগের মতোই আবেদন সৃষ্টি করে এবং করে যাবে অনেক দিন পর্যন্ত।

কিন্তু এ বাস্তবতাকে কোনোভাবেই পাশ কাটানো যাবে না যে, নদওয়াতুল উলামা'র যে-আন্দোলন, তার প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ.। তবে তাঁর আহ্বানে নদওয়াতে যে-সংস্কৃতি ও চেতনা সৃষ্টি লাভ করেছে, তাতে অবদান রেখেছেন আরো অনেকেই। যেমন মাওলানা মিবলী ন'মানী, মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল

হাই, সদর ইয়ারজংগ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, নদওয়াতুল উলামা'র গর্ব মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.। এরা সবাই ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নমুনা। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন—

মূল থেকে শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে,

প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও সূচকদের অনুগ্রহ ভুলে গেলে,

বরং তাঁদের অবদান ও কীর্তিকে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করলে—

যে-অবস্থা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবেই,

যে বে-বরকতী নেমে আসে অজান্তেই, আমি তখন নদওয়াতুল উলামায় বসে তা-ই অনুভব করছিলাম।

মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেব এ বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। শুধু তাই নয়; প্রায়ই তিনি এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতেন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছ থেকে এমনটি প্রত্যাশিতও ছিলো। কেননা তিনি নদওয়াতুল উলামা'র সত্যিকার চেতনার ধারক বাহক ছিলেন। তাঁর দাওয়াতী মেযাজ ও আধ্যাত্মিক চেতনা দিন দিন প্রখর থেকে প্রখর হচ্ছিলো। তাঁর ইলমী যোগ্যতা ছিলো সুগভীর। তাঁর জ্ঞান-গবেষণা ছিলো ব্যাপক-বিস্তৃত। নদওয়াতুল উলামায় এমন এক সময়ে তাঁর পড়ালেখা করার এবং গড়ে ওঠার সুযোগ হয়েছে, যখন খোদ মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী নিজেই ছিলেন এর মহাপরিচালক।

বেশ মনে পড়ছে, একবার মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী আমাকে শিক্ষাভবনের উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন: 'মৌলভী আলী সাহেব (তিনি আমাকে এভাবেই সম্বোধন করতেন!)! সব প্রতিষ্ঠানেই এক বা একাধিক আদর্শ ব্যক্তিত্ব থাকেন (এখানে 'আদর্শ' শব্দটি উর্দূ 'মি'ইয়ারি' শব্দের অনুবাদ), যাঁরা ছাত্রদের জন্যে নমুনা ও আদর্শ, যাঁদের অনুসরণ করলে মন আনন্দিত ও গর্বিত হয়! মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ে এমন আদর্শ ব্যক্তি হলেন স্যার সৈয়দ, নওয়াব মুহসিনুল মুলক, নওয়াব ওয়াকারুল মুলক। (তিনি এখানে দেওবন্দে কে কে এমন আদর্শ ছিলেন, তাও উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের নাম এ মুহূর্তে আমার মনে নেই।) আপনারাও এখানে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় এমন আদর্শ ব্যক্তি নিয়ে আসুন, যাতে ছাত্ররা তাঁদের রঙে রঙিন হতে পারে! আমাদের এখানে চারজন এমন আদর্শ ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ., মাওলানা শিবলী রহ., আপনার পিতা মাওলানা সায়্যিদ আবদুল হাই রহ. ও নওয়াব সায়্যিদ আলী

হাসান খান রহ.।' এরপর তিনি বললেন: 'আপনার পিতা ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচে' পরিপূর্ণ। তিনি একদিকে ছিলেন আধ্যাত্মিক রাহবার, আরেকদিকে শীর্ষস্থানীয় আলেম। এ ছাড়া উর্দূ ও আরবীতে সুসাহিত্যিকও ছিলেন। উচ্চস্তরের লেখকও ছিলেন। আপনি তাঁকেই ছাত্রদের সামনে 'আদর্শ নমুনা' হিসাবে পেশ করুন!'

অনেক দিন আগের স্মৃতি হাতড়ে কথাগুলো বর্ণনা করলাম, শব্দে কিছু রদ-বদল হতে পারে, কিন্তু সায়্যিদ সাহেবের কথার মর্ম ছিলো এটাই। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপট এমন ছিলো যে, তাঁর সন্তান হওয়ার কারণে আমি তাঁর (সায়্যিদ সাহেবের) অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারছিলাম না। এ-নিয়ে সামনে বাড়লেও ফল হতো না। কেননা, শিক্ষকদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়াঈ ছাড়া এ বাস্তবতা অন্য কারো তেমন জানা ছিলো না। আব্বা সম্পর্কে তিনিই শুধু সভা-সেমিনারে আলোচনা করতেন। ফল ছিলো এই যে, তালিবুল ইলমরা (মাওলানা শিবলী নু'মানী রহ.-কে অনুসরণের নামে) কেন্দ্রীভূত করে ফেলেছিলো নিজেদের একজন লেখক, ঐতিহাসিক, সমালোচক হওয়ার স্বপ্নের মধ্যেই। প্রাচীন দীনি প্রতিষ্ঠান, সিলেবাস ও ব্যবস্থাপনা এবং বাইরের ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে হয়তো তারা অবিদিত ছিলেন নয়তো তাঁদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। ভাইজানও এ-অবস্থার কারণে বেশ চিন্তিত ও মনোক্ষুণ্ন ছিলেন। তিনি মনে-প্রাণেই চাইছিলেন দীনি ও রুহানী ব্যক্তিত্বদের সাথে, উলামায়ে রাব্বানীর সাথে ছাত্রদের চিন্তা-চেতনার গভীর সংযোগ স্থাপিত হোক। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে যে-চিন্তা ও পরিবেশ নদওয়াতে অনেক গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিলো, তা রাতারাতি কয়েক বছরেই দূর করা সম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া সে সময় এমন কোনো দাওয়াতী ও দীনি আন্দোলনও প্রকাশ পায় নি, যেদিকে যাওয়ার জন্যে ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারতো।

ছাত্রদের কিছু বৈশিষ্ট্য

সে সময়ের ছাত্রদের ভিতরে কিছুটা স্বাধীনতা, দীনি বিষয়ে এক ধরনের গাফিলতি এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের অনুকরণ-প্রিয়তা ছিলো বটে, কিন্তু যারা উঁচু খানদান থেকে এসেছিলে, যারা স্বাবলম্বী পরিবার থেকে এসেছিলো, যাদের মধ্যে প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। তা ছাড়া বিহার, উত্তর প্রদেশের মেধাবী ও প্রতিভাবান পরিবারের যেসব ছেলেরা এসেছিলো, যাদের

মধ্যে অনেক ঐতিহ্যিক গুণ ছিলো, ভদ্রতা ও আভিজাত্য, ধীশক্তি, সহনশীলতা, উন্নত নৈতিকতা, আত্মসম্ভ্রমবোধ, বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, উস্তাযের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা ইত্যাদি সুন্দর গুণের কারণে তারা কোনো রকমের অনাকাঙ্ক্ষিত ও নীচু আচরণ করতো না। বরং এখানে উপরের শ্রেণীর ছাত্রদেরকে নিচের শ্রেণীর ছাত্ররা উস্তাযের মতোই সম্মান করতো। বড়রা ছোটদেরকে ধমকাতো, শাসাতো, ভুল করলে বকাঝকা করতো। এটাকে ছোটরা মেনেও নিতো। বড়দের বড়রাও বড়দের এ আচরণকে বড় করে দেখতো না। এদের ভিতরে নিজেদের প্রতিভার গুণে অল্প পরিশ্রমে ভালো ফলাফল করার যোগ্যতা ছিলো। বাইরের বড় বড় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এরা হকচকিয়ে যেতো না। নেতৃস্থানীয়দেরকে দেখেও এরা ভড়কে যেতো না। যাহোক; দর্শনের বক্তব্য হলো, শুধুই ভালো যেমন একসঙ্গে পাওয়া যায় না আবার শুধুই খারাপও একসঙ্গে অকল্পনীয়। সে সময়ে নদওয়াতে কিছু দুর্বলতা থাকলেও অনেক ভালো ভালো দিকও ছিলো।

ড. উম্বেদকারের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও বোম্বাই সফর

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আমার শিক্ষকতার এক বছর সবে শেষ হয়েছে। তখন বয়স একুশ। তখন ভাইজান ও শায়খ খলীল আরব আমার কাঁধে এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করলেন। বললেন, তাঁরা আমাকে বোম্বাই যেতে, ড. উম্বেদকার[১] নামক একজনের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। সেখানে ড. উম্বেদকার ছিলেন নিম্ন বর্ণের (De presse Classes) এক সম্প্রদায়ের নেতা। তার সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি কোনো-না-কোনো ধর্মে দীক্ষিত হতে যাচ্ছেন। তাঁর পছন্দের ধর্মের তালাশে আছেন এখন তিনি এবং তাঁর সম্প্রদায়। তাঁর সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক, লক্ষ লক্ষ।

আমার বড় ভাই আর আমার শফিক উস্তায অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যে-কোনো সুযোগকেই কাজে লাগাতেন। এ-ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন ভীষণ আগ্রহী ও সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। অনেকটা নিজেদের ধর্মীয় চেতনা ও জযবার কাছে বন্দি ছিলেন। নিজেদের সাধ্যের ভিতরে ও সীমিত গন্ডিতে তাঁরা এ জন্যে অনেক পদক্ষেপই গ্রহণ

---

১. হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা। দেশভাগের পরপর তিনি সেখানকার আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর হাতেই হিন্দুস্তানের সংবিধান প্রণিত হয়। জন্ম ও বংশগতভাবে তিনি ছিলেন নিম্নবর্ণের (De presse Classes) মানুষ।

করেছিলেন। জানি না, এ নাজুক ও মহান কাজের জন্যে তাঁদের নির্বাচন-দৃষ্টি আমার উপরেই কেনো পড়েছিলো। অথচ আমি ছিলাম কম বয়সী এক যুবক। ড. উম্বেদকার সে সময় বোম্বাই ল'কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। রাজনৈতিক মহলে ও আইনজ্ঞদের মাঝে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। নিম্ন বর্ণের লোকদের তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত নেতা। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হতো যে, তিনি যে-পথ ও মতাদর্শই গ্রহণ করুন, তার একটা সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব পড়বে এবং তা প্রভাবিত করবে হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক চিত্র ও ভবিষ্যতকে গভীরভাবে। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ধর্ম যেমন খৃষ্টবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম এবং ইসলাম— সবাই চাইছিলেন এই 'হুমা'কে শিকার করতে (নিজ নিজ ধর্মে টানতে)! এর মধ্যে সবচে' বেশি দায়িত্ব বর্তায় মুসলমানদের উপর। কেননা, তারা তো এ কাজের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত! তাদের ধর্ম হলো দাওয়াতের ধর্ম। মানবতার ধর্ম। ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ও ধর্ম। এখন আমার মনে নেই, কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো তাঁকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্যে, শুধু এতোটুকু মনে পড়ছে যে, হায়দারাবাদ সরকারের পক্ষ থেকেও চেষ্টা করা হয়েছিলো।

শায়খ খলীল আর সাহেবের সান্নিধ্যের বরকতে আমার ভিতরেও অমুলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দানের একটা চেতনা গড়ে উঠেছিলো। আমি এটিকে নিজের জন্যে সৌভাগ্যের বিষয় বরং এক মহান ইবাদত মনে করতাম। কিন্তু এর জন্যে যে যোগ্যতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার এবং ইংরেজিতে যতোটা দক্ষতা থাকা দরকার, তার কোনোটাই আমার ভিতরে ছিলো না। তা ছাড়া দেখতে-শুনতেও আমি ছিলাম হালকা-পাতলা গড়নের, বয়সেও একেবারেই নবীন। পোশাক-আশাকও আমার অতি সাধারণ, মোটেই দৃষ্টি-আকর্ষক নয়। তবুও তাঁদের হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে। ব্যস্, কিছু উর্দূ-ইংরেজি বই-পুস্তক —যার অধিকাংশই 'সীরাত কমিটি পট্টি' প্রকাশিত— এবং বিকথাল সাহেবের তরজমায়ে কুরআন নিয়ে আমি একদিন বোম্বাই রওয়ানা হয়ে গেলাম।

আমি তখন পর্যন্ত লাহোর ছাড়া কোনো দীর্ঘ সফরে বের হই নি। আর বোম্বাই ছিলো আমার জন্যে একদমই নতুন জায়গা, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.-এর ভাষায় 'ইয়াজুজি শহর'। সেখানে একমাত্র মাওলানা শরফুদ্দীন কুতুবী সাহেব ছাড়া আর কাউকেই চিনি না, জানি না। তার আরবী কিতাবাদির একটা লাইব্রেরী ছিলো সেখানে কিমাভাড়ি বাজারে।

সহকর্মী মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়াঈ এবং মৌলভী রঈস আহমদ জা'ফরী সাহেব বেশ কিছুদিন বোম্বাইয়ে কর্মরত ছিলেন, 'খেলাফত' পত্রিকায়। 'খেলাফত হাউজ'-এ তারা থাকতেন। মাওলানা কিদওয়াঈ যখন জানতে পারলেন আমার বোম্বাই সফরের কথা, তখন সেখানে 'অল ইন্ডিয়া খেলাফত কমিটি'র সেক্রেটারি ও 'খেলাফত হাউস'-এর ব্যবস্থাপক মাওলানা ইরফান সাহেবকে পরিচিতিমূলক একটি 'বিশেষ চিঠি' লিখে দিলেন। বোম্বাই পৌঁছেই আমি সোজা গিয়ে উঠলাম 'খেলাফত হাউজ'-এ। মাওলানা ইরফান সাহেব আমাকে সসম্মানে সেখানে থাকতে দিলেন। এদিকে আমার এক সহপাঠী ও বন্ধু মাওলানা ইবরাহীম ইমাদীকেও সেখানে পেয়ে গেলাম! তিনি ওখানেই কর্মরত ছিলেন! দু'জনের মেহমানদারিতে বোম্বাই আস্তে আস্তে আমার কাছে 'পরিচিত' হয়ে উঠলেও আমি আমার 'মিশন'-এর কথা সতর্কতার সাথে এবং সঙ্গোপনে যাকেই বলছিলাম, সে-ই বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলো! চোখ উপরে তুলে আবার নিচে নামিয়ে আমার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলো, তারপর হেসে উঠছিলো (যা আমাকে অযোগ্য ঘোষণারই শামিল!)! উর্দূ কবির ভাষায় ওদের ভাবখানা এমন—

اس حوصلہ کو دیکھے اور انکو دیکھے

লক্ষ্য করুন এর আশার দিকে একবার আর ফিরে তাকান
এর নিজের দিকে একবার, কোনো মিল আছে!

আমি খুব সতর্কতার সাথে ড. উম্বেদকারের বাসার ঠিকানা জানার চেষ্টা করলাম। বোম্বাইয়ে তখন ট্রাম চলতো। আমি ঠিকানা সংগ্রহ করার পর লখনৌ থেকে নিয়ে-আসা দাওয়াতী বই-পুস্তকগুলো নিয়ে ট্রামে চড়ে বসলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে তাঁর বাংলোয় গিয়ে উঠলাম। তখন সকাল ৭টা কি ৮টা। ড. সাহেবকে পেলাম না, আমাকে বসতে বলা হলো বসার ঘরে। আরো বলা হলো, তিনি একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, এক্ষণি চলে আসবেন।

বসার ঘরে অনেক সাক্ষাতপ্রার্থী মানুষের ভীড়। ভাবলাম, এতো লোক-সমাগমে আমি তাঁকে কী বলবো? তিনি আমার দিকে কী-বা ভ্রুক্ষেপ করবেন? আল্লাহর নাম নিয়ে আমি গুটিশুটি হয়ে বসে গেলাম। সারিবদ্ধ হয়ে বসে থাকা এতো মানুষের ভীড়ে নিজেকে বেশ ছোট মনে হচ্ছিলো, অপ্রস্তুত লাগছিলো।

একটু পরই ড. সাহেব ভিতরে ঢুকলেন। দোহারা শরীর। মাঝামাঝি উচ্চতা, গায়ের রঙ অনেকটাই ফর্সা, হাতে ধরা ছড়ি। উপস্থিত লোকদেরকে এক নজর দেখে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনি আমার সাথে আসুন!

তিনি আমাকে নিয়ে উপরে নিজের গবেষণা কক্ষে পৌঁছলেন। ইশারায় বসতে বললেন। আমি দেখলাম, টেবিলে রাখা কিতাবের মধ্যে আমি যে-কুরআন তরজমা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটিও শোভা পাচ্ছে। সেখানে কতোটুকু পড়া হয়েছে, সে চিহ্নও দেয়া আছে! আমি মনে মনে আমার আলোচ্য বিষয় ঠিক করে ফেলেছিলাম।

আমি আমার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। এ জন্যে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, আমি সাদাসিধে একনিষ্ঠ এক মুসলমান ও দাঈ'র ভাষায় কথা বলবো। পরিস্কার ভাষায় কথা বলবো, কোনো রাখ-ঢাক করবো না, যেখানে রাজনীতি ও লোক-দেখানো সামাজিকতার কোনো মিশ্রণ থাকবে না। আমি কথা শুরু করলাম, বললাম: 'ড. সাহেব! বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় সুযোগ্য প্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই আপনার সাথে সাক্ষাত করেছেন, কথা বলেছেন, বক্তব্য পেশ করেছেন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায়! আমি তাঁদের মতো নই! খুব সাধারণ এক তরুণ যুবা! আমি আপনাকে শুধু এটুকুই বলতে এসেছি যে, আমার জানামতে আপনি সঠিক ধর্মের সন্ধানে আছেন! আপনি যদি নিজের জন্যে .. আপনার জাতির জন্যে মঙ্গল ও কল্যাণ এবং নাজাত ও মুক্তি চান, তাহলে আমি আপনাকে ইসলাম কবুল করে ধন্য হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি! এর বিনিময়ে আমি আপনাকে কোনো প্রলোভন দেখাবো না, দেখাতে পারবো না, না আর্থিক না রাজনৈতিক না সামাজিক! দুনিয়ার কোনো কিছুরই কোনো লোভ আমি আপনাকে দেখাবো না, দেখাতে পারবো না!'

আরো কী কী বলেছিলাম, এখন তা মনে পড়ছে না। তবে বিষয়বস্তু এ-ই ছিলো। এ-ধারায়ই আমি তাঁর সাথে যতোক্ষণ বলার বলেছি। আমার কথা তিনি শুনেছেন বড়ো গুরুত্ব দিয়ে, বড়ো সম্মান দিয়ে। তিনি আমার কথার জওয়াবে বললেন: 'বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ চিন্তা-ভাবনা দাবি রাখে। আমি এখন এ নিয়ে প্রচুর পড়ছি, গবেষণা করছি, চিন্তা করছি। খুব শিগগিরই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবো!'

আরেকটা কথা লিখতে আমি ভুলে গেছি। শায়খ খলীল আরব রওয়ানা হওয়ার সময় আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন যে, কথা যদি এখানে

এসে থেমে যায় যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কে আমার সাথে সম্পর্ক করবে? কে আমার কাছে বিবাহ দেবে? তাহলে তুমি বলে জানিয়ে দেবে যে, এক অভিজাত আনসারী আরব খানদান আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তৈরী আছে! আলী! তুমি আমার পক্ষ থেকে তাঁকে এ-মর্মে ষোল আনা প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসতে পারো!' আমার মনে পড়ে; এ-কথা বলার সময় শায়খ খলীল আরবের চোখে ছিলো পানি আর কণ্ঠে ছিলো আবেগের দৃঢ়তা! বিষয়টি সত্যিই ঘটলে তা বাস্তবায়নের জন্যে তিনি অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে যেতেন!

তারপর আমি যখন দেখলাম, ড. সাহেবের সঙ্গে আর কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন ও অবকাশ নেই, আমি আমার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি, তখন ইংরেজি বই-পুস্তকগুলো তাঁর সামনে রেখে বিদায় আরজ করলাম। আর অনুরোধ করলাম, অবশ্যই যেনো তিনি এগুলো পড়ে দেখেন। তিনি আমাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন, আমি চলে এলাম।

তারপর আল্লাহর ফায়সালায় যা লেখা ছিলো এবং কুরআনের এ আয়াত যা বলছে إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ তা-ই হলো। জানতে পারলাম, পরবর্তীতে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত নিজের জীবদ্দশাতেই তিনি নিজের এ-সিদ্ধান্তগত ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে না-পারলেও তার জাতির বিবেকবান শিক্ষিতরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। এ ধর্ম পরিবর্তনে তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। যেমনটি ফুটে উঠেছে ভি.টি. রাজেশকার রচিত গ্রন্থ 'ড. উম্বেদকার এবং তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ' গ্রন্থে।

এখানে পাঠকের উদ্দেশে ঐ চিঠির কথাও উল্লেখ করতে চাই, যা আমি বোম্বাই অবস্থানকালীন ড. উম্বেদকারের সাথে সাক্ষাতের পর নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভাইজানকে লিখেছিলাম :

২২শে রজব ১৪৫৪ হিজরী
২১শে অক্টোবর ১৯৩৪ ঈসায়ী
খেলাফত হাউজ, বোম্বাই
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
শ্রদ্ধেয় ভাইজান!

আমি কাল রবিবার সকাল ১১টায় এসে বোম্বাই পৌঁছেছি। 'খেলাফত হাউজ'-এ রাতে ছিলাম। আবদুস সালাম সাহেব

মাওলানা ইরফান সাহেবের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি আপনাকে ভালোভাবেই জানেন। দারুল উলুমের সাথী ইমাদী সাহেবও এখানে আছেন। এতে আমার অনেক সুবধা হয়েছে। এখন এখানে একেবারে ঘরের মতোই খাওয়া-দাওয়া করছি। গতকাল সন্ধ্যায় শরফুদ্দীন সাহেবের দোকানে গিয়েছিলাম। আবদুস সামাদ[১] সাহেব বলেছেন যে, ড. গোর[২] গিয়েছিলেন। তিনি[৩] পরদিন ৮:৩০ মিনিটে সময় দিয়েছেন। পরদিন আমি গিয়েছিলাম। তখন তিনি বলে দিলেন যে, আমি একটু ব্যস্ত আছি, এখন সাক্ষাত সম্ভব নয়। আবদুস সামাদ সাহেব জানিয়েছেন যে, আমি ইংরেজিতে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছি। তিনি আমাকে তার খোলাসা শোনালেন। মনে হলো, খুব যুক্তিপূর্ণ ও আবেদনময়।

এ দিকে 'খেলাফত হাউজ'-এ ফিরে এসে জানতে পারলাম মাওলানা ইরফানও ওখানে গিয়েছিলেন। তিনিও আশাব্যঞ্জক কোনো খবর নিয়ে আসতে পারেন নি। সব মিলিয়ে আমার মন ভেঙে না-গেলেও এবং হতাশ না-হলেও আমি বেশ ভাবনায় পড়ে গেলাম। বেশি ভাবছিলাম তিনি সাক্ষাতের সময় দিতে আবার অস্বীকারই করে না-বসেন, তাহলে তো দরোজাটাই বন্ধ হয়ে যাবে, এখানে আসাটাই বৃথা যাবে। এদিকে আমার নেই কোনো অবস্থান কিংবা মাধ্যম। এক রকম ধরেই নেয়া যায় তিনি সময় দেবেন না। সম্ভবত মানুষ তাঁকে খুব বিরক্ত করে। সময়ে-অসময়ে দেখা করতে চায়, হয়তো জরুরী তারবার্তাও তিনি পড়তে পারেন না।

আজ সকালে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি। মাওলানা ইরফান সাহেবের কাছে ড. উম্মেদকারের বাসার ঠিকানা চাইলাম। তিনি বললেন, গিয়ে কোনো লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

---

১. কিমা কুতুবখানার মালিক
২. একজন নওমুসলিম ডক্টর
৩. ড. উম্মেদকার

কিন্তু আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে সামনে 'দাদর' নামে একটা ষ্টেশন আছে, সেখানেই তাঁর বাংলো। খুঁজে পেতে তেমন কষ্ট হয় নি। আমি সঙ্গে করে কোনো ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আসি নি। এ জন্যে ভেবেছিলাম, আজ শুধু তাঁর অবস্থান ও সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় জেনেই ফিরে যাবো। কিন্তু একটু ভিতরে যেতেই জানতে পারলাম, ড. সাহেব আজই ১১টায় আহমদাবাদ যাচ্ছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে সময় মতো কাছে পেয়ে গেলাম বলে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং তাঁর অপেক্ষায় বসে গেলাম। আমার সাথে বসা ছিলো আরো ৮/১০ জন লোক। দেখে মনে হচ্ছিলো তারা নিম্ন বর্ণের। আমি জানতে চাইলাম, আপনারা কি হরিজন? উত্তরে তারা বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ড. সাহেব কি মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছেন? তারা বললোঃ না, মহাত্মা গান্ধী এবং আমরা এক না।

একটু পরই ড. সাহেব ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমাকে দেখে বললেনঃ কী কাজ? তিনি উপরে সঙ্গে যেতে আমাকে হাতে ইশারা করলেন। কামরায় ঢুকেই দেখলাম, তাঁর টেবিলে বইয়ের স্তূপ। কুরআনুল কারীমের তরজমাও ছিলো। আদর্শ নবী (আইডিয়াল প্রফেট)সহ আরো বেশ কিছু কিতাবও ছিলো। বুঝতে পারলাম, তিনি বেশ পড়াশুনা করছেন। আমি কিতাবগুলো দিয়ে বললামঃ আমি লখনৌ থেকে এসেছি। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি। ঐ সময় যা মনে এসেছে, তা-ই তাঁকে বলেছি। আমি বলেছি, ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ সুযোগ আপনার সামনে অপেক্ষা করছে; সম্ভবত শেষ সুযোগও। এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে আর কখনো ফিরে আসবে না। চাইলেই এখন আপনি আপনার সম্প্রদায়কে মহামুক্তির সন্ধান দিতে পারেন। শুধুই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি বিষয়টি বিবেচনা করবেন না। বরং ধর্মীয় বিবেচনাকেই প্রাধান্য দেবেন বলে আমি আশা করছি।

মুসলমান বর্তমান ইতিহাসের এ নাজুক সময়েও যে কোনো বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আছে। এরপর আমি তাঁকে আরব সাহেবের 'পয়গাম'ও পৌঁছে দিলাম, আপনার কথাও তাঁকে বললাম। ড. সাহেব বেশ মনোযোগ দিয়েই আমার কথাগুলো শুনেছেন। বলেছেন: বিষয়টা আমার একার না। এখানে হরিজন সম্প্রদায়ের সবার মতামতের বিষয় আছে। তাই দ্রুতই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মুশকিল। আমি বললাম: তারা তো আপনার অনুগত, আপনি যা বলবেন তাই হবে। আশা করি, এরা আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আপনি লখনৌ সম্মেলনের রিপোর্ট মনে হয় পড়েছেন! তিনি বললেন: হ্যাঁ, আজকের পত্রিকায় আমি দেখেছি। আমি শিগগির সভা আহ্বান করবো, পরামর্শে বসবো।

এরপর আমি ইসলামের সাম্যনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করলাম। তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন। এরপর আমি বললাম: আমি এখানে শুধু আপনার জন্যে এসেছি, অবস্থান করছি। আমার এবং আমার খানদানের পক্ষ থেকে আপনার কোনো খিদমত করতে পারলে খুশি হবো! আপনি কবে ফিরছেন? আমি কি আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো? তিনি বললেন: আমি নভেম্বরের ২ তারিখের ভিতরেই ফিরবো। না, আপনার এখানে অবস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই! যে সিদ্ধান্ত আমি নেবো আশা করি তা জানতে পারবেন!

তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত ও আলাপের এই ছিলো খোলাসা। আমি বিশেষভাবে এখানে কয়েকটি জিনিসের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

১. ব্যক্তি হিসাবে তিনি খুবই ভাবগম্ভীর ও বুদ্ধিমান।

২. ইসলাম নিয়ে তিনি পড়াশুনা করছেন।

৩. সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে মানে, বিশ্বাস করে, তাঁর উপর ভরসা করে।

আমি যখন তাঁর সাথে দেখা করে ফিরে আসছিলাম, তখন অনেকেই আমার কাছে ছুটে এসে বড়ো আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সাথে জানতে চাইলো, কী কথা হয়েছে! আমি বললামঃ তিনি আপনাদের পক্ষে কাজ করছেন? তারা বললোঃ ড. সাহেব যা বলেন, তা-ই আমাদের মত) । তিনি তো আমাদের হরিজনদের সেবক!

আমার মনে হয়, মুসলমানদের পক্ষ থেকে যতোটুকু করা দরকার, তারা তা করেছে । এ জন্যে আল্লাহর আদালতে তাদেরকে আর পাকড়াও করা হবে না । এখন তাঁর এবং তাঁর কওমের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে । তিনি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন— সে অপেক্ষায় বসে থাকা ঠিক হবে না । পুরাপুরি আশ্বস্ত হওয়াও উচিত নয় । মুসলমানদের উচিত নিজেদের কাজ চালিয়ে যাওয়া । তাদের প্রথম কাজ হলো, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র নিজেদের অবস্থা ও অনুভূতি তুলে ধরা । ড. সাহেবের 'নাসেক'-এ প্রদত্ত বক্তব্য প্রয়োজনীয় ভাষায় অনুবাদ করে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা । দ্বিতীয়ত, ইসলামের সাম্যনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে লিখিতভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানো । এ ছাড়া দল বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় সফর করে করে এ কাজ করা দরকার । এ কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা দরকার । যদি ফায়সালা হয় তাহলে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে কিছু বক্তব্য এখানে বিশেষ করে আমার ফেরার পথে 'নাসেক'-এও আমি বিলি করে যেতে পারবো । আর আপনি যদি এখানে আর অবস্থান করা উপকারী মনে না করেন, তাহলে ভাড়া ও ছাপার কাজের জন্যে সামান্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবেন । আরব সাহেবকে চিঠিটা দেখাবেন অথবা চিঠির বিষয়বস্তু বলে দেবেন । মৌলভী মুহাম্মদ আলী মাদ্রাজে আছেন । আর মহিউদ্দীন[১] সাহেব আছেন কাসুরে । উত্তর দেবেন জলদি ।

আপনার

আলী

---

১. এরা দু'জন আবদুল কাদের কাসুরী সাহেবের ছেলে, যারা অমুসলিমদের ভিতরে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করেন ।

এ গুরুদায়িত্ব শেষ করার পর আমি আরো সপ্তাহ দশদিন বোম্বাইয়ে থাকলাম। ওখানে থাকা অবস্থায়ই আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। সবাই বলতে লাগলোঃ তাড়াতাড়ি লখনৌ ফিরে যাও, নইলে এ জ্বর তোমার পিছু ছাড়বে না। আমি আর দেরী করলাম না, লখনৌ রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ঐ তারিখটা এলেই আমাকে ম্যালেরিয়া এসে আক্রমণ করতো। অবশেষে ভাইজান আমাকে এন্টি-ম্যালেরিয়া কোর্স সমাপ্ত করালেন। তারপর মুক্তি পেলাম।

লখনৌ পৌঁছেই দু'টি সংবাদ পেলাম। একটি আনন্দদায়ক সুসংবাদ আরেকটি বেদনাদায়ক দুঃসংবাদ। সুসংবাদটি হলো, মুহাম্মদ আল হাসানীর জন্ম। লখনৌ পৌঁছার ক'দিন আগেই তার জন্ম হয়েছে, ১৫ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে/ ১৭ রজব ১৩৫৪ হিজরীতে। দুঃসংবাদটি হলো, আমার মামাতো ভাই সায়্যিদ মুস্তফার আকস্মিক ইন্তিকাল। ধারণা করা হচ্ছিলো যে, সাপের কামড়েই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আপন সহোদরের মতো আমরা ছিলাম। একসাথে থাকতাম। একসাথেই খেলতাম।

মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবকে মানপত্র

অক্টোবরে সায়্যিদ সাহেব প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গেলেন। এ অসুস্থতা অনেক দিন ধরে চললো। তাঁর সহকর্মী ও ভক্তবৃন্দরা সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। ভাইজান তাঁকে দেখতে এবং চিকিৎসা পরামর্শ দিতে ছুটে গেলেন আজমগড়ে। আমরা তরুণ শিক্ষকরা—আমি, আবদুস সালাম কিদওয়াঈ ও মাসউদ আলম নদভীসহ আরো অনেকেই আজমগড় গেলাম তাঁকে দেখতে। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি যখন সফরের উপযুক্ত হলেন, ১৯৬৫ সালের মার্চে আবহাওয়া বদল করার জন্যে দেহরাদুন যাওয়ার ইরাদা করলেন। এ উপলক্ষেই তিনি লখনৌ এলেন। আমরা এ সুযোগে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান দিতে পরামর্শ করলাম। এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হলো। তাঁকে ঘিরে আমরা ব্যক্ত করবো আমাদের আনন্দগাথা, প্রকাশ করবো আমাদের প্রাণোৎসারিত অনুভূতি। অনুষ্ঠানে দু'টি মানপত্র পাঠের সিদ্ধান্ত হলো। একটি ছাত্রদের পক্ষ থেকে আরেকটি আসাতিযায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। প্রথমটি লেখার দায়িত্ব পড়লো মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর উপর আর দ্বিতীয়টি লেখার ভার পড়লো আমার কাঁধে। আমরা বেশ উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে মানপত্র তৈরী করলাম। আমি আমার লেখা মানপত্রে একটি বিষয়ে বেশ

গুরুত্ব দিলাম। তা হলো, এ পর্যন্ত সায়্যিদ সাহেবের যতো কিতাব লেখা হয়েছে, সে গুলোর নাম উল্লেখ না করে সবগুলোর বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করা। আলহামদুলিল্লাহ, এতে আমি সফল হয়েছি। তাঁকে আমি সম্বোধনও করেছি বিষয়-বৈচিত্র্যের সাথে সাথে শব্দ-বৈচিত্র্য দ্বারা। এ-মানপত্র এখনো দারুল মুসান্নিফীন-এর কোথাও রাখা আছে। এ অনুষ্ঠানে লখনৌ'র বিশিষ্টজনকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি আমরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামসহ বিচারপতি, আইনজীবী এবং নদওয়াতুল উলামা'র সর্বোচ্চ পরিষদ। পঠিত মানপত্রের জওয়াবে সায়্যিদ সাহেব যে আবেগ-প্লাবিত ও হৃদয়-ছোঁয়া ভাষণ দিয়েছিলেন, তা কখনো ভোলবার নয়। সব মিলিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান ছিলো ভীষণ সুন্দর ও পরিপাটি এবং আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। আমাদের শিক্ষকতা জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে তা আলো ছড়াবে আমাদের মনে অনেক কাল।

মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স

১৯৩৬ সালে আলিগড়ে মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় মানুষ সদর ইয়ার জং মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানী। নদওয়াতুল উলামা থেকে একটি প্রতিনিধি দলও এখানে এসেছিলেন, আমিও ছিলাম। সম্ভবত এটাই আমার প্রথম আলিগড় সফর। আমি সেখানে উঠেছিলাম ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের নাজেম মাওলানা আবু বকর ফারুকী জৌনপুরী সাহেবের বাসায়, যাঁর সাথে আমাদের কয়েক পুরুষ ধরে পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। তাঁর পিতা মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ মক্কী সাহেব আমার নানা সায়্যিদ শাহ্ জিয়াউন্নবী রহ.-এর অনেক কাছের মুরিদ ছিলেন। এ সম্পর্কের কারণে আমার মামাতো ভাইয়েরা সবাই তাঁকে আবু বকর চাচা বলে সম্বোধন করতেন। আর আমরা ভাই-বোনেরা তাঁকে মামু বলে ডাকতাম। মাওলানা আবু বকর সাহেবের দাদা হযরত মাওলানা সাখাওয়াত আলী জৌনপুরী হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর একজন খলীফা ছিলেন। আমাদের খানদানের বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা খাজা আহমদ নাসিরাবাদী সাহেব তাঁর শাগরিদ ছিলেন।

মাওলানা আবু বকর সাহেবের ওখানে বরাবরই আমাদের যাতায়াত ছিলো। আর তিনি যখন আমাদের এখানে বেড়াতে আসতেন, তখন আমাদের আনন্দের কোনো সীমা থাকতো না, সারা বাড়িতে বয়ে যেতো 'কী মজা!'-এর ঢেউ। আমার প্রিয় মামা হাফেজ মৌলভী সায়্যিদ উবায়দুল্লাহ

জৌনপুরে তাঁদের বাড়িতে থেকেই হিফজ পড়েছিলেন। ইবতিদায়ী তা'লিমও সেখানেই লাভ করেছিলেন। এই গভীর সম্পর্কের কারণেই তাঁর ঘর ছিলো আমার নিজের ঘর। তাই আমি ওখানেই গিয়ে উঠে গেলাম নিজের বাড়ির মতো। কিন্তু সদর ইয়ার জং সাহেব যখন অনুযোগের কণ্ঠে মিষ্টি করে আমাকে বকা দিলেন, এখানে এসে ওঠায় (তাঁর কাছে না গিয়ে), তখন আমি কিছু সময়ের জন্যে 'হাবীব মঞ্জিলে' চলে গিয়েছিলাম।[১]

---

১. বিস্তারিত দেখুন 'পুরানে চেরাগে'

ষষ্ঠ অধ্যায়

সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ লেখার সূচনা, হযরত থানভী রহ.-এর মাজালিস, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সফর ও ঘটনা, ইকবাল-কাব্যের প্রতি আকর্ষণ

তোংক সফর এবং সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ লেখার সূচনা

এলো সে সময় এবং বরকতময় অবকাশ, যা আমার জীবনের একটি মাইল ফলক এবং যা আমার জীবনের এক নতুন ও বরকতময় সূচনা। আগে বলে এসেছি যে, ১৯৩১ সালে ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. সম্পর্কে আমার লেখা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন মিশরের প্রখ্যাত লেখক-সাহিত্যিক আল্লামা সায়্যিদ রশীদ রেজা সাহেব। শিরোনাম ছিলো— ترجمة الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد (ইমাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনকথা)! সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর জীবনগাথা নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে পড়াশুনা করার যে-পুণ্য ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিলো, এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটিই তার প্রবেশদ্বার।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর জীবনী সম্পর্কে জানতে আমাকে সবচে' বেশি সহযোগিতা করেছে আব্বার একটি সফরনামা। তিনি তার শিরোনাম দিয়েছিলেন— 'আরমাগানে আহবাব—বন্ধুদের জন্যে উপহার'। এ ছাড়া আব্বার রোজনামচাও আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। উক্ত সফরনামাটি ছিলো একটি অপ্রকাশিত সংরক্ষিত পাডুলিপি। পরবর্তীর্তে এটি প্রকাশ পেয়েছে ধারাবাহিকভাবে মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবের স্মারক 'মা'আরিফে'। অবশ্য আরো পরে দিল্লী থেকে তা পুস্তিকা আকারেও প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা মাসউদ আলম নদভী সায়্যিদ আহমদ শহীদ এবং তাঁর জামাতের ভীষণ গুণগ্রাহী ছিলেন, মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর আলোচনা আসলেই

তিনি চেতনায় উজ্জীবিত হতেন। তাঁর জন্যে, তাঁর পক্ষে কথা বলতে, ভাব বিনিময় করতে, যে-কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। আমি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.কে নিয়ে বন্ধু মাসউদ আলম নদভীর সাথে অনেক কথা বলতাম, মত বিনিময় করতাম। সে সব আলাপচারিতায় আমি তাঁকে বলার চেষ্টা করতাম, সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর জীবন ও কর্মকে এবং তাঁর জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনকে নতুন ধাঁচে, নতুন আঙ্গিকে লেখা দরকার উপস্থাপন দরকার। আলাপে আলাপে ভালো ফল হলো।

শেষে আমরা এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, আমি লিখবো ইতিহাসের আলোকে তাঁর জীবনচরিত নিয়ে আর তিনি তাঁর আন্দোলন ও তাঁর গড়া মুজাহিদ বাহিনীকে গভীরভাবে পরিচিত করিয়ে দেবেন পাঠকের সাথে। এর মাঝেই আমাকে এবং দারুল উলুমের অপর দু' শিক্ষক শায়খ মুহাম্মদ আল আরাবী ও আবদুস সামী সিদ্দীকীকে আমাদের প্রিয় উস্তায শায়খ হায়দার হাসান খান তুংকী তাঁর সঙ্গে ছুটি কাটাতে তুংকে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা সানন্দে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং ১৯৩৬ সালের মে মাসের শুরুতে একদিন তুংকে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

তুংকে আমাদের খানদানের একটি বড় অংশ থাকতো। আমি মাওলানার বাড়িতেই ছিলাম। কিন্তু প্রিয় আত্মীয়দের এখানেও মাঝে মাঝে যেতে হতো। বিশেষ করে, আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সায়্যিদ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের কাছে। যিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর আপন নাতির ছেলে ছিলেন। স্নেহ-ভালোবাসার কারণে অধিকাংশ সময় তাঁর এখানেই আমাকে মেহমান থাকতে হতো। তাঁর বাড়িতেই আমি সন্ধান পেয়েছিলাম সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. সম্পর্কে লেখা وقائع احمدی, নামে কয়েক খণ্ডের একটি কিতাবের । এ কিতাব থেকে আমি সীমাহীন উপকৃত হয়েছি। তুংক অনেক সুন্দর এলাকা। আমি আশপাশ্ ঘুরে ঘুরে দেখেছি, এর শোভা-সৌন্দর্য অবলোকন করেছি। এমনকি এ সফরে এক দক্ষ নিশানাবাযের কাছে আমি বন্দুকের নিশানাও শিখেছি। তাঁর নাম আমীর আবদুর রহমান খান, যিনি ছিলেন তুংকের প্রশাসকের জামাতা।

এ সফরে একবার আমি তুংক নগরীরর পাশ দিয়ে বয়ে চলা 'বেনাস' নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিলাম, যেখানে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও তাঁর মুজাহিদ বাহিনী কতো অজু করেছেন। আমি বসেছিলাম সূর্যাস্তের একটু আগে নদীর একেবারে কোল ঘেঁষে একটা পাথর খণ্ডে, 'বেনাস'-এর শীতল পানিতে পা

দু'টি ডুবিয়ে। সে দিনটি ছিলো ১৯৩৬ সালের মে মাসের কোনো একটি দিন। আমি এই 'রূপালী পরিবেশে' শুরু করে দিলাম আমার জীবনের প্রথম কিতাব—সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর ভূমিকা বা পূর্বকথা'র কাজ। (উর্দূতে) আমি এর শিরোনাম দিয়েছিলাম— سید صاحب کی سیرت پر ایک اجمالی نظر (এক নজরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.)। সেদিন নদীর তীরে বসে কী লিখেছিলাম তা 'একটু হলেও' না বলে মানতে মন চাচ্ছে না। এতে ঐ নবীন লেখকের লেখার ধারা ও ভঙ্গি সম্পর্কে এবং তার চিন্তাধারা সম্পর্কেও একটি অনুমান পাঠকের হয়ে যাবে।

'ইসলামের ইতিহাসে বারবারই প্রবাহিত হয়েছে ঈমান ও ইয়াকিনের বরকতের হাওয়া। কিন্তু ইয়ামান ও ইয়াকিনের, নিষ্ঠা ও আল্লাহমুখিতার এমন 'বসন্ত-হাওয়া' কমপক্ষে আমাদের জানা মতে এ-দেশে ইতিপূর্বে আর কখনো প্রবাহিত হয় নি! না, অতীতে তাওয়াক্কুল ও সংকল্পের, ঈমান ও পুণ্যলাভের, শহীদী মওতের জন্যে এমন ব্যাকুলতা ও পরকালের প্রতি এমন অবিচল বিশ্বাস আর কখনো দেখি নি, শুনি নি! এ এক আশ্চর্য সুন্দর ব্যাপকভিত্তিক নজিরবিহীন উদাহরণ! চেতনা গড়া ও বিকাশের এবং প্রজন্ম গঠন ও সংস্কারের এমন বিস্ময়-জাগানিয়া ঘটনা পৃথিবীর সংস্কার আন্দোলন ও প্রজন্ম গঠন ইতিহাসে একেবারে দুর্লভ না হলেও অতন্ত বিরল যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'[১]

আমি মনে করি, এ সূচনা ছিলো এক মুবারক সূচনা। এর মাধ্যমে শুরু হয়েছিলো আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। আমি কল্পনাও করি নি যে, এ কাজ আমার জীবনে সৃষ্টি করবে এক বিরাট পরিবর্তন এবং সূচনা করবে এক নতুন যুগের। ভাবতেও পারি নি যে, এ-কিতাব দ্বীনদার তবকায় এতোটা সমাদৃত হবে এবং এমন ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করবে, আমাকে নিয়ে যাবে আল্লাহর নৈকট্যধন্য মানুষের অনেক অনে-ক কাছে।

গ্রীষ্মকালিন ছুটি কাটিয়ে জুনের শেষ দিকে আমি ফিরে এলাম তুংক থেকে। পথে মাওলানা আমাদেরকে দেখালেন জয়পুর ও আম্বির।[২] বুকে তাজা সংকল্প— যে কোনো মুল্যে আমাকে এ-কাজ শেষ করতে হবে। কেননা এ-কাজ সময়ের দাবি, বিবেকের অনুরোধ। এড়িয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

---

১. সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ, প্রথম খণ্ড

২. জয়পুরের রাজরাজড়াদের প্রাচীন রাজধানী

নাগপুর ও অন্যান্য সফর

তখন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিলো। মাসের শুরুতে বেতন দিতে খুব কষ্ট হতো। কখনো কখনো দু'এক মাস বাকিও পড়ে যেতো। আমার মনে আছে, এক সময় অবস্থা এতোটাই শোচনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো যে, ভাইজানের নির্দেশে আমি এবং দারুল উলুমের একজন উস্তায মৌলভী খলীল আহমদ সাহেব রেল ষ্টেশনে গিয়ে চাদা সংগ্রহ করতাম। কেউ চার আনা কেউ আটানা করে দিতো। হিন্দুস্তানের মানুষের এ-গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তখন নজর ছিলো না। তাদের জানা ছিলো না, কী উপায়ে কর্তৃপক্ষ এ-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। বাস্তবতা হলো এই যে, ভারতের মুসলমানদের জন্যে দেওবন্দ ও আলীগড় সম্পর্কে জানা অনেক সহজ ছিলো।

প্রথমটি ছিলো প্রাচীনধারার খালেস দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয়টি হলো আধুনিকধারার খালেস দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে নদওয়াতুল উলামা'র উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা ও অনুধাবন করাটা এমন অনেকের জন্যেই কঠিন ছিলো, যাদের দ্বীনি, ইলমী ও ফিকরী অবস্থান বেশি উঁচু ছিলো না। যারা সে সময়কার বিপ্লব ও চাহিদা সম্পর্কেও পুরোপুরি অবগত ছিলেন না, এর জন্যে নদওয়াতুল উলামার যিম্মাদারগণও কিছুটা দায়ী ছিলেন। কেননা, তাঁরা সরাসরি জনগণের সাথে এ ব্যাপারে ব্যাপক সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেন নি। জনগণকে নদওয়ার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তাও বোঝাতে সক্ষম হন নি, এ ছাড়া নদওয়াতুল উলামা'র বার্ষিক সম্মেলনও তখন বন্ধ ছিলো। ১৯২৭ সালে অমৃতসরে সর্বশেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এটি অব্যাহত থাকলেও অবস্থা অমন নাজুক হতো না।

কেননা, এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো কেন্দ্রীয় কোনো জায়গায়, যেখানে অংশ গ্রহণ করতেন দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাশীল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ আরো অনেকেই। তাঁরা নদওয়াতুল উলামার শিক্ষাদর্শন, সিলেবাসের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করতেন। নদওয়া সম্পর্কে দ্বীনি হালকায় এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝিও এর জন্যে দায়ী ছিলো। নদওয়াতুল উলামা'র সন্তানদের (ফারিগীনদের) উচিত ছিলো এ ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করা। কারণ যাই হোক, নদওয়াতুল উলামায় অর্থ-সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু আনন্দের ও সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো এই যে, দায়িত্বশীলগণ এ নাজুক অবস্থায়ও একটুও ভেঙে পড়েন নি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন নি। বরং হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে কাজ চালিয়ে গেছেন। নদওয়াতুল

উলামার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তখনো তাঁদের মনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় সৃষ্টি হয় নি।

এ অর্থ-সঙ্কটকে কেন্দ্র করেই ভাইজান চাচ্ছিলেন, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র মুহতামিম হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ. কয়েকজন উস্তাযকে সঙ্গে নিয়ে যেনো একটু মাদ্রাজ সফর করে আসেন। মাদ্রাজ ছিলো মুসলমানদের একটি ব্যবসাকেন্দ্র, বিশেষত সেখানে ছিলো চামড়া ব্যবসার বিশাল কেন্দ্র। এ ছাড়া কিছু পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীও সেখানে ছিলেন। মাদ্রাজ যাওয়ার আরেকটা কারণও ছিলো। তা হলো, এই কিছুদিন আগে সেখানকার বড় ব্যবসায়ী উত্তর হিন্দুস্তান সফর করে গেছেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে বড় অঙ্কের অনুদানও দিয়ে গেছেন। তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামাও পরিদর্শন করে গেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু না দিয়ে গেলেও আশা করা হচ্ছিলো যে, কোনো প্রতিনিধি দল সেখানে গেলে তিনি কদর করবেন, বড় কোনো অনুদান দেবেন।

একদিন হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ. তিনজন সঙ্গী নিয়ে মাদ্রাজের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন। অন্য তিনজন হলেন মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান খান নদভী সাহেব, মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়াঈ নদভী ও আমি। ১৯৩৭ সালের ১লা মে আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম। আমাদের প্রথম মঞ্জিল ছিলো ভুপাল। ভুপালে এসে অনেক ভালোই হলো। অনেক প্রিয় জনের সাথে এখানে দেখা হয়ে গেলো, যাঁদের সাথে এর আগে কখনো দেখা হয় নি। হলেও হয়েছে একেবারে সেই ছোটবেলায়। আমাদের দ্বিতীয় মঞ্জিল ছিলো নাগপুর। সেখানে সে সময় অমুসলিমদের ভিতরে দাওয়াতের কাজ চলছিলো বেশ জোরেশোরে। নাগপুরে কিছুটা সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। এখানে আমাদের দেখা হয়ে গেলো নওয়াব সিদ্দীক আলী হাসান খান এবং ব্যরিষ্টার ইউসুফ শরীফ সাহেবের সাথে।

সেখানে আঞ্জুমানে ইসলাম স্কুলের পক্ষ থেকে নদওয়াতুল উলামা'র এ প্রতিনিধি দলকে সংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়েছিলো। আমাদেরকে তাঁদের ইউনিয়নের ফেলোশিপও দেয়া হয়। একদিন খান বাহাদুর বেলায়াতউল্লাহ সাহেব সন্ধ্যায় আমাদেরকে এক চা চক্রে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর কাছে আমাদের ভালোই সময় কেটেছে। তিনি বিশিষ্ট

কবি আকবর ইলাহাবাদী'র ভঙ্গিতে কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি আমাদেরকে নিজের কবিতাও শুনিয়েছেন।

একদিন আবদুল লতিফ সাহেবও আমাদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি সেখানকার জজ ছিলেন। অনেক ধার্মিক ছিলেন তিনি। সেখানে এক মহীয়সী, যার জুতার বড় ব্যবসা ছিলো নদওয়াকে ভালো একটা অংক দান করেছিলেন। সম্ভবত এ সফরে এটাই সবচে' বড় অঙ্ক। আমাদের তৃতীয় এবং শেষ মঞ্জিল ছিলো মাদ্রাজ। কিন্তু সেখানে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয় নি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থও হয়ে পড়েচিলেন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মের কারণে। সফর সংক্ষিপ্ত করে আমরা বেশ তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিলাম।

মাদ্রাজে মাওলানা আবুল জালাল নদভী সাহেবের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিলো। তাঁর কথা আমি অনেক শুনেছি, দেখেছি এই প্রথম। মাদ্রাজে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো সি. আবদুল হাকীম সাহেবের বানানো মুসাফিরখানায়। নদওয়াতুল উলামার এ প্রতিনিধি দলের আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে মাদ্রাসের মানুষের ভালো জানা ছিলো না। আফসোসের বিষয়, হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান রহ. এর আগমন সম্পর্কে তারা বেখবর ছিলো। অথচ হযরতের ইলমী মাকাম অনেক উঁচু, দীর্ঘ দিন ধরে তিনি শাইখুল হাদীস। সর্বোপরি আরব আজমের শায়খ ও বুযুর্গ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.এর সরাসরি মুরিদ ও মুজায ছিলেন তিনি।

লখনৌতে হযরত থানভীর আগমন ও মজলিস

১৯৩৮ সালের আগস্টে লখনৌ আগমন করলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আমরাফ আলী থানভী রহ.। তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, এসেছেন মূলত চিকিৎসার উদ্দেশেই। এখানে ছিলেন তিনি চল্লিশ দিন। লখনৌবাসী ও আশ্পাশের জেলাগুলোর জন্যে এ এক বিরাট সৌভাগ্যই বলতে হবে। কেননা হযরত বর্তমানে কোথাও সফরে যেতেন না, সব সময় থানাভবনেই[১] অবস্থান করতেন। সালিকীন মুসতারশিদীন (ভক্ত অনুরক্ত ও মুরিদ) যারাই হযরতের সাথে দেখা করতে চাইতেন, তাঁর সুহবতে থাকতে চাইতেন, তাদেরকে সেই থানাভবনেই ছুটে যেতে হতো। কিন্তু আল্লাহর কী মেহেরবানি, 'কূপ' এখন নিজেই চলে এসেছে পিপাসাকাতর মানুষের পিপাসা মেটাতে, আত্মার চিকিৎসক এসেছেন দেহের চিকিৎসা নিতে রুগীদের কাছে!

---

১. উত্তর প্রদেশে মুজাফফর নগরে অবস্থিত প্রাচীন একটি গ্রাম। এখানে মানুষ ছুটে আসতো দূর দূরান্ত থেকে খানকায়ে ইমদাদিয়ায়।

ভাইজান পীর-মাশায়েখের সুহবতের অপেক্ষায় থাকতেন! সুতরাং এ মহা সুযোগকেও তিনি হেলায় নষ্ট করলেন না। তা ছাড়া হযরত থানভীর প্রতি তিনি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। পারিবারিকভাবেও আমরা হযরত থানভীর অনুরক্ত ছিলাম। হযরত উঠেছিলেন 'আনওয়ারুল মাতাবি'ই'-এর মালিক মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সাহেবের বাড়িতে। সেখানে জোহরের পর মজলিস হতো। আবার আসরের পরও মজলিস হতো মহল্লার মসজিদে। একজন ছাত্রের মতো ভাইজান 'সেই মাদরাসায়' নিয়মিত যাওয়া শুরু করলেন। সঙ্গে আমাকেও নিতে ভুললেন না।

আমার সৌভাগ্যই তো বলতে হবে, তখন হযরত মাওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী সাহেবের পুস্তিকা যন্ত্রস্থ ছিলো। হযরত থানভী ছিলেন এ পুস্তিকার ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী। এখানে অনেক লম্বা লম্বা আরবী ইবারত ছিলো আর তা দেখে দেয়া ও বিশুদ্ধ করার দায়িত্বটা পড়েছিলো অধমের কাঁধে। এ উপলক্ষে সেখানে আমাকে যেতে হতো। এতে আমি হযরতের আরো কাছে—তাঁর সান্নিধ্যের আরো গভীরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। ১৯৩৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর হযরত নিজেই চলে এলেন পায়ে হেঁটে হেঁটে আমাদের গৃহে! ভাইজানের চেম্বারে কিছুক্ষণ বসলেন! তারপর আলাপে আলাপে উল্লেখ করলেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর অবদান ও তাঁর খানদানের প্রতি উলামায়ে দেওবন্দের আকিদাতের—শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা!

আল্লামা ইকবালের সাথে শেষ সাক্ষাত

১৯৩৪-৩৫ সালের দিকে ইকবাল কাব্যের প্রতি আমার তেমন একটা ঝোঁক ছিলো না। আমি তখন কেবল তাঁর লেখা 'বাঙ্গেদরা' সংকলনের সাথেই পরিচিত ছিলাম, যেটি ছিলো একেবারেই সূচনা-সংকলন। তাতে ছিলো না সেই সমুচ্চ চিন্তা-মানস ও ভাব-সমৃদ্ধির অবাধ ঊর্দ্ধ-বিচরণ যা তাঁর পরবর্তী ও শেষ দিকের কাব্য সংকলনগুলোতে পুরামাত্রায় ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত ছিলো। আগে বলে এসেছি যে, আমি আল্লামা ইকবালের 'চাঁদ-কবিতা'র আরবী অনুবাদ করেছিলাম এবং তা কবিকে পেশও করেছিলাম। তিনি তাতে চোখও বুলিয়েছিলেন। এ ছিলো ১৯২৯ সালের কথা, যখন আমি প্রথম লাহোর সফর করি।

কিন্তু পরে যখন আমার চোখ পড়লো তাঁর অন্যান্য কাব্য সংকলনের উপর বিশেষত 'জরবে কালীম'-এর উপর, তখন আমার চোখ খুলে গেলো! আমি

তখন যাদুমুগ্ধ হলাম! দেখলাম এখানে যেমন আছে তাঁর অবাধ বিচরণশীল চিন্তা-মানসের মহা উচ্চতায় নির্বিঘ্ন উড্ডয়ন, তেমনি আছে হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে দেওয়া— সুর-লহরী ও নন্দন-ঝংকার।

কবির লেখা অন্যান্য কাব্য সংকলনও আমি পড়ে ফেললাম মুগ্ধতায় বিচরণের মধ্য দিয়ে! ভীষণ প্রভাবিত হলাম আমি! সমকালের অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিকের লেখা ও কবিতা পড়ে আমি এতো প্রভাবিত আর হই নি।

ইকবাল কাব্যের নন্দনধারার প্রতি আমার মুগ্ধতার কারণ আছে। কারণটা হলো, আমি তো কমবেশি জানি, উলামায়ে কেরাম কীভাবে জ্ঞান-গবেষণা করেন। কী করে বিন্যস্ত করে চলেন লেখক-কবিরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। আরো জানি, তাদের সাহায্য লাভের উৎস কোথায়, তাদের তথ্য ও তত্ত্বের উপাদান কেন্দ্র কোথায়। এ সব ব্যাপারে আমার কমবেশি জানাশোনা আছে। কিছুটা অভিজ্ঞতাও আছে, কিছুটা অংশগ্রহণও করেছি আমি এ ময়দানে— বয়সের .. ইলমের, অধ্যয়ন-গবেষণায় (অন্যদের তুলনায়) পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও।

আমি ভাবতাম যে, চেষ্টা করলে, গবেষণা চালিয়ে গেলে, দক্ষ উপস্থাপন ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করতে পারলে এবং দীর্ঘ সাধনা ও অনুশীলন অব্যাহত রাখলে 'এ-দিগন্ত' স্পর্শ করা কিংবা তার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া— মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু ইকবাল কাব্যধারার নান্দনিকতায় প্রবেশ করে দেখলাম, ইকবালের চিন্তাধারা ও মতামত, তাঁর অনুভব ও অনুভূতি, তাঁর কবিতার সুর-লহরী ও নন্দন-ঝংকার আমার ক্ষমতার অনেক বাইরে, অনেক উপরে! তা শুনলে কিংবা পড়লে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, ইকবাল অন্যলোকের মানুষ। শুধু মেধা-প্রতিভা-গবেষণা-অধ্যাবসায় দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করা যাবে না। ইকবালের এ ভাবধারা ও চিন্তা-মানস বরং আল্লাহর বিশেষ দান, যা তিনি শুধু তাকেই দান করেন যাকে চান! ঊর্দ্ধলোকের এ মহাদান সবাইকে সিক্ত করে না, এ কখনো সাধারণ প্রতিভার কাছে হার মানে না, কোনো প্রকাশভঙ্গিরও তোয়াক্কা করে না, এ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে দিতে চান, তাকেই দেন!

আমি আল্লামা ইবারকে নিয়ে যে কিতাবটি রচনা করেছি আরব বন্ধুদের জন্যে روائع إقبال (ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা) নামে, তার কয়েকটি পঙক্তি এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছে হচ্ছে—

ইকবাল কাব্যে মুগ্ধ হওয়ার কারণ অনেক। মুগ্ধ যারা, নিজেদের সে মুগ্ধতা প্রকাশ করতে ব্যাকুল তারা। এ অধিকার তাদের আছে। এ

কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, মানুষ ইকবালের কবিতায় নিজেদের স্বপ্নের আলো দেখতে পায়, স্বপ্ন পূরণের দ্যোতি দেখতে পায়, মনের কথার ধ্বনি শুনতে পায়। মানুষ নিজেকে ভীষণ ভালোবাসে। নিজের মাঝেই সে বাস করতে ভালোবাসে, যা কিছু তার মনের সাথে এসে এক মোহনায় মিলে যায় এবং তার বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়, তাকেই সে 'এসো!' বলে। এটাই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। আমি নিজেকেও এ চেতনা থেকে মুক্ত মনে করি না, করতে পারি না। বহুবার আমি ইকবালের কবিতার কিছু বাণীকে ভালোবেসে ফেলেছি শুধু এ কারণে যে, তা ছিলো আমার মনের কথা, বিবেকের ধ্বনি। আমার আক্বিদা-বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি, আমার চিন্তা-চেতনার দ্যুতিত স্ফুরণ, আমার আবেগ-অনুভূতির সাথে এক সুরে 'গান-গাওয়া পাখি'।

ইকবাল-কাব্যের প্রতি আমার এই-যে মুগ্ধতা ও ভালোলাগা, এর সবচে' বড় কারণটি হলো, তাঁর কবিতায় রয়েছে উচ্চকাঙ্ক্ষার অবাধচারিতা, ভালোবাসা ও ঈমান! এক সঙ্গে এ তিনটি জিনিসের আশ্চর্য সুন্দর সফল সংমিশ্রণ তাঁর কবিতায় .. তাঁর চিন্তায় সমকালীন অন্য যে কারো তুলনায় অনেক বেশি দ্যুতিময় ও ঝলমলে হয়ে উঠেছিলো। তাঁর সাথে আমার মিল খুঁজে পাই আমি। কেননা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা ও ঈমান— আমার লেখকসত্তার ভেতরেও আমি অনুভব করি। আমি নিজের অজান্তেই অমন সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ি, ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হই, যাতে আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উন্নত মানসিকতা, দূরদর্শিতা, ইসলামের নেতৃত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টিলোকের উপর সুনিয়ন্ত্রণ লাভের কথা। আরো আছে, কী করে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিস্তৃত অঙ্গন নিয়ন্ত্রণ করা যায়— সে কথা। আরো আছে, কেমন করে সবার মাঝে, সব কিছুর মাঝে ভালোবাসা ও প্রীতিবন্ধন ছড়িয়ে দেয়া যায়— সে কথা। সর্বোপরি, যেখানে আছে ঈমানী জাগরণের অবিনাশী চেতনার কথা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সর্বানুগত্য ও অটুট ভালোবাসার কথা, তাঁর বাণী ও আদর্শের চিরন্তনতার প্রতি, সব যুগের সব মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও নমুনা হওয়ার প্রতি ও তাঁর আদর্শের ও নেতৃত্বের সর্বব্যাপিতার প্রতি নির্দ্বিধ ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।

আমি কবিকে ভালোবাসি সেই 'উচ্চকাঙ্ক্ষা, ভালোবাস ও ঈমান'-এর কবি হিসাবে। এমন কবি হিসাবে, যাঁর আছে একটি আক্বিদা, একটি আহ্বান, একটি পয়গাম। আমি তাঁকে আরো ভালোবাসি বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার

একজন খাঁটি ও কট্টর সমালোচক হিসাবে। আমি তাঁকে ভীষণ ভালোবাসি ইসলামী ঐতিহ্যের দিকে, মুসলিম নেতৃত্বের দিকে একজন সেরা আহ্বানকারী হিসাবে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একজন দুর্বিনীত যোদ্ধা হিসাবে, মানবতা ও ইসলামের এক মহান দাঈ হিসাবে।[১]

সৌভাগ্যক্রমে মাওলানা মাসউদ আলম নদভীও ইকবালের ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতা ও সাহিত্য তাকে বন্দি করে ফেলেছিলো। আমরা একে অন্যকে ইকবালের কবিতা শোনাতাম আর তার গভীর স্বাদ নিতাম। যখনই আমরা শুনতাম রবি ঠাকুরের উচ্চ প্রশংসা কিংবা দেখতাম তার কোনো কবিতার অনুবাদ আরবী পত্র-পত্রিকায়, তখন আমরা ভীষণ ক্ষুব্ধতা অনুভব করতাম। মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য মহলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঠাকুরকে নিয়ে প্রায়ই আমরা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করতাম। এমন কি শায়খ সায়্যিদ কুতব পর্যন্ত রবি ঠাকুরের কবিতায় ভূয়সী প্রশংসা করতেন। বলতেন, তার কবিতায় আছে বস্তুবাদ ও অনুভবীয় জগতের বাইরে আত্মা ও বিবেকের ধ্বনি। এ স-বই দিনে দিনে আমাদের রাগ ও ক্ষোভের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিলো, আমাদের ক্রমেই উদ্বুদ্ধ করছিলো আল্লামা ইকবালের মতো মহাকবিকে আরব বন্ধুদের কাছে তুলে ধরতে।

বন্ধু মাসউদ আলম নদভী আমাকে বললেন, আরবীতে কবিতা অনুবাদে আমি অভ্যস্ত নই। এ কাজটি আমার ধাঁচে নেই। আপনিই বরং এ কাজটি করে ফেলুন। আমি যেটি পারবো তা হলো, ইকবালকে, তাঁর দর্শনকে আরব বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। অর্থাৎ তাঁর একটা ছোট-খাটো জীবনী আমি লিখবো।

এরপর আমরা দুজনে কাজ শুরু করে দিলাম। তিনি বেশ ক'টি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলেন মিশরের 'আল-ফাতহ' পত্রিকায়। আর কয়েক বছরের সাধনায় আমি প্রস্তুত করলাম روائع اقبال (ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা)। এ কিতাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরের দিকে আবার আসছে।

ইকবাল এবং তাঁর কবিতা ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে যখন আমরা এমনই যখন ব্যস্ত ছিলাম, তখনই এসে গেলো পাঞ্জাব সফরের এক মোক্ষম সুযোগ।

---

১. روائع اقبال (ইকবাল সাহিত্যের নন্দনধারা)

আগেই বলে এসেছি, ওখানে আছেন আমার প্রিয় ফুফা মাওলানা সায়্যিদ তালহা সাহেব। আরো আছেন প্রিয় উস্তায শায়ক আহমদ আলী লাহোরী।

১৩৩৭ হিজরী ১৬ রমজান মোতাবিক ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে মাওলানা সায়্যিদ তালহা সাহেবের সাথে পৌঁছে গেলাম সকালের দিকে আল্লামা ইকবালের সান্নিধ্যে। আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন চাচাতো ভাই সায়্যিদ ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈলও। কবি আমাদেরকে অনেক ক্ষণ সময় দিলেন, তিন ঘন্টা! সাধারণত এতো সময় তিনি কাউকেই দেন না। দীর্ঘ দিন থেকেই তিনি অসুস্থ। চিকিৎসকেরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে পেয়ে কবি ছিলেন অসুস্থতা (যা ছিলো মৃত্যু পূর্ববর্তী অসুস্থতা) সত্ত্বেও বেশ হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল। তাঁর বিশেষ খাদেম আলী বখশ বারবার তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি 'এ-ই তো শেষ করছি' বলে বলে কথা শেষ আর করছিলেন না, বলেই যেতে লাগলেন। হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সম্পর্কেও তিনি কথা বললেন। আমি মাওলানা মাদানীর পক্ষে আমার অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

কবির সাথে বসতে ইচ্ছে করছিলো আরো অনেকক্ষণ। কিন্তু তাঁর অবস্থা চিন্তা করে অবশেষে আমরাই বিদায় চাইলাম। আমার নিজেরও একটু তাড়াহুড়া ছিলো। পরের দিন আবার আমার সফরও ছিলো। রমজান চলছিলো তখন, তাই আমরা কবিকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম। এ-ই ছিলো কবির সাথে আমার শেষ দেখা। এর পাঁচ মাস পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিলো, ২১শে এপ্রিল ১৯৩৮ সাল।

আমি পরে আল্লামা ইকবালের সাথে এ বৈঠকের বিষয়বস্তু 'কবির সান্নিধ্যে কয়েক ঘন্টা' নাম দিয়ে জালেন্ধর থেকে প্রকাশিত 'পয়গাম' পত্রিকায় দিয়েছিলাম, ওরা বেশ গুরুত্বের সাথে তা ছেপেছে। অবশ্য روائع اقبال -এ এ সাক্ষাতের কথা সংক্ষেপে চলে এসেছে। উর্দূ সংস্করণেও তা এসেছে। কবির কাছে যাওয়ার সময় সীরাতে আহমদ শহীদ রহ. লেখার কাজ অনেকটাই শেষ করে এনেছিলাম। লাহোর যাওয়ার সময় পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়েও গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিলো, কবিকে তা দেখিয়ে অনুরোধ করবো একটি ভূমিকা লিখে দিতে। কিন্তু গিয়ে যখন দেখলাম তাঁর অসুস্থতা, তখন এই ভেবে আর অনুরোধ করলাম না যে হয়তো তিনি পাণ্ডুলিপি রেখে আসতে বলবেন। রেখে আসাটা একটু জটিল ছিলো। কেননা, আমার কাছে তখন এর

কোনো ফটোকপি ছিলো না। এমন কি কিতাব সম্পর্কেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে কিছু বলি নি। সম্ভবত তাঁকে ভূমিকা লেখার অনুরোধ না করে আমি ভালোই করেছি। কেননা, পরে এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.। আর সে ভূমিকা ছিলো সমহিমায় মহীয়ান, সগৌরবে উজ্জ্বল।

পাটনা সফর

১৯৩৮ সালের কথা। পাটনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলো 'মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন'-এর ঊনপঞ্চাশতম সম্মেলন। সভাপতিত্ব করবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাঙ্গাল মৌলভী ফজলে হক সাহেব। এ সম্মেলনের আমিও একজন আমন্ত্রিত মেহমান। সেখানে যাওয়ার একটা ছোট্ট প্রেক্ষাপট এবার তুলে ধরি। আমার বিশিষ্ট বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদভী অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে ১৯৩৭ সালে নদওয়া ছেড়ে بجنور চলে গিয়েছিলেন 'মদীনা' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে। সেখানে ছয় সাত মাস থেকে অবশ্য আবার নদওয়ায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু সেও ছিলো মাত্র দু' মাসের জন্যে। তারপর আবার তিনি 'খোদাবখশ লাইব্রেরী'র একটা দায়িত্ব নিয়ে বাংকীপুর পাটনায় চলে আসেন। যেহেতু এ সম্মেলন হচ্ছে পাটনায় আর সেখানে আছেন মাসউদ আলম নদভী, তাই আমি বেশ আগ্রহের সাথে আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করলাম। নদওয়াতুল উলামার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করলাম। এক অধিবেশনে মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর লিখিত প্রবন্ধ আমাকে পাঠ করতে হলো (তাঁর সামান্য উচ্চারণ-জড়তা ছিলো)। তখন মুসলমানদের মনে স্থিতি ও শান্তি ছিলো না। খেলাফত আন্দোলনের কারণে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের কারণে তারা বেশ অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন।

এ জন্যে নীরব ও শান্ত মেজাজে কোনো রাজনৈতিক উত্তেজনা বহির্ভূত কোনো গবেষণাধর্মী বিষয়বস্তু বেশিক্ষণ কিছু শোনার ধৈর্য ও স্থৈর্য তাদের ছিলো না। মাসউদ আলম নদভীর প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও ঘটলো ঠিক তাই। বড়ো অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হলো শ্রোতাদের ভিতরে। বিভিন্ন কোণ্ থেকে আওয়াজও আসতে লাগলো— 'শেষ করুন, শেষ করুন' বলে। আমার মনে আছে, মাওলানা আহমদ সাঈদ সাহেব ছিলেন খুবই সুবক্তা। তা ছাড়া তিনি ছিলেন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর সাধারণ সম্পাদক। সেদিন তাঁর বক্তব্যও সুন্দর করে শোনা হয় নি। সূচনায় নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উঠেছিলো ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রোতা-মনোযোগ আকর্ষণ করা মোটেই

সম্ভব হয় নি। সম্মেলনের অন্যতম আয়োজক (জেনারেল সেক্রেটারি) মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী এ অবস্থায় অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করতেও বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় নি, অবস্থার কোনো বদল হলো না। সামনেই বসা ছিলেন আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী, মাওলানা আবুল মাহাসিন মুহাম্মদ সাজ্জাদ। তাঁরা এ তামাশা দেখে দেখে ব্যথিত হচ্ছিলেন।

সদর ইয়ার জং মাওলানা হাবীবুর রহমান শেরওয়ানী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ সফর সম্পর্কে 'পুরানে চেরাগ'-এও আমি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছি।

পাটনার এ সফরে আমার আরেকটা উপকার হয়েছিলো। তা হলো, সাদেকপুর ঘুরে আসা। আমি ছোটবেলা থেকেই সাদেকপুরের নাম শুনে আসছিলাম। তখন থেকেই সাদেকপুরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় মনটা ভরে গিয়েছিলো। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর শাহাদাতের পর তাঁর রেখে যাওয়া আন্দোলনের সবচে' বড় কেন্দ্র ছিলো এই সাদেকপুর। এ অঞ্চলের মানুষ শায়খের কাজকে এগিয়ে নিতে সীমাহীন কুরবানী পেশ করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাহেবের ছেলে মৌলভী মূসা জীবিত ছিলেন। তাঁর সাথে আমি সাক্ষাত করলাম। ঐ খানদানের আরেক পুণ্যপুরুষ মৌলভী আবদুল গাফফার সাহেবের সাথেও। অনেক মূল্যবান ও উপকারী তথ্যাবলী তাঁর কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করেছি। মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাহেবের সেই চিঠিও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, যা তিনি আল্লাহর নবীকে স্বপ্নে দেখার পর নিজের ছেলে ও প্রিয়জনকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। এ ছাড়া ড. আজিমুদ্দীন সাহেব ও মাওলানা হাকীম আবদুল খাবীর সাহেবের সাথেও দেখা করেছিলাম, তাঁদের মজলিসে বসার সুযোগ লাভ করেছিলাম। সবখানেই আমার সঙ্গে ছিলেন মাসউদ আলম নদভী। তিনিই ছিলেন আমার রাহবার। তিনিই আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন সবার সাথে।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যায় সফর এবং কিছুদিন অবস্থান

১৯৩৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের প্রধান মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান আশরাফ পত্রিকায় একটি আবেদন

জানিয়েছিলেন। আবেদনটি হলো এই যে, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ক্লাসের জন্যে এমন একটি কিতাব রচনা করা দরকার, যেখানে ইসলামী আক্বিদা, জরুরী মাসআলা-মাসায়েল, সীরাতে নববী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ও ইসলামী ইতিহাসের উপর একটু আলোকপাত থাকবে। সে ঘোষণায় এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিলো যে, কিতাবটি রচনার পর উপযুক্ত বিবেচিত হলে লেখককে উপযুক্ত সম্মানী প্রদান করা হবে।

আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান আশরাফ সাহেবকে চিঠি লিখে আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং এ কিতাব রচনার দায়িত্ব নিতে রাজি থাকার কথা জানিয়ে দিলাম। যথা সময়ে আমি সবুজ সংকেত পেয়ে গেলাম। এর কারণ মূলত এটাই ছিলো, আমি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র শিক্ষক। আর আমার আব্বার ও মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান আশরাফের মাঝে রয়েছে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক। কিতাবটি প্রস্তুত করতে আমার সময় লাগলো দুই থেকে তিন মাস। এরপর আমি তা পাঠিয়ে দিলাম মাওলানার কাছে। তিনি দেখলেন এবং পছন্দ করলেন। তবে মাওলানা আবু বকর সাহেবের মাধ্যমে আমাকে কিছুদিনের জন্যে আলীগড়ে ডেকে পাঠালেন, কিতাবের কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে। আমি আলীগড় রওয়ানা হয়ে গেলাম। মাওলানা আবু বকর সাহেব ছিলেন ধর্ম অনুষদের পরিচালক। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং 'সার সৈয়দ হোস্টেলে' থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি এখন তাঁরই মেহমান।

সব মিলিয়ে আমি আলীগড়ে ছিলাম প্রায় দু' মাস। সন্ধ্যার দিকে গিয়ে হাজির হতাম মাওলানা সয়্যিদ সোলায়মান আশরাফ সাহেবের মজলিসে। প্রধানত কিতাবের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন, মত বিনিময় করতেন। তাঁর জ্ঞান-গভীরতা ও মূল্যবান দিক নির্দেশনায় আমার অনেক উপকার হয়েছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের অনেক প্রভাব ছিলো। উপাচার্য থেকে শুরু করে সবাই তাঁকে মানতেন, সমীহ করে চলতেন। মাওলানার উপস্থাপনাকে তাঁরা সবাই শ্রদ্ধার সাথে উপভোগ করতেন। তাঁর সামনে অন্য সবাইকে মনে যেনো ছাত্র! আরো মনে হতো, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আধুনিক শিক্ষার সবচে' বড় কেন্দ্রে মাওলানা যেনো সমস্ত উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিশেষ মিশন নিয়ে এখানে এসেছেন। আসলে আলেম উলামা সম্পর্কে এবং ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে যারা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন,

তাদের জওয়াব দেয়ার জন্যে এমন একজন ব্যক্তিত্বশীল আলেমের অবস্থান প্রার্থনীয় ছিলো।

এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানার আগে জানিয়ে দিচ্ছি এ কাজের সেই 'ঘোষিত' সম্মানীর কথাটা ৫০০ রুপী। অংকটা তৎকালীন সময়ের বিবেচনায় আমার জন্যে অনেক! এক সঙ্গে এতো টাকা আমি আগে কখনো পাই নি! অনেক খুশি ও আনন্দ অনুভব হচ্ছিলো! এদিকে আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভীও আমাকে 'এ কাজের এ-প্রাপ্তিতে' চিঠি লিখে মুবারকবাদ জানিয়েছেন!

মাওলানা আবু বকর শীস সাহেব ফারূকী

এখানে মাওলানা আবু বকর ফারূকী সাহেবের কথা আরেকটু বলতে হয়। আলীগড়ে তাঁর মেহমান থাকাকালে আমি তাঁকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। তাঁর সাথে আমাদের খানদানের অনেক গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি নানাজানের খাস মুরিদ ছিলেন। আমার মামা'র বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নদওয়াতুল উলামা'র ইন্তেজামিয়া কমিটি'র সদস্য ছিলেন। আমাদের পরিবারের বাচ্চারা পর্যন্ত তাঁকে চিনতো। আমি তাঁর মতো হৃদয়বান ও বহুগুণের অধিকারী মানুষ কমই দেখেছি। পড়ছেন দরসে নিজামী'র সেই প্রাচীনধারায়, ছিলেন সভ্যতা ও শিক্ষার মনকাড়া নমুনা। যেমন ছিলো ইলম তেমনি ছিলো আমল। ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপকতায় ছিলেন ভীষণ রুচিশীল। কাদীম ইলমের সব বিষয়েই ছিলেন দক্ষ ও যোগ্য। অনেক গভীর দৃষ্টির ফকীহ ছিলেন। উচ্চ পর্যায়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্য-ঘড়ি বানাতেন তিনি। এদিকে ফারসী ভাষার একজন পন্ডিতও ছিলেন তিনি। জানতেন প্রচুর কবিতা, বলতেনও। তাঁর সাধারণ ও বৈঠকি জ্ঞান ছিলো আপন বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের অধ্যাপকেরাও তাঁর মজলিসে বসতে পারাকে শুধু সৌভাগ্যই মনে করতো না, বরং তাদের জানার জগতও অনেক সমৃদ্ধ হতো। তাঁর দানের হাতও অনেক লম্বা ছিলো। তাঁর আচার-আচরণে ও গুণ-গরিমায় মনে পড়ে যেতো সালফে সালেহীন ও অতীত ইতিহাসের গৌরব, পুরুষদের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এটিই ছিলো আমার লম্বা সময়ের অবস্থান। সেও ছিলো একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে, স্যার সৈয়দ হোস্টেলে। এখান থেকে প্রতিদিন অন্তত তিনবার আমি মাওলানা আবু বকর সাহেবের বাসায় যেতাম খাওয়া-দাওয়া করতে। ইসহাক গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা থেকে বের হয়ে যাকাউল্লাহ সড়কে অবস্থিত মাওলানার বাসায় যেতে হতো। পথে

কতোজনের সাথে দেখা হতো। কিন্তু একদিনও আমি তাঁদেরকে আগে সালাম দিতে পারতাম না। কেউ কখনো বিদ্রূপাত্মক কিছু বলেছে শুনি নি। নিঃসন্দেহে মাওলানা আবু বকর ও মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান আশরাফ সাহেবদের মতো ব্যক্তিত্বের প্রভা ও প্রভাবেই এখানে ধীরে ধীরে এমন সুন্দর ইসলামী পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো। অথচ আমাদের লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিলো এর উল্টো। ওখানে আমাদের মতো লোকদের চলাফেরা করাটা ছিলো ওদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের খোরাক।

মুসলিম লীগ ও খাকসার আন্দোলনের তোড়জোর

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন মুসলিমলীগ ছিলো পূর্ণ যৌবনে। জমিয়তে উলামা বিশেষত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর সাথে মুসলিমলীগের বিরোধের কারণে এবং কংগ্রেসে তাঁর সংযুক্ত হওয়ার কারণে মুসলিমলীগে উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও আক্রমণাত্মক সমালোচনার মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। এমন কি ধীরে ধীরে এ সমালোচনা ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে লাগলেন সাধারণ তবকার উলামায়ে কেরামও।

পার্কে হোটেলে চা-চক্রে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়া হচ্ছিলো। মাওলানা মাদানী লখনৌতে আসলে যেহেতু আমাদের বাসাতেই উঠতেন, সেহেতু একে জমিয়তে উলামা'র সমর্থক ও কর্মীদের সম্মিলনস্থল ও কেন্দ্র মনে করা হতো। এদিকে কিছুটা মনের দাবিতে, কিছুটা পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে, কিছুটা চিন্তা ও অধ্যয়নের ভূমিকা থাকার কারণে, কিছুটা মাওলানা মাদানী'র মহান ব্যক্তিতের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকার কারণে এবং তাঁর ইখলাস ও নিষ্ঠার কারণে আমাদের খানদানের সকল বাচ্চা পর্যন্ত জমিয়তে উলামা'র ঘোর সমর্থক ছিলো। মুসলিমলীগের ব্যাপারেও বেশ দূরত্ব ছিলো। মাওলানা যখনই আমাদের এখানে আসতেন তিনিই মসজিদে ইমামতি করতেন, শুক্রবারে জুমাও তিনিই পড়াতেন। মহল্লার মানুষ (যাদের অধিকাংশই দেশের অন্যদের মতো জযবা ও আবেগে দোলায়িত হচ্ছিলো) তাঁর ইমামতিতে উসখুস করতো, যদি মুখে তারা কিছুই বলতে পারতো না আমাদের পারিবারিক অবস্থানের কারণে এবং ভাইজানের প্রতি তাকিয়ে। আমরা অবশ্য তাদেরকে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম, মাওলানা মাদানী এলে তিনি নামাজ ও জুমা পড়াবেন। এতে কারো আপত্তি থাকলে অন্য মসজিদে তারা চলে যেতে পারে।

পরিস্থিতিকে সবচে' বেশি উত্তপ্ত করে তুলেছিলো খাকসার আন্দোলন। আল্লামা মাশরেকী সাহেবের একের পর এক পুস্তিকা প্রকাশ পাচ্ছিলো 'মৌলভীর ভুল' ১ ২ ৩ নামে, মানুষের মুখের ভাষায়ও যোগ হতে লাগলো একের পর এক ধারালো ও অশালীন ভাষা। তখন আল্লামা মাশরেকী লখনৌ এসে গ্রেপ্তার হলেন। অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি। তারপর উত্তর প্রদেশ ছেড়েও চলে গিয়েছিলেন। সে সময় 'আল ফুরকান' পত্রিকায় খাকসার আন্দোলন নিয়ে আমার একটি সমালোচনামূলক তথ্যভিত্তিক লেখা প্রকাশ পায়। আন্দোলনটিকে আমি যুক্তি ও তথ্যের নিরিখে 'কাঠগড়ায়' দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম। খারেজি ও বাতেনি সম্প্রদায়ের উদাহরণ টেনে টেনে একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলাম। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম যে, শুধু সাংগঠনিক তোড়জোরে, শুধু ত্যাগ ও ব্যবস্থাপনা-শৃঙ্খলা ভেলায় চড়ে এমন কি শুধু ইবাদত-বন্দেগীর উপর নির্ভর করে সত্যকে পাওয়া সম্ভব নয়, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। মূল বিষয় হলো, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ভেজাল হওয়া এবং শরিয়তের পূর্ণ অনুসরণ করা।

সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ -এর প্রকাশনা ও সমাদৃতি, তখনকার প্রেক্ষাপট

মুসলিমলীগের চিন্তার ভারসাম্য ও সমন্বয়হীনতা এবং মাত্রাতিরিক্ত আবেগ আর খাকসার আন্দোলনের অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা সত্ত্বেও হিন্দুস্তানের মুসলমানরা এমন দাওয়াত ও লেখার আশায় বুক বেঁধে বসে ছিলো, যা তাদেরকে বলে দেবে আত্মপরিচয়ের কথা, আত্মমর্যাদার কথা, যা তাদেরকে আরো বলে দেবে দাসত্বের অন্ধকার পথের কথা। আরো বলে দেবে, বাকহীন হয়ে, অর্থহীন হয়ে, বাধ্য ও অনুগত ভৃত্যসম হয়ে হিন্দুস্তানে বসবাস করবে না সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে এবং কওমের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে এখানে থাকবে। আরো বলে দেবে, তাদের নিকট-অতীতের সালফে সালেহীনের জিহাদী জীবনের অমর কীর্তিগাথার কথা, সৃষ্টি করবে তাদের মন ও মননে জিহাদী জযবা ও চেতনা।

আল্লামা ইকবালের ভাষায়—

موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے
دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے
فتنۂ ملت بیضا ہے امامت اسکی
جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے

তিনি কাদিয়ানিদের উদ্দেশে বলেছেন—

وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش
جس نبوت میں نہیں شوکت و قوت کا پیام

কুদরতের কী শান! এ সময়টাকেই তিনি নির্বাচন করলেন আমার প্রথম কিতাব সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ প্রকাশের জন্যে! ১৯৩৯ সালের শুরুতে মোতি নামে একটা ছোট্ট ছাপাখানা থেকে ছোট্ট আকারে ছাপা হয়ে এলো! পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৪৬৪। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কিতাবটির শোভা ও মূল্য বর্ধন করেছিলো আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.-এর সুলিখিত শক্তিশালী ভূমিকা, যার শিরোনাম ছিলো— 'হিন্দুস্তানের পরদেশে ইসলামের মুসাফির'। এ ভূমিকায় তিনি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সংস্কার আন্দোলন ও তাঁর জিহাদী কীর্তিগাথাকে বর্ণিল উপস্থাপনায় তুলে ধরেছেন যেমন, তেমনি তরুণ লেখকের প্রথম সৃষ্টিকর্মকেও বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ লেখা একটি ছোট্ট ভূমিকার কলেবরে হলেও আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.-এর সাহিত্য-সুষমামণ্ডিত ও ইতিহাস-আশ্রিত লেখাগুলোর মধ্যে একটি সেরা লেখা। এক তরুণ লেখকের জন্যে এ ছিলো এক বিরাট সম্মান। এ ছাড়া শুরুতে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. ও মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. দিল-ধোওয়া দু'আ ও অনুভূতিও ছিলো। কিতাবটি অর্পণ করেছি আমি প্রিয় মামা হাফেজ মৌলভী উবায়দুল্লাহ সাহেবের নামে। কিতাব বের হওয়ার কিছুদিন আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে, ১৯৩৮ সালের ৩১ শে মে।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.কে নিয়ে মাওলানা জা'ফর আহমদ থানেশ্বরী 'সাওয়ানেহে আহমদী' নামে এবং মির্জা হিরাত সাহেবের 'হায়াতে তাইয়িবাহ' (যা মূলত শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.কে নিয়ে লেখা) কিতাব ছাড়া আর কোনো কিতাব পাওয়া যেতো না। এ ছাড়া উল্লেখিত কিতাব দু'টিও ছিলো প্রাচীন ধারায় লেখা। অনেক উচ্চ শিক্ষিতজনও সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতেন না। যা-ও বা জানতেন, সেও ছিলো ভাসা-ভাসা। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর ব্যাপারে সাধারণ ধারণা ছিলো এই যে, তিনি ছিলেন বিগত শতাব্দির একজন কামেল বুযুর্গ, যিনি একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে রাজা রণজিৎ সিংহের প্রশাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিছুদিন বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ করার পর অবশেষে নিজের অনুগত ও একনিষ্ঠ বাহিনীর সাথে বালাকোটের ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। এভাবেই তাঁর জিহাদী তৎপরতার অবসান ঘটে। তথ্যাভিজ্ঞ ও রাজনৈতিক মহলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মগাথা নিয়ে এরচে' উঁচু ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতো না। তাঁর সীরাত ও জীবনকাহিনী নিয়ে কেনো গবেষণা ও প্রচারধর্মী কোনো উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, হিন্দুস্তানের মুসলমানেরা ধীরে ধীরে এ মহান ব্যক্তিত্বকে এবং তাঁর অসাধারণ কীর্তিগাথাকে একদিন ভুলেই যাবে।

এ কিতাব যাবতীয় সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও ছিলো সময়ের ভাষায় লেখা প্রথম কিতাব। এ কিতাবে এই প্রথম সায়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ.-এর দাওয়াত ও আন্দোলনকে ব্যাপক আকারে ও বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর হাতে গড়া মুজাহিদ বাহিনীর ঈমানী চেতনা ও জিহাদী জযবা এবং নৈতিক উচ্চতা ও রণশৃঙ্খলা; সর্বোপরি, তাঁদের কুরবানী ও ত্যাগের কাহিনী এখানে বিধৃত হয়েছে। এ কথাও সেখানে বলা হয়েছে যে, সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর এ আন্দোলন শুধু পাঞ্জাবের মুসলমানদেরকে জালিমের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যেই নয়; এ আন্দোলন শুধু জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং এ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো— খেলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়া। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর রণাঙ্গণ শুধু পাঞ্জাবের শিখ প্রশাসনই ছিলো না, বরং তাঁর লক্ষ্য ছিলো সমগ্র হিন্দুস্তানেই ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা, যে হিন্দুস্তান ধীরে ধীরে ইংরেজ আধিপত্যের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

এ কিতাবে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর মুজাহিদ বাহিনীর পূর্ণ বীরত্বগাথা। এখানে দুশমনের কারাগারে বিশেষত আন্দামানের দ্বীপে তাঁদের নির্বাসিত জীবন, বন্দিদশার দুঃখ-দুর্ভোগ ও সীমাহীন জুলুম-নিপীড়নের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে, যা পড়লে একদিকে যেমন শরীর শিউরে ওঠে। অপরদিকে সবকিছুর সামনে তাঁদের সবর-ইস্তিকামাত ও অটল-অবিচলতায় মনে সৃষ্টি হয় ঈমানী জযবা। এ সব পড়লে সীমাহীন নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষের মনও আবেগে চেতনায় দ্রোহে জ্বলে ওঠবে।

অথচ বাস্তবতা তো হলো, এমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এ নবীন বয়সে এতো অল্প সময়ে (তখন আমার বয়স ২২ বছর) সীমাহীন উপকরণ-সঙ্কটে বসে, সর্বোপরি লেখা ও গবেষণার আচার ও নীতিমালা রপ্ত হওয়ার পূর্বে এমন একটি কিতাব লিখে ফেলা সম্ভব হয়েছে কেবলই সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. আল্লাহর এক কামেল ওলী ও প্রিয় বান্দা ছিলেন বলেই। দ্বিতীয়ত, এমন একটি কিতাব পাঠকের সামনে পেশ করা ছিলো সময়ের অন্যতম দাবি। এমন মনে হচ্ছিলো কেউ যেনো বেদনায় আক্রান্ত উম্মতের ঘা'য় এসে মলম লাগিয়ে দিয়েছে। মৃতপুরীতে বইয়ে দিয়েছে জীবনের ছোঁয়া। নীরব-নিস্তব্ধতায় হঠাৎ বেজে উঠেছে এক সুরমূর্ছনা। কবির ভাষায়—

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

কিতাব হাতে হাতে পৌঁছে গেলো অনেক পিপাসু পাঠকের কাছে। অর্জন করলো ব্যাপক সমাদৃতি। মাদরাসায় মাদরাসায় এবং মসজিদে মসজিদে তা পড়ে পড়ে শোনানো হলো। অখ্যাত তরুণ লেখকের কাছে আসতে লাগলো একের পর এক গভীর অভিনন্দনবার্তা। কোনো চিঠির ভাষা ও অতিপ্রশংসাভঙ্গি আমার কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। এমন কিছু শিক্ষিত যুবকের কথাও আমার কানে এসেছে, যারা ইসলামের জীবনী শক্তি ও নেতৃত্বের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলো এবং কমিউনিজম ও ইলহাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো, এ কিতাব তাদের মনেও নতুন করে ঈমানের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলো। সৃষ্টি করেছিলো তাদের মৃতপুরীতে জীবনের জয়গান। আমি জানতে পেরেছি কোনো কোনো পাঠক এ কিতাব পড়েছেন আট বার! কেউ-বা দশ বার!

অনেক চিঠিই তো আমি তখন পেয়েছিলাম, এখানে শুধু দু'টি চিঠি উল্লেখ করছি। একটি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর আর আরেকটি হলো মাওলানা আবদুল বারী নদভী'র। আমার প্রিয় সহকর্মী হযরত মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব এ কিতাব বের হওয়ার পর হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর কাছে একজনের মাধ্যমে হাদিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর সাথে তিনি আরেকটি কিতাব হযরতকে হাদিয়া পেশ করেছিলেন, সেটি হলো মাওলানা মওদুদী সাহেবের 'পর্দা'। সে সময় দীনি হালকায় এ কিতাবটির বিরাট প্রচলন ছিলো। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কিতাব পাওয়ার পর যে অনুভূতির কথা জানিয়েছিলেন তা এমন—

> 'আমি কোনো বন্ধুর পক্ষ থেকে কিতাব হাদিয়া পেলে মনের অনুভূতি লুকিয়ে রাখতে পারি না। সুতরাং এ হাদিয়া বিশেষত সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. কিতাবখানি আমার মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি করেছে, তা একদিকে আনন্দের আরেকদিকে লজ্জার। লজ্জার কারণ হলো এই যে, এ কিতাব হাতে নিলে মনে হয়, কিছুই তো করলাম না! আমাদের ভিতরে না আছে সেই হিম্মত, না আছে সেই আত্মসম্ভ্রমবোধ। জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবন পার করে দিচ্ছি। ঘুম-খাওয়ার ভিতরেই আমরা ব্যস্ত। তাই এ ধরনের হাদিয়া যদি তাদেরকেই দেয়া হয়, যারা এ থেকে উপকৃত হতে পারবে, তাহলে তো ভালো, নইলে তা নষ্ট হবে। এখন দু'আর আবেদন রেখে শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা বুযুর্গানে দীনের আদর্শ অনুসরণের তাওফিক দান করুন।'[১]

এর চাইতেও আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, আমি ১৯৪২ সালে গরমের সময় থানাভবন গিয়েছিলাম (কিতাব বের হওয়ার আড়াই বা তিন বছর পর)। তখন সেখানে পৌঁছেই আমার চোখে পড়লো যে, হযরত 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.' কে তাঁর ডেস্কের উপর রেখে দিয়েছেন! কিতাবের লেখা ছিলো ঝকঝকে সোনালী কালিতে, তাই ভুল দেখার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না।

---

১. পুরানে চেরাগ ১ম খণ্ড, চিঠিতে তারিখ উল্লেখ ছিলো না

মাওলানা আবদুল বারী নদভী সাহেব হায়দারাবাদ যাচ্ছিলেন। আমি তখন তাঁকে একটি কিতাব হাদিয়া দিলাম। ট্রেনে বসেই তিনি কিতাবটি পড়ে ফেললেন। হায়দারাবাদ পৌঁছেই তিনি লিখে পাঠালেন—

উসমানিয়া কলেজ ডাকঘর

লালাগড়া, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য

১৩ মার্চ ১৯৩৯

প্রিয় ভাই! আসসালামামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

সায়্যিদ সাহেবকে নিয়ে আপনার লেখা কিতাব সফরেই শেষ করলাম। আমার এ সফর ছিলো আল্লাহর কামেল ওলীদের মজলিসে বসে তাঁদের নিবিড় সান্নিধ্যে। ইসলাম ও ঈমান তো তাঁদেরই ছিলো। চতুর্থ অধ্যায়টি পড়ে 'এ-পাষাণদিল'ও চোখের-পানি ধরে রাখতে পারে নি! সত্যিই, মুসলমানদের ঈমানী চেতনা আবার জাগিয়ে তোলার জন্যে অমন জীবনীগ্রন্থেরই প্রয়োজন ছিলো! জাযাকুমুল্লাহু আনিল মুসলিমীন— সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন!

আপনার কিতাব আমার এ বিশ্বাসও আজ বাড়িয়ে দিয়েছে যে, শুধু দল ও সংগঠনে কাজ হবে না কখনো, কাজ হবে (সায়্যিদ আহমদ শহিদ রহ.-এর মতো) এমন মানুষকে দিয়েই, যাঁর চারপাশে না-চাইতেই হাজারো মানুষ জমা হয়ে যায়! ঈমান রক্ষার সত্যিকার দল ও সংগঠন সেটিই।

আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভীর সাথে একটি ঐতিহাসিক সফর

আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী কিতাব পড়েছিলেন। পরে সীমাহীন আগ্রহের সাথে সেই ভূমিকাটিও লিখে দিয়েছেন। তাঁর সাথে এতোদিন আমার সম্পর্কটা ছিলো শুধু এই হিসাবে যে, আমি তাঁর শিক্ষকের ছাত্র এবং দারুল উলুম নদয়াতুল উলমার একজন সাধারণ শিক্ষক। কিন্তু সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. কিতাবে সুবাদে তাঁর সাথে এখন আমার সম্পর্ক গভীর হয়েছে। সায়্যিদ সাহেব আমাকে আরো কাছে টানলেন। আমি আরো

নিবিড় করে তাঁর সান্নিধ্য পেলাম। আমি তাঁর সাথে ঐতিহাসিক এক সফরে সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করলাম।

পূর্ব পাঞ্জাবের কর্ণাল জেলায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া মাদরাসা পরিদর্শনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভীকে। অনেক মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কয়েক বছর আগে যা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মাদরাসার জন্যে মূল্যবান একটি ভূ-খণ্ডও দান করেছিলেন শমসের জং নবাব আজমত আলী খান সাহেব। সায়্যিদ সাহেব আমাকে সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বললেন। তিনি তখন নদওয়ার বাইরে ছিলেন, সেখান থেকে আমাকে চিঠি লিখে বললেন—

'মার্চের শুরুতে কর্ণাল যেতে হবে ইসলামিয়া মাদরাসা পরিদর্শনে, আপনিও যাওয়ার জন্যে তৈরী থাকবেন।'

এ সফরে আমরা অনেক জায়গা পরিদর্শন করেছি। কর্ণাল, পানিপত, থানেশ্বর ও দিল্লি। এ সফরে আমার অর্জন অনেক কিছু। কখনো সমৃদ্ধি ঘটেছে আমার জানার জগতে, কখনো শিখেছি আমি উন্নত নৈতিকতার উন্নত রূপ। কখনো উন্মোচিত হয়েছে আমার চোখের সামনে সাহিত্যের নানা দিক। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ও বড় বড় উলামায়ে কেরামের সাথেও সাক্ষাত হয়েছে। এ ছাড়া অনেক বুযুর্গানে দীনের কবর যিয়ারতের সুযোগ হয়েছে।

'আন নাদওয়া' পত্রিকার তৃতীয় প্রকাশ

'আন নাদওয়া' প্রথম প্রকাশ পেয়েছিলো ১৯০৪ সালে। তখন এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন আল্লামা শিবলী নু'মানী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী। হিন্দুস্তানের তথ্য প্রবাহ ও জানার আকাশে এ পত্রিকাটি ছিলো জ্বলজ্বলে এক নক্ষত্র। প্রথমত, তখন এ পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে পারলে বড় বড় লেখক ও শিক্ষাবিদগণও গৌরব অনুভব করতেন। দ্বিতীয়ত, এ পত্রিকাটি তখন বিবেচিত হতো লেখক হিসাবে পরিচিত ও স্বীকৃতি লাভ করার মাধ্যম হিসাবে। কেননা এ পত্রিকায় লিখতেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তিনি রাজনীতি ও সাহিত্যে হিন্দুস্তানের আকাশে পূর্ণ চাঁদ হিসাবে উদিত হওয়ার পূর্বে এ পত্রিকাতেই সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে যিনি সারা হিন্দুস্তানের মানুষের চোখে ঈদের নতুন চাঁদের মতো 'গেঁথে গিয়েছিলেন'।[1]

---

১. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রকাশিত 'আল হেলাল' পত্রিকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার প্রত্রিকাটি বেরিয়েছিলো ১৯১৪ সালের জুলাইয়ে। সম্পাদক ছিলেন মাওলানা ইকরামুল্লাহ নদভী। কিন্তু ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেব যখন নদওয়াতুল উলামা'র প্রতি একটু বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলেন এবং নদওয়ায় আবার ফিরিয়ে আনতে চাইলেন প্রথম যুগের 'কায়া ও ছায়া' তখন তিনি এ ধারাবাহিকতায় সিদ্ধান্ত নিলেন আবার 'আন নাদওয়া' পত্রিকাটি প্রকাশ করার। সময়টা ছিলো ১৯৪১ সাল। লোকসংকটের কারণে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পড়লো এসে আমার ও বন্ধুবর আবদুস সালাম কিদওয়াঈ নদভী'র কাঁধে। সময়ের পরিবর্তন, তরুণ হাতের সম্পাদনা ও কাঁচা অভিজ্ঞতার কারণে পত্রিকা আর সেই আগের যুগের সমাদৃতি ও জৌলুস ফিরে পায় নি। তবুও তা একটি রুচিসম্পন্ন, তথ্যসমৃদ্ধ, চিন্তাশীল, গবেষণাধর্মী ও দাওয়াতী পত্রিকা হিসাবে সবার কাছেই একটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেলো। বিশেষত, আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভীসহ মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ও মাওলানা যিয়াউল হাসান নদভী'র বিভিন্ন লেখা প্রকাশ পেতে শুরু করার পর থেকে।

সম্পাদনার কাজ করতে করতে মাথায় এলো একটি নতুন চিন্তা। ১৯৪০ সালের নভেম্বর থেকে আমি একটি সিরিজ লেখা শুরু করলাম। শিরোনাম— الكتب التي أفادتني —'যে-সব কিতাবের কাছে আমি ঋণী'। এ বিষয়ে অন্য বড় বড় লেখকদের কাছেও আবেদন পেশ করলাম লেখা পাঠানোর জন্যে। অনেকেই সাড়া দিয়েছেন। জানিয়েছেন কোন্ কোন্ কিতাব তাঁদের জীবন ও চিন্তা-মানস গঠনে অবদান রেখেছে। এভাবে বড় বড় পনের জন লেখকের কাছ থেকে আমরা লেখা পেয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে বিষয়-গুরুত্বের বিবেচনায় সংখ্যাটা ব্যাপক উৎসাহ যুগিয়েছে আমাদেরকে। যাঁরা যাঁরা আমাদের আবেদনে লেখা পাঠিয়ে আমাদের পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁরা হলেন নওয়াব সদর ইয়ারজং মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী, মাওলানা সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা আবদুল বারী নদভী, অধ্যাপক সায়্যিদ নওয়াব আলী, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা আবদুল আযিয মায়মানী, মাওলানা ই'যায আলী, মাওলানা মাওলানা শাহ হালীম আতা, মাওলানা সায়্যিদ তালহা, মাওলানা বদরুদ্দীন আলাভী, মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, মিয়া বশির আহমদ সাহেব ও খাজা

গোলামুস সায়্যিদাইন। আফসোস, অর্থ সঙ্কটের কারণে পত্রিকাটি ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার বন্ধ হয়ে যায়।

দারুল উলূমে নতুন উস্তায

১৯৩৯ সালে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র আসাতিযায়ে কেরামে এসে যোগ দিলেন হযরত মাওলানা শাহ হালিম আতা সাহেব। তাঁকে পেয়ে শুধু ছাত্ররাই খুশি হয় নি, বরং আসাতিযায়ে কেরামের ভিতরেও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিলো। তাঁরাও তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছিলেন বিভিন্নভাবে, দিকনির্দেশনায় ও তা'লিম-তারবিয়তে। তিনি ছিলেন হাদীসের উস্তায। ছাত্রজীবন থেকেই আমি তাঁর নাম শুনে আসছিলাম। খুব দূরের মানুষ নন তিনি, আমাদের রায়বেরেলির পাশে সালুন গ্রামের বাসিন্দা তিনি। সম্ভ্রান্ত ফারূকী খানদানের সন্তান তিনি। চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়েখের খানদানের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি। তাঁর সাথে ছাত্রজীবনে আমার সাক্ষাতও হয়েছিলো। ফুফা মাওলানা সায়্যিদ তালহা সাহেবের সাথে আমি সালুন সফরের সময় তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর ওখানে আরো দেখেছি চোখভরে তাঁর বিশাল কুতুবখানা। ভীষণ মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর জানা ও পড়াশুনার পরিধিও ছিলো অনেক ব্যপ্ত। ইলমী গবেষণা ও গভীর পাঠোধ্যয়নে তিনি ছিলেন এক আদর্শ নমুনা। হিন্দুস্তানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কায়্যিম, ইবনে রজব, ইবনে আবদিল হাদী ও ইবনে জাওযী রহ.-এর কিতাব তিনি যতোটা প্রাচুর্য ও গভীরতা নিয়ে পড়েছেন ও গবেষণা করেছেন, তার নজির খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁদের কিতাবের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তাঁর মুখস্থ ছিলো। পীরযাদা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আক্বিদায় কোনো রকমের অশুদ্ধতা ছিলো না। হাদীসশাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিলো বিরাট অনুরাগ। ব্যক্তিগতভাবে আমি শিক্ষকতায় বিশেষত গবেষণাধর্মী কাজে শাহ সাহেবের অনেক মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য লাভ করেছি।

অনেক সময়ই আমি অনেক জরুরী উৎস তালাশে কিতাব ঘাঁটা থেকে বেঁচে গিয়েছি তাঁর কারণে। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আর এর ভিত্তি ছিলো আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক। মূলত আমিই তাঁকে দারুল উলূমে আনার ব্যাপারে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলাম। আরবী সাহিত্যের প্রতিও তাঁর চমৎকার ঝোঁক ও আগ্রহ ছিলো। সেরা সাহিত্যিকদের ভঙ্গি ও ধরন সম্পর্কে তিনি চমতকার ধারণা রাখতেন। প্রাচীনধারায় পড়াশুনা করলেও

নতুনধারার উপরও তাঁর দৃষ্টি ছিলো। নতুন ধারার লেখকদের দুর্বলতা সম্পর্কেও তিনি বে-খবর ছিলেন না। সব মিলিয়ে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় তাঁর আগমন ছিলো একটি মুবারক ঘটনা। তাঁর আগমনে পড়াশুনার পরিবেশ যেমন ভালো হয়েছিলো, তেমনি এতে ঘটেছিলো অনেক ব্যাপকতা ও গভীরতা।

আমার এক পুরোনো সহপাঠী হাফেজ মাওলানা ইমরান খান নদভী আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে শরিয়া অনুষদে উচ্চতর গবেষণা শেষ করে দারুল উলুমে এসে নায়েবে মুহতামিম হিসাবে যোগ দেন তিনি ১৯৩৯ সালে। তার আগমনে দারুল উলুমের ব্যবস্থাপনাকর্মে বেশ গতি সঞ্চার হয়েছিলো। আমাদের সাথে এসে যোগ দিলেন একজন ভালো ব্যবস্থাপক সংগঠক ও প্রভাবশালী সাথী।

কিন্তু এ-যোগের মাঝেও একটি বিরাট বিয়োগ এস যোগ হলো। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামাকে মুখোমুখি হতে হলো দীনি ও ইলমী এক বিরাট ক্ষতির। সে ক্ষতি হলো এই যে, শ্রদ্ধেয় মুহতামিম ও দীর্ঘ দিনের শায়খুল হাদীস আল্লামা হায়দার হাসান খান তুংকী রহ.-এর চলে যাওয়া। এমনিতে তাঁর শরীরটা বেশি ভালো যাচ্ছিলো না। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় তাঁর বিশাল দায়িত্ব, এখানকার 'এই মুহূর্তের প্রতিকূল' আবহাওয়া ও বয়সের ন্যুজতা— সব মিলিয়ে তুংক ফিরে গিয়ে সেখানকার স্বাস্থ্যানুকূল আবহাওয়ায় স্বাধীনভাবে কাজ করে যাওয়াই তাঁর জন্যে অনুকূল ছিলো। তা ছাড়া ওখানে হযরতের প্রতিষ্ঠা-করা মাদরাসায়ে ফোরকানিয়াও তাঁকে টানছিলো। ফলে ৩রা যিলহজ্ব ১৩৫৮ হিজরীতে হযরত একেবারে চলে গেলেন নদওয়াকে বিদায় বলে স্বদেশভূমি তুংকে। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা এভাবেই বঞ্চিত হলো উচ্চস্তরের এক মুহাদ্দিস, এক সাহেবে নিসবত বুযুর্গ, ইলমে ওহীর এক গভীর সমুদ্রের বরকতের ধারা ও অভিভাবকত্ব থেকে।

শাইখুল হাদীস আল্লামা হায়দার হাসান খান রহ. চলে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় শাইখুল হাদীস হিসাবে দায়িত্ব পেলেন হযরত মাওলানা শাহ হালীম আতা সাহেব। এদিকে মাওলানা ইমরান খান নদভী সাহেবের উপর মুহতামিম হিসাবে দায়িত্বভার ন্যস্ত হলো। আমাদের মাঝে চমৎকার সমন্বয় ছিলো। তিনি আমাকে আমার কাজে সহযোগিতা করতেন আর আমি তাঁকে তাঁর কাজে সহযোগিতা করতাম। এ পারস্পরিক সমন্বয় ও আস্থায় দারুল উলুমের পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব পড়লো। ব্যবস্থাপনা যেমন অনেক সুন্দর হলো তেমনি পড়ালেখার পরিবেশও অনেক উন্নত হলো, ছাত্রদের আমল-

আখলাকও অনেক উন্নতি করলো, প্রাতিষ্ঠানিক কাজ-কর্মেও বেশ গতি সৃষ্টি হলো, মুহতামিম সাহেব পাশাপাশি নজর দিলেন দারুল উলুমের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে। প্রয়োজনে তিনি এ জন্যে দূরের সফরেও বেরিয়ে গেলেন দিনের পর দিন।

দারুল উলুমের আরো দু'জন বুযুর্গ ক্রমে ক্রমে চলে গেলেন দুনিয়া ছেড়ে। একজন হলেন হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব রহ.। তিনি মা'কুলাতের এর অনেক বড় ও সফল উস্তায ছিলেন। তাঁর বয়ান ও আলোচনা শুনতে ছাত্ররা সব সময় উন্মুখ থাকতো। ২রা জুলাই ১৯৩৬ সালে ইন্তেকাল করেন। আরেকজন হলেন আমার প্রিয় উস্তায হযরত মাওলানা শিবলী সাহেব। দারুল উলুমের অনেক প্রিয় ও সম্মানিত উস্তায ছিলেন তিনি। তিনি ইনতিকাল করেন ১৯৪৫ সালে। রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

সপ্তম অধ্যায়

নদওয়াতুল উলামা'র পক্ষ থেকে সিলেবাস ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর কিতাব রচনা, আরো কিছু নতুন কিতাব

নতুন করে সিলেবাসের কিতাব প্রণয়ন ও তার গুরুত্ব

নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের ভিত্তি ছিলো শিক্ষাদর্শনে সুদূর প্রসারী একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার উপর। ধর্মীয় শিক্ষা সিলেবাসের মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চারও নদওয়াতুল উলামার একটি উদ্দেশ্য। চলমান যুগের চাহিদা ও দাবিকে সামনে রেখে গঠনমুখী সংস্কার সাধনও এর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। নদওয়াতুল উলামা সিলেবাসের নির্দিষ্ট কিতাব নয়, বরং বিষয়-এর উপর গুরুত্ব দেয়। প্রান্তিক বিষয় নয়, বরং মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা ও পরিপক্বতা সৃষ্টির পক্ষে এর জোরালো অবস্থান। সর্বোপরি, নদওয়াতুল উলামা 'মুতাকাদ্দিমীন' (পূর্ববর্তী শিক্ষাতত্ত্ববিদ উলামায়ে কেরাম)- প্রণীত পন্থা ও ধারাকে আবার ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। সে পন্থা ও ধারাতেই আছে আবেগের খোরাক এবং বুদ্ধির পাথেয়। তা ইলম ও রুচিকে দান করে একদিকে পরিপক্বতা অন্যদিকে যাবতীয় প্রান্তিক বিতর্ক থেকে বেঁচে থাকার মানসিক শক্তি। শরাহ ও হাশিয়ায় নিজের সবটুকু মেধা ও প্রতিভা ঢেলে দেয়ারও বিপক্ষে যার অবস্থান। এ ছাড়া নদওয়াতুল উলামা'র আরেকটি বিশেষ লক্ষ্য হলো, আরবী ভাষাকে একটি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ভাষা হিসাবে শিক্ষাদান, যাতে অনরাবরাই আরবদেরকে আরবীতে সম্বোধন করতে সক্ষম হয়, যাতে আরব-আজম সর্বত্র এ ভাষার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত ও পয়গাম ছড়িয়ে দেয়া যায়। ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হয় আরবী পড়া-লেখা-বলা'র সুযোগ্যতা। নদওয়াতুল উলামার এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৩১২ হিজরীতে নিজস্ব কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন 'দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান ছিলো সমস্ত হিন্দুস্তানে অন্যান্য মাদরাসার জন্যে একটি জীবন্ত নমুনা।

এর মূল লক্ষ্য ছিলো দু'টিঃ

এক. এমন সিলেবাস তৈরী যা এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী হবে। সে সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ বদলা হবে, যা বাধ্য হয়ে এক সময় উপযুক্ত কিতাবের অনুপস্থিতিতে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো । যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বিরোধী কিতাব পড়ানো হয়, তাহলে এ সিদ্ধান্তকে এক রকম আত্মঘাতি সিদ্ধান্তই বলতে হবে। সুতরাং (জেনে কিংবা না-জেনে) যারা এমনটি করেন তারা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই অবস্থান নেন।

দুই. এমন উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলা, যারা শুধু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সাথে একমতই হবেন না, বরং এ জন্যে তারা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করবেন এবং সবাইকে এর দিকে ডাকবেন, উদ্বুদ্ধ করবেন। সর্বোপরি, তারা নিজেদের ভিতর থেকেই গড়ে তুলবেন প্রতিষ্ঠানের জন্যে জীবন্ত ও বাস্তব নমুনা, তারা সকল সাধনা ব্যয় করবেন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্যে, শতভাগ সফল শিক্ষক সৃষ্টি করার জন্যে, যারা সক্ষম হবে এ কথা প্রমাণ করতে যে, তাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিকল্পনা অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পদ্ধতি ও পরিকল্পনা থেকে ভালো ও উত্তম।

একদম সূচনাতেই এ ধরনের শিক্ষক ও উস্তায পাওয়া যাওয়া সম্ভব ছিলো না, যাদের সংস্কৃতি ও মানসিকতা কাঙ্ক্ষিত এ ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির ছায়ায় গড়ে ওঠবে। কারণ, তা এখনো বাস্তবায়নেরই সুযোগ হয় নি। কিন্তু এমন আসাতিযায়ে কেরামের উপস্থিতি অবশ্যই সম্ভব ছিলো, যারা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু এমন আসাতিযা খুঁজে বের করার জন্যে দরকার গভীর পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্মদৃষ্টি।

এ ছিলো এক তিক্ত ইতিহাস যে, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা প্রথম দিকে নিজস্ব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নানা প্রতিকুলতার মুখোমুখি হয়েছিলো, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধও দেখা দিয়েছিলো। এ মতবিরোধ নিরসনে, ভবন নির্মাণে ও অন্যান্য প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহে, দেশে নদওয়াতুল উলামা'র পরিচয় তুলে ধরতে, বিশেষত দীনি হালকায় এর প্রতি আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টিতে তখন দায়িত্বশীলদেরকে প্রচুর সময় দিতে হচ্ছিলো। এর ফলে অতি প্রয়োজনীয় সিলেবাসের দিকে ভালো করে নজর দেয়ার আর অবকাশ মিলে নি। অনুরূপভাবে উপযুক্ত আসাতিযা তৈরীরও

সুযোগ হয় নি। সিলেবাসে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সব কিতাবই ছিলো পুরোনো ধাঁচের। আসাতিযায়ে কেরামের মধ্যেও বড় অংশ ছিলেন প্রাচীনধারার মাদরাসার ফারিগীন। এ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে নদওয়াতুল উলামা নিজস্ব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দান করতে এবং মানসম্পন্ন উন্নত শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হিমশিম খাচ্ছিলো। পাশাপাশি দেশের বুকে এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বেও নদওয়াতুল উলামা আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারছিলো না। বড় কোনো কীর্তি ও অবদানও পেশ করতে সক্ষম হচ্ছিলো না, তবে কিছুসংখ্যক আসাতিযা ছিলেন ব্যতিক্রম। তারা প্রাচীনধারার মাদরাসায় পড়াশুনা করলেও নিজেদের চেষ্টা-সাধনা-অধ্যাবসায় এবং উস্তাযগণের সান্নিধ্যে নিরত থেকে অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের যেমন ছিলো ইলমী গভীরতা, আরবী-উর্দূতে পারদর্শিতা, তেমনি ছিলো উদার প্রশস্ত দৃষ্টি ও জ্ঞান-গবেষণার প্রতি একনিষ্ঠ ঝোঁক। লেখালেখিতেও তারা ছিলেন আদর্শ নমুনা।

এ অবস্থা বহাল ছিলো নদওয়াতুল উলামা'র ষষ্ঠ নাজেম ডা. মাওলানা সায়্যিদ আবদুল আলী সাহেব রহ.-এর সময়কাল পর্যন্ত। তিনি সুদীর্ঘ সময় ধরে নাজেম ছিলেন ৩০ বছর। তিনি নদওয়াতুল উলামার সদস্যদের যথাসাধ্য সহযোগিতাও লাভ করেছিলেন। সবাই ছিলেন তাঁর প্রতি আস্থাশীল। তাঁর সময়কাল কেটেছে বেশ সুশান্ত ও কর্মময় অবস্থায় (দু'টি ছাত্র-প্রতিবাদের ঘটনা ছাড়া)। ছিলো না কোনো ধরনের হাঙ্গামা ও দলাদলি। তিনি ছিলেন আধুনিকধারা ও প্রাচীনধারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার একজন আদর্শ সমন্বয়ক। একদিকে তিনি ছিলেন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার সনদপ্রাপ্ত, অপরদিকে দারুল উলুম দেওবন্দের বিশিষ্ট ফারেগ। পাশাপাশি ছিলেন একজন পূর্ণ চিকিৎসক— আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও, প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানেও। তাঁর আচারণ ছিলো মিষ্টি। সবার সাথেই মিশে যেতে পারতেন। সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান তো তাঁর জানা ছিলো, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। আধুনিক শিক্ষার উপরও তাঁর চোখ ছিলো। সবকিছুর সমন্বয়ে তিনি ছিলেন যুগ সচেতন বাস্তবপ্রেমী। তাঁর সাফল্যের আরেকটি অন্যতম কারণ ছিলো দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র নাজেমে তা'লিমাত (শিক্ষাসচিব) আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.-এর সহযোগিতা আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন। আরো পাশে পেয়েছিলেন তিনি মাওলানা মাসউদ আলী সাহেবকে, যিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র কাজে বড়ো মনোযোগী ও তৎপর ছিলেন। আরো

পেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নিষ্ঠাবান কোষাধ্যক্ষ মুন্সী ইহতিশামুল হক সাহেবকে, ছিলেন মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী সাহেব। সবাই তাঁকে সহযোগিতা করতেন। তাই এ সময়টাই ছিলো নদওয়াতুল উলামার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নবান্ধব সিলেবাস এবং উপযুক্ত ও সুপ্রশিক্ষিত আসাতিযায়ে কেরাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজে হাত দেয়ার সুবর্ণ সময়।

সবার আগে ভাইজান নজর দিলেন আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের দিকে। এ বিষয়ে যে সিলেবাস তখন পড়ানো হচ্ছিলো, তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না তিনি। এ বিষয়টা আসলেই একটু ভাবনার। কেননা আরবী ভাষা ও সাহিত্য শুরু থেকেই দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র সবচে' অগ্রাধিকারযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো। স্বয়ং নদওয়াতুল উলামার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী রহ. নিজের লেখা ও পত্রাবলীতে এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সরাসরি যাতে আরব শায়খদের কাছে ছেলেরা আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিখতে পারে সে জন্যে অনেক চেষ্টাও করেছেন তিনি।

আরবী ভাষা শেখানোর জন্যে নদওয়াতুল উলামার ভিতর থেকে ধরতে গেলে কোনো কিতাবই রচিত হয় নি, একমাত্র কিতাব ছিলো (دروس الأدب), যা লিখেছিলেন আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.। এ কিতাবটি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিলো। নদওয়াতুল উলামার বাইরেও অনেক মাদরাসায় তা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। হিন্দুস্তানে এটি ছিলো এ ধারার প্রথম কিতাব। কিন্তু আরবী ভাষা অধ্যয়নের পূর্ণতার জন্যে যে গদ্য সাহিত্য প্রয়োজন ছিলো, আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন নমুনা ও পন্থা সামনে থাকা দরকার ছিলো, এবং এর ফলে আরবী ভাষায় বলা ও লেখার যে যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিলো, উপযুক্ত কিতাবের অভাবে তা হচ্ছিলো না। অনেক দিন পর্যন্ত دروس الأدب (١-٣) ও مقامات الحريري (যা কিছু কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহিত্যের ছাত্রদের জন্যে একটি উপকারী ও জরুরী কিতাবই ছিলো।)-এর মাঝখানে অন্য কোনো কিতাব ছিলো না। ফলে বাধ্য হয়েই অতি পুরোনো ধাঁচের কিছু কিতাব সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে এ ছিলো এক বিরাট অন্তরায়। অনেকদিন পর্যন্ত إخوان الصفا পড়ানো হয়েছে, যা মূলত কোনো আরবী আদবের কিতাব ছিলো না। কিছুদিন মুহাম্মদ তালআত হারব-এর تاريخ دول العرب والإسلام ও পড়ানো হয়েছে। 'সীরাতে মুগলতায়ী'ও কিছুদিন পড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া আল্লামা

যামাখশারী'র أطواق الذهب ও সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আরবী কবিতা সাহিত্যে পড়ানো হতো তখন কবি আবুল আতাহিয়া'র কাব্য সংকলন। এ চয়ন কিছুটা পুরোনো ছিলো। এর পরের ধাপেই পড়ানো হতো গদ্যে মাকামাতে হারিরী এবং পদ্যে হামাসা ও সাবউল মু'আল্লাকাত।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য ঃ যেভাবে সিলেবাসের সংস্কার শুরু

ভাইজানের ইচ্ছে ছিলো মিশর শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত আরবী সিরিজকেই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা। সে সময় সিলাবাসে 'সামান্য পরিবর্তন'-এর জন্যেও পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সাথে আলাপ করে অনুমোদন নিতে হতো। এ পরিবর্তনের মূল পরিকল্পক ছিলেন ভাইজান এবং খলীল আরব সাহেব। আশা করা হচ্ছিলো, আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ.ও তাঁদেরকে সমর্থন করবেন। ভাইজান এ ব্যাপারে মজাদার ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সিলেবাসের পরিবর্তন নিয়ে নিয়মিত মজলিস হচ্ছিলো কাকুরী কুঠিতে। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী সভাপতিত্ব করছিলেন। আমি জানি না, আরব সাহেব এ মজলিসের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন নাকি কোনো জরুরী কাজে তিনি কোথাও আটকা পড়েছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হন নি। আমি প্রস্তাব পেশ করলাম যে, القراءة الرشيدة সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। শেরওয়ানী সাহেব জানতে চাইলেন, এ প্রস্তাব কে কে সমর্থন করেন? মসায়্যিদ সোলায়মান নদভী নীরবে বসে রইলেন, কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না। মুন্সী ইহতিশাম আলী সাহেব বললেন, আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি। বিপক্ষে কেউ-ই হাত ওঠালেন না, প্রস্তাব পাস হয়ে গেলো। আমি মুন্সী সাহেবকে —যিনি আরবী জানতেন না এবং আলেমও ছিলেন না— জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেমন করে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন? তিনি বললেন, এ প্রস্তাব আপনাদের পক্ষ থেকে এসেছে আর আপনাদের ব্যাপারে আমার ভরসা আছে।'

এ সব বিস্তারিত বলার কারণ আছে। এতে ফুটে উঠেছে, সিলেবাস পরিবর্তনের বিষয়টি তখন কতো মুশকিল এবং নাজুক ছিলো। القراءة الرشيدة সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরই মিশরের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক কামেল কিলানী'র লেখা শিশু সিরিজ حكايات الأطفال ও সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ সিরিজটি শিশুদের জন্যে ভীষণ উপকারী। শিশুর কোমল মানসিকতা এবং ভাষা শেখার নতুন নতুন নিয়ম কানুনকে সামনে রেখে

কিতাবটি রচিত হয়েছে খুবই সহজ সাবলীল ভাষায়, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায়। ধাপে ধাপে শিশুর যোগ্যতাকে উপরে নিয়ে যায়। কাহিনীও সব হৃদয়কাড়া। সাথে আছে রঙ্গিন চিত্রাঙ্কন; কিন্তু ধর্মের কোনো ছোঁয়া নেই, নৈতিকতার শিক্ষা থেকে একদম মুক্ত।

কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবারও আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা আছে তা শুধু বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের গল্প, তার ছবি। কিতাবের শুরুতে যদি কোনো খৃষ্টান লেখকের নাম জুড়ে দেয়া হয়, তাহলে কেউ বলবে না এটার লেখক কামেল কিলানী। কিন্তু এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও আরবী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এবং বাচ্চাদের জন্যে ভীষণ হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়।

মুখতারাত সংকলন

এটিই ছিলো খুব স্বাভাবিক যে প্রথমেই রচিত হবে القراءة الرشيدة ও حكايات الأطفال হিসাবে এমন কোনো কিতাব যা আরবী ভাষার বুনিয়াদি নিয়ম-কানুন সম্বলিত হওয়ার পাশাপাশি শিশুতোষ মানসিকতার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করবে, নতুন শিক্ষা-অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, আর এর মাধ্যমে উপকৃতও হওয়া যাবে। সাথে সাথে এতে আরো থাকবে নৈতিকতা শিক্ষার শিশুতোষ উপকরণ, নৈতিকতার আধার—বড় বড় বুযুর্গদের কথা, মহান পূর্ব পুরুষের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলকথা তুলে ধরা হবে। কিন্তু যা চাওয়া হয়, সব সময় তা হয় না, ঘটনাপ্রবাহ ছুটে চলে উল্টো দিকে, প্রয়োজন ও যুক্তি সেখানে সামনে থাকে না। প্রথমেই আমার মাথায় এলো আরবী গদ্য ও পদ্যের এমন একটি সংকলন প্রস্তুত করার কথা যা প্রথম শতাব্দি থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নমুনাকে একে একে অন্তর্ভুক্ত করবে, যাতে থাকবে না অন্ত্যমিল ও ছন্দমিলের বাড়াবাড়ি, কৃত্রিমতা ও লৌকিকতাও থাকবে না। থাকবে হৃদয়ের সহজাত আবেগ-অনুভূতি, সুন্দর ও সঠিক চিন্তা-চেতনার ঝলক, যা আরবী ভাষার শুধু কোনো নির্দিষ্ট রঙ ও ঢঙকেই উপস্থাপন করবে না, যার নজির আমরা দেখতে পাই মাকামাতে হারিরীতে, যা হিন্দুস্তানের ইলমী ও দরসী হালকায় ছয় শতক ধরে এমনভাবে 'রাজত্ব করছে' যেনো এ ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যের আর কোনো 'কিতাব' নেই।

এ চিন্তাটাই ছিলো আমার 'মুখতারাত' রচনার প্রথম ভিত্তি। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে রচিত হয়েছে 'মানসূরাত'[1] এবং অন্যান্য কিতাব। এ ধারণা ও চিন্তার উপর ভিত্তি করেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৮১ সালের ১৭-১৯-শে এপ্রিল আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সম্মেলন। যেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন দেশ-বিদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও লেখক-সাহিত্যিকগণ। আরব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুষদের প্রধানগণ।

এখানে 'মুখতারাত' কিতাবের ভূমিকার একটা অংশ উপস্থাপন করছি যাতে এ কাজের গুরুত্ব ও উপকারিতা স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যায়।

যে কোনো সাহিত্যের জন্যে বেদনাদায়ক বিষয় হলো সে সাহিত্যের উপর সওয়ার হয়ে বসবে এমন একটি দল যারা সাহিত্যকে একটি পেশাগত বিষয় হিসাবে বেছে নেয় এবং তা কব্জা করে নেয়, সাহিত্যের গায়ে রঙ-বেরঙের জামা চড়িয়ে নিজেদের দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যায়। সাহিত্যকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এমন কি অবস্থা এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, সাহিত্য তাদের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, শুধু তাদের উত্তরাধিকার হিসাবেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর এমন সময়ও আসে যখন মানুষ সাহিত্য বলতে বোঝে শুধু তাদের বর্ণিত লেখা ও কথাকেই, যা কেবলই কৃত্রিমতায় ঢাকা। গতানুগতিকতায় ঠাসা। নেই তাতে কোনো প্রাণ, নেই কোনো শক্তি, কোনো নতুনত্ব ও অভিনবত্বও নেই, কোনো আকর্ষণ ও মজাও নেই। এ কৃত্রিম ও গতানুগতিক রসকষহীন সাহিত্য ওই সহজ সাবলীল ও সহজাত সাহিত্যকে গ্রাস করে ফেলতে চায়, যা বর্ণিত হয়ে এসেছে উম্মাহর কীর্তিপুরুষদের কথায় ও কলমে, যার প্রাচুর্য নিয়ে গর্ব করে উম্মাহর বড় বড় গ্রন্থাগারগুলো, যা স্বভাবজাত গদ্যের ভাষায় এবং অলংকারমিশ্রিত অভিব্যক্তিতে হৃদয়-মনে সৃষ্টি করে বিপুল মুগ্ধতা ও আকর্ষণ। চিন্তার ব্যাপ্তিকেও অনেক বাড়িয়ে দেয়, যা কোনো কিছুর অন্ধ অনুসরণ থেকে বাঁচায়, মনে সৃষ্টি করে আত্মবিশ্বাস। অর্থাৎ সে সহজ-সরল সাবলীল সাহিত্যে খুঁত খুঁজে পাওয়া যাবেই না, খুঁত থাকলে আছে ওই একটাই, তা বের হয়ে এসেছে এমন লোকদের কলম ও মুখ থেকে, যাঁরা সাহিত্য চর্চা ও রচনার দিকে কখনোই ঝুঁকেন নি। সাহিত্যকে কখনোই তাঁরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি। আয়-রোজাগারের পথ হিসাবেও বেছে নেন নি, সাহিত্য-শিল্পী বা

---

১. মাওলানা রাবে হাসানী নদভী রচিত

নামকরা লেখক হিসাবেও তাঁরা খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন নি, তাঁদের চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়-ছোঁয়া ও নান্দনিক 'সাহিত্যকর্ম' সাহিত্যের কোনো শিরোনামে পরিচিত হয় নি। সাহিত্য প্রসঙ্গেও তা রচিত বা উচ্চারিত হয় নি। তা রচিত হয়েছে দ্বীনি বিষয় হিসাবে, গবেষণামূলক ও ইলমী কিতাব হিসাবে। কিংবা দার্শনিক বা সমাজতত্ত্ব বিষয়ক কিতাব হিসাবে। তাই দ্বীনি সাহিত্য হিসাবেই তা অখ্যাত ও অনাদৃত হয়েই দ্বীনি নৈতিক ও ইলমী কিতাবের পাতায় পড়ে আছে, প্রচলিত সাহিত্য-শিল্প 'অহঙ্কারবশত' নিজের কাতারে একটু জায়গা দিতেও প্রস্তুত হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাসবোদ্ধারাও সংকীর্ণ চিন্তা ও ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এর প্রতি নজর দেয় নি, যথাযথ স্থান দিতে পারে নি।

এই স্বভাবজাত সুন্দর সাবলীল ও শক্তিমান সাহিত্য যে খুব অল্প— তা কিন্তু নয়, তা আরবী গ্রন্থাগারের নীরব ভা-ারে সীমাহীন এবং প্রচলিত পোশাকী সাহিত্যের চেয়ে তা অনেক বেশি প্রাচীন। কেননা এ সাহিত্যের জন্ম হাদীসের কিতাবে, সীরাতের কিতাবে। আর বর্তমান প্রচলিত শিল্প-সাহিত্যের জন্ম হয়েছে অনেক পরে পত্র-সাহিত্য ও মাকামা সাহিত্যের (ছান্দসিক কাহিনীভিত্তিক দ্বি-চারিত্রিক গল্পের) নামে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো প্রচলিত শিল্প-সাহিত্য যে সুদৃষ্টি লাভ করেছে সাহিত্য-গবেষকদের কাছে, এ সাহিত্য তাদের কাছে সে গুরুত্বটা পায় নি। অথচ এ সাহিত্যের ভিতরেই জ্বলে উঠেছে আরবী ভাষার মূল প্রাণ ও জীবনী শক্তি এবং গভীর তাৎপর্য ও রহস্য। ভাষাবিদদের সুযোগ্যতা ও বিচক্ষণতাও এখানে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। এটিই মূলত সাহিত্যের প্রধান ও মূল উৎসধারা।

হাদীস পড়ার সময়ই দেখেছি যে, সিহাহ সিত্তায় এমন অনেক দীর্ঘ বর্ণনা আছে, যেখানে কোনো সাহাবী অথবা সাহাবিয়্যাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা নিজের কোনো সফরের ঘটনা কিংবা জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করছেন বিশদভাবে সাবলীল হৃদয়াবেগের মিশ্রণে। যেখানে স্বচ্ছন্দে তাঁরা ব্যবহার করেছেন প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, অথচ কী তার শিল্পমান! কী তার হৃদয়গ্রাহিতা! এর সুন্দর নমুনা লক্ষ্য করতে পারি আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণিত 'হাদীসে হিজরতে', 'হাদীসে ইফকে'। হালিমা সা'দিয়া রা.-এর দুধ পান করানোর ঘটনাতে। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা.-এর মহা অগ্নি পরীক্ষার ঘটনা—তাবুক অভিযানে অংশ না-নেয়ার বর্ণনায়ও তা দেদীপ্যমান। উপরিউক্ত হাদীসসমূহে আরবী ভাষার যে অলংকার ও নান্দনিকতা ফুটে

উঠেছে, তা নজিরবিহীন। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরবী ভাষা এবং চমৎকার বাগধারা ও অভিব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের পর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পুরা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে আরবী ভাষার এ চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে আরো অনেক সাহাবীর শক্তিমান বক্তব্যে— আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গঠনাকৃতি বর্ণনাকালে অথবা অন্য কোনো মর্যাদাবান সাহাবীর পরিচিতি তুলে ধরার ধারা বর্ণনায়।

الضياء পত্রিকার প্রকাশকালে প্রথম সংখ্যায় আমি এ সাহিত্যের একটি নমুনা পেশ করার চেষ্টা করেছি। শিরোনাম ছিলো—الأدب النبوي—নববী সাহিত্য। এরপর যখন দামেস্কের প্রাচীন ও সারা দুনিয়ায় খ্যাতিমান المجمع العلمي—'গবেষণা একাডেমি'র পক্ষ থেকে আমাকে সদস্যপদ দেয়া হলো ১৯৫৭ সালে এবং আমার কাছে আরবী ভাষার কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে একাডেমি'র গবেষণা পত্রিকায় লিখতে বলা হলো, তখন আমি বেছে নিলাম এই শিরোনাম— المكتبة العربية في حاجة إلى بحث وغربلة جديدة — আরবী গ্রন্থাগারকে নতুন করে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। এখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, আরবী সাহিত্য ও তার ইতিহাস নতুন করে উপস্থাপন করতে হবে, আরবী সাহিত্যের ভিতরে লুকিয়ে আছে যে 'রত্নভাণ্ডার', তাও তুলে-তুলে আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে অনেক বিস্তৃত পরিসরে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছি। দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো অনেক প্রশস্ত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছি। প্রচলিত গৎবাঁধা সাহিত্যের সীমিত গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ মত আমার অনেক পুরোনো। শুধু আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই ব্যক্ত করি নি, বরং সব ভাষার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য, যে ভাষার ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে, যে ভাষার প্রাণময়তা আছে।

ভাইজানের অনুমতি নিয়ে আমি 'মুখতারাত'-এর কাজ শুরু করলাম। ১৩৫৯ হিজরী/ ১৯৪০ সালের মধ্যে এমন একটি সংকলন তৈরী করে ফেললাম যা দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্রদের উপযোগী ছিলো। এরপর কঠিন কঠিন শব্দ ও ইবারত বোঝার যোগ্যতা তৈরী হওয়ার জন্যে এবং যে কোনো মাদরাসায় আরবী ভাষা শেখার ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে শুধু 'মাকামাতে হারিরী' পড়ার প্রয়োজন বাকি থেকে যেতো। এইসব দীর্ঘ হাদীস ও সীরাত সম্পর্কিত বর্ণনা ছাড়াও আরবী ভাষার মধুময় সাবলীলতা ও নান্দনিকতার শ্রেষ্ঠ কিছুও 'মুখতারাত'-এ অন্তর্ভুক্ত হলো। আরো সংযোজিত হলেন এমন সব ব্যক্তিত্ব, লেখক সাহিত্যিক হিসাবে যাঁরা

একদম পরিচিত নন, যেমন শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহ., হযরত হাসান বসরী রহ., ইবনুস সাম্মাক আল-মাসউদী রহ., ইমাম গাযালী রহ., ইবনুল জাওযী রহ., ইবনে হিব্বান আল-বাস্তী রহ., হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ., আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ., ইবনে খালদুন রহ. ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ.সহ প্রমুখ। 'মুখতারাত'-এর সংকলন তৈরী হয়ে যাওয়ার পর প্রথম দুয়েক বছর আমি লিখে লিখেই ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিলাম। কিন্তু এতে অনেক সময় লাগতো। সুতরাং 'মুখতারাত' ছাপানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। নাজেমে তা'লিমাত আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী রহ. ছাপানোর অনুমতি দিলেন। সে সময় হিন্দুস্তানে আরবী টাইপ শুধু দু জায়গাতে ছিলো— দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ ও মাকতাবায়ে কায়্যিমাহ, বোম্বাই। কিন্তু খরচ পড়ে যেতো অনেক।

অবশেষে 'নিজামী প্রেস', লখনৌ থেকেই ছাপার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রেসের মালিক মির্যা মুহাম্মদ জাওয়াদ সাহেব এতো সুন্দর ও নিখুঁত করে কিতাবাত করিয়েছেন যে, প্রথম দেখায় টাইপের সাজানো অক্ষর বলেই ভ্রম হয়। ছাপার কাজ শুরু হওয়ার আগে আমি হযরত মাওলানা আবদুল হাফিজ বিলইয়াভী সাহেবকে (মিসবাহুল লুগাত সংকলক ও দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা'র আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উস্তায) অনুরোধ করলাম কঠিন কঠিন শব্দগুলোর অর্থ ও প্রয়োজনীয় টিকা লিখে দিতে। তিনি 'না' বললেন না, বরং বড়ো সুন্দর করে অনেক পরিশ্রম করে ভীষণ দক্ষতার সাথে এ কাজটি করে দিলেন।[১] ১৩৬১ হিজরী মুতাবিক ১৯৪২ সালে এ কিতাব ছাপাখানা থেকে ফিরে এলো নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে। কিছুদিন পর বন্ধুবর মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়াঈ সাহেবের পরামর্শে সহজ ও কঠিন হিসাবে আমি কিতাবটিকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলি। ১৯৫৬ সালে আমি যখন দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে যাই (যার বিস্তারিত বিবরণ একটু পরই আসছে), তখন আমি সেখানকার এক নামীদামী ছাপাখানা: المطبعة الجديدة থেকে সুন্দর টাইপে মুখতারাত-এর প্রথম খণ্ডটি দারুল উলূমের পক্ষ থেকে ছাপার ব্যবস্থা করে ফেলি। অবশ্য চার পাঁচ বছর পর ছাপার এ আধুনিক উপকরণ ও প্রযুক্তি হিন্দুস্তানে চলে আসে। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় খণ্ডটি হায়দারাবাদে দাইরাতুল মা'আরিফ থেকে ছাপানোর সুযোগ হয়। ১৩৮৬

১. মাওলানা দুনিয়াতে এখন নেই। ১৭ই জুমাদাল উখরা ১৩৯১ হিজরী মুতাবিক ১০ আগস্ট ১৯৭১ সালে ইন্তেকাল করেন।

হিজরী / ১৯৬৫ সালে বৈরুতের 'দারুল ফিকরিল হাদিস' থেকে ভীষণ সুন্দর ছাপা ও উন্নত কাগজে আবার প্রকাশ পায়, দুই খণ্ড এক মোড়কে। এবার মুখতারাত উপযোগী হলো আরব দেশে প্রবেশের এবং পড়ার। সে সময়েই এ কিতাব দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের কিতাব হিসাবে সিলেবাসভুক্ত হয়। এক হিন্দুস্তানী অনারব লেখকের জন্যে এ ছিলো বড়ো সম্মানের ব্যাপার যে, বিশুদ্ধ আরবী ভাষার উপর তার সংকলিত কোনো কিতাব আরব দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভুক্ত হবে। সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর!

আরবী সাহিত্যের উচুঁ মাপের লেখক ও সাহিত্যিক শায়খ আলী তানতাভী, লেখক যাকে মিশরের গণ্যমান্য লেখক-সাহিত্যিকদের চেয়েও অনেক বড় মাপের লেখক-সাহিত্যিক মনে করেন, তিনি দামেস্কে ও সৌদি আরবে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা অনুষদের অধ্যাপক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। একবার তাঁর চোখ পড়ে যায় আমার 'মুখতারাত'-এর উপর। المسلمون في الهند কিতাবের ভূমিকা লিখছিলেন তখন। সে ভূমিকায় 'মুখতারাত' সম্পর্কেও এই মন্তব্য করেছিলেন—

'লেখকের রুচিবোধের পরিচায়ক যদি হয় তার নির্বাচন, তাহলে পাঠককে তার একটা নমুনার কথা বলছি। এই কিছুদিন আগে আমরা একবার অনেক 'মুখতারাত' জমা করলাম। উদ্দেশ্য হলো, যে কোনো একটি নির্বাচন করবো দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ অনুষদের ছাত্রদের জন্যে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব যাঁদেরকে দেয়া হয়েছিলো তাঁরা সবাই বিশিষ্ট লেখক-গবেষক-সাহিত্যিক। সব যাছাই-বাছাইয়ের পর যে জায়গাটায় এসে সবাই একমত হলেন, তা হলো, এই সব 'মুখতারাত'-এর মধ্যে আবুল হাসান আলী নদভী'র 'মুখতারাত'-ই সেরা!'

এরপর শায়খ আলী তানতাভী প্রাচীনধারার নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন বলেছেন যে, কেমন করে সাহিত্য বিশ্লেষকগণ এবং গ্রন্থপ্রণেতাগণ দুঃখজনকভাবে হাতে গোনা কয়েকজন সাহিত্যিক ও রচনা-শিল্পীর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি আর আমাদের ছাত্র ও যুবকদেরকেও এদের জিন্দানখানায় আটকে রাখতে ছাড়েন নি। এরা সাহিত্যকে জীবন ও বাস্তবতা থেকে যোজন যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছে। হৃদয়ের স্পন্দনও এরা শুনতে পান না, কেবল শব্দের কারুকার্য ও সাজসজ্জা, কেবল লোকদেখানো মনভোলানো কসরত।

'মুখতারাত' বেশ দ্রুতই সমাদৃতি লাভ করলো। কিন্তু তা প্রথমে দৃষ্টি কেড়েছে আধুনিক তবকার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বি.এ. ও এম.এ. ক্লাসের ছাত্র-শিক্ষকদের। শায়খ খলীল আরব সাহেবের ছোট ভাই শায়খ উবায়দ বিন মুহাম্মদ আরব, যিনি আরবী ভাষার অধিকাংশ সিলেবাস কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় আলিগড়, এলাহাবাদ, হায়দারাবাদসহ বিভিন্ন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুখতারাত' পাঠ্যভুক্ত করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রাচীনধারার মাদরাসাগুলোয় 'মুখতারাত' অতোটা সমাদৃত ও গৃহীত হয় নি। এখানে সম্ভবত انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال-এর পরিবর্তে انظر إلى من قال ولا تنظر إلى ما قال এর দিকেই বেশি তাকানো হয়। তবে আমাদের মুহতারাম উস্তায ও আরবী সাহিত্যের সবচে' বড় শিক্ষক হযরত মাওলানা ই'জায আলী সাহেব 'মুখতারাত'কে পছন্দ করেছেন এবং এর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করেছেন জেনে আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। বড়রা এমনই হয়। তাঁরা কোনো আত্মস্বার্থ দেখেন না। তাঁদের হৃদয় অনেক উদার। কিছুদিন আগে তিনি তিনি نفحة العرب নামে একটি সংকলন লিখেছিলেন, যা نفحة اليمن-এর পরিবর্তে সমস্ত দ্বীনি মাদরাসাগুলোয় পাঠ্য কিতাব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। বিশেষত যে সব মাদরাসা দারুল উলূমের আদর্শ ও সিলেবাসে পরিচালিত হতো। কিছুদিন পর 'মুখতারাত'-এর উপর একজন সৌদি শায়খের দৃষ্টি পড়লো। তিনি কিতাবটিকে খুব পছন্দ করে ফেললেন। তিনি বিভিন্ন সেখানকার কলেজে তা পাঠ্যভুক্ত করলেন এবং দুই হাজার কপির 'অর্ডার' দিলেন। ১৩৯৮ হিজরীতে 'দারুশ শুরুক জেদ্দা' থেকে 'মুখতারাত' নতুন সাজে বের হয়।

আল-ক্বিরাআতুর রাশিদা

কয়েক বছর আমার সুযোগ হয়েছে মিশরের القراءة الرشيدة পড়ানোর। দরসে এবং দরসের বাইরে। বিশুদ্ধ ভাষা, পাঠননীতি, ছাত্রদের বয়স মানসিকতা ও সাধারণ জ্ঞানের দিক থেকে সিরিজটি সফল ছিলো। এমনকি এ সিরিজে আত্মার খোরাকও বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু এটি হিন্দুস্তানের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় নি, তা রচিত হয়েছে মিশরের প্রেক্ষাপটে। মিশরে অনেক বেশি মুসলমানদের বাস থাকলেও সেখানে আছে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ছাত্রও, আছে কিবতি ছাত্রও। মিশরের জাতীয় শিক্ষানীতিতে সবার ধর্মমত প্রতিফলিত হয়েছে কমবেশি। তা ছাড়া এ সিরিজে আরো চিত্রিত হয়েছে

মিশরের মাটি ও মানুষের কথা, সেখানকার পরিবেশ ও প্রকৃতির কথা, সেখানকার ঐতিহাসিক কীর্তি ও স্থাপত্যশিল্পের কথা। বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট করতে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। যেমন এক জায়গায় এসেছে— রাওযা ব-দ্বীপ, পিরামিড, কানাতির খাইরিয়্যাহ, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া সংলাপ ইত্যাদির আলোচনা। আরো এসেছে সেখানকার বিভিন্ন জাতীয় উৎসবের আলোচনা, স্থানীয় অনুষ্ঠানের কথা, নীল নদ নিয়ে কথকতা। আরো এসেছে সেখানকার খ্যাতিমান ব্যক্তিদের আলোচনা। আরো আছে সেখানে মিশরের জাতীয় সঙ্গীত, যেখানে গাওয়া হয়েছে মিশরের মাহাত্ম্যগাথা। আলোচিত হয়েছে মিশরের বৈশিষ্ট্যমালা। এখন প্রশ্ন হলো, হিন্দুস্তানের এক ছাত্র কেনো হিন্দুস্তানে বসে মিশরের মাহাত্ম্য গাইবে? আছে এর পেছনে কোনো যুক্তি বা প্রয়োজনীয়তা? এ ছাড়া 'নীল উৎসব'ই বা কেনো হবে তাদের আওড়ানো বিষয়, যা সেখানে নিছক খৃস্টানরাই পালন করে থাকে? হিন্দুস্তানের পরিবেশ মাটি ও মানুষের সাথে এর কী সম্পর্ক আছে?

এরপর থেকেই আমার মাথায় নতুন একটি পাঠ্য-সিরিজ লেখার চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো, যা অন্যান্য কিতাবের স্থলাভিসিক্ত হতে পারে। ভাইজানের উপস্থিতি, আল্লামা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবের স্নেহদৃষ্টি এবং প্রিয় সহপাঠী মাওলানা ইমরান খান সাহেব সদ্য মুহতামিম হওয়ার কারণে এ বিশ্বাস আমার বুকে ছিলো যে, সিরিজটি লেখা হয়ে যাবে এবং তা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তও হয়ে যাবে। ব্যস, আল্লাহ ভরসা করে লেখা শুরু করে দিলাম। ১৯৪৪ সালে কাজ শুরু করলাম আর দু' বছরেই তিন খণ্ড সমাপ্ত হয়ে গেলো। সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে যেনো কোনো পাঠই 'শিক্ষা-শূন্য' না হয়। ছাত্ররা যেনো পড়তে পড়তে নৈতিক পাঠ, ধর্মীয় আবেগ ও সাংস্কৃতিক উপকার থেকেও তারা বঞ্চিত না হয়, ইসলামী মানস ও নৈতিকতার আলো যেনো তাদের উপর ছায়া ফেলে এমনভাবে যে তারা তা বুঝতেই পারবে না। পাঠ পড়তে পড়তে এবং কাহিনীর ভিতরে বাস করতে করতে তারা অনেক কিছুই জেনে ফেলবে নিজেদের অজান্তে, অনিচ্ছায়। তাদের উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে— এমন মনে হবে না। বাইরে থেকে কিছু গেলানো হচ্ছে— এমনও মনে হবে না। দ্বিতীয় খণ্ডের كسرة من الخبز (এক টুকরো রুটির ইতিকথা), تاريخ القميص (জামার ইতিহাস), ماذا تحب أن تكون (তুমি কী হতে চাও), كن أحد السبعة (সাতজনের একজন হও) ইত্যাদি লেখাগুলো পড়লে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এ ছাড়া সাধারণ জ্ঞানে যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু লেখা। যেমন— العين (ঝরনা), الأسد (সিংহ), الجمل (উট), القاطرة (ইঞ্জিন), جسم النبات (উদ্ভিদ তনু) ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে এসেছে— الحنين إلى الشهادة (শাহাদতের বাসনা), رسالة إلى رسول الله (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পয়গাম), في بيت أبي أيوب الأنصاري (আবু আইয়ূব আনসারী রা.-এর গৃহ-কাহিনী) ইত্যাদি। আর মহাপুরষদের কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে— الخليفة عمر بن عبد العزيز (খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.), الإمام مالك (ইমাম মালেক), السلطان محمود الكجراتي (সুলতান মাহমুদ গুজরাটি), شيرشاه السوري (শেরশাহ সূরী), السلطان مظفر حليم (সুলতান মুজাফফর হালীম) ও اورنكزيب عالمكير (আওরঙ্গজেব আলমগীর) প্রমুখ। উলামায়ে কেরামের মধ্যে আলোচিত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা হলেন— ইমাম গাযালী রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., মোল্লা নিযামুদ্দীন ফিরিঙ্গি মহল্লী রহ. ও আবদুল আযিয রহ.। দরসগাহের মধ্যে এসেছে— আল-আযহার, দারুল উলুম দেওবন্দ, মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর ও দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র কথা। অপরদিকে এসেছে 'কুতুব মিনার'-এর কথা المنارة تتحدث শিরোনামে। এখানে হিন্দুস্তানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ননা করা হয়েছে। হিন্দুস্তানের বুকে ইসলামের সোনালী শাসনের হাজার পৃষ্ঠার বর্ণিল ইতিহাসকে এখানে ছোট্ট আকারে বলে দেয়া হয়েছে। من النجوم إلى الأرض (তারকালোক থেকে পৃথিবী)— এ শিরোনামে লেখক আবেগের ভাষায় বর্ননা করেছেন ইসলামের সোনালী যুগের সোনালী ইতিহাস।

সিরিজটি ছেপে আসার পর প্রথমে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় পরে শাখাগুলোয় পাঠ্যভুক্ত হয়ে গেলো। এদিকে পাকিস্তানেও সিরিজটি ছাপা হলো এবং সেখানকার বিভিন্ন মাদরাসায় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

শিশু সিরিজ 'কাসাসুন নাবিয়্যিন' লেখার ইতিহাস

কিন্তু বলতে কোনো দ্বিধা নেই লেখক যে সিরিজটির জন্যে সবচে' বেশি আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং যেটিকে তিনি আখেরাতের নাজাতের ওসিলা মনে করেন, তা হলো, আরব-আজম সর্বত্র গৃহীত 'কাসাসুন নাবিয়্যিন' সিরিজটি। আগে আমি উল্লেখ করেছি যে, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় কামেল কিলানী'র حكايات الأطفال নামে একটি সিরিজ পড়ানো হতো।

আরব জাহানেও সিরিজটি বেশ সমাদৃত ছিলো। আমি নিজেও বেশ কিছুদিন সিরিজটি পড়িয়েছি। তখন দেখেছি, এ সিরিজে অনেক সমস্যা আছে। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় তা লেখা হয়েছে। ধর্মের কোনো ছোঁয়া ও পরশ নেই। আগা-গোড়া জীবজন্তুর ছবিতে ভরা। ১৯৪২ সালে আমাকে লেখা এক চিঠিতে হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ. এ সিরিজের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আমাকে বলেছেন—

> 'কিছুদিন আগে নদওয়া'র প্রাথমিক পর্যায়ের একটি আদবের কিতাবের উপর ঘটনাক্রমে চোখ পড়লো। মনে বড়ো ব্যথা পেলাম। ছবির পরিমাণ মনে হয় লেখার চাইতেও বেশি হবে। কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ছবি আর ছবি, সব রঙ্গিন। অথচ শুরু-শেষে একটিবারও আল্লাহ-রাসূলের নাম উচ্চারিত হয় নি। দৈত্য-দানবের ফালতু কল্প-কাহিনীতে ঠাসা। আমি ভেবে অস্থির, কেমন করে এ ধরনের কিতাব সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো, তাও আবার সায়্যিদ সাহেব এবং ডাক্তার সাহেবের যামানায়?! হ্যাঁ, তাঁদেরকেও আমি চিঠি লিখেছি। মিশরী কিতাব শিক্ষা উপকরণ হিসাবেও আমাদের এই নদওয়ার ছাত্রদের জন্যে উপযোগী নয়!'

লেখার কাজ শুরু হয়েছিলো ৪৩-৪৪ সালের দিকে। ধারাবাহিকতা চলতে লাগলো। কখনো সফরে কখনো আবাসে, কখনো রেলে বসে, কখনো গাড়ির অপেক্ষায় সড়কের কিনারায় বসে। কখনো বা লাহোরে, কখনো বা সোহায়[১]। সময় পেলেই লিখেছি। এমন কি নিযামুদ্দীনে অবস্থানকালীন সময়েও লিখতে ভুলি নি। এখানে ওখানে যাওয়ার পথে একটু ফুরসত মিললেই লিখতে বসে যেতাম। মন ভালো থাকলেও লিখতাম, মন খারাপ থাকলেও লিখতাম। অবশেষে আল্লাহর তাওফিক ও সহযোগিতায় সমাপ্তিতে পৌঁছলাম। লেখা শুরু করার পর আমার মনে হয়েছে যে, আল্লাহ পাক আমার জন্যে এ কাজ এতোই সহজ করে দিয়েছেন যে, অবলীলায় আমি লিখে যেতাম, একদম বেগ পেতে হতো না, যেনো আমি কথা বলে চলেছি। লেখার সময় আমি বিশেষভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য রেখেছি—

১. শব্দভাণ্ডার যতো কম আনা যায়। কিন্তু পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সীমিত সে শব্দগুলোকেই আত্মস্থ করিয়ে দিতে হবে।

---

১. কাশ্মিরের একটি বসতি। প্রিয় মৌলভী সায়্যিদ মোজাফফর শাহ নদভী- এর আমন্ত্রণে ওখানে গিয়েছিলাম। তৃতীয় খণ্ডের প্রায় সবটাই ওখানে বসে লিখেছি।

২. লেখার ভাষা অবশ্যই হতে হবে আরবী ভাষা, কুরআনের ভাষা। আর কুরআনের আয়াতকে জায়গায় জায়গায় এমনভাবে জুড়ে দিতে হবে যেভাবে আংটির মধ্যে পাথর জুড়ে দেয়া হয়।

৩. ইসলামী আক্বিদা বিশ্বাসের শিক্ষা (যেমন– তাওহিদ, রিসালাত, পরকাল) থাকতে হবে এবং অবচেতনভাবে তা ওরা গ্রহণ করে ফেলবে কিতাব পড়ে পড়েই।

৪. গল্প ও কাহিনী বলা হবে সম্প্রসারিত ঢঙ্গে। এতে থাকবে দিক নির্দেশনামূলক এমন উপকরণ, যা শিশুদের মনে জন্ম দেবে একদিকে কুফরি ও শিরক-এর প্রতি ঘৃণা অপরদিকে ঈমান ও তাওহিদের প্রতি এবং নবী-রাসূলদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। আর এসবই হবে শিশুদের অজান্তে।

শিশু-কিশোরদের আকিদা-বিশ্বাস ও মন-মানসিকতা তৈরী করার স্বার্থে এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সর্ব প্রথম হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.-এর। তিনি মন খুলে এ কিতাব নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, এ কিতাব শিশু সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো। আমাদের শিশু-কিশোররা এখন জানতে পারবে ইসলামের 'ইলমে কালাম'— সঠিক আক্বিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

মাসউদ আলম নদভী ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবে সাহিত্য, ধর্ম-চেতনা ও আক্বিদা-বিশ্বাসকে নোখ আর গোশতের মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার মতোই মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী এ কিতাবের ব্যাপারে এতোটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে অন্যসব কাজ বন্ধ করে এ সিরিজ শেষ করার তাগিদ দিয়েছিলন। কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনার উপর রচিত তৃতীয় খণ্ডে এসে সিরিজটি বন্ধ হয়ে যায়। আমি পরে জানতে পেরেছি, মাওলানা নিজের মেয়েদেরকে নিয়মিত এ কিতাব পড়াতেন।

কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণ যখন মিসর থেকে বের হলো, তখন সায়্যিদ কুতবের একটি ভূমিকা যুক্ত করার বাসনা জাগলো মনে। ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন। দিল খুলে তিনি কিতাবের প্রশংসা করেছেন, বলতে বলতে এ-কথাও বলেছেন—

> 'জীবনে আমি অনেক শিশুতোষ গ্রন্থ পড়েছি। এর মাঝে 'কাসাসুল আম্বিয়া'ও পড়েছি। নবী কাহিনী নিয়ে আমি

নিজেও কুরআনের আলোকে লিখেছি মিসরের শিশুদের জন্যে القصص الديني للأطفال। কিন্তু অকপটে নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী বিরচিত কাসাসুন নাবিয়্যিন আমার লেখা কিতাবের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও পূর্ণ। কেননা এতে আছে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম দিকনির্দেশনা, ঘটনার উদ্দেশ্যের উপর চমৎকার আলোকপাত এবং মাঝে মাঝে বর্ণিত হয়েছে এমন সব বিষয়ও যা অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঈমানী হাকিকত ও তাৎপর্যের পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে।'

মিসরের পর বৈরুতের বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মু'আসসাসাতুর রিসালাহ্ থেকেও এটি প্রকাশিত হয়েছে। সৌদি আরবের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ভারত, পাকিস্তানের অনেক মাদরাসায়ও আরবী সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লেখক যদি নিজের কোনো কিতাব সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে বিস্মিতবোধ করেন এবং কণ্ঠে অনুযোগ ঝরিয়ে কথা বলেন, তাহলে সেটি হলো এ কিতাব—কাসাসুন নাবিয়্যিন। কেননা এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা যুগপৎভাবে ভাষাও শেখায় আবার ধর্মীয় চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসও তৈরী করে। কিন্তু দলীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক গোঁড়ামী বড় বড় বাস্তবতার উপর পর্দা টেনে দেয়। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, এ কিতাবকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষিতরা বেশি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীসহ অনেক গুণীজন এ সিরিজটি শেষ করার জন্যে আমাকে বারবার অনুরোধ করলেও তিশ-পয়ত্রিশ বছর কেটে যাওয়ার পরও আমি চতুর্থ খণ্ড শুরু করতে পারি নি এবং এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর পর অন্যান্য 'উলুল আযম' রাসূলগণের ঘটনা বিশেষ করে খাতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনকথা আলোচনা করে পঞ্চম খণ্ডের মাধ্যমে এর সমাপ্তি টানারও সুযোগ ঘটে নি। (শেষ নবীর উপর লেখা ছোটদের কিতাবের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও) আমি এ দীর্ঘ সময় বসতে পারি নি। কিন্তু হঠাৎ আল্লাহর কী মেহেরবানি! ১৩৯৫ এর রমজানে মুতাবেক ১৯৭৫ সালে আমার মনে প্রবল এক আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। আমি লিখতে বসে গেলাম এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর পরবর্তী কয়েকজন নবীকে নিয়ে চতুর্থ খণ্ড শেষ করে ফেললাম। লেখার কাজ শুরু করার দেখলাম কলম চলে না।

শিশুদের যে ভাষায় আমি 'কাসাসুন নাবিয়্যিন' শুরু করেছিলাম সে ভাষাটা যেনো আমি ভুলে গেছি। তবে একটু চেষ্টা করার পর আবার আয়ত্ত্বে এলো। কলমে এলো কিছুটা হলেও আগের সেই গতি। এভাবেই শেষ হলো চতুর্থ খণ্ড। শুরু শু'আইব আলাইহিস সালামকে নিয়ে আর শেষ হলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে। এবার বাকি ছিলো শুধু 'মিসকুল খিতাম'—শুভ সমাপ্তি! আল্লাহ এর জন্যেও আমাকে তাওফিক দান করলেন। ১৩৯৭ যিলক্বদ-১৯৭৭ সালের অক্টোবরে 'সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া' লেখার মধ্য দিয়ে এ সিরিজের সুন্দর সমাপ্তি হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশ পেলো 'মুআসসাসাতুর রিসালাহ' বৈরুত থেকে। বিশেষ ও সাধারণ মহলে তা ব্যাপক সমাদৃতও হয়।

উল্লেখ্য যে, আমার السيرة النبوية এর ভিত্তি ছিলো 'কাসাসুন নাবিয়্যিন'-এর পঞ্চম ও শেষ খণ্ডটি। সওদি আরবসহ অন্যান্য দেশের উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ কিতাবকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে এটির চতুর্থ সংস্করণ বেরিয়েছে বেশ সুন্দর সাজে।

কুরআনের খিদমত

উপরের পৃষ্ঠা থেকে জানা গেছে যে, আমার শিক্ষক জীবনের সূচনা হয়েছিলো দরসে কুরআন দিয়ে। ১৯৪৩ থেকে তাফসিরের গুরুত্বপূর্ণ সবকগুলো আমার দায়িত্বে অর্পিত হয়েছিলো। তখন আমার মনে হয়েছে কুরআন অধ্যয়ন এবং কুরআন গবেষণার বিশুদ্ধ ও মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে তারা বেশ অসচেতন। তা থেকে কেমন করে কীভাবে উপকৃত হবে— এ ব্যাপারে তারা অনেক পেছনে। এ কারণে তারা কুরআনের আসল মজা পায় না, কুরআনের গভীরে প্রবেশ করে মর্ম ও তাৎপর্য বুঝাতে পারে না এবং কুরআনের অলংকার ও ই'জাযপূর্ণতাও বুঝাতে তারা সক্ষম হয় না। কুরআন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকে প্রাথমিক পর্যায়ের, ভাসা-ভাসা ও অপরিপক্ক। জীবনের শিক্ষা-অভিজ্ঞতা এবং কয়েক বছর ধরে তাফসির পড়ানোর কারণে মনের ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিলো যে, উপরের জামাতের তাফসিরের ছাত্রদের জন্যে এমন কিছু লিখবো, যা কুরআন গবেষণা ও অধ্যয়নে তাদের উপকারে আসবে, কুরআনের ই'জায ও মাহাত্ম্য অনুধাবনে সহযোগিতা করবে। সুতরাং আমি ১৯৩৮-৩৯ সালে লেখার কাজ শুরু করলাম। তৈরী হতে লাগলো প্রবন্ধ একটির পর একটি। শিরোনামগুলো এ-রকম :

১. কুরআন নিজেই নিজের কথা বলে অথবা কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের পরিচিতি।

২. কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত ও উপকার-বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

৩. ই'জাযুল কুরআন।

৪. কুরআনুল কারীমের মৌলিক বিষয়বস্তু।

৫. কুরআনুল কারীমের ভবিষ্যতবাণী, বিশেষত রোমক বাহিনীর বিজয়ের ভবিষ্যতবাণী।

৬. বুনিয়াদি আক্বিদা-বিশ্বাস। যেমন– তাওহিদ, রিসালাত, পরকাল, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত।

কিন্তু শেষোক্ত বিষয়টি শুরু করলেও সমাপ্ত করতে পারি নি।[১]

ছাত্ররা এ সব বিষয় লিখে নিতো। অবশ্য পরবর্তীতে নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত আন-নাদওয়া পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে থাকে এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতাও পায়। কিতাব আকারে বের করার দিকে অনেকদিন নজর দিতে পারি নি। ধারণা করা হচ্ছিলো যে পাণ্ডুলিপি হারিয়েই গেছে। কিছু কিছু প্রবন্ধ ছিলো অপ্রকাশিত। কিন্তু হঠাৎ করেই ১৯৮১ সালে প্রিয় ছাত্র নাজেম নদওয়াতুল উলামা'র সহকারী মৌলভী সায়্যিদ মুহাম্মদ তাহের এর কাছে পাণ্ডুলিপিটি মিলে যায়! আমি আবার আগাগোড়া এটিকে দেখলাম। আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা অন্তর্ভুক্ত করলাম। বর্ধিত প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম ছিলো এমন— 'বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে কুরআনে কারীম ও অন্যান্য আসমানী কিতাব', 'তিলাওয়াত ও কুরআন গবেষণার কিছু নমুনা' এবং 'কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু দিক-নির্দেশনা, কিছু উপদেশ'। তারপর তুলে দিলাম স্নেহাস্পদ মৌলভী সায়্যিদ সানী মুহাম্মদের ছেলে মৌলভী সায়্যিদ মুহাম্মদ হামযা নদভীর হাতে। ও 'কুরআন গবেষণার মৌলিক নীতিমালা ও সূচনা-জ্ঞান' নামে 'মাকতাবায়ে ইসলাম' থেকে প্রকাশ করে।

এ কিতাবের সবচে' উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিলো এই যে, এখানে রোমক বাহিনীর বিজয়ের ভবিষ্যতবাণী'র কথা ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে

১. অবশ্য পরবর্তীতে আরকানে আরবা'আ লেখার মাধ্যমে এ বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করে।

এবং এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য সংযোজন করা হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত অন্য কিতাবে আমার চোখে পড়ে নি। কুরআন গবেষকদের জন্যে এ কিতাব ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সামনে খুলে দিতে পারে অনেক অজানা দিগন্ত। এ কিতাব তাফসিরের ছাত্রদের জন্যে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভীষণ প্রয়োজন বলে মনে করি।

সিলেবাস ঢেলে সাজানোর আরো কিছু প্রয়াস

আল-হামদুলিল্লাহ! সিলেবাসকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রয়াস অব্যাহত রইলো। যদিও তা নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক ছিলো না, তবুও ধারা বন্ধ হলো না। আমার প্রিয় ভাগ্নে মৌলভী সায়্যিদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদভী (আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান) منثورات সংকলন করলেন القراءة الراشدة ও مختارات এর মাঝের শূন্যতা দূর করার জন্যে যেটিতে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, যা একদিকে মুখতারাত-এর তুলনায় সহজ। অন্যদিকে ছাত্রদের সামনে আসা ছিলো খুবই জরুরী। সংকলক বিষয় নির্বাচনে বেশ সুরুচি ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আমি মনে করি, এ কিতাবটিও আরবী মাদরাসার সিলেবাসের জন্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। এটি ছাড়াও তার আরেকটি সুন্দর কাজ হয়েছে الأدب العربي بين نقد وعرض। নির্বাচিত আরবী গদ্যমালার যে শিল্পমানসমৃদ্ধ সমালোচনা এখানে করা হয়েছে, তা ছাত্রদের হৃদয়-মনকে ছুঁয়ে যায় এবং তারা আরো সামনে বাড়ার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে সাহিত্যের প্রতি সৃষ্টি হবে তাদের ঝোঁক ও ভালোবাসা এবং আরো অর্জিত হবে সাহিত্যের প্রকারভেদ নির্ণয়ের পর তার রস আস্বাদনের চেতনাবোধ। অপরদিকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও শুরু হয়ে গেলো মৌলভী আবদুল মাজেদ সাহেবের কলমে معلم الإنشاء রচনা। যেটির শূন্যতা ভীষণ অনুভূত হচ্ছিলো। কেননা আরবী রচনা শেখার জন্যে তখন পর্যন্ত মাদরাসার সিলেবাসে এমন কোনো কিতাব অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

অনেক পরিশ্রম ও গবেষণা করে তিনি প্রথম দু'টি খণ্ড সমাপ্ত করেন। তৃতীয় খণ্ডটি লিখেন মৌলভী সায়্যিদ রাবে হাসানী নদভী। এ কিতাবটি বর্তমানে অনেক মাদ্রাসায় পড়ানো হচ্ছে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে পড়ানো হচ্ছিলো আহমদ হাসান আয যাইয়্যাতের تاريخ الأدب العربي। এটির পরিবর্তে অন্য কোনো নতুন কিতাবের প্রয়োজন ছিলো, যেখানে প্রতিফলিত

হবে আরো নতুন গবেষণা, আরবী সাহিত্যের আরো নতুন নতুন ভাবনা। আরো থাকতে হবে এ ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের উলামায়ে কেরামের অবদান ও কীর্তির কথা। স্নেহাস্পদ মুহাম্মদ ওয়াজেহ রশিদ নদভী অবশ্য এ কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আশা করি, দ্রুতই তা ছাপা হবে এবং এ বিষয়ে শূন্যস্থান পূরণ করবে। অনুরূপভাবে ইসলামের ইতিহাস নিয়েও কাজ শুরু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে নতুন সিলেবাসের ভীষণ প্রয়োজন।

এদিকে মাওলানা মাহবুবুর রহমান আযহারী উস্তায, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা আরবী ভাষার শিশুদের জন্যে লিখেছেন المحاورة العربية। এটিও সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

অপরদিকে আরবী ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফের ক্ষেত্রে যে-শূন্যতা ছিলো, সে শূন্যতা পূরণের জন্যে রচিত হলো একদিকে تمرين النحو। এ খিদমতটি আঞ্জাম দিয়েছেন মৌলভী আবদুল মাজেদ সাহেব। আরেকদিকে تمرين الصرف। এটি লিখেছেন মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব নদভী। উভয়টি এখন সিলেবাসভুক্ত। আগে এর পরিবর্তে 'মিযান-মুনশায়িব' পড়ানো হতো।

নতুন সিলেবাস বিন্যস্তকরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো প্রিয় ভাগ্নে মৌলভী রাবে হাসানী নদভী রচিত 'ইসলামী বিশ্বের মানচিত্র' কিতাবটি। এখানে একটু আফসোসের সাথে বলতেই হবে যে, হাদীস ও সীরাতের ছাত্ররাই শুধু নয়, আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্ররাও যখন নিজেদের বিষয় নিয়ে পড়তে বসে, তখন তাদের মনে হয় তারা যেনো এক সুড়ঙ্গের ভিতরে এসে ঢুকেছে। আগে-পিছে ও ডানে-বামে কিছুই চোখে পড়ছে না। কেবলই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সব ঢাকা। অসংখ্য জায়গার নাম আসে হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এবং জাহেলী যুগের কবিতায়। কিন্তু একটি জায়গা সম্পর্কেও কোনো ধারণা তাদের নেই। এ না-জানার কারণে তারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য, সীরাত ও হাদীসের বিভিন্ন ঘটনার গুরুত্ব, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রেক্ষাপট অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছে, একজন সচেতন ও সজাগ ছাত্রের জন্যে যা জানা খুবই জরুরী। আর একজন শিক্ষকের জন্যে এ-সব জানা তো আরো জরুরী।

এ কিতাব বড়ো যত্ন করে, মেহনত করে, বড়ো সুন্দর করে লেখক সাজিয়েছেন। মানচিত্র দিয়েছেন। হাদীস ও সীরাতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং জায়গার সাথে সম্পর্কিত আরবদের কবিতাও উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের সবচে' বেশি মূল্যায়ন করেছেন হযরত মাওলানা

আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী। আমাদের মাদরাসাগুলোতে কিতাবটি ব্যাপকভাবে সিলেবাসভুক্ত না-করায় তিনি অনেক হতাশাও ব্যক্ত করেছেন।[১]

মাদরাসার সিলেবাস প্রণয়ন নিয়ে আলোচনাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেলো। এ বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে কথা বললেই আমার ভালো লাগে। আমি চাই আমাদের মাদরাসাগুলো সিলেবাসের বিষয়টি নিয়ে সচেতনভাবে ভাবুক এবং চিন্তা করুক। আমাদের প্রাচীন সিলেবাসে সব সময় (মাদরাসার বর্তমান 'দরসে নিজামী'র সময়কাল পর্যন্ত) পরিবর্তন ও সংস্কার হয়ে এসেছে। পরিবর্তন হয়েছে কিতাবের যেমন মানেরও তেমন।[২]

এ সব সংস্কার হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন দেশের দীন ছিলো এক। আইন ছিলো এক, ধর্মীয় ভাষা ছিলো এক (আরবী), দাপ্তরিক ভাষা ছিলো এক (ফারসী)। সভ্যতা ছিলো এক। জীবনবিধান ছিলো এক (হানাফী আইন ও নীতিমালা) এবং প্রশাসনও এক ছিলো। (সবাই ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। একজন যেতেন, আরেকজন আসতেন। তাও কখনো কখনো সীমাবদ্ধ থাকতো একই পরিবারের ভিতরে।) কিন্তু যখন হিন্দুস্তানের আসমান-জমিন বদলে গেলো, প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশাসনিক দক্ষতা ও ক্ষমতা বদলে গেলো, আরো বদলে গেলো তাহযিব-তামাদ্দুন (সভ্যতা-সংস্কৃতি), ভাষা ও সাহিত্য এবং আইন ও নীতিমালা, বিস্তৃত হয়ে পড়লো বিপ্লবের সীমানা, তখন এ সিলেবাস এক জায়গায় এসে এমনভাবেই থমকে গেলো যে, একটিমাত্র কিতাবের-পরিবর্তনকেও মনে করা হতে লাগলো পূর্বসুরীদের পথ ও আদর্শ থেকে সরে যাওয়া! অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, আমাদের পূর্বসুরীগণ যাঁরা হিন্দুস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেছিলেন তাঁরা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে এবং মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন ও যুগচাহিদা অনুধাবন করতে মোটেই পিছিয়ে ছিলেন না। অপরদিকে বর্তমান যুগের উত্তরসুরী উলামায়ে কেরামই প্রাচীনধারার সিলেবাস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছেন এবং যে কোনো পরিবর্তনের বিপক্ষে তাঁরা যে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে বসে আছেন, তা সত্যিই অনভিপ্রেত। সিলেবাস তো প্রণীত হবে যুগ চাহিদার আলোকে, উম্মাহর প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখে। এ ব্যাপারে কোনো রকম বিলম্ব ঘটলে পরবর্তী প্রজন্মের অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

---

১. ১৯৮৩ সালে আরো অনেক প্রয়োজনীয় সংজোযনসহ এ কিতাবটি 'জাযিরাতুল আরব' নামে মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত থেকে প্রকাশিত হায়েছে।

২. বিস্তারিত পড়ুন ওয়ালেদে মাজেদের কিতাব 'হিন্দুস্তানের প্রাচীন শিক্ষা সিলেবাস'।

এবার ফিক্‌হ প্রসঙ্গ। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিলো সে সব অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের জন্যে —যারা সময়ের আগেই নূরুল ইযাহ ও কুদুরি পড়তে বাধ্য হয়— ফিকহের একটি কিতাব লিখবো, যার উপস্থাপনা হবে শিশুতোষ এবং বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দমালা হবে সহজ-সরল-সাবলীল, ছোট ছোট বাক্যে ও প্যারায় বিভক্ত। পাশাপাশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বয়সের সীমানা অতিক্রম না-করা এবং শুধুমাত্র আমলি ও প্রয়োজনীয় মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা। আমার ইচ্ছে ছিলো, এটিই হবে আরবীতে ছোট ছাত্রদের প্রথম পাঠ্য, ইলমুল ফিকহে। আমি নিজেই এ কাজে হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু পূর্ণতায় পৌঁছতে পারি নি। কিন্তু আনন্দের বিষয় হলো, স্নেহাস্পদ মৌলভী শফিকুর রহমান নদভী 'আল ফিকহুল মুয়াসসার' লিখে এ চাহিদা পূরণ করেছেন এবং এখন এ কিতাবটিই আমাদের প্রথম ফিকাহ পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, কিতাবটি সংশ্লিষ্ট মহলে বেশ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এদিকে আক্বাইদ বিষয়ক একটি কিতাবও সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। আর তা হলো, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. রচিত العقيدة الحسنة। অবশ্য এটিকে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াইস নদভী সাহেব হাশিয়াযুক্ত করে নতুন দিয়েছিলেন العقيدة السنية। ইলমে আকাইদে বলা যায়, এ কিতাব চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে। কিন্তু মানতেক-ফালসাফা-শরহে আকাইদ ও উসূলে ফিকহের উপর কোনো সহজ-সরল ও উপযোগী নতুন কিতাব পাওয়া যাচ্ছিলো না। এ ব্যাপারেও যদি বিরাজমান শূন্যতা কাটিয়ে ওঠা যেতো, তাহলে সিলেবাস-বিন্যাস মোটামুটি একটা পূর্ণতার পর্যায়ে চলে আসতো। তবে মনে রাখতে হবে, সীহাহ সিত্তা, হিদায়া ও হামাসা হলো এমন সব কিতাব, যার কোনো বিকল্প অকল্পনীয়।

অষ্টম অধ্যায়

মাদরাসার চার দেয়ালের বাইরে এসে আরো একটু বিস্তৃত পরিসরে পাঠ গবেষণা এবং চিন্তা ও আমলের ময়দানে অগ্রসর হওয়া

রুচির পরিবর্তন

এ পর্যন্ত আমার পৃথিবী ছিলো দারুল উলুমের বেষ্টনী। লখনৌ শহরে তখন প্রায় প্রতিদিনই সভা সেমিনার ও লোকসমাগম হতো। কিন্তু আমার এবং অধিকাংশ আসাতেযায়ে কেরামের সেদিকে কোনো ঝোঁক ও সম্পর্ক ছিলো না। সেখানে মুসলিমলীগ-এর জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলন —যা মুসলিমলীগকে এক নবজাগরন এনে দিয়েছিলো— ছাড়াও জাতীয় সম্মেলন সংস্থার বৈঠক এবং মুসলিম সংসদ সদস্যদের বৈঠক এবং 'মাদহে সাহাবা আন্দোলনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো বড়ো জাঁকজমকের সাথে। কিন্তু আমি এবং মুহাম্মদ আরাবী সাহেব ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে কয়েকটি সভায় বক্তব্য রাখা ছাড়া এ ধরনের রাজনৈতিক কোনো জনসভায় কখনোই যোগদান করি নি।

দীনি মাদরাসা বরং যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিতেই এ ধরনের একাগ্রচিত্ততা ও বহিঃজগতবিচ্ছিন্নতা ছিলো প্রশংসনীয় ও উপকারী। কোন্ প্রতিষ্ঠান চায় না— ছাত্র-শিক্ষক সবার মন পড়ে থাকবে শুধু দরস-তাদরিসে—পড়া ও পড়ানোয়। এ ব্যাপারে শিথিলতা বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে মাদরাসাগুলোয় বিরাজ করছে এক ধরনের অস্থিরতা ও অস্বস্তি। ইমাম গাযালী বলেছেন—

العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر.

ইলম তোমাকে এতটুও দেবে না যদি না তুমি ইলম অর্জনে নিজের সব বিলিয়ে দাও। আর শোনো, তুমি তোমার সবটুকু বিলিয়ে দিলে ইলম-যে তোমাকে একটু দেবে, সেটা কিন্তু সুনিশ্চিত না।

দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতা শুরু হওয়ার পর (১৯৩৪-১৯৩৯) খুব মজা ও আগ্রহ নিয়ে ছাত্রদেরকে পড়াতাম। বিশেষ করে তাদের মাঝে কুরআনুল কারীমের তরজমা ও তাফসীর, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে প্রকৃত মজা ও স্বাদ অনুভব করার আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতাম। মেধাবী, যোগ্য ও সৌভাগ্যবান ছাত্রদের সাথে এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদেরকে পড়তে দেখলে এবং পড়াতে পারলে মনে সৃষ্টি হতো অদ্ভুত এক আনন্দ, আত্মিক এক শক্তি। এ জন্যেই লম্বা ছুটি এলে মনে আনন্দের পরিবর্তে সৃষ্টি হতো এক ধরনের বিরহকষ্ট।

পাশাপাশি শেষ সময়গুলোতে এটাও মনে হচ্ছিলো যে, একবুক জ্বালা ও চিত্তভরপুর মমতা নিয়ে ছাত্রদের পড়ালেও এবং ওদের ইলমী আখলাকী উন্নতি ও আত্মিক সংশোধনের শত চেষ্টা করা হলেও ছাত্ররা কিন্তু তা এতোটা আমলে নিতে চায় না। উস্তাদের এ গভীরতা ওদের চোখেই পড়তে চায় না। বিশেষ করে কুরআনের দরসে যেভাবে সাধনামুখর মুতালাআ করে ওদের সামনে দিল খুলে খুলে বরং কলিজা বের করে-করে সবকিছু উজাড় করে দেওয়ার চেষ্ট করা হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ইলহামী বাক্য একের পর এক মুখ থেকে আসতে থাকে, তা খুব অল্প ক'জন তালেবে ইলমই বুঝতে পারে। কখনো কখনো মনে হয়েছে, আজ নিষ্প্রাণ দেয়ালের গায়ে হয়তো আমার কথা প্রভাব ফেলেছে কিন্তু ছাত্রদের মন-মানসে আসলেই কি তা কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছে?

আমার মনে বারবার এসে ধাক্কা দিয়েছে এ প্রশ্নটা— কেনো এমন হচ্ছে? কেনো ছাত্রদের অন্তঃকরণে আগের মতো ফুল ফোঁটে না? কারণ, যেটা আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা হলো— মাদরাসার বাইরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে নৈতিকতা-বিধ্বংসী এবং মন-মানসে ভীষণ প্রভাববিস্তারকারী বিভিন্ন আজেবাজে গল্প, উপন্যাস ও তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের বই। এ সবের কারণে অনেক ছাত্রই শ্রেণীকক্ষে মন বসাতে পারে না। উস্তাযের সবকে বসে আনমনা হয়ে থাকে। শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে যতো ভালো ভালো পাঠই তাকে দেয়া হয়, বিভিন্ন রকমের বিষাক্ত জীবাণু নানান পথে তার ভিতরে এসে আক্রমণ করে এবং লাভ যা হয়েছে, তার তুলনায় অনেক গুণ বেশি ক্ষতি করে দিয়ে যায়।

পাশাপাশি মনের ভিতরে এ চিন্তায় শিকড় গেড়ে উপস্থিত হয় যে, ছাত্রদের তা'লিম-তারবিয়ত—শিক্ষা-দীক্ষার পেছনে এই যে আমরা পরিশ্রম

করে যাচ্ছি, এর সাথে ছাত্রদেরকে বয়সের সাথে খাপ খাইয়ে এবং শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাইরের বিভিন্ন দাওয়াতি কর্মসূচী ও তৎপরতার সাথে এবং ও মাঠ পর্যায়ের কাজের ভিতরে সম্পর্কিত না করতে পারলে সবই বৃথা এবং পানির মাঝে রেখা টানার নামান্তর।

এ ছাড়া হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক চিত্রটাও ছিলো তখন ঘটনাবহুল। অনেক রাজনৈতিক দলের ছিলো মাঠে রমরমা উপস্থিতি। মুসলিমলীগ, যা ইসলামী চেতনায় ছিলো ভরপুর, খাকসার আন্দোলন, এখানে অস্ত্র-যুদ্ধ-চেতনায় সবাই ছিলেন বলীয়ান। কিন্তু তাদের নীতি ছিলো ভ্রান্ত। উলামায়ে কেরামের সমালোচনা যেনো এদের প্রতীকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যেও এদের অনেক চেষ্টা ছিলো। সাধারণ জনতার সাথে সরাসরি মিশে কাজ করারও বিভিন্ন কর্মসূচি তারা হাতে নিয়েছিলো। রাজনীতিসচেতন মানুষ বুঝতে পারছিলেন, হিন্দুস্তান এক মহাবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে, যা হিন্দুস্তানের সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা আক্বিদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রভাব ফেলবে এবং এসবকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাবে।

নানামাত্রিক মুতালা'আর বিস্তৃত জগতে:

আমার পাঠোধ্যয়ন শুধু তাফসীর হাদীস ইতিহাস সাহিত্যের সীমিত গন্ডিতে আবদ্ধ ছিলো। ১৯৩৭-১৯৩৮ সালে আমি আরো বিস্তৃত পরিসরের দিকে বেরিয়ে এলাম। এর মাঝে পড়া হয়ে গেছে ড. আহমদ আমীনের فجر الإسلام (ইসলামের ঊষা বা সূচনাকালের ইতিহাস), ضحى الإسلام (ইসলামের পূর্বাহ্নকাল), ظهر الإسلام (ইসলামের মধ্যাহ্নকাল)। পরের দিকে আরো পড়েছি তার লেখা— زعماء الإصلاح في العصر الحديث (সাম্প্রতিককালের কয়েকজন সংস্কার নেতা)। এ-সব কিতাবের বিষয়বস্তু আমাকে যেমন টেনেছে, তেমনি লেখকের সুন্দর প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাষা ও ভঙ্গিও আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে। এ ছাড়া আমির শাকিব আরসালানের حاضر العالم الإسلامي (মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা) এর উপর যে তথ্যভিত্তিক ও প্রাণময় টিকা লিখেছেন, তাও আমার জানাশোনার পরিধিকে অনেক বিস্তৃত ও ব্যপ্ত করেছে। শায়খ আবদুর রহমান আল কাউয়াকিবী রচিত উদ্দীপনাময় কিতাব مؤتمر أم القرى (উম্মুল কুরা সেমিনার) ও আমার অনেক উপকার করেছে। আর আল-ফাতাহ পত্রিকার শক্তিশালী ও হৃদয়স্পর্শী প্রবন্ধমালা আমার চিন্তা-ভাবনায় অনেক সমৃদ্ধি এনেছে। হিন্দুস্তানের সীমানা পেরিয়ে মুসলিম বিশ্বের

নানা বিষয় ও আন্দোলন সম্পর্কেও আরো জানার ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হলো। পাশাপাশি হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও পড়াশুনা শুরু করলাম।

রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন কিতাবও পড়তে শুরু করলাম, যা আমাকে অনেক মূল্যবান তথ্যগত খোরাক যুগিয়েছে এবং আমার পরবর্তী লেখালেখিতে শক্তিশালী ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ করেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ ও প্রকৃতি চিনতে সাহায্য করেছে, সে সভ্যতার একটা ছবিময় উপাদান আমার সামনে পেশ করেছে। যেমন ড্রেপরের বই— Conflict Between religion And Scince— যার আরবী তরজমা হলো— الصراع بين الدين والعلم — ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব। এটির আরবী তরজমা করেছেন মাওলানা জাফর আলী খান সাহেব তাঁর শক্তিশালী যাদুময়ী কলমে। আরেকটি বই হলো লেকী বিরচিত History of the European Morals — যার হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল তরজমা আঞ্জাম দিয়েছেন হযরত মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.। আরেকটি বইয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়, সেটি হলো গীবন লিখিত জগদ্বিখ্যাত বই Decline And Fall of Roman Empiar। এ বইয়ের বেশ কিছু অংশ পড়েছি আমি সরাসরি ইংরেজি থেকে। এ ছাড়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো হোফডিং লিখিত تاريخ الفلسفة الجديدة (আধুনিক দর্শনের ইতিহাস)। তখন আরেকটি বই আমার হাতে এসেছিলো, নাম الصراع بين الشرق والغرب في تركيا (তুরস্ক নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লড়াই)। এর লেখিকা ছিলেন খালেদা আদিব খানম। অবশ্য আমি এর সব বক্তব্যের সাথে মোটেই একমত নই। কিন্তু আধুনিক তুরস্ককে এবং এর বেড়ে ওঠার এবং দ্রুত এগিয়ে চলার ইতিহাস সম্পর্কে বেশ ধারণা লাভ করতে পেরেছি, বিভিন্ন ঘটনার তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি।

এতোটুকু পাঠোধ্যয়ন যে আমার জন্যে যথেষ্ট ছিলো না, তা আমি জানি এবং এতে আমার পরবর্তী গবেষণাধর্মী কাজের মজবুত ভিত্তিও তৈরী হওয়ার কথা নয়। কেননা, এ সব বিষয়ে আরো অনেক অনেক কিতাব রয়েছে। বরং বড় বড় গ্রন্থাগার পর্যন্ত রয়েছে। সে গ্রন্থাগারে অনেকেই পড়েও থাকবেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য সঙ্গে থাকলে অনেকেই অল্প তথ্যের আশ্রয় নিয়ে অনেক বড় বড় কাজ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে ফেলেন। এভাবেই প্রকাশ পায় কুদরতে ইলাহির কারিশমা—

مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.

সে সময় আরো পড়েছি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সাড়া জাগানো লেখক মুহাম্মদ আসাদ রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ Islam At The Cross-roads (সংযোগ পথের মুখে দাঁড়িয়ে ইসলাম)। খুব মনোযোগ দিয়ে একেবারে প্রতিটি পাঠই পড়েছি। আমার বুদ্ধি ও চিন্তা তাঁর এ লেখায় অনেক খোরাক পেয়েছে। কী শক্তিশালী লেখা! কী বিশ্বাসময় ভঙ্গি! কখনো কখনো তা আবার ভীষণ আক্রমণাত্মক! পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তুলে ধরেছেন একেবারে উন্মুক্তভাবে। স্পষ্ট করে বলেছেন কী কী আছে সংঘাত এর মাঝে এবং ইসলামী সভ্যতার মাঝে। এ বইয়ে আরেকটি বিষয় দেদীপ্যমান, তা হলো— হাদীসের পক্ষে তার শক্ত অবস্থান।

এ সময়ে আরো পড়ার সুযোগ হয়েছে মহাত্মা গান্ধীজী'র বই— 'সত্যের সন্ধানে'। আরো পড়েছি জওহারলাল নেহেরু সাহেবের 'আমার কাহিনী'। আরো পড়েছি হযরত মাওলানা তোফায়েল আহমদ সাহেবের 'মুসলমানদের আলোকিত ভবিষ্যত'। এতে আমার বেশ ফায়দা হয়েছে, জানাশোনার পরিধিও একটু বেড়েছে।

সে সময় 'তারজুমানুল কুরআন'-এ প্রকাশিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের প্রবন্ধের উপর চোখ পড়ে। শিরোনাম ছিলো— 'আসন্ন বিপ্লব'। বেশ প্রভাবিত হয়েছি। মনে হয়েছে, যে বিপদ সম্পর্কে তিনি সতর্ক করছেন, চলমান বিভিন্ন ঘটনার কারণে বলা যায় তা খুব কাছে। এ সব বিষয় আমার শান্ত মনে তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। কিছু কিছু সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে দিলো।

তখন শিক্ষিত ও সচেতন প্রকৃতির মুসলমানদের একটি বড় অংশ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে না কংগ্রেসের অবিভক্ত জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে পারছিলো, না মুসলিমলীগের ইসলামী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে পারছিলো।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব সম্পাদিত 'আল হেলাল' পত্রিকার বীরত্বব্যঞ্জক প্রবন্ধমালা, আল্লামা ইকবালের জীবনসঞ্চারী কাব্য, মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেবের আবেগ-ঝরানো ভাষণ এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধিতা, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত অবস্থানই মুসলমানদেরকে স্বকীয়তা ও স্বধর্মের প্রতি এমন অবস্থান নিতে বাধ্য করেছিলো। মুসলমানদের এ অবস্থান —আল্লামা ইকবাল যেটিকে 'খুদি'—স্বকীয়তার তালাশ হিসাবে ব্যক্ত করেছেন— সামাজিক পরিমণ্ডলে

এবং উম্মাহর সর্বস্তরে ঝড় তুলেলো! ক'বছর আগে উসমানিয়া খেলাফতের উপর পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের সময় আল্লামা ইকবাল যা যা বলেছিলেন, সবই বাস্তব হয়ে একে-একে দৃশ্যপটে আসতে লাগলো:

'পাশ্চাত্যের ঝড় এসে মুসলমানকে মুসলমান করে দিয়ে গেলো! বিক্ষুব্ধ সাগরেই-না একের পর এক হাতে এসে ধরা দেয় জহরত, মণি-মুক্তা-জহরতের তীব্র পিপাসায় ঢেলে দেয় শীতলধারা! মুসলমানের মৃত শিরায় সঞ্চার করেছে জীবনসঞ্চারী রক্তধারা! এ এক মহা রহস্য! সিনা-ফারাবীও পারবে না তা অনুধাবন করতে!'

হিন্দুস্তানের মুসলমান সে সময় ব্যাকুল ও অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছিলো সামনে চলার বাণী শুনতে এবং শক্তি ও ক্ষমতার বার্তা শুনতে। এমন সব বক্তৃতা ও বই-ই তাদের চেতনায় ঝড় তুলছিলো, যা শীর্ষদেশে বসে আহ্বান করছিলো এবং তাদের মনে আত্মসম্মানবোধ ও স্বকীয়তা জাগিয়ে তুলছিলো। পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও হিন্দুস্তানের একক জাতীয়তাবাদে বিলীন হয়ে যাওয়ার কঠিন সমালোচনা করছিলো। মুসলমানদের আরো দেখিয়ে দিচ্ছিলো তাদের অবস্থান ও মর্যাদার আসন, যে আসনে বসে তারা পৃথিবীকে এক সময় নেতৃত্ব দিয়েছে, সফলভাবে পরিচালনা করেছে। আরো বলছিলো, সব সমস্যার সমাধান আছে শুধুই তোমাদের ইসলামে। তাদের সমস্ত রোগের সফল ও অব্যর্থ ওষুধ এবং সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান নিহিত আছে শুধুই ইসলামে।

এ সময়টাতেই আমি পরিচিত হই মাওলানা মওদুদী সাহেবের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কিতাবের সাথে। 'তরজুমানুল কুরআন'-এ প্রকাশিত হতো তার প্রবন্ধ। তার যে সব কিতাব পড়েছি তা হলো, 'মুসলমান এবং বর্তমান প্রচলিত রাজনীতির দ্বন্দ্ব', 'ইসলামী হুকুমত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে', 'পর্দা', 'সুদ'সহ আরো কিছু কিতাব। সুদ ও পর্দা বিষয়ক কিতাব দু'টি শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। লেখা ও উপস্থাপনার ভঙ্গি এবং তার ভাবনা-পদ্ধতি এ মহলটির আবেগ-অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো।

এ সময়েই মাওলানার সাথে আমার পত্র-যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার সম্পাদিত পত্রিকা 'তরজুমানুল কুরআন'-এ 'ধর্ম ও রাজনীতি' শিরোনামে আমার একটি লেখায়ও ছাপা হয়েছিলো। এ লেখায় আমি ধর্ম থেকে রাজনীতিকে আলাদা করার তীব্র সমালোচনা করেছি, যেটি পাশ্চাত্যের মস্তিস্কপ্রসূত একটি অযৌক্তিক চিন্তা। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, উলামায়ে

কেরাম মোটেই রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন ও সমাজ-বিমুখ নন। বরং সারা ইসলামী জাহানে ব্যাপকভাবে এবং সারা হিন্দুস্তানে বিশেষভাবে উলামায়ে কেরাম দেশকে হানাদারমুক্ত করতে, ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কখনোই পিছিয়ে ছিলেন না। তারা বেশ ভালোই বোঝেন সময়ের দাবি এবং যুগের চাহিদা, আধুনিক স্তরের চেয়ে অনেক বেশি।

নয়া নেতৃত্বের সন্ধান এবং পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান সফর

১৯৩৯ সালে আমার লেখা 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.' প্রকাশিত হয়েছিলো। সদ্য পরিচিত-হওয়া মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেবকে আমি এ কিতাবের একটি নুসখা হাদিয়া দিয়েছিলাম। তিনি তখন হযরত মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারূকী সাহেবের মাদরাসায় মুদাররিস ছিলেন। এ পরিচয়ের গোড়ার কথা হলো এই— আমার বিশিষ্ট বন্ধু হাজী মুহাম্মদ সাঈদ নাসিরাবাদী সাহেব আমাকে এবং মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেবকে একবার দাওয়াত দেন এখানে আসার। তখন তিনি এখানেই ছিলেন। তখন হযরত মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারূকী সাহেবের ছেলে মাওলানা আবদুল মু'মিন ফারুকী সাহেব আমাদের বাসার গলি মুহাম্মদ আলী লেন-এ 'আফতাব প্রেস' নামে ছাপাখানা দিয়েছিলেন।

এ প্রেসে মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব প্রায়ই ছাপার কাজে যাতায়াত করতেন। অধিকাংশ সময় আমার মহল্লার মসজিদেই নামায পড়তেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর তা গাঢ় হতে সময় লেগেই যায়। কিন্তু আমারদের পরিচয়টা বেশ তাড়াতাড়িই গাঢ় হয়ে গেলো এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হলো। আর এ সুবাদেই আমার সদ্য প্রকাশিত কিতাব তাঁকে হাদিয়া পাঠিয়ে দিলাম। কিতাব পেয়ে তিনি খুশি হলেন এবং আমাকে চিঠি লিখলেন— 'এখানে (হিন্দুস্তানে) চিঠি আসে তখনই যখন আমরা ঘুমোতে যাই! শোনো, তোমার কিতাব আমাকে একদম ঘুমোতে দেয় নি। রাত জেগে-জেগে পড়েছি। অনেক প্রভাবিত হয়েছি। এখন তুমি আমাকে লিখে জানাও— তোমার এ কিতাব কি শুধু লেখার জন্যে লেখা নাকি কিছু করারও ইচ্ছে আছে তোমার!'

আমার যতোটুকু মনে পড়ে; তাৎক্ষণিকভাবে আমি তাঁকে লিখেছিলাম— 'কেনো নয়? আমার জন্যে কিছু করার থাকলে আমি প্রস্তুত আছি!'

স্বাভাবিকভাবে এবং পারিবারিকভাবে আমি আন্দোলনমুখী নই। তবুও ঐতিহ্যিক কারণে এবং সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর সাথে সংশ্লিষ্টতার

সুবাদে ধর্মীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস ও সম্ভ্রমবোধ-এর একটা ভালো অংশ লাভ করেছিলাম অবশ্যই। বাস্তবে না হলেও চিন্তায় এ ক্ষেত্রে বেশ এগিয়েই ছিলাম। বিশ্বজাহানের ব্যাপ্ত পরিমণ্ডলে নিরন্তর তাকবীর ধ্বনিকে এবং আল্লাহর কালিমাকে চিরউন্নত রাখার জন্যে আমার বোধ ও বিবেক সব সময় দায়বদ্ধ ছিলো।

হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী সাহেব তখন মনে প্রাণে চাইছিলেন 'খাকসার আন্দোলন'-এর মতো সমরাশ্রয়ী একটি দল গড়ে তোলা। এটির তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছিলেন তিনি। কেননা তিনি মনে করতেন। এ ছাড়া দুর্বার তারুণ্যকে খাকসারমুখী হওয়া থেকে ফেরানো মুশকিল ছিলো। এর জন্যে তিনি দৌড়ঝাঁপ শুরুও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, এর নেতৃত্ব দানের জন্যে তিনি মোটেই উপযুক্ত ব্যক্তি নন। কেননা, সব মহলেই তিনি পরিচিত ছিলেন—একজন বিদগ্ধ দেওবন্দি বিতার্কিক হিসাবে। বেরলভী চিন্তাধারা ও মতবাদের একজন কট্টর সমালোচক হিসাবে। একজন আলেমে দ্বীন হিসাবে। এখন হঠাৎ করে এ ময়দানে অবতীর্ন হলে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই এর হাল ধরার জন্যে এমন একজন ব্যক্তি তিনি খোঁজ করছিলেন, যাঁর তাঁর মতো এ ধরনের খ্যাতি নেই। পাশাপাশি বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও তিনি সচেতন হবেন। দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথেও তার গভীর সম্পর্ক থাকবে। মজার ব্যাপার হলো, এ কাজের জন্যে তাঁর দৃষ্টি আমার উপর পড়লো। আমার ব্যাপারে তাঁর ধারণা তখন খুবই সীমাবদ্ধ ও প্রাথমিক পর্যায়ের ছিলো। অবশ্য আরেকটা কারণে তাঁর নজর পড়ে ছিলো আমার দিকে। সেটি হলো, কিছুদিন আগে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'আল ফুরকান'-এ 'খাকসার আন্দোলন'কে কঠোর সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো। এ থেকেই হয়তো তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, আগামী দিনের যে সংগঠন তিনি করতে যাচ্ছেন খাকসার আন্দোলন-এর স্রোত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে, এর জন্যে আমি আলী মিয়াই উপযুক্ত।

আমার সাথে দেখা করার জন্যে তিনি সরাসরি রায়বেরেলী চলে এলেন। আমাকে দলের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে অনুরোধ করলেন। আমি তো আমার ব্যাপারে বেশ অবগত ছিলাম। আমার শরীর ছিলো দুর্বল, নেতৃত্বসুলভ গুণাবলীর অভাব ছিলো প্রকট। আর স্বভাব ছিলো আন্দোলন বিমুখ।

তাই হযরত মাওলানার কাছে বিনয়ের সাথে একান্ত অপারগতা পেশ করলাম। বললাম— আমি এর জন্যে একেবারেই উপযুক্ত নই। মাওলানা তখন জানতে চাইলেন— তাহলে তোমার দৃষ্টিতে এ কাজের উপযুক্ত কেউ আছে কি? আমি বললাম, তিনি হলেন আমাদের সুহৃদ হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব! তিনিই এ কাজের উপযুক্ত বলে আমি মনে করি! তিনি ভীষণ সংকল্পপ্রিয় মানুষ। ইংরেজি তার বেশ জানা। এ ধরনের সংগঠনের জন্যে এ দিকটি খুব জরুরী। দীনি ইলমও আছে প্রয়োজন মাফিক। আক্বীদাও বিশুদ্ধ। বুযুর্গানে দীনের সাথেও তাঁর গভীর সম্পর্ক। দীন ও জাতির সেবায় তিনি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আমার জানা মতে। বর্তমানে তিনি বেলুচিস্তানের আদালতের একটা ভালো পদে চাকরি করছেন। আমি মনে করি, আমরা অনুরোধ করলে এ কাজের দায়িত্ব নিতে তিনি অস্বীকার করবেন না। মাওলানার মনে প্রাণে তখন এ আন্দোলনের প্রবল হাওয়া বইছিলো। তিনি নিজেই সেখানে সশীরে হাজির হওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেলেন। সঙ্গী হিসাবে আমাকেও যেতে উৎসাহিত করলেন। ব্যস সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো যে আমরা আগস্টের কোনো একদিন রওয়ানা হয়ে যাবো।

আমাদের সফরের প্রথম মঞ্জিল ছিলো লাহোর। হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সাহেবের কাছে আমরা গিয়ে উঠলাম। তারপর সেখান থেকে তাঁর বড় ছেলে মাওলানা হাবীবুল্লাহকে নিয়ে দেখা করতে গেলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেবের সাথে। তিনি থাকতেন মুবারক পার্কে। সে সময় মাওলানা 'তরজুমানুল কুরআন' সম্পাদনার পাশাপাশি লাহোর ইসলামিয়া কলেজে ইসলামিয়াতের অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। আমাদের সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে মাওলানা বলে উঠলেন— 'আজ তো সৌভাগ্যের দুই সূর্য নয়— অনেক সূর্য একসঙ্গে উদিত হয়েছে।'

লাহোর থেকে আমরা কোয়েটার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। অতিক্রম করতে হলো 'দাওরায়ে বুলান'[1], যা শত বছর আগে সায়্যিদ আহমদ শহীদ তাঁর ১০০জন জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে অনেক কষ্টে অতিক্রম করেছিলেন। তবে এই দুই অতিক্রমের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। তিনি অতিক্রম

১. যার বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ কিতাবে।

করেছিলেন ঘোড়া ও উটে করে সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ দিয়ে জীবনের সমূহ ঝুঁকি নিয়ে আর আমরা অতিক্রম করছি দিব্যি আরামে রেলগাড়িতে চড়ে।

আমরা যেদিন কোয়েটা —যার পূর্বনাম ছিলো শিয়ালকোট— পৌঁছলাম সেদিন জার্মানি বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। রেডিও থেকে ভেসে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা।

কোয়েটায় একদিন থেকে আমরা রওয়ানা হলাম 'ফোর্ট স্যান্ডেম্যান', যা কান্দাহারের দিক থেকে আফগান সীমান্তে অবস্থিত একটি ফওজি ছাউনি। ওখানেই একটি স্কুলের হেড মাস্টার হাজী আবদুল ওয়াহাব সাহেব। তাঁর সাথে দেখা করে আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করলাম। তারপর তিনজনে মিলে প্রথমেই ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও খানক্বাহ্ পরিদর্শন করার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো, যেখানে যেখানে সামাজিক ও সাংগঠনিকভাবে দীনি কাজ চলছে, তাকে আরো বেগবান ও প্রভাবমুখী করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা হবে অথবা যুগ চাহিদার ভিত্তিতে আরো সময়োপযোগী কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

এ উদ্দেশে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সাহারানপুর, দেওবন্দ, থানাভবন, রায়পুর ও নিযামুদ্দীন সফর করার। এর কয়েক মাস আগে মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং তাঁর দাওয়াত নিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী একটি লেখা লিখেছিলেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী সাহেব তার সম্পাদিত তরজুমানুল কুরআনের একটি সংখ্যায়। শিরোনাম দিয়েছিলেন— গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় আন্দোলন। লেখাটি তৈরী করার আগে মাওলানা নিজে সফর করলেন নিযামুদ্দীন ও মেওয়াত। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি কিছু পরামর্শসহ এ জামাতের পরিচয় তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। এ জামাতের দাওয়াত ও কর্মপন্থা নিয়ে তিনি গভীরভাবে নিজের মুগ্ধ অনুভূতির কথা উপস্থাপন করেন। তার এ লেখা পড়ে আমরা গভীরভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত হই। আমি এর আগে দু'জনের কাছে মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও তাঁর তাবলীগী মেহনত সম্পর্কে জেনেছিলাম প্রাথমিকভাবে। একজন হলেন বিশিষ্ট বুযুর্গ আলহাজ্ব সায়িদ মুহাম্মদ খলীল নাটোরী সাহেব। আরেকজনের নামটা মনে নেই। তাঁর সাথে দেখা হয়েছিলো এক মাহফিলে, হযরত মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবের সাথে সফরের সময়। সেখানকার ডেপুটি কমিশনার হাফেজ আবদুল মজিদ সাহেব (আই.সি.এস)-

এর দাওয়াতে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। অবশ্য মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব তাঁর দাওয়াতের কথা বেশ গভীরভাবেই আগে থেকেই জানতেন।

মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব দু'দিন থেকেই অন্য ব্যস্ততার কারণে চলে গেলেন। আমি আরো দশদিন থাকলাম সেখানে। ফেরার পথে মুনির আহমদ সাহেবের বাসায়ও যাওয়ার সুযোগ হলো। তিনি কোয়েটার চীফ কমিশনারের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন, ইংরেজ আমলে। তারপর লাহোর হয়ে আমি লখনৌ ফিরে এলাম।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সফর শুরু

১৯৩৯ এর শেষ দিকে আমরা তিন বন্ধু সাহারানপুর ও দিল্লী সফরের জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি রওয়ানা হলাম লখনৌ থেকে। আর মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব ও হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব রাস্তায় কোনো এক ষ্টেশনে এসে আমার সাথে মিলিত হলেন। আমরা প্রথমেই গেলাম সাহারানপুরে। সে সময় সম্ভবত শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব সাহারানপুর মাদরাসায় অবস্থান করতেন না। তাঁকে আমি ১৯৩২ সালে এক ঝলক দেখেছিলাম দেওবন্দে। মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেবের সঙ্গে মুনাযারার সুবাদে পরিচিত হযরত সাহারানপুর মাদরাসার সদরুল মুদাররিসীন হযরত মাওলানা আসআদ উল্লাহ সাহেবের বাড়িতেই আমরা মেহমান হলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় আমরা রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। ব্যাগ ইত্যাদি কিছুই সঙ্গে নিলাম না, শাহ মাসউদ সাহেবের এখানে সব রেখেই আমরা পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। পাঁচ মাইল দূরত্বের পথ অতিক্রম করে আমরা যখন রায়পুর খানকায় গিয়ে উঠি, তখন হযরত মাত্র রাতের খাবার শেষ করেছেন এবং বিশ্রামের জন্যে উঠতে যাচ্ছিলেন। হযরত আমাদেরকে বিপুল উষ্ণতায় সংবর্ধনা জানালেন। পূর্বপরিচিতি ছাড়াই এতোটা সস্নেহ সংবর্ধনা এবং বুযুর্গানে দীনের এ মহানুভবতায় আমরা আপ্লুত। হযরতের বিশেষ খাদেম আলতাফ ভাইয়ের বলেছেন আমাকে, হযরতের সাথে মুসাফাহা করার সময় আমার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— 'আমি তো আপনার অপেক্ষাতেই বসে ছিলাম!' কিন্তু আমার মনে নেই। রায়পুরে আমরা একরাত একদিন ছিলাম। হযরত আমাদের অনেক আদর-যত্ন করেছেন। আমরা যখন আমাদের সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলাম, তখন হযরত শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস

দিলেন। আমাদেরকে উৎসাহ দিতে আগে বেড়ে আরো বললেন—'আপনারা চাইলে আমার এ জায়গাও উপস্থিত!' তিনি আমাদেরকে সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী নিজের একজন প্রিয়ভাজনের সাথেও দেখা করিয়ে দিলেন, যার সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। হযরত আমাদেরকে প্রথমেই নিযামুদ্দীনে গিয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সাথে মিলিত হতে বললেন। (হযরত তাঁকে 'হযরতে দেহলভী' বলে অভিহিত করতেন।) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তাবলীগী কাজকে দেখতে বললেন। তারপর মন সায় দিলে সে কাজে অংশগ্রহণেরও পরামর্শ দিলেন।

আমরা রায়পুর থেকে ভীষণ অনুপ্রাণিত হয়ে দেওবন্দ এলাম। দেওবন্দ থেকে আমাদের ইচ্ছে ছিলো থানাভবন যাবো। কিন্তু জানি না, কী কারণে এ ইচ্ছে পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা সোজা চলে গেলাম দিল্লী—নিযামুদ্দীনে। অবশ্য মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব অসুস্থতার একটা হঠাৎ সংবাদে বেরেলীতে ফিরে গেলেন এবং আমি আর হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব নিযামুদ্দীন হয়ে মেওয়াত চলে গেলাম। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর দাওয়াত ও তাবলীগী কাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র আসবে, কেননা সেটি এক সতন্ত্র কাহিনী। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখন আমি এ সফর থেকে ফিরে এসে সংক্ষেপে যেভাবে নিজের ভাব ও অনুভূতিকে তুলে ধরেছিলাম, 'যা দেখলাম চোখে, যা ভাবলাম মনে' শিরোনামে যে লেখাটি লিখেছিলাম এবং যা আল-ফুরকান ও আল নদওয়ায় ছাপা হয়েছিলো, তা-ই এখানে উদ্ধৃত করছি—

'সাহারানপুর শহর থেকে ২০/২১ মাইল দূরত্বে শোলেক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রায়পুর জেলা। এখানেই থাকেন হযরত শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী (খলীফা হযরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ.)। আমি তাঁর এই অজানা-অচেনা কিংবা প্রায় অজানা-অচেনা খানকায় কাটিয়েছি মাত্র এক দিন এবং দুই রাত সমর্পিতচিত্তে। চোখভরে দেখেছি জীবন্ত খানকার এক উজ্জ্বল নমুনা, যা এই বিপ্লব-যুগেও মুসলমানদের জন্যে অনেক উপকারী। শুধু তাই নয়, আংশিকভাবে ধর্মীয় এবং আত্মশুদ্ধিগত কারণে জরুরীও বটে। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. হলেন একজন অত্যন্ত সচেতন, আলোকিত চিন্তা ও মনের অধিকারী, বহুগুণসম্পন্ন আলেমে রাব্বানী ও বিশিষ্ট শায়খে তরীকত। বর্তমান যুগের বিশিষ্ট বুযুর্গানে দীন ও রুহানী জগতের রাহবারদের একজন, যাঁদের রাহনুমায়ী ও

দিকনির্দেশনা এই উম্মতের বড়োই প্রয়োজন। হযরতের যুগ-সচেতনতা, রাজনৈতিক বোধ ও দূরদর্শিতা, দীনি ও দুনিয়াবি সমন্বয় এবং আমলের জযবা— সবকিছু এ-খানকাকে পরিণত করেছিলো 'ঝলকময় সানূসী আধ্যাত্মিক সাধনালয়ে'। হযরতের উদার আচরণ, বুযুর্গসুলভ মমতা, নম্রতা এবং আগন্তুক মুসাফিরদের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব— এ-সবই মনে করিয়ে দেয় অতীত যুগের মহানুভব সদয় আচরণের সোনালী ইতিহাসকে।

হযরত শাহ সাহেবের দিক-নির্দেশনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সিকি শতাব্দির ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলন ও নেতৃত্বের উপর তাঁর বিচক্ষণতালব্ধ ও ন্যায়ানুগ বিশ্লেষণ আমাদের জানার জগতকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর মুখে বুযুর্গানে দেওবন্দ এবং সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. ও তাঁর সঙ্গীদের আবেগ-জাগানিয়া ঘটনাবলী শুনে আমাদের ঈমান তাজা হয়ে গিয়েছিলো, হৃদয় জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো।

এই সফরে যে বিষয়টি আমাদেরকে নিরন্তর আনন্দ ও মুগ্ধতা দান করেছে তা হলো, মেওয়াত অঞ্চলে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর তাবলীগী কার্যক্রম ও তার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। ওখানে আমরা চোখভরে যা যা দেখলাম, তাকে মোটেই বিংশ শতাব্দির কোনো ঘটনা মনে হয় নি। বরং মনে হচ্ছিলো, এ যেনো প্রথম পুণ্য শতাব্দিরই দৃশ্য! নবুওতকালের মহা সংস্কার ও বিপ্লবের অবস্থা এবং প্রথম পুণ্য শতাব্দিতে যে আবেগ-উদ্দীপনা, ইসলাম প্রচারের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও স্পৃহার যে গল্প আমরা সীরাত ও ইতিহাসের পাতায়-পাতায় পড়েছি, গোড়গানো'র জামে মসজিদে এবং কাসবায়ে নূহ ও শাহপুরের অলিগলিতে তারই ঝলক দেখে এলাম। বাস্তবতা হলো এই যে, চিশতিয়া তরীকার এই দরবেশ, মুজাদ্দেদী আলেম প্রাচীন গিয়াসপুর এবং বর্তমান নিযামুদ্দীন বস্তিতে হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়ার পাশে বসে আসলে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতির ইসলাম প্রচার এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর হেফাজতে ইসলামের সুন্নত জিন্দাহ করে যাচ্ছেন!'

জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ এবং তা ছেড়ে আসা

১৯৪০ থেকেই মাওলানা মওদুদী সাহেবের সাথে আমার পত্র যোগাযোগের সূচনা হয়েছিলো। তিনি ১৯৪০ সালের ৩১ আগস্ট আমাকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। এ চিঠিতে তিনি আমাকে তাঁর সাড়া জাগানো

কিতাব 'পর্দা'র আরবী অনুবাদ করার জন্যে অনুরোধ করে বলেছিলেন, 'নদয়াতুল উলামা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর যাচ্ছে না। আমি মনে করি, এ কাজটি হলে ওখান থেকেই হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনি কি এমন কাউকে দিয়ে একটু অনুবাদের ব্যবস্থা করবেন, যার হৃদয় জাগ্রত এবং ভাষা জীবন্ত?' এরপর তিনি আমার আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যা আমি বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামকে উপকারী কিতাবসমূহের ব্যাপারে করেছিলাম।[1]

মাওলানা মওদুদী সাহেবের সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিলো ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন সেমিনারে, যা নওয়াব স্যার আহমদ সাঈদ খান সাহেবের আমন্ত্রণে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। এ কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে তিনি এখানে অংশ নিয়েছিলেন। মাওলানা সবার আগে নিজের আসার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন এবং তিনি এসে কোথায় ওঠবেন ও থাকবেন— সে দায়িত্বও আমার উপর ন্যস্ত করলেন। ১৯৪১ সালের ৪ বা ৫ই জানুয়ারি তিনি লখনৌ এলেন এবং নদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায় এসে উঠলেন।[2]

সম্ভবত ১৯৪১ সালের শুরুর দিকেই আমি মাওলানা মনযুর নুমানী সাহেবের মাধ্যমে আমি জামায়াতে ইসলামীর আনুষ্ঠানিক রুকন হিসাবে গণ্য হই এবং লখনৌ জামায়াতে ইসলামী'র দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। এরপর মাওলানা আবার এলেন নদওয়াতুল উলামায় জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতে। তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার আল ইসলাহ ছাত্রসংঘ হলে 'নতুন শিক্ষাব্যবস্থা' লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আমার অনুরোধেই তিনি এটি লিখে এনেছিলেন। অনুরূপ আমার আবেদনে তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি সেমিনারে অংশগ্রহণপূর্বক 'মানুষের জীবিকা ও অর্থসংস্থান এবং ইসলামে এর সমাধান' বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন।

মাওলানা ও তার দলের সাথে আমার সম্পর্ক অব্যাহত ছিলো বরাবরই। আমি জামায়াতে ইসলামী'র মজলিসে আমেলাতেও অংশ গ্রহণ করেছিলাম, যা ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ঐ সম্মেলনে মাওলানার কোনো কোনো লেখা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেশ বিতর্ক

১. এর জওয়াব দেখা যেতে পারে পুরানে চেরাগ দ্বিতীয় খণ্ডে।

২. বিস্তারিত দেখুন পুরানে চেরাগ দ্বিতীয় খণ্ড।

বেধেছিলো। হিন্দুস্তানের কিছুসংখ্যক শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট লেখকদের বিরোধিতার কারণে সম্মেলনে প্রশ্ন এলো যে, এই অবস্থায় জামায়াতে ইসলামী'র শীর্ষপদে মাওলানার পরিবর্তে মাওলানা আমীন ইসলাহীকে মনোনয়ন করলেই ভালো হয়।

এরপর ভোটাভোটি হলো। আমার ভোটটি মাওলানার পক্ষেই দিয়েছিলাম। আমার সামনে যে বিষয়টি কাজ করছিলো তা হলো, এ পরিবর্তন হলে নিছকই তা লোকদেখানো হবে, যার বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। কেননা, জামায়াতে ইসলামী'র অস্তিত্বের প্রতিটি কণা মিশে আছে মাওলানার লেখা ও চিন্তাধারার সাথে। মাওলানা পদে না-থাকলেও তার সাথেই এ দলের সবকিছু আবর্তিত হবে। যাইহোক ভোটাভোটির পর শেষ পর্যন্ত মাওলানাই আমীর পদে বহাল থাকলেন। জামায়াতে ইসলামী'র যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আগের মতোই বহাল থাকলো।

১৯৪২ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদের মিটিংয়েও আমি উপস্থিত ছিলাম। দিল্লী থেকে আমি মাওলানার সাথে আলিগড় সফর করেছিলাম। আমরা আলিগড় (পুরোনো ও ফারেগ) ছাত্রাবাসে দুই অথবা তিনদিন অবস্থান করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে মাওলানার ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা ছিলো চোখে পড়ার মতো। নওজোয়ান ছাত্রদের মাঝে মাওলানার প্রতি যে ভক্তি অনুরক্তি ব্যাকুলতা ও আকর্ষণ আমি লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে এখন এই তরুণ প্রজন্মের রুহানী পিপাসা মিটানোর জন্যে এবং তাদের মানসিক অস্থিরতা দূর করার জন্যে একজন রাহবার দরকার।

সে সময় মাওলানা একটি আরবী পত্রিকা বের করার একটি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যা জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী দাওয়াতের মুখপত্র হিসাবে বিবেচিত হবে। আমি তখন এ ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সামনে আসে তা একে একে উল্লেখ করলাম। অবশ্য এ ব্যাপারে আমরা একমত হলাম যে, আরব দেশের সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত পত্রিকাগুলোতে আরবী প্রবন্ধমালা লিখে লিখে পাঠাবো। এ কাজের দায়িত্বও মাওলানা আমার কাঁধেই ন্যস্ত করতে চাইছিলেন কিন্তু আমি প্রস্তাব করলাম সহপাঠী বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর নাম। মাওলানা আমার প্রস্তাব সাদরেই গ্রহণ করলেন এবং এদিকে মাওলানা মাসউদ আলমও সাগ্রহে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপেই তা আঞ্জাম দিয়ে গেলেন।

লখনৌ জামায়াতে ইসলামী'র দায়িত্ব পালনকালে (যা প্রায় তিন বছর ছিলো) আমার মনে তিনটি বিষয় বেশ তোলপাড় করছিলো, যা আমাকে নতুন করে এ দলটি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিলো।

এক. আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, জামায়াতে ইসলামী'র সদস্যদের ভিতরে ব্যাপকভাবে মাওলানার প্রতি ব্যাক্তিত্ব-মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ছিলো। তাঁকে নিয়ে সবাই এক রকমের বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিলো। সবাই ভাবতে শুরু করেছিলো যে, তারা তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও দাঈ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা রাখতে এবং তাঁদের উপর ভরসা রাখতে তাঁদের লেখা থেকে উপকৃত হতে ব্যর্থ হচ্ছিলো ধীরে ধীরে। আমার এমন মনে হচ্ছিলো যে, (কখনো কখনো মুখেও শোনা যেতো) এরা ভাবতে শুরু করেছে যে, তাঁর চেয়ে ভালো করে কেউ ইসলামকে না বুঝেছে, না পেশ করতে পেরেছে! দীনের একমাত্র দাঈ-ও তিনিই! এরা সবাই আধুনিক শিক্ষিত তবকার মানুষ এবং চাকরি-বাকরির সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন। এরা দীনকে যতোটুকু বুঝেছে, তা মাওলানার কিতাবাদি পড়েই বুঝেছে। এরা শুধু বিগতকালের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গানে দীন ও উলামায়ে কেরামের নয় বরং বর্তমানকালের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গানে দীন ও উলামায়ে কেরামের দীনি খেদমত, গবেষণা বিষয়েও অন্ধকারে ছিলেন। ইসলামের সংস্কার আন্দোলন ও ইতিহাস এবং এর নিশানবরদারদের ইলমী আমলী কীর্তিগাথা সম্পর্কেও এদের কোনো খবর ছিলো না। সম্ভবত এ জন্যে এরা এক রকমের অপারগও ছিলো।

দুই. দ্বিতীয়ত সমালোচনাযোগ্য ও স্পর্শকাতর এ বিষয়গুলো এদের মাঝে দিন-দিন বেড়েই চলছিলো এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দীন ও উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে ধীরে ধীরে এরা আরো বেফাঁস ও উল্টাপাল্টা মন্তব্য বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

তিন. তৃতীয় যে বিষয়টি আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলছিলো তা হলো এই যে, আমি তাঁর মাঝে দীনের জন্যে বিশেষ দরদ ও ব্যথা এবং আমলের জন্যে কোনো জযবা ও উদ্দীপনা, আত্মশুদ্ধির জন্যে কোনো আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরো নিবিড় ও গভীর করারও বিশেষ কোনো চেষ্টা নজরে পড়ে নি।

এ জন্যে আমার মন খুব খারাপ ছিলো। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, এখানে মাওলানার লেখালেখির উপর চোখ রাখা, তা পড়ে পড়ে শোনানো

এবং তার প্রশংসা করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। দ্বিতীয়ত নিজের অবস্থা ছিলো এই যে, যখন আমি দূরে বসে মাওলানার কিতাব পড়তাম, তখন চিন্তার মাঝে অনেক ইতিবাচকতা সৃষ্টি হতো, অনেক আকর্ষণ অনুভব করতাম। কিন্তু সাক্ষাত হলে এবং অনেকদিন তার সঙ্গে থাকলে আগের সেই সম্পর্ক ও আকর্ষণ আর খুঁজে পেতাম না। অথচ আমি এর বাহ্যিক কোনো কারণ খুঁজে পেতাম না। সম্ভবত এ ছিলো আমাদের খান্দানের প্রভাব। সত্যিকারের বাতেনী ও রুহানী কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া অন্য কোনো দিকে স্বভাব ঝুঁকতো না।

মাওলানা মাওদুদী সাহেবের ঘোর সমালোচকগণ যে সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, আমি অবশ্য সে সীমায় পৌঁছি নি। তারা তাকে 'কাফের' অথবা 'ফাসেক' বলা ছাড়া ভিন্ন কোনো কিছু মানতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু আমি এখনো মনে করি, তাঁর মাঝে অনেক যোগ্যতা আছে। তার অনেক গুণ আছে। তার সুযোগ্য প্রতিভাকে আমি সম্মান করি। আমি আরো মনে করি, তার অনেক কিছুই আধুনিক শিক্ষিত নওজোয়ানদেরদের জন্যে উপকারী ও দৃষ্টিউন্মোচনকারী। তার কিছু কিছু কিতাব পড়ার পরামর্শও আমি দেবো।

কিন্তু মাওলানার দাওয়াত ও তার সংগঠনের সাথে ধীরে ধীরে আমার সম্পর্ক শীতল হয়ে এবং কমে আসতে লাগলো। তা ছাড়া মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর কাছে যাতায়াত বেড়ে গেলো। তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে উঠলাম। এর ফলে মাওলানা মওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে আমার মানসিক অবস্থা দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠতে লাগলো। এক সময় আমি মাওলানাকে আমার মনের অবস্থা জানালাম। মাওলানা আমাকে একাগ্রচিত্ত হতে বললেন। আমি প্রকাশ্যে জামায়াত ত্যাগের ঘোষণা তখনো দিই নি। এমন কি আমার লেখা সমালোচনামুলক কিতাব 'ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা' প্রকাশিত হওয়ার সময়ও এ ঘোষণা আসে নি। আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াত থেকে সরে আসার পরও মাওলানার সাথে আমার যোগাযোগ ছিলো দুই পুরোনো বন্ধুর মতোই। পাকিস্তান গেলেই আমি মাওলানার সঙ্গে সাগ্রহে দেখা করতাম। তিনি আমাকে সম্মান করতেন, আমি তাকে সম্মান করতাম।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই 'পুরানে চেরাগ'-এর ঐ অংশ, যা পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন কেনো ও কী কারণে আমি এ দলটির সাথে আমার বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এর সীমানা কতোটুকু ছিলো। লক্ষ্য করুন—

মাওলানার লেখালেখি এবং,জামায়াতের সাহিত্য পড়ে প্রভাবিত হওয়ার এবং এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ভিত্তি হলো মাওলানার সেই সব জ্ঞানগর্ভ ও তাত্ত্বিক সমালোচনামূলক লেখালেখি, যা তিনি লিখেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার জীবনদর্শনের এবং বস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যার বড় একটা অংশ স্থান পেয়েছে তার 'তানকীহাত' নামক গ্রন্থে। আমার এবং মাওলানার চিন্তা-ভাবনার মাঝে সমতপার্থক্য যা ছিলো, সেটা ছোট ও বড় এবং বিজ্ঞ ও অনবিজ্ঞ দুই লেখকের মতপার্থক্যের মতোই। তার প্রদত্ত দীনের যে নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, তাতে না আমার কোনো আগ্রহ ছিলো, না আমি এর প্রয়োজন কখনো অনুভব করেছি। এই নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে তার রচিত ৩টি কিতাবে :

১. কুরআন মাজীদের চার বুনিয়াদি পরিভাষা

২. তাফহিমাত

৩. রাসাইল ও মাসাইল

এ ব্যাপারে আমার অবস্থান খুব স্পষ্ট। আমি তো সেই নওজোয়ানের মতো নই, যে ইলমের মূল উৎসধারা (কুরআন ও সুন্নাহ এবং ধর্মীয় আবহ ও শিক্ষা-দীক্ষা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু মাওলানার বা অন্য কোনো গবেষকের কিতাবাদি পড়েই ইসলামকে বুঝেছে জেনেছে, তার সাথে পরিচিত হয়েছে। আমি তো আরো অনেক দূরের ও গভীরের উৎস থেকে ইসলামকে জেনেছি বুঝেছি ও পড়েছি। আমি সরাসরি পড়েছি মূল উৎসধারার ইলম, উপকৃত হয়েছি মহান অতীতের উলামায়ে কেরাম এবং পরবর্তী বুযুর্গানে দীনের লেখা কিতাবাদি থেকে। তাঁদের লেখা কিতাবাদিতে রয়েছে মূল উৎসধারা নিঃসৃত শরীয়তের গভীর জ্ঞানরহস্য ও তাৎপর্য। এ জন্যে কখনোই মাওলানাকে আমার মনে হয় নি এমন বিরল কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরেও যার নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে আমি উপলব্ধি করে এসেছি তার বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য, প্রতিভা, ধী-দ্যুতি, তার শক্তিধর কলম, চিত্তাকর্ষক আধুনিক উপস্থাপনা— সবই। এখনো আমি তা ক্রমাগত উপলব্ধি করি।

কিন্তু কিছুদিন পর অনুভব হলো যে, জামায়াতে ইসলামী'র আধুনিক শিক্ষিত সমালোচনামুখর যে অংশটি পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বস্তুভিত্তিক দর্শনকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলো, তারাও দীনকে ঠিক সেভাবেই উপলব্ধি করেছে, যেভাবে উপলব্ধি করেছেন খোদ মাওলানাসহ জামায়াতের অন্যান্য

নেতৃবৃন্দ। তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যাই ছিলো তাদের মতে দীনের বুনিয়াদি ও মূল ব্যাখ্যা। আমার অনুভূতি যতো পরিণত হচ্ছিলো এবং আমার জানা ও অভিজ্ঞতার জগত যতো বিস্তৃত হচ্ছিলো আমার মনের দ্বন্দ্ব মুখরতা ততোই বেড়ে যাচ্ছিলো। আর এ অবস্থাটা একটা উচ্চমাত্রা পেয়েছিলো তখন, যখন হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ তাবলিগ জামাতের মহান দাঈ ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সান্নিধ্যে আমার যাতায়াত বেড়ে গেলো। আমি তাঁর গভীর সান্নিধ্যে বসে যতোই দেখছিলাম তাঁর জীবনের সকাল-সন্ধ্যা, তাঁর রুহানি জগতের বিভা এবং ঈমান ও আমলের এই দাওয়াতের বিভিন্ন অবস্থা, ততোই আমার চিন্তার দোদুল্যামানতা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং দুই দাওয়াতের মাঝে এক বিশাল আড়াল খাড়া হয়ে আছে বলে মনে হতে লাগলো। আমার অনুভব হলো, কেমন হয় নববী দাওয়াত এবং তার ধারক বাহক ও তাদের বৈশিষ্ট্য। নবুওতের ছায়ায় পরিচালিত এ দাওয়াত আর শুধুই প্রতিভানির্ভর গবেষণাময় ও দর্শনভিত্তিক ঐ দাওয়াতের মাঝে কী বিশাল ব্যবধান। আমি মাওলানা মওদুদী সাহেবকে লখনৌ থেকে আবারো লিখে পাঠালাম আমার এ দ্বন্দ্বমুখরতার কথা। অকপটে তাকে জানালাম হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সাথে আমার গভীর সম্পর্কের কথা এবং ধীরে ধীরে তাবলিগী কাজে আত্মনিবেদিত হয়ে ওঠার কথা। সব বিবেচনায় এবার মাওলানা মওদুদী সাহেবও আমাকে ভালোলাগা-কাজে ব্যস্ত থাকার অনুমতি বরং পরামর্শ দিলেন।

জামিয়া মিল্লিয়া'র সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন

১৯৪১ এর শেষের দিকে অথবা ৪২ এর শুরুতে জামিয়া মিল্লিয়া'র ইসলামী মজলিস থেকে বিভাগীয় প্রধান আমার উস্তায মাওলানা খাজা আবদুল হাই ফারুকী সাহেব আমাকে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্যে চিঠি পাঠান। তিনি চাচ্ছিলেন আমি যেনো অবশ্যই উপস্থিত হয়ে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করি। জামিয়া মিল্লিয়া একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পাঠ করার জন্যে আমার মতো এক অপরিচিত ও কম বয়সী নওজোয়ানের জন্যে প্রবন্ধ তৈরী করা তারপর তা উপস্থিত দেশবরেণ্য আলেম উলামা, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও এখানকার ফারেগ ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করা— বেশ দুঃসাহসিক কঠিন কাজই বটে। আমি নিজের এ শূন্যতা ও অপূর্ণতাকে — আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আমি তা ভালো করেই জানতাম — ঢাকার জন্যে ভাবলাম এমন একটি বিষয় আমি নির্বাচন করবো, যা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও

আকর্ষণীয়। তারপর এ বিষয়ে হাতের নাগালে যতো কিতাব আছে সব পড়বো। তারপর এমন একটি গবেষণা প্রবন্ধ তৈরী করবো, যেখানে ফুটে উঠবে গভীর পড়াশোনা ও গবেষণার ছাপ। আমি ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম 'মাযহাব ও তামাদ্দুন' বিষয়ে লেখা। দর্শনের নতুন পুরোনো ইতিহাস বিষয়ে এবং এ ব্যাপারে নানা জনের নানা যুক্তিতর্ক বিষয়ক যে কিতাবগুলো হাতের নাগালে পেয়েছি সবই পড়েছি। বলার চেষ্টা করেছি যে, মাযহাব ও তামাদ্দুনের কিছু অভিন্ন জিজ্ঞাসা রয়েছে, যার উপর রচিত হয়েছে জীবনের ভিত্তি। এ সব জিজ্ঞাসার জবাব সবাই দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর এখানে আমি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি সমাজ বিনির্মাণ ভাবনা ও জীবন পরিচালনার চিন্তা। আমি এখানে আরো তুলে ধরেছি, মানুষের অনুভূতি ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি-বিবেচনা, দর্শন, ধর্মদর্শন, আলোকময়তা, জীবনের কর্মক্ষেত্র এবং সেখানে সাফল্য ও ব্যর্থতা, লাভ ও ক্ষতি ইত্যাদির একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

আরো স্পষ্ট করে বলেছি, এ-সব বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসে তিনটি নগর সভ্যতা— এক. অনুভূতিকেন্দ্রিক নগরসভ্যতা। দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক নগরসভ্যতা। তিন. ইশরাকি — দীপ্তিময় সভ্যতা। তারপর প্রতিটির উপর আলোকপাত করেছি। বলেছি, কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়ার জন্যে রয়েছে আরেকটি পথ। সে পথ হলো নবুওত ও রিসালাতের পথ। আর এ-সব বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে এবং মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে এ পথই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত এবং একমাত্র পথ। এরপর আমি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও তার ফলাফল, ইসলামী জীবনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে চিত্রিত করেছি। এ প্রবন্ধে অনুভূতি, বুদ্ধি ও দর্শনের উপর পাশ্চাত্যের বর্তমান দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্ধৃতি এসে গেছে, যা এ তিন রকমের নগরসভ্যতারই দুর্বলতা তুলে ধরেছে, স্পষ্ট করে দিয়েছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবনে এর ব্যর্থতা এবং বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাও ফুটে উঠেছে।

এ প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সুধীসমাবেশে ১৯৪২ সালের কোনো এক মাসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. যাকের হোসাইন খান, ড. সায়্যিদ আবিদ হোসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও শহরের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীরা। সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী। ১৯৪৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রবন্ধটি পুস্তিকা

'আরশাদ সাহেব সীমান্ত প্রদেশের শুধু 'রাজুলুন রাশীদ'ই নন, বরং 'রাজুলুন আরশাদ'!'

কিছুদিনের মধ্যেই আরশাদ সাহেব তাবলিগের কাজের সাথে গভীর মিশে গেলেন এবং হযরতের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেলো। হিন্দুস্তানের পেশোয়ার ও কলিকাতা ছাড়াও জাপান ও মক্কা-মদীনায় তিনি তাবলিগের বিশাল কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন। জাপানে এতো সুচারুরূপে তিনি কাজ করেছেন যে, সেখানকার লোকেরা দলে দলে তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছে। হিজাযভূমিতেও এ কাজকে তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিত করেছেন এবং বিশেষ ব্যক্তিদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তাবলিগের কাজে তিনি আমেরিকাও সফর করেছেন।

এদিকে সৌদি আরবে অটোমেটিক টেলিফোন প্রকল্প চালু হওয়ার পর তিনি সে বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর মর্জি হলে আর কিছুদিন তিনি হায়াত পেলে দাওয়াত ও তাবলিগের অনেক উপকার হতো। কিন্তু আল্লাহর মঞ্জুর ছিলো অন্যকিছু। ১৪ শা'বান ১৩৮৩ হিজরিতে রওজা যিয়ারত শেষে ১৫ই শা'বানের রোযা রেখে নবীপ্রেমের পরশ বুকে নিয়ে তিনি যখন সফর করে জেদ্দার কাছাকাছি এলেন তখনই এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। হারাম শরীফে তাঁর জানাযা শেষে জান্নাতুল মা'আল্লায় শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী এবং হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর পাশে সমাহিত হন।

কী নসীব! কী সৌভাগ্য! আল্লাহু আকবার!

সীমান্ত প্রদেশের প্রথম সফর

পেশোয়ার সফরে এসে আমার প্রিয় বিষয় 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর ব্যাপারেও উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করলাম। আরশাদ সাহেব পাশে থেকে থেকে অনেক সহযোগিতা করলেন আমাকে। আমি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর স্মৃতিবিজড়িত সীমান্ত প্রদেশ সফরে বের হলাম। আমি প্রথমেই অকুড়ায় গেলাম। এখানেই সায়্যিদ সাহেবের জিহাদের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিলো। ময়দানী লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও এখান থেকেই সূচিত হয়েছিলো। এরপর এখান থেকে শাইদূ, সাওয়াবি, তাহসিল মানেরি ও জেলা শহর মারদান-এর একাধিক জায়গায় আমার যাওয়ার সুযোগ হলো। সায়্যিদ

সাহেবের আন্দোলনের সাথে এ সব জায়গার গভীর সম্পর্ক ছিলো। এখানে যে দু'টি জায়গার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তা হলো হান্ড ও পাঞ্জেতার।

হান্ড একটি বিপজ্জনক কৌতুক

মারদান জেলা শহরে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হান্ড শহর। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী'র মতে সুলতান মাহমুদ গাযনভী এই সমুদ্র পথ ধরেই ভারত প্রবেশ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ ভুল করে এর নাম হান্ড না-লিখে লিখেছেন ভ্যান্টেন্ড। সায়্যিদ সাহেবের যামানায় এখানে সরদার খাদি খানের হুকুমত ছিলো। এ স্থানেই সায়্যিদ সাহেব ১২ই জুমাদাল উখরা ১২৪২ হিজরিতে ইমাম ও আমীর হিসাবে বাইয়াত নিয়েছিলেন। সরদার খাদি খান অন্যান্য খানদের নিয়ে তাঁর হাতে বাআয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে খাদি খান বায়আত ভেঙে সায়্যিদ সাহেবের বিরোধীদের সাথে যোগ দেয়। মুজাহিদ বাহিনী শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। খাদি খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং সে নিজেও নিহত হয়। হান্ড কেল্লাও মুজাহিদদের কজায় চলে আসে।[১]

হান্ড পরিদর্শনের ইচ্ছে বেশ প্রবল ছিলো, বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্থানের ছবি তোলার আগ্রহও মনে কাজ করছিলো। এ জন্যে আরশাদ সাহেব আমাদের সাথে একজন লোকও দিয়েছিলেন। আমরা সোজা হান্ড মসজিদে চলে গেলাম। সময়টা ছিলো ১৮ই মার্চ ১৯৪৪। প্রথমেই জানার চেষ্টা করলাম এমন কেউ আছেন কি না যার কাছে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পারবো। একজন সরদার খাদি খানের বংশের একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। লাহোর রেলওয়ের তিনি একজন কর্মকর্তা। আমার কাছে তিনি জানতে চাইলেন— আপনি এখানে কী কীজে এসেছেন? আমি বললাম— 'ইতিহাসের প্রতি আমার এক ধরনের ঝোঁক আছে। এ টানেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। এখানকার ইতিহাসগুলো আমি একটু জানতে চাই!' তিনি বলতে লাগলেন— 'এতোটুকু কাজের জন্যে তো মানুষ এতো দূরের সফর করে না!' এরপর তিনি যোগ করলেন— 'লখনৌতে একজন আছেন আবুল হাসান আলী নদভী। তিনি একটা কিতাব লিখেছেন। নাম 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ'।

---

১. বিস্তারিত সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে দেখুন

সেখানে তিনি আমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষ সরদার খাদি খান সম্পর্কে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি কী সব ভুলের শিকার হয়ে এ সব লিখেছেন জানি না।' আমি পাশ কেটে গিয়ে বললাম— 'মানুষ কিতাব লিখেই যাচ্ছে একের পর এক!' তিনি তখন আমার নাম আর জানতে চান নি আমিও জানানোটা প্রয়োজন মনে করি নি। প্রসঙ্গ এভাবেই শেষ হয়ে গেলো। যাইহোক; তিনি আমাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানালেন। সন্ধ্যায় বললেন— 'চলুন আপনাকে সমুদ্রের পাড়টা একটু দেখিয়ে আনি।' আমি এবং মাওলানা আবদুল গাফফার সাহের তার সঙ্গে সমুদ্রের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলাম। মাওলানা আবদুল গাফফার ওজু করতে এক জায়গায় বসে গেলেন।

এদিকে আমি এবং ঐ ভদ্রলোক এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন— 'আপনার নাম কী জনাব!' আমি বললাম— 'আলী!' তিনি তখন চমকে ওঠে বললেন— 'আপনিই কি সেই আবুল হাসান আলী নদভী!' (পাঠক জানেন নিশ্চয়ই পাঠানেরা সব সময় বন্দুক সাথে রাখেন। তার সাথেও বন্দুক ছিলো! আর জায়গাটাও ছিলো বেশ নিরিবিলি!) আমি বিব্রতবোধ করলাম। বললাম— 'লখনৌ শিয়া-প্রধান শহর। ওখানে অনেক সুন্নীও নিজেদের নাম 'আলী' 'হোসাইন' রাখেন!' তিনি আর কথা বাড়ালেন না। আমরা ওখানে মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরে এলাম।

রাতে দস্তরখানে বসে বেশ অবাক হলাম। তিনি ভীষণ রাজকীয় মেহমানদারির আয়োজন করলেন। পরদিন ছিলো বিদায় নেয়ার পালা। আমি তাকে খুঁজছিলাম বিদায় আরজ করতে। জানতে পারলাম তিনি ক্ষেত-খামারের কাজে একটু বেরিয়েছেন। আমি তাকে খবর দিলাম। তিনি অবিলম্বেই ফিরে এলেন। এলে পরে বিনয়ের সাথে বললাম— 'এখন আমার যেতে হবে। এখন বিষয়টা অস্পষ্ট না রাখা-ই সঙ্গত। আমিই 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ'-এর লেখক আবুল হাসান আলী নদভী!' তিনি এ কথা শুনে আমার সাথে বড়ো ভালো ব্যবহার করলেন। শ্রদ্ধাভরে বললেন— 'এখন তো পরিচয় হলো! আর কয়েকটা দিন থেকে যান! উপযুক্ত মেহমানদারি তো কিছুই করা হলো না!' তিনি নিষ্ঠাভরেই এ আবদার করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব থেকেই সফরসূচী ঠিক করা ছিলো। তাই বিনয়ের সাথে ওযর পেশ করে বিদায় আরজ করলাম। ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম মানেরি।

পাঞ্জতার ও বালাকোটে

মানেরি থেকে রওয়ানা হলাম পাঞ্জতারের উদ্দেশে। পাঞ্জতার ছিলো সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এবং মুজাহিদ বাহিনীর ৪/৫ বছরের দীর্ঘ অবস্থানস্থল। এ এলাকাটিই ছিলো তার জিহাদী দাওয়াত ও কর্মতৎপরতার বিশেষ কেন্দ্রভূমি। পাঞ্জতার গিয়ে আমি ভীষণ প্রভাবিত হলাম। বিশেষত যখন আমি সেই মসজিদে পা রাখলাম, যেখানে সায়্যিদ সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরা বছরের পর বছর এখানে নামাজ পড়েছেন। এখানে ঢুকেই এর ভাবগম্ভীর পরিবেশ যেনো আমার ঈমানী উষ্ণতায় অন্য রকমের এক উত্তাপ এনে দিলো। আমার দু'চোখে নেমে এলো আবেগময় অশ্রুধারা। আমার চোখের উষ্ণ অশ্রুতে যেনো ভিজে গেলো শুষ্ক ভূখণ্ড। আমার অশ্রু-উৎসের মুখ যেনো খুলে গেলো। আল্লাহর ভালোবাসায় হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। মন দু'আর প্রতি ঝুঁকে পড়লো এমন আচ্ছন্নময়তায় যে, হারামাইন শরীফাইনে এবং জীবনের কিছু নির্দিষ্ট প্রহর ছাড়া আর কখনো অন্তঃকরণ সঁপে দেয়ার এমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় নি।

সৌভাগ্যক্রমে পাঞ্জতারের সফরের পরপর ভাইজানকে চিঠি লেখার সুযোগ হলো। চিঠি-পত্রের ভিতরে সেই চিঠিটিও পেয়ে গেলাম। পাঠকের সমীপে পেশ করছি :

> 'মুহতারাম ভাইজান! (আল্লাহ তাঁর ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করে আমাদেরকে আরো বেশি বেশি উপকৃত করুন!)
>
> আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ
>
> পরশুদিন মধ্যরাতে আমি প্রথম সফর থেকে নিরাপদেই ফারেগ হলাম। আকোড়া থেকে আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, আশা করি পৌছেছে। আমি আকোড়া থেকে হান্ড গিয়েছি। নিহত খাদি খানের বংশধরের সাথেও দেখা হয়েছে। রাতে তার বাড়িতেই মেহমান ছিলাম। তিনি সেখানকার অবস্থা ও ইতিহাস সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছুটিতে এসেছিলেন। তিনি নিজেও সেখানকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহের এবং মহান ব্যক্তিদের

কথা লিখে রেখেছেন। আমার লেখা 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.' থেকেও পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেছেন।

তিনি আমাকে নানা ঐতিহাসিক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, সব স্মৃতিময় জায়গা পরিদর্শন করিয়েছেন। তাকে আমি নিজের পরিচয় প্রকাশ করি নি। তিনি সায়্যিদ সাহেবের অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর (সায়্যিদ সাহেবের) নৃত্যনিষ্ঠা আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিমুখতার ভীষণ তারিফ করেছেন। তবে খাদি খানের পক্ষে ওযর পেশ করারও চেষ্টা করেছেন। সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে খাদি খানের বিরোধিতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার মতে এ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো কিছু ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে। খাদি খানের প্রো-নাতি আমাকে খাদি খানের ভিটা দেখিয়েছেন। আরো বলেছেন অনেক ঘটনা। দেখিয়েছেন অনেক ইতিহাসবিজড়িত স্থান। হান্ড থেকে আমরা মানেরি গিয়েছি।

এ জায়গার উল্লেখ সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. গ্রন্থে বারবার এসেছে। মানেরিতে আমরা একরাত ছিলাম। পরদিন ভীষণ উৎসাহ ও ব্যাকুলতা নিয়ে আমরা পাঞ্জতারের পথে রওয়ানা হলাম। এটিই সায়্যিদ সাহেব এবং তাঁর সাথীদের মূল কেন্দ্র ছিলো। এলাকাটি মানেরি থেকে থেকে ৮/৯ দূরত্বে সোয়াতে (মিয়া গুল সাহেবের প্রশাসনিক এলাকা) পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দ্বি-প্রহরে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছি। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে আমরা যার মেহমান হয়েছিলাম, তিনি ফতেহ খান সাহেবের প্রো-নাতি দোসত মুহাম্মদ খান সাহেব। উল্লেখ্য যে, ফতেহ খান সাহেবই সায়্যিদ সাহেবকে ঐ এলাকায় আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাঁর মেহমানদারি করেছিলেন। তাঁর নাতি আতা খান সাহেবের সাথেও দেখা হয়েছে। তাঁর ভাতিজা পছন্দ খান সাহেবের সাথেও কথা

হয়েছে। তাঁর অন্যান্য প্রিয়জনের সাথেও দেখা হয়েছে। ফতেহ খান সাহেবের বংশধর সবাই (১০/১৫ পরিবার) মিলে থাকে পাহাড়ের এক টিলায়। বড়ো সবুজ-শ্যামল নয়নাভিরাম প্রকৃতির মায়া ও ছায়ায় ঘেরা এলাকা। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝরনা। চারপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা উঁচু পাহাড় যেনো এলাকাটিকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছে। এমন এলাকাকেই বানানো যায় ফৌজি নিবাস। এমন জায়গাতেই গড়ে তোলা যায় নয়া আবাদি।

সায়্যিদ সাহেবের পরবর্তীতে এ এলাকা একাধিকবার শত্রুর নিশানা হয়েছে, অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে, সে সবের চিহ্ন এখনো চোখে পড়ে। ভাঙা কেল্লার অংশ ও পাথরের ঢের ছাড়া সেই জীবন্ত নগরের এখন আর বিশেষ কিছু চোখেই পড়ে না। শুধু সায়্যিদ সাহেবের কিয়ামগাহের একটা সমতল ভূমি এখনো অবশিষ্ট আছে। এখনও তাঁর তাহখানাটি (মাটির নিচে বানানো পাকা ঘর) বিদ্যমান।

কিন্তু এই বিরানময়তা সত্ত্বেও সব জায়গার চেয়ে এই জায়গাটিতে আমি বেশি আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতা অনুভব করলাম। পুরোনো ঐতিহ্যের দৃশ্যাবলীকে চোখের সামনে পেয়ে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। দিল তৃপ্তিতে ভরে গেলো। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলো আগের সেই ছবি। এখানে ছিলেন একদিন সায়্যিদ সাহেব। ছিলেন তাঁর তিনশত মুজাহিদ। সেই পুণ্যবানদের বরকতঘেরা এই জায়গা। তাঁদের ইবাদতে যিকিরে ফিকিরে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র আলোচনায় এ জায়গা ছিলো সব সময় সরব ও মুখর। অনেক খুঁজে দেখলাম, কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি-চিহ্ন ও নিদর্শন পেয়ে যাই কি না! আমাদের মেযবানরাও এ ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পেলাম না। আমরা এই খান্দানের দুই শাখারই মেহমান ছিলাম। ফেরার সময় আমরা পাশের গ্রাম গোরগাশতি গেলাম। সেখানকার গন্যমান্যদের সাথে দেখা হলো। নিজেদেরকে এরা

'হাসানী' বলে দাবি করেন। বড়ো শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালেন আমাদেরকে। এখানে আরো থেকে যেতে ভীষণ পীড়াপীড়ি করলেন। তাঁদের কাছে পুশতু ভাষায় লেখা একটি ইতিহাসনামার সন্ধান পাওয়া গেলো। অবশ্য পাণ্ডুলিপিটি একজন পড়তে নিয়েছিলেন বলে আমরা তখন সেটি আর দেখতে পারি নি। তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেটি আমাকে যথা সময়ে পাঠাবেন।

সবই দেখা হলো। এখন বাকি আছে শুধু বালাকোট। ইনশা আল্লাহ আগামী শনিবার বালাকোট রওয়ানা হবো। এখানেও প্রচণ্ড শীত। লাহোর ও দিল্লি হয়ে আমি শিগগির লখনৌ পৌঁছে যাবো।আমার সশ্রদ্ধ সালাম রইলো।

আপনার স্নেহাস্পদ

আবুল হাসান আলী'

আমরা হান্ড গিয়েছিলাম ১৮ই মার্চ ১৯৪৪ সালে। মার্চের ২৬ অথবা ২৭ তারিখে আমরা বালাকোটে গিয়ে পৌঁছলাম। বরকতময় ঈমানী কাফেলার সফরের আখেরি মঞ্জিল ছিলো এই বালাকোট, যে সফরের সূচনা হয়েছিলো আমাদেরই প্রিয় মাটি রায়বেরেলি থেকে। এই বালাকোটের পুণ্যভূমির ইঞ্চি-ইঞ্চি মাটি ভীষণ প্রিয়। সফরকালে মনে হচ্ছিলো, এ মাটি যেনো আমাদেরকে আলিঙ্গন করছে। আর দর্শনার্থীদেরকে লক্ষ্য করে আবেগভরে বলছো হযরত মির্যা মাযহার জানজানাঁ'র ভাষায়—

یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے

قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں

প্রিয় দর্শনার্থী! আস্তে আস্তে পা ফেলো!

জানো, কোন্ মহান শহীদদের যিয়ারতে এসেছো!

আদব ও শ্রদ্ধাভরে তাঁদেরকে সালাম বলো!

আরেকটা কথা বলি, কখনো ভুলে যাবে না তাঁদের সেই মহান লক্ষ্যের কথা, যা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা এখানে!

সুহৃদ ছেড়ে ..

স্বদেশ ছেড়ে!

শাহাদতের গভীর তামান্না বুকে নিয়ে!

আমরা সরকারি গেস্টহাউজে অবস্থান নিলাম, যার জন্য আরশাদ সাহেব আগেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। মেহমান হলাম এলাকার কাজী সাহেবের। এখানে কোনো ভ্রমণকাহিনী বা রোজনামচা লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর জন্য তো স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থই রচনা করা আবশ্যক। পাঠকগণ 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণের 'বালাকোটের শহীদদের মর্যাদা ও বার্তা' (পৃ. ৪৫৯-৪৬৩) অংশটি পড়ুন এবং সেই লক্ষ্য ও বার্তাটি তাজা করে নিন, যার জন্য এসব দুঃসাহসী মুমিন ও মুজাহিদগণ নিজেদের রক্ত দ্বারা এ ভূখণ্ডকে সজীব ও সতেজ করেছেন এবং শহীদদের সমাধি-ভাণ্ডার দ্বারা গুলজার বানিয়েছেন। অন্ততপক্ষে একালের মানবতা ও হিন্দুস্তানে ইসলাম-বাগিচার 'মজমুয়া আতর' – যা বিগত কয়েক শতাব্দি যাবত তৈরি হয়নি – এখানকার মাটিতে পাওয়া গেছে এবং মুসলমানদের একটি নতুন ইতিহাস তৈরি হয়ে গেছে।

এ সফরে আমার পুরনো বন্ধু মৌলভী ইহসানুল্লাহ সাহেব পেশোয়ারি নদভীও আমার সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়বার; সম্ভবত তার পরের বছরই স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে ও হাজী নূর এলাহি সাহেব পেশোয়ারির সঙ্গে পুনরায় হাজির হলাম। তারপর এখনও পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের রং ও ঘ্রাণে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ মিলেনি।

ফেরার পথে পেশোয়ার, লাহোর ও দারুস সালাম পাঠানকোটে সম্ভবত এক-দুদিন থাকতে হলো, যেখানে মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। যখন সাহারানপুর ফিরে এলাম, ততক্ষণে এই দীর্ঘ সফরে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারপর এক কি দুদিন নিযামুদ্দীনে মাওলানার খেদমতে অবস্থান করে (যার অসুস্থতার ধারা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল) দ্রুত আপন ঠিকানায় পৌঁছে যেতে চাচ্ছিলাম। কারণ, মাদরাসা থেকে বেরিয়েছি প্রায় এক মাস হয়ে গিয়েছিল। সাহারানপুরে যখন হযরত শায়খের খেদমতে হাজির হলাম, তখন হঠাৎই তাঁর নামে আসা মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের হাতে লেখা একখানা পত্র আমার হাতে পড়ল, যার সর্বশীর্ষে লেখা ছিল। وَبِاللّٰهِ فَثِقُوْا وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا (তোমরা আল্লাহর উপর আস্থা রাখো এবং তাঁরই উপর ভরসা করো।) এই পত্রে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, মুবাল্লিগদের যে-দলটি করাচি গেছে, তার পক্ষ থেকে একটি তারবার্তা এসেছে; তাতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদে বড় একটি মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে মাওলানা মুফতী কেয়ায়েতুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা তাইয়েব সাহেব প্রমুখ

অংশগ্রহণ করছেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাবলীগি দাওয়াতকে গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা এবং এ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

আমি পত্রখানা পড়ে কঠিন দ্বিধায় পড়ে গেলাম। সফরের দীর্ঘতা, দারুল উলূমের উপস্থিতির তাগাদা ও নিজের শারীরিক দুর্বলতার প্রতি তাকিয়ে মন চাইল, অপারগতার কথা জানিয়ে দিই। কিন্তু আল্লাহ আমাকে হিম্মত ও তাওফীক দান করলেন এবং হযরত শায়খও ইঙ্গিত দিলেন। আমি সফরসঙ্গী মৌলভী আবদুল গাফফার সাহেব নদভীকে লাখনৌ পাঠিয়ে দিয়ে পরদিনই পাঞ্জাব মেইলে লাহোরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। লাহোর থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব সম্ভলির সাথী হয়ে গেলাম; তিনিও জমিয়তের এই জলসায় অংশগ্রহণ করবেন। জলসায় আমার ওস্তাদের ওস্তাদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীও এসে হাজির হয়েছেন, যিনি কংগ্রেসের প্রথমবারের শাসনামলে মাওলানা আযাদের প্রচেষ্টায় হিন্দুস্তান এসেছিলেন। মাসকয়েক আগে লাখনৌ এসেছিলেন এবং নদওয়ার মেহমানখানায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সাইয়িদ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি উক্ত জলসায় অংশগ্রহণও করলাম এবং বক্তৃতাও দিলাম।

সেখান থেকে আমি দুদিনের জন্য নিউ সাঈদাবাদ হয়ে গোঠপীরজান্ডার বিখ্যাত কেন্দ্র ও পল্লীতে গেলাম, যার সঙ্গে হযরত সাইয়িদ সাহেব ও তাঁর মুজাহিদদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং উক্ত সিলসিলার প্রধান ব্যক্তি হযরত (মাওলানা আহমাদ আলী সাহেবের মাধ্যমে) সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রাশেদিয়ার মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত। আমি গ্রন্থাগারটিও দেখলাম। সে-সময় পীর জিয়াউদ্দীন শাহ সাহেব জীবিত ও গদিনশিন ছিলেন। তিনিও আমাকে খুব স্নেহ দেখালেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব ওখানেই মাদরাসার ছাত্রাবাসের উপর তলায় থাকতেন। শারীরিক দুর্বলতা, বার্ধক্য এবং আমার বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমার কাছে আসতেন এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন। আমি তাঁর থেকে তাঁর হিজরতের সফর ও মস্কো অবস্থানের এমন কিছু তথ্য জানতে পারলাম, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

মাওলানার অসুস্থতার শেষ দিন ও মৃত্যু

হায়দারাবাদ ও করাচি থেকে – যেখানে এ-ই প্রথমবার যাওয়া হলো এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান নেওয়া হলো – দিল্লি রওনা হলাম। এতদিনে

মাওলানার অসুস্থতা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমাকে দারুল উলূমে হাজিরি দিতেই হবে বিধায় আমি লাখনৌ চলে এলাম। খুবসম্ভব জুন মাসের শুরুর দিনগুলোতে আমি দীর্ঘ অবস্থানের নিয়তে হাজির হয়ে গেলাম। সে-সময়ে মাওলানা যফর আহমাদ সাহেব থানুবিরও সেখানে অবস্থান ছিল। জুনের ১২ তারিখে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবও এসে পৌঁছান। এ মাসেই মাদরাসায়ে মুঈনুল ইসলাম-এরও জলসা ছিল। আমিও তাতে শরিক হলাম। শঙ্কা সন্নিকটে মনে হচ্ছিল। আমাকে কয়েকবারই বললেন, আমার আর বাঁচবার আশা নেই। আমি এই রোগ থেকে সেরে উঠব বলে মনে হচ্ছে না।

তবে আল্লাহর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। একদিন বিশেষ কিছু পরিস্থিতির কারণে নানা চিন্তা এসে আমার মাথায় ভিড় জমাল এবং মেজাজটা খুবই খারাপ ছিল। মাগরিবের নামাযের সালাম ফেরানোর সাথে-সাথেই ডাক পড়ল। শায়খ পরম মমতার সঙ্গে আমার মাথায় হাত রাখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত চুলে হাত বোলাতে থাকলেন। তারপর আমি বলতে পারব না, কীভাবে এই দুর্বলতার মধ্যে (যে, মুখ নাড়াতেও কষ্ট হতো) মাথা তুলে আমার কপালে চুমো খেলেন এবং বললেন, তুমি ক্লান্ত হয়ে গেছ; তোমার কোনো সহযোগী নেই। এভাবে তিনি আমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে থাকলেন।

এ-সময়ে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরিও এসে পৌঁছান (যাঁর আঁচলের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ত হওয়া পরবর্তী সময়ের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং যাঁর সঙ্গে সাহারানপুরে আমার কয়েকবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল)। মাওলানা আপন ভক্তদের তাঁর মজলিসে বসার, তাঁর উপস্থিতি থেকে লাভবান হওয়ার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। একবার আমাকে তালাশ করা হলো। আমি মজমা থেকে ঘাবড়ে গিয়ে পুলিশ চৌকির সম্মুখের সড়কে চলে গেলাম। অবশেষে মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব আমাকে খুঁজে বের করলেন। আমি এসে হাজির হলাম। মাওলানা আমাকে ইশারা করলেন, তোমার কান আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আস। তারপর বললেন, মানুষকে যিকিরের তাকিদ করো আর মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি সাহেবের মজলিসে বসার পরামর্শ দাও।

এটি ১৯৪৪ সালের ৮ জুলাইয়ের ঘটনা। ১২, ১৩ জুলাইয়ের মধ্যরাতে নির্ধারিত সময়টি এসে পড়ল এবং ফজরের আযানের আগমুহূর্তে মাওলানার জীবন জীবনের মালিকের হাতে সোপর্দ হয়ে গেল। আজীবনের ক্লান্ত মুসাফির গন্তব্যে পৌঁছে আরামের ঘুম ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই দুর্ঘটনা আমার উপর এমন প্রভাব ফেলল যে, আমি দাফনের পর বাঙলাওয়ালী মসজিদ ও শোকসভায় থাকতে পারলাম না। ফলে মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব প্রমুখ কয়েকজন সাথীকে নিয়ে হুমায়ুন কবরস্তানে চলে গেলাম। ঈশার আগমুহূর্তে যখন এলাম, তখন শায়খকে ধৈর্য ও গম্ভীরতার একটি অটল পাহাড় পেলাম, যিনি খোদ আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

এখন মাওলানার অবর্তমানে সান্ত্বনার উপকরণ হলো তাঁর দাওয়াতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একান্ত মনে কাজ করা আর তাঁর স্থলাভিষিক্তদের সঙ্গে, বিশেষ করে সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব ও মুহতারাম ভাতিজা শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, যা আলহামদুলিল্লাহ দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার বিস্তারিত আলোচনা আগামী লেখাগুলোতে আসবে।

একাদশ অধ্যায়

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের ওফাতের (জুলাই ১৯৪৪) পর থেকে ১৯৪৭ সালের হজ পর্যন্ত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের স্থলাভিষিক্তি ও খেলাফত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর অসুস্থতার সময় যাদের এ-কাজের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল, যারা মাওলানার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও তাঁর নেসবতের শক্তি সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত ছিলেন এবং তাঁর দাওয়াতের বিস্তৃতি ও প্রতিদিনকার উন্নতি প্রত্যক্ষ করছিলেন, তাঁদের জন্য এ বিষয়টি একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল যে, মাওলানার ওফাতের পর (যা কিনা বেশি দূরে মনে হচ্ছিল না) তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এবং কল্যাণ ও বরকতের এই ধারা কীভাবে চালু থাকবে। যাদের বিভিন্ন দাওয়াত এবং রুশ্দ ও ইরশাদের সিলসিলাগুলোর ইতিহাসের উপর নজর ছিল এবং তারা জানতেন, সাধারণত এমন সিলসিলা ঐক্যবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও শক্তিশালী সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, তাঁদের আরও বেশি উদ্বেগ ছিল। তাঁরা তাঁদের এই উৎকণ্ঠার কথা হযরত শায়খুল হাদীছের কাছে ব্যক্ত করলেন। শায়খ সকলের উত্তরে বললেন, আল্লাহর যেসব খাস বান্দা তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দেন, তিনি তাঁদের সম্পদ বিনষ্ট করেন না। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমরা কিছু লোক মিলে তার একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম আর তা ওভাবেই হয়ে যাবে। কখনও এমন হয় যে, হঠাৎ তাঁর লোকদের মধ্য থেকে কোনো একজনের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এসে যায় এবং তিনি সেই কাজটি সামলে নেন। (সূফীদের পরিভাষায় একেই 'নেসবতের স্থানান্তর' বলে)। আপনারা এর অপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকুন। তবে যদি এমনটি না হয়, তাহলে আমি পরামর্শ দেব, চাচাজানের কবর আর তাঁর হুজরার দরজা-জানালার সুবাদে এখানে আসবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর ইনতিকালের দুদিন আগে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবকে (আরও কয়েকজনসহ) এজাযত ও খেলাফত দান করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত বানানো হলো। অনেকের কাছে – যাদের কাছে দাস্তারবন্দি ও স্থলাভিষিক্তির এই সনাতন রীতির পরিচিতি ছিল না – বিষয়টি আপত্তিকর ঠেকল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই আন্দাজ হয়ে গেল যে, তাঁর মাঝে একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে এবং সেসব যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, যা কিনা এই মহান সিলসিলাকে তার মেজাজ এবং তার প্রথম দাঈ ও প্রতিষ্ঠাতার ধারা ও অভিপ্রায় অনুপাতে চালাতে সক্ষম। তদুপরি মেওয়াতের এই অঙ্গন; বরং গোটা সমাজকে আশ্বস্ত ও কর্মতৎপর রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান লোকদের মধ্যে শুধু তাঁর মাঝেই ছিল, যিনি দাওয়াতের মূলধন, তার সফলতার নমুনা এবং কুরবানি ও ঈছারের (নিজের উপর অন্যদের প্রাধান্যদান) জন্য সবার চেয়ে বেশি প্রস্তুত ছিলেন।

আমার অবস্থান ও চিন্তার রীতি

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহ.)-এর ব্যক্তিসত্তার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবোধ, তাঁর দীনের বুঝ ও ইখলাসের উপর পূর্ণ আস্থা, তাঁর কাজের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার উপর বিশ্বাস ও কার্যত অংশগ্রহণ; বরং একজন দাঈ ও মুখপাত্রের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি (যা কিনা মাওলানার জন্যও আনন্দ ও প্রশান্তির কারণ ছিল) ঘটনা হলো, আমার মস্তিষ্কের ধাঁচ (যা একটি বিশেষ ইলমি পরিবেশ ও অধ্যয়ন দ্বারা তৈরি হয়েছিল) পরিপূর্ণ পরাজয় বরণ করেনি এবং তার জায়গায় অন্য কোনো মানসিক ও চিন্তানৈতিক ধাঁচ গড়ে ওঠেনি। এমন পরিস্থিতি সেই লোকদের প্রায়ই সৃষ্টি হয়, যাদের মানসিক ও চিন্তানৈতিক ধাঁচ আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে এবং তাঁরা নিজেদের মস্তিষ্ক ও অধ্যয়ন দ্বারা কাজ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অধিক বিশুদ্ধ শব্দে বলতে হলে বলতে হয়, তারা মস্তিষ্কগত আত্মসমর্পণ ও অতীত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেনি। সেজন্য আন্দোলন ও দাওয়াতি মিশনগুলোর জন্য সেই লোকগুলোই বেশি কাজে আসে, যাদের ধাঁচ সেই আন্দোলন ও দাওয়াতে আসার পরে তৈরি হয় এবং তাদের জন্য কোনো চিন্তানৈতিক হিজরত বা সফরের প্রয়োজন পড়ে না।

সৌভাগ্যক্রমে হোক বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ব্যাপারটা তার থেকে ভিন্ন ছিল। আমার একটি চিন্তানৈতিক ও বিদ্যাগত পটভূমি ছিল। সংশোধন ও

সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলো ও তাদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বদের আমি শুধু অধ্যয়নই করিনি; বরং তাঁদের পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করার সৌভাগ্যও আমার নসিব হয়েছিল। প্রতিটি যুগে আমি কুরআন-হাদীছের জ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা এবং লক্ষ্য ও উপকরণের মাঝে পার্থক্য অনুধাবন করতে থাকি এবং আমার জীবন থেকে উন্নতি থেকে অধিক উন্নতির এবং উপকারী থেকে অধিকতর উপকারীর অনুসন্ধানের ধারা কখনও বন্ধ হয়নি। অনুরূপভাবে আমার কাছে প্রতিটি দাওয়াত ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে – যেগুলো দীনের খেদমত ও আল্লাহর বাণীর সমুন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত – উন্নতি, জীবন ও তার সমস্যাবলি সম্পর্কে অবগতি লাভ, সে-সবের বৈধ ও প্রয়োজনমাফিক সমাধান ও জীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালানো জরুরি। অন্যথায় সেই আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান উন্নতি ও জীবন পরিচালনার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, স্থবিরতার শিকার হয়ে যাবে এবং তার উপকারিতা একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আটকে যাবে।

এসব চিন্তাধারা – যা আমার বিশেষ পরিবেশ, অধ্যয়ন ও মানসিক গঠনের ফলাফল ছিল – কোনো কালেই আমার সঙ্গ ছাড়েনি। মাওলানার জীবদ্দশায় আমি মাঝে-মধ্যে নির্জনে বসে ইকবালের এই চরণগুলো আবৃত্তি করতাম–

اس کشمکش میں گزریں میری زندگی
کبھی سوز وساز رومی کبھی پیچ وتاب رازی

'এই দ্বিধার মাঝেই কেটে গেছে আমার জীবনের বহু রাত।
কখনও রুমির পোড়ন-জ্বলনে, কখনও রাযির প্যাঁচ-জটিলতায়।'

কিন্তু মাওলানার নেসবতের শক্তি, অপার মমতা ও কর্মব্যস্ততা তাঁর জীবনের পুরোটা সময়ে আমার এই চিন্তাকে দাবিয়ে রেখেছিল। মাওলানার মৃত্যুর পর বিষয়টি আবার মাথা জাগাতে শুরু করল। বিষয়টি প্রথমে এই রূপ ধারণ করল যে, এ-কাজে – যেটি বর্তমানে প্রায় সমগ্র হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিও অগ্রসর হচ্ছে – আরও বেশি সংগঠিত, কার্যকর ও বিচক্ষণ-শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য স্বস্তিদায়ক ও আকর্ষণীয় বানাতে দাওয়াতের মূলনীতি ও তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে ঠিক রেখে (যেগুলোকে এই আন্দোলনে ছয় নম্বর নামে স্মরণ করা হয়) খানিক পরিবর্তন

ও অনেকগুলো সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন মজলিসে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব ও তাঁর শূরা সদস্যদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কথাও হয়েছে। কিন্তু আমি অনুমান করলাম, তাদের মস্তিষ্ক বিষয়টি আমলে নিতে প্রস্তুত নয় এবং এতে তাঁদের কোনো সমর্থন নেই। সম্ভবত মাওলানার ইনতেকালের পর দাওয়াতের এই প্রাথমিক স্তরে সাবধানতার খানিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল।

আমি বারকয়েক দৃষ্টি আকর্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আসল দাঈর মাথায় – যিনি দাওয়াতের মূল চালিকাশক্তি – কোনো প্রয়োজনের অনুভূতি এবং কোনো পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকে পরামর্শ দিয়ে কোনো লাভ হয় না। বিশেষ করে সেই লোকদের পরামর্শ, যারা কাজ ও কুরবানিদাতাদের প্রথম সারির লোক নন এবং যারা নিজেদের গোটা জীবনকে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করেননি। অনেক দাঈ ও যিম্মাদার তাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে, যেমন এমন কেউ ইমামকে লোকমা দিল, যে নামাযে শরিক নয় এবং যার লোকমা গ্রহণ করলে নামায ভেঙে যায়।

এই অনুভূতি এবং বারবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা, জামাতের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের বাতেনি ও দাওয়াতি শক্তি এবং তাতে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া, জীবনের পুরোটা সময় এই মিশনের সঙ্গে জড়িত থাকা এমনকি মিশনের জীবন বদলকারী আমল দেখে এ-ধারাটি সেখানেই থামিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করলাম। অবশ্য নিজের মস্তিষ্ককে কাজ করা থেকে বিরত রাখা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, মারকাযের সঙ্গে এই সম্পর্ক ও দাওয়াতের ব্যস্ততা অব্যাহত রাখা হবে। অবশ্য নিজের কর্মপরিধিতে একে অধিক ফলপ্রসূ বানাতে এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল রাখতে এবং দাওয়াত ও তাফহীমে (অপরকে বোঝানো) নিজের জিহ্বাকে ব্যবহার করতে কোনো দোষ তো আর নেই। কুরআনের ভাষ্য 'সবাই যার-যার কাজ করবে। কে কতখানি সঠিক পথে আছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন' এ এক চিরন্তন ও বিশ্বজনীন বাস্তবতা।

লাখনৌর দীনি ও ইলমি মহলে কাজের গ্রহণযোগ্যতা এবং গুরুত্বপূর্ণ তাবলীগি সমাবেশসমূহ

১৯৪৪ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত এই নীতির উপরই কাজ চলতে থাকে। তার ফলাফল এই ছিল যে, দিল্লির আলেম ও

এই কাকতালীয় ঘটনায় লেখক কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন— তা শুধুই অনুভব করা যায়, ভাষায় আর কতোটুকু প্রকাশ করা যায়?! এরপর লেখক কিছুদিনের জন্যে রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে কিতাবটা চেয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আনন্দের এই আকাশে লক্ষ কোটি তারার দ্যুতি যেমন ছিলো, ছিলো একপাশে বেদনার একটা শোকতারাও। ড. আমিনের ভূমিকাটি পড়ে আমি প্রচণ্ড হতাশ হলাম। তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ গবেষক ও লেখকের কাছ থেকে এমন নিরস-কৃপণ-আবেদনহীন ভূমিকা মোটেই আশা করি নি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

'এ বইয়ে কোনো অস্পষ্টতা খুঁজে পেলে পাঠককে বুঝে নিতে হবে— লেখক অনারব—হিন্দুস্তানের এক বাসিন্দা।'

বন্ধুরা এ ভূমিকা পড়ে কেউ-ই খুশি হতে পারেন নি। তারা বললেন: 'কিতাবের সাথে ইনসাফ করা হয় নি।' আমার মনে হয়, ড. আমিন যখন এ ভূমিকা লিখতে বসেছিলেন, তখন হয়ত তাঁর লেখার 'মুড'ই ছিলো না। অথবা হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, চেনা নেই .. জানা নেই , দেখা নেই এমন এক লেখকের বইয়ের ভূমিকায় বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।

তারপরও যেমনি হোক একটি ছোট্ট ভূমিকাসহ ড. আমিনের প্রকাশনা পরিষদ থেকে বইটি বের হওয়ায় ভীষণ উপকার হয়েছিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তা আরব দুনিয়ার তথ্যাভিজ্ঞ বিশেষ মহলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো। এও ছিলো এক বিরাট প্রাপ্তি।

যাহোক, কিতাবটি বের হওয়ার দু' তিন মাস পর মিসরে এসে দেখলাম— লেখকের ধারণার চেয়েও বইটি অনেক বেশি সমাদর পেয়েছে। বিশেষত ইলমী ও দীনি হালকায়। ব্যাপকভাবে তা পঠিত হয়েছে শিক্ষিত মহলে। ইসলাম ও মুসলমানদের উত্থান ও জাগরণ-স্বপ্নে যারা বিভোর, তারা কিতাবটিকে বড়ো আগ্রহভরে গ্রহণ করলো। তখন 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি তুলে নেয়া না হলেও কিছুটা শীতল করা হয়েছে। তাদের মুরুব্বী ও রাহনুমা শায়খ হাসানুল বান্না'র করুণ শাহাদতে তাদের সকলের হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত, শোকাহত। এই কিতাব তাদের শোকাকুল বেদনার্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার শীতল পরশ বুলিয়ে দিলো। তারা যেনো তাদের মতাদর্শ ও চিন্তার পক্ষে লড়াই করার জন্যে এক নতুন অস্ত্র ও নতুন উপকরণ পেয়ে গেলেন। ইখওয়ানের যে-সকল কর্মী বন্দি হলো, তাদের হাতেও পৌঁছে গেলো এই কিতাব। জেলে বসেই তারা পড়লেন এই

কিতাব, হলেন আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত। এমন কি তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ-সিলেবাসেও এই কিতাব অন্তর্ভুক্ত হলো। আদালতে বাদী-বিবাদীর তুমুল তর্কের সময়েও এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হতে লাগলো। সংসদের আলোচনা ও বক্তব্যেও এ কিতাব জায়গা করে নিলো। তারা সবাই লেখককে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-ভালোবাসায় আপন করে নিলো। লেখক যদিও তাদের মাঝে এই প্রথম বেড়াতে এসেছেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো বেগ পেতে হয় নি। নতুনত্ব ঘনিষ্ঠতায় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। লেখকের আসার আগেই তার কিতাব সবার কাছে তাকে তুলে ধরেছে, সবার কাছে তার নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি করেছে। সবার সাথে ছায়াঘেরা-মায়াঘেরা পরিবেশে বসে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক ও ইসলামী গবেষক সায়্যিদ কুতব এ কিতাবকে বড়ো উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি তাঁর ঘনিষ্ট মহল ও ছাত্রদেরকেও তা পড়তে বলেছিলেন।

সায়্যিদ কুতবের বাসভবনে প্রতি শুক্রবার একটি বৈঠক হতো অনেকটা সাহিত্য আসরের মতো বিভিন্ন ইসলামী বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। উপস্থিত সদস্যদের কারো লেখা নিয়েও 'সাহিত্য সমালোচনা' ধরনের আলোচনা হতো। একদিন আমি সে বৈঠকে হাজির হওয়ার দাওয়াত পেলাম সায়্যিদ কুতবের পক্ষ থেকে। আর আনন্দের ব্যাপার হলো– সে দিন আলোচনার বিষয়বস্তু ধার্য করা হলো—ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين! (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্ব কী হারালো?)! কথা ছিলো, তাঁর এক ছাত্র —যিনি ফুয়াদ আল-আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারেগ ছিলেন— কিতাবের সারমর্ম ও বিষয়বস্তু লিখিত আকারে পেশ করবেন এবং তার উপরই আলোচনা হবে। লেখক বড়ো আনন্দভরে, বড়ো কৃতজ্ঞতাভরে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আলোচনায় অংশ নিলেন। লেখক হিসাবে উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন। নিঃসন্দেহে মহান শহীদের পক্ষ থেকে এ আয়োজন ছিলো লেখকের জন্যে বড়ো আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়।

সে বৈঠকে বসেই লেখকের মনে একটা বাসনা উদয় হলো। সায়্যিদ কুতবের মতো একজন আদর্শনিষ্ঠ, ঈমানী চেতনাস্নাত শক্তিমান লেখকের কাছ থেকে -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين!- -এর জন্যে একটি ভূমিকা লিখিয়ে নিলে কেমন হয়!! সায়্যিদ কুতুব বড়ো সুন্দর করে 'হ্যাঁ' বললেন।

তাঁর শক্তিশালী ও প্রাণময় ভূমিকা কিতাবের অবস্থান ও মর্যাদাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ গ্রন্থের আরেকজন গুণগ্রাহী ব্যক্তিত্ব হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অধ্যাপক এবং جماعة الأزهر للتأليف والترجمة والنشر -এর প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউসূফ মূসা। তিনি একদিনেরও কম সময়ে এই গ্রন্থটি পড়ে শেষ করে গ্রন্থের শেষে লিখে রেখেছিলেন এই অমর বাক্যটি—

'إن قراءة هذا الكتاب فرض على كل مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام'

'যারা ইসলামের হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে চায়, তাদেরকে এই গ্রন্থ পড়তেই হবে।'

যাহোক; তিনি নিজের প্রকাশনা থেকে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার আগ্রহের কথা আমাকে জানালেন। আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। তখন ড. আমিনের কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। গ্রন্থের জন্যে তিনি নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও লিখলেন। অপরদিকে লেখকের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ড. আহমদ আশ শিরবাসীও লেখকের জীবনের টুকরো কথা নিয়ে চমৎকার একটি লেখা এই সংস্করণের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। এই লেখাটি কীভাবে তৈরী হলো এবং গ্রন্থের সাথে সংযোজিত হলো, তা আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি। বুঝতে পেরেছি গ্রন্থ প্রকাশের পর! বন্ধুবর ড. আহমদ আশ-শিরবাসী আলাপে আলাপে লেখকের কাছ থেকে লেখকের পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করে করে এই লেখাটি দাঁড় করিয়েছিলেন আমার একেবারে অজান্তেই। শিরোনাম ছিলো–

أخي أبو الحسن: صورة وصفية (আমার ভাই আবুল হাসান! কিছু কথা, কিছু গুণাবলি!)

কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়কালটা ছিলো ১৯৫৩ সাল। এই সংস্করণের পর বইটি এতটাই সমাদৃত হলো যে, প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে বিভিন্ন ভাষায় তা একের পর এক অনূদিত হয়ে আসতে লাগলো। এই মুহূর্তে বইটির ত্রয়োদশ (বৈধ) সংস্করণ চলছে।

অতি সংক্ষেপে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে এই হলো বইটির জন্ম কাহিনী। সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর।

এখানে আমার সব কিতাবের পরিচিতি তুলে ধরা সম্ভব নয় এবং এটি কোনো লেখকের জন্যে সমীচীনও হবে না। তবুও এ কিতাবের কথা আমি এখানে একটু বিস্তৃত পরিসরেই পেশ করলাম। কেননা, আমার দাওয়াতি ও ইলমি জীবনে এ কিতাব অনেক প্রভাব ফেলেছে। সামনের লেখাগুলোতে বারবার এ কিতাবের উদ্ধৃত আসতে থাকবে।

إلى ممثلي البلاد الإسلامية — ইসলামী দেশের প্রতিনিধিদের সমীপে

এখন এ কিতাবের পাশাপাশি আমি আরেকটি কিতাবের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, হিজায ভূমিতে দাওয়াতের কাজে এ কিতাবটিও আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের কথা। হিন্দুস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু এশিয়াভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। দেশবিভাগের আগে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সেমিনার এটিই প্রথম। বিভিন্ন আরব ও মুসলিমদেশকেও এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো, এ সেমিনারে প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্যে। আমি সে সময় দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে নিযামুদ্দীনে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। (এ জামাত সম্পর্কে আলোচনা যথাস্থানে আসবে) আশা করা যাচ্ছিলো, মিসর শাম, ইরাক, লেবানন, তুর্কি ও ইরানের প্রতিনিধিরা এখানে অংশগ্রহণ করবেন। তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর সুযোগ্য সাহেবযাদা ও উত্তরসূরি এবং তৎকালীন আমীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধলভী রহ. আমাকে দিল্লি ডেকে পাঠালেন এ সেমিনারে উপস্থিত হতে। এও বলে দিলেন আমি যেনো এ সেমিনারে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের প্রস্তুতি নিয়ে আসি।

আমি লখনৌ ত্যাগের আগে মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেবের 'আল ফুরকান' পত্রিকা অফিসে গিয়ে إلى ممثلي البلاد الإسلامية শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করলাম দুই বৈঠকে। মূলত এর বিষয়বস্তু আমি আহরণ করেছিলাম ১৯৪৪ সালে পেশাওয়ারের সীরাত সেমিনারে উপস্থাপিত একটি প্রবন্ধ থেকে। যাহোক, এ প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে তার নির্যাস হলো এই—

ইসলাম এমন এক মুহূর্তে এসেছে, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে অনেক জাতি-গোষ্ঠির বাস ছিলো। তাদের ছিলো প্রশাসনিক ব্যবস্থা। তাদের ছিলো সভ্যতা-সংস্কৃতি, নানা রকম শিল্প ও বিদ্যায় তারা ছিলো পারদর্শী। সুতরাং এ সব বিষয়ে শূন্যস্থান পূরণের জন্যে নতুন কোনো উম্মতের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিলো না। তাই জোর দিয়েই বলা যায় যে মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব ঘটেছিলো পৃথিবীতে সে সময় একটি নতুন দাওয়াতের জন্যে। নতুন আক্বিদার জন্যে। নতুন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে। আল্লাহর রাসূলের আগমনের পর ইসলাম এবং কুফরীর মাঝে যে চূড়ান্ত লড়াইটা হয়েছিলো প্রথমে মক্কায়, তারপর মদীনায়। তা ছিলো মূলত একটি বিশেষ আক্বিদা ও বিশ্বাসের লড়াই, নৈতিকতা ও অনৈতিকতার লড়াই, একটি বিশেষ জীবনাদর্শ ও তার জন্যে নির্দ্ধারিত কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্যে লড়াই। মক্কার কাফের মুশরিকরা এবং মুসলমানরা এ লড়াইয়ে প্রতিনিধিত্ব করছিলো দু'টি পরস্পরবিরোধী আক্বিদার, দু'টি দ্বন্দ্বমুখর জীবনাদর্শ ও জীবনপন্থার। মক্কার কোরাইশ গোত্র লড়াই করছিলো মদীনার আনসার মুহাজিরদের সাথে। কেননা, তারা একটি বিশেষ আক্বিদা ও দাওয়াতের ধারক বাহক। তারা গুণান্বিত বিশেষ গুণাবলীতে।

তাদের জীবনচরিত বিশেষ ধারায় প্রবহমান। তারা ডাকেন মানুষকে এক বিশেষ জীবনপন্থার দিকে। এ জন্যে ইসলামের নবীকে অর্থ-সম্পদ, পদ-পদবি, সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতার কোনো প্রলোভনই আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি বরং এ সবকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপর এসেছে বদর ওহুদ খন্দক আওতাসসহ আরো অনেক যুদ্ধ। জাহেলি যুগের সরদারদের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে মুসলমানরা সম্পদলোভীও নয় বস্তুপূজারিও নয়। ক্ষমতা ও নেতৃত্বও তাদের কাম্য নয়। ভোগ-বিলাসিতাও তাদের কাছে শত ডেকেও কোনো সাড়া পায় না। তারা তো বোঝে শুধু নিজেদের আক্বিদা-বিশ্বাস, নিজেদের ঈমান ও আখলাকের বিষয়ই তাদের কাছে সবচে' বড় বিষয়।

কিন্তু নির্মম ও তিক্ত সত্য হলো, দৃশ্যপট বদলে গেছে। ইসলামী দেশে মুসলিম উম্মাহ আগের সেই অবস্থানে এখন আর নেই। তারা বরং আগের সেই ধিকৃত প্রত্যাখ্যাত বস্তুকেই লুফে নিচ্ছে। তাদের কাছে বরণীয় এখন সেই জীবনপন্থা ও আদর্শ যা আল্লাহর নবী ও সাহাবায়ে কেরাম ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে কোনো সভা সেমিনারে মুসলিম উম্মাহর

প্রতিনিধিদল একত্রিত হলে তাদের ভিতরে আগের সেই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আর পরিলক্ষিত হয় না, যা তাদেরকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা মহিমায় ভাস্বর করে রাখতো। অবস্থা দেখে এমন মনে হচ্ছে যে, এখন বদর ওহুদে নিহত কাফের-মুশরিকরা দুনিয়ায় ফিরে এসে আমাদেরকে দেখলে জানতে চাইবে—

তোমাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে কী নিয়ে লড়াই হয়েছিলো! সে তো একটি আক্বিদা বিশ্বাস ও জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে! আমরা আগে যে পথ নিয়ে তোমাদের সাথে দরকষাকষি করতাম, তোমরা তো দেখছি এখন আমাদের সে পথকেই গ্রহণ করে বসে আছো! কই, এখন তো আর আগের মতো তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছো না! আশ্চর্য! এখন তোমরা আমাদের পথে চলার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো! ঠিক সেভাবেই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছো, যেভাবে পতঙ্গরা আলোকশিখার উপর এসে পড়ে আর ধ্বংস হয়ে যায়! কেমন করে বলি এখন, তোমরা সেই পূর্বসুরীদের উত্তরসুরী! সেই দাওয়াতের তোমরা কি আসলেই ধারক-বাহক যে-দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তোমাদের নবী! আমাদের তো নিশ্চিত বিশ্বাস; বদরে, ওহুদে, খন্দকে, হোনায়নে তোমাদের পূর্বসুরীরা যে ত্যাগময় ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তোমরা তা থেকে দূরে বহুদূরে!'

আজকের সেমিনারের হে মুসলিম প্রতিনিধিরা! এ সব প্রশ্নের উত্তর আছে কি আপনাদের কাছে?! কে তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে? আছে কি সুদক্ষ কোনো তর্কবিদ বা আইনজ্ঞ?!

আমি দিল্লি পৌঁছালাম। প্রথমেই গিয়ে বসলাম সম্রাট হুমায়ূনের সমাধিস্থলে। ওখানে বসে সব আগাগোড়া পড়লাম। প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করলাম। পরিচ্ছন্ন করে আবার লিখলাম। পরে এসে কনফারেন্সে যোগ দিলাম, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো মিসেস সরোজিনি নাইদু'র সভাপতিত্বে। একের পর এক বক্তব্য উপস্থাপিত হচ্ছিলো। ইংরেজিতে বক্তব্য শুনলাম পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরুর। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবের এবং শ্রী আয়েঙ্কর-এর। এদিকে আরব দেশ থেকেও এসেছিলেন অনেক প্রতিনিধি। আল্লামা ইকবালের উর্দু কবিতার অনুবাদক ড. আবদুল ওয়াহাব আযযামও এসেছিলেন মিসর থেকে। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন অধ্যাপক মোস্তফা মু'মিন। লেবানন থেকে এসেছিলেন তাকিউদ্দিন সালাহ। পরবর্তীতে যিনি লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এ

ছাড়া আফগানিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন এ কনফারেন্সে। জনাব আলহাজ্ব কোরেশি সাহেব কয়েকজন আরব প্রতিনিধির সম্মানে এক চাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও এখানে এসেছিলেন।

সময় স্বল্পতার জন্যে আমি আমার প্রবন্ধটি উপস্থাপন করতে পারি নি। উপযুক্ত পরিবেশ সঙ্কটও ছিলো। পরবর্তীতে 'ডন' পত্রিকার ছাপাখানা থেকে একটি আলাদা পুস্তিকা হিসাবে এটি ছাপা হয়। আমার প্রথম হিজায সফরে এর বেশ কিছু কপিও সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো ১৯৬৬ সালে, এক ভালো মধ্যস্থতাকারী হিসাবে, যা আমাকে প্রচুর সহযোগিতা করেছিলো।

ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দরসে কুরআন ও 'তামির' পত্রিকা

১৯৪৩ সালে বিশেষ কারণে প্রিয় সহকর্মী মাওলানা আবদুস সালাম ক্বিদওয়াঈ নদভী দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা থেকে চলে গিয়েছিলেন। দৃশ্যত, বিষয়টি ছিলো দুঃখজনক ও ইলমি ক্ষতির কারণ। পাশাপাশি একটি সামাজিত ও ধর্মীয় ফায়দার কারণও সৃষ্টি হয়েছিলো এতে। মাওলানা নিজ উদ্যোগে লখনৌ শহরে এক মহল্লায় কুরআনে কারীমের দরস দিতেন—তাফসির করতেন। এ দরসে শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছাড়াও উত্তর প্রদেশের প্রশাসনের কিছু অফিসারও অংশগ্রহণ করতেন। তারা যখন দেখলেন, মাওলানা এখন আর নদওয়াতুল উলামায় যাচ্ছেন না, তখন এটিকে সুযোগ মনে করলেন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে মাওলানা 'ইদারায়ে তা'লিমে ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন। আর এ জন্যে শহরের উদ্যান নগরী আমিনাবাদে ঘন্টাঘরের সামনে একটি ভবন ভাড়া করা হলো। এ কাজে সবার আগে ছিলেন মুহতারাম ভাই উত্তর প্রদেশ সরকারের স্ট্যান্ট সেক্রেটারি সায়্যিদ সগির হোসাইন, ডেপুটি সেক্রেটারি (রিনিউ) শায়খ জহুরুল হাসান, মুহতারাম খান বাহাদুর সাহেব ও বিশিষ্ট সরকারি শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব সায়্যিদ আসগার হোসাইনসহ আরো অনেকে।

মাওলানা এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরবী ভাষা শেখাচ্ছিলেন। কুরআনের সাথে মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ় ও মজবুত করছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় দরসে কুরআন হতো আর শনিবারে দরসে হাদীস হতো। উভয় দরসের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো আমার কাঁধে। দরস প্রদানের ক্ষেত্রে আমি আমার উস্তাদ ও

মুরুব্বী হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ.-এর বিশেষ ধারা অনুসরণ করতে লাগলাম। এ ধারাটাই আধুনিক শিক্ষিত তবকার জন্যে বেশি উপযোগী। দাওয়াত ও আত্মসংশোধনের জন্যে এ ধারাই হযরত অনুসরণ করতেন এবং এ ধারাটাই আধুনিক সংস্কৃতিবান শিক্ষিত মানুষকে বেশি প্রভাবিত করতো। ফলে তাদের পক্ষ থেকে অনেক সাড়াও পড়েছিলো। সরকারের দীনদার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সবাই এসে এমনভাবে ভীড় করতে লাগলো যে, নিচতলায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় উপরতলায়ও বসার ব্যবস্থা করতে হলো। আনন্দের ব্যাপার ছিলো এই যে, এই দরস চলাকালীন সময়ে শহর জুড়ে কেউ যদি কোনো সাচ্চা দীনদার ব্যক্তির কথা কারো কাছে জানতে চাইতো, তাহলে হয়তো এই উত্তরই মিলতো— তাকে পাওয়া যাবে এখন দরসে কুরআনে, দরসে হাদীসে।

এই দরসের ধারাবাহিকতা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। ক্রমে ক্রমে এর মর্যাদা ও চাহিদা বাড়তেই লাগলো। ১৯৫১ সালে আমি যখন মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে আসি এদিকে মাওলানাও দিল্লি চলে গেলেন জামিয়া মিল্লিয়ায় উস্তাদ ও ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের প্রধান হয়ে এবং এ প্রতিষ্ঠানও কোনো রকম টিকে রইলো। কিছুদির পর এ-দরসে কুরআন ও দরসে হাদীসের জায়গাও পরিবর্তন হয়ে চলে গেলো কাচারি রোডে সদ্য প্রতিষ্ঠিত তাবলিগী মারকাযে। অবশ্য তখন লোকজনের ভিড় আরো বাড়লো, এক পর্যায়ে মাইক পর্যন্ত লাগাতে হলো। এখানে দরসের এ ধারাবাহিকতা ভালোই চলতে লাগলো, লোক সমাগম অনেক বেড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত আমার বহিঃবিশ্বে দীর্ঘ সফরের কারণে এবং দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় অবস্থানের কারণে এ দরসের দায়িত্ব আমার পরিবর্তে অর্পিত হয় মুহতারাম সহকর্মী মাওলানা মনযুর নুমানী সাহেবের কাঁধে। আলহামদুলিল্লাহ! এখনো কোনো না কোনো ভাবে দরসের এ ধারাবাহিকতা চলছে।[১]

১৯৪৩ সালের পরের দিকে আমরা একটি পত্রিকা বের করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় জাগরণ ও অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মা 'তামির' নামে একটি

১. মাওলানা এখন নজিরাবাদ নিজের বাড়ির পাশে এক মসজিদে প্রতি রবিবার এ দরস দিচ্ছেন। (এখন এ মহান দায়িত্বটি পারন করছেন তাঁর সাহেবজাদা হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান সাজ্জাদ নদভী নুমানী- অনুবাদক)

পত্রিকা বের হলো। পত্রিকার প্রচ্ছদে আমার এবং আবদুস সালাম নদভী সাহেবের নাম দেয়া হলো সম্পাদক হিসাবে। এ পত্রিকায় একে একে ছাপা হতে লাগলো আলোড়ন সৃষ্টিকারী শক্তিশালী প্রবন্ধমালা, জেগে উঠতে লাগলো তাদের ঈমানী চেতনা, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি।

এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে আমার বেশকিছু প্রবন্ধ। একটির শিরোনাম ছিলো— العالم في حاجة إلينا (বিশ্ব আমাদের কাছে কী চায়) । পরবর্তীতে এটি منارة النور (আলোর মিনার) শিরোনামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তখন তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। শিরোনাম ছিলো مواضع ضعف في سيرتنا وشخصيتنا القومية (আমাদের চরিত্র ও জাতীয় ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা)। এ প্রবন্ধে মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রে যে সব দোষ-ত্রুটি শিকড় গেড়ে বসেছে, তার কঠোর সমালোচনা করেছি এবং নিচের বিষয়গুলিতে সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিঃ

১. স্বার্থ ও মুনাফাচিন্তাকে নৈতিকতা ও সুকুমারবৃত্তির উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা।

২. ইসলাম ও মুসলমানের আসল দুশমন—ইউরোপ ও ইউরোপীয় সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় উদাসীনতা প্রদর্শন।

৩. আমলের স্বল্পতা ভীরুতা ও কাপুরুষতা।

৪. ইসলামবিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বকে মেনে নেয়ার প্রবণতা।

৫. বক্তৃতা ও ভাষণে লাগামহীন আবেগ এবং তীব্র মতবিরোধিতাকে টেনে আনা।

কাপুরুষতা ও আমলের স্বল্পতা নিয়ে আমি লিখেছিলাম—

> 'মুসলমানদের ভিতরে অধঃপতন ও অনৈতিকতা এতোটাই গেড়ে বসেছে যে, তারা পারস্পরিক সহমর্মিতাবোধ থেকে বঞ্চিত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছে। একজনের বিপদে আরেকজন হাসে বাঁকা হাসি। অনৈতিকতা তো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, অন্যের ত্যাগ ও কুরবানী এবং শৌর্য ও বীর্যকেও স্বীকার করা হচ্ছে না। মুসলমানরা হারিয়ে বসেছে আত্মবিশ্বাস, হতাশা বাসা বেধেছে তাদের হৃদয়ে। তারা নিজেদেরকে কেবলই দুর্বল ভাবে আর অপরকে মনে করে শক্তিশালী। কে সংখ্যালঘু

> আর কে সংখ্যাগরিষ্ঠ— এ নিয়ে রাতদিন কেবলই ব্যস্ততা। আর এসবই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজনীতির কুফল, যে পাশ্চাত্য মুসলিম জাতিকে মনে করে এক নিষ্প্রভ ও জমে-যাওয়া জাতি, যারা কখনো সংখ্যার ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

এ প্রবন্ধ বেশ তাড়াতাড়িই একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ পেয়েছিলো। সুধীমহলে বেশ সমাদৃতও হয়েছিলো। কিন্তু মুসলমানদের সমালোচনা যারা একদম সইতে পারেন না, তারা আবার এ কিতাবকে ভালো চোখে দেখলেন না। পুস্তিকার আকারে বের হলেও প্রবন্ধটি মাসিক 'আল ফুরকান'সহ আরো কিছু পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

এদিকে আমাদের শুরু করা 'তা'মির' পত্রিকাটি বেশ পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠছিলে দিনে-দিনে। বিস্তৃত হচ্ছিলো তার পরিসর ক্রমে ক্রমে। পাশাপাশি আমাদের 'ইদারায়ে তা'লিমাতে ইসলামিয়া'ও সর্বত্র ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করলো। কিন্তু হঠাৎ করে এলো দেশ-বিভাগের ঝড়। এসে সব যেনো লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেলো। আমাদের সযত্ন লালিত ফলেল-ফুলেল বৃক্ষটি নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে গেলো। প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক অবস্থা শুরুতেই ছিলো দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। এরপর আরো সঙ্কটময় হয়ে উঠলো। এ সময়টাতেই মাওলানা আবদুস সালাম নদভী সাহেবের আমন্ত্রণ এলো জামিয়া মিল্লিয়া দিল্লি থেকে ধর্মবিজ্ঞান অনুষদের চেয়ারম্যান হিসাবে। মাওলানা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভালো ছাত্রও ছিলেন। সেখানকার শিক্ষক অধ্যাপক ও দায়িত্বশীলদের সাথে তার ভালো সম্পর্কও ছিলো। সুতরাং তিনি লখনৌকে বিদায় বলে সেখানে চলে গেলেন। এর পরপরই একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো প্রিয় পত্রিকা আর প্রিয় প্রতিষ্ঠান! কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত সুশীল সমাজে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে-মায়াবন্ধন সূচিত হয়েছিলো, তা অক্ষুণ্ণই থাকলো এবং তা আমাদের ভীষণ কাজে লেগেছিলো দাওয়াত ও তাবলিগের ময়দানে কাজ করার সময়, অন্যান্য দীনি কাজের সময়। প্রচার ও প্রকাশনার কাজের সময়।

দশম অধ্যায়

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ও তাঁর দাওয়াতি আন্দোলনের সাথে আমার সম্পর্ক

হযরত মাওলানার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতঃ

পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে আমি ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠছিলাম উলামায়ে কেরাম বুযুর্গানে দীন এবং সংস্কারক ও দাঈগণের জীবনকাহিনীর ছায়ায়। যেমনটা আমি উল্লেখ করেছি আমার বড় আরবী সীরাতগ্রন্থ— السيرة النبوية এর ভূমিকায়। সেখানে বলেছিলাম—

'প্রথম মাদরাসা যেখানে একজন তালিবে ইলম বা ছাত্র হিসাবে আমার নাম লেখা হয়েছিলো এবং যার বরকতের ধারায় আমি সিক্ত হয়েছিলাম, তা হলো 'সীরাতে নববী'র মাদরাসা। এখানে আমি প্রবেশ করেছিলাম আমার পারিবারিক পরিবেশের কারণে আমার প্রাজ্ঞ বড় ভাইয়ের প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণে একেবারে ছোটবেলাতেই, যে বয়সে ছেলেরা এ সবের সাথে একদমই অপরিচিত থাকে।'

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছিলাম যে এ অল্প বয়সেই সীরাতের কিতাব পড়ার সুযোগ আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। (বলা উচিত এ সুযোগ আমাকে তৈরি করে দেয়া হয়েছিলো)। যে বয়সে বাচ্চারা এ সুযোগ সাধারণত লাভ করে না। সীরাতগ্রন্থের তালিকায় সবার আগে যে কিতাবটির কথা উল্লেখ করতে হয় তা হলো, কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান মানসুরপুরী রহ.-এর লেখা رحمة للعالمين —রাহমাতুল-লিল-আলামীন। এ কিতাবটি আমার মাঝে সবচে' বেশি প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। সীরাতের প্রতি সৃষ্টি করেছিলো কোমল আবেগ ও ভালোবাসা। আমার মনে পড়ে, আম্মা অসুস্থ। কিং জর্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি তাঁর কাছে ছিলাম। তাঁর সেবা-যত্ন করছিলাম। আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার প্রিয় সীরাতগ্রন্থ 'রাহমাতুল-লিল-আলামীন'। সুযোগ পেলেই তা খুলে বসে যেতাম, গভীর

মনোযোগে পড়তে থাকতাম। একটু ভেবে দেখার যেনো আমার অবকাশ ছিলো না— এখানে ছাত্র আছে, ডাক্তার আছে। আছে অনেক রুগী। অমন তন্ময়চিত্তে এখানে আমাকে পড়তে দেখলে অন্যরা কী ভাববে এ সব আমি কিছুই ভাবতাম না। গভীর ভালোবাসা ও মনোযোগে একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টে যেতাম। বিশেষ করে আমি যখন পড়তে-পড়তে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা. এবং তাঁর সঙ্গীদের জীবনকথায় পৌঁছে গেলাম, তখন আশ্চর্য এক ভালোলাগা আমাকে পেয়ে বসলো। পথে হাঁটতে-হাঁটতে বেশ হেলে-দুলে আমি তাঁর ঘটনা পড়তে লাগলাম। এ আবেগ ও ভালোবাসার কারণেই যখন মাওলানা মওদুদী সাহেবের 'একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনি আন্দোলন' পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এবং তা বারবার পড়েছিলাম। এটি লিখেছিলেন তিনি 'মেওয়াত' থেকে ফিরে এসে। আর এটি ছাপা হয়েছিলো তার 'তরজুমানুল কুরআন' পত্রিকায়।

মনে পড়ে; দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার মূল ফটকের সামনে দিয়ে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে তার পাড়ে বসে আমি মাওলানার লেখাটি তন্ময়তাভরে পড়ে যাচ্ছিলাম— একবার দুবার তিনবার আশ্চর্য এক ভালোলাগা নিয়ে। অদ্ভুত এক ভালোবাসা নিয়ে। আমার আশপাশ দিয়ে কে যাচ্ছে, কে আসছে তার কোনো খেয়াল আমার ছিলো না।

আগেই আমি যেমনটা উল্লেখ করে এসেছি যে, মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর কথা আমি প্রথম শুনেছিলাম আমাদের পরিবারের এক সম্মানিত সদস্য আলহাজ্ব সায়্যিদ মুহাম্মদ খলীল নাটোরী সাহেবের মুখে। তিনি তখন দিল্লিতে থাকতেন। এ ছাড়া তাঁর আলোচনা শুনেছি আরো নানা জনের মুখে। তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো ১৯৪০ সালের শুরুতে যখন আমি মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেব এবং আলহাজ্ব আবদুল ওয়াহিদ এম.এ. সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন দীনি মারকায ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ সফরে বেরিয়েছিলাম। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসের ২ অথবা ৩ তারিখে আমরা নিযামুদ্দীন বাংলাওয়ালি মসজিদে গিয়ে উঠলাম। এখানেই থাকতেন মাওলানা। জানতে পারলাম, এই মুহূর্তে মাওলানা নেই। সাহারানপুরে কোনো তাবলিগী জলসায় অংশ নিতে তিনি ওখানে অবস্থান করছেন। ফিরবেন একদির অথবা দু'দিন পর। মাওলানা এহতেশামুল হাসান কান্ধলভী আমাদেরকে —যিনি মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর দাওয়াতি কাজের এক রকম নাজেম ও ব্যবস্থাপক ছিলেন— সময় কাজে লাগানোর ব্যবস্থা

করে দিলেন। তিনি আমাদেরকে গোড়্‌গাওয়াঁ জেলার এক ইজতেমায় শরীক হওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ওখানে শরীক হওয়ার পর মনের অনুভূতি ও ভাবনার কথা আমি আগে বলে এসেছি। 'দীনি মারকাযসমূহে এক সপ্তাহ'— এই শিরোনাম থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আমার মনে আছে, দিল্লি ফিরে আসার পর হাতে কিছুটা সময় থাকায় হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব তার এক হিন্দু দোস্তের সাথে দেখা করার জন্যে নয়াদিল্লিতে গেলেন। তারা বেলুচিস্তানে একসঙ্গে কাজ করতেন। আমিও তার সঙ্গী হলাম। তিনি ওখানে যখন তার পুরোনো বন্ধুর সাথে যখন কথা বলছিলেন তখন আমার ভিতরে কিসের অজানা কিন্তু শক্তিশালী এক অস্থিরতা তোলপাড় সৃষ্টি করছিলো। মনে হচ্ছিলো আমি যেনো চেতনা হারিয়ে ফেলবো। ইচ্ছে হচ্ছিলো দরোজাটা খুলে সোজা নিযামুদ্দীনের দিকে দৌড়ে চলে যাই। পাশাপাশি মনে তৈরী হয়েছিলো আল্লাহর দিকে গভীর মনোযোগী হওয়ার আশ্চর্য এক অবস্থা, যা কখনো কখনো রুহানী পরিবেশে সৃষ্টি হয়। আমি নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখছিলাম, যাতে আমার এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা প্রকাশ না-পেয়ে যায়।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে এক সময় কথা শেষ হলো। তারপর দু'জনে মিলে রওয়ানা হয়ে গেলাম নিযামুদ্দীনের দিকে। আমাদের পৌছার কিছুক্ষণ পরই মাওলানা ইলিয়াস রহ. এসে গেলেন। আমাদেরকে এমন আন্তরিকভাবে ও উষ্ণতাভরে তিনি স্বাগত জানালেন যে, মনে হচ্ছিলো, কতো বছর আগের এ পরিচয়। অথবা তিনি যেনো আমাদের অপেক্ষায় প্রহর গোনে যাচ্ছিলেন। বিশেষ করে যখন তিনি জানতে পারলেন, আমি সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর লেখক এবং তাঁরই খান্দানের মানুষ, তখন আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালোবাসা ও গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে গেলো। আমাদেরকে যে বিষয়টি সবচে' বেশি প্রভাবিত করেছে এবং মুগ্ধ করেছে তা হলো, হযরতের আন্তরিকতা ও মমতাপূর্ণ আচরণ। তাঁর চিত্তাকর্ষক মধুময় ব্যবহার। যদিও এটি ছিলো আমাদের মাঝে প্রথম সাক্ষাত কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে মানুষের মাঝে অপরিচিতির যে-জড়তা ও সংকোচ থাকে তা একদমই অনুভূত হলো না। ব্যক্তিত্বের মাঝে যে বিশাল উঁচু-নিচু ব্যবধান, তাও কোনো প্রাচীর খাড়া করতে পারলো না।

এ ছিলো প্রথমদিনের কথা মমতা ও উষ্ণতায় আমরা আপ্লুত হলাম। বরং আজ তা আরো শিকড়ময়তা । দ্বিতীয় দিনও একইভাবে হযরতের স্নেহ-বিস্তার করলো। মনে হচ্ছিলো যেনো কতোদিনের এ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

তৃতীয় দিন আমাকে বেরুতে হলো। বিদায় নেয়ার সময় হযরত অনেকক্ষণধরে এমন গভীরভাবে দু'আ করলেন যে তা হৃদয়-মন ছুঁয়ে গেলো। নিজেকে বড়ো ধন্য মনে হলো। ওখানে বসেই আবার উপস্থিত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করলাম। সম্ভবত এ সঠরেই হযরত আমাকে বলেছিলেন: মাওলানা! আমি আপনার কিতাব 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.' পড়েছি। কিন্তু এতে আমি নতুন কিছু জানতে পারি নি। বরং খান্দানের মহিলা ও বড়দের কাছ থেকে এরচে' আরো বেশি শুনেছি।

কথায় কথা আসে। এ মুহূর্তে আরো মনে পড়ছে যে একদিন আমি মসজিদের উপরতলায় বসা ছিলাম। যেখানে সাহেবযাদা হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী থাকতেন। দেখলাম হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আগমন করলেন এবং আমার দিকে কাপটা বাড়াতে বাড়াতে বললেন: মাওলানা! আমরা এখনো সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর তাজদীদের ছায়াতেই আছি!'[১]

আমি লখনৌ ফিরে তো এলাম কিন্তু মনের অবস্থা ছিলো কবির ভাষায় এই—

ویرینہ سال پیرے ، روش بیک نگا

লখনৌ শহরের আশপাশে তাবলিগের কাজ এবং হযরতের চিঠি

লখনৌ ফিরে এলাম। মনের টানে ছুটে গেলাম লখনৌর আশপাশের এলাকা ও গ্রামে। দাওয়াত দিতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে। মেওয়াতে দেখে-আসা পন্থায় এবং হযরতের মুখে শোনে-আসা উপস্থাপনায়। আমার এ দাওয়াত শুধু গ্রামকেন্দ্রিক ছিলো। কেননা, শহরের লোকজনের সাথে আমার বিশেষ জানাশোনা ছিলো না। আমার সহযোগী বলতে ছিলো সেসব প্রিয় সৌভাগ্যবান ছাত্র, যাদেরকে আমি পড়াতাম। আমার সাথে যারা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই ছুটে যেতাম মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে গ্রামে। বিভিন্ন তবকার লোকজনের মাঝে এভাবে দাওয়াত ছড়িয়ে

১. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর খান্দানের গভীর সম্পর্ক ছিলো সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. -এর খান্দানের সাথে। হযরতের নানা তাঁর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার ধারক বাহক ছিলেন। এ খান্দানের অনেকেই সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর জিহাদী কাফেলায় শরীক হয়েছিলেন। কেউ কেউ শহীদও হয়েছিলেন।

দিতে লাগলাম। দরিদ্র অসহায় লোক এরা। দীন সম্পর্কেও একেবারে অজ্ঞ। তাদের ভিতরে ঈমানকে এবং ধর্মীয় চেতনাবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। পাঁচওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করার তাগিদ দিতে লাগলাম। সামান্য এ দাওয়াতি আমলের কথা জানিয়ে হযরতকে চিঠিও লিখলাম। হযরতও আমাকে লিখতে লাগলেন, উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন।

হযরতের প্রথম চিঠিতে তারিখ লেখা ছিলো—মার্চ ১৯৪০। হস্তাক্ষর ছিলো বর্তমান আমীর হযরত মাওলানা এনামুল হাসান কান্ধলভী সাহেবের।[১] হযরতের দ্বিতীয় চিঠির গায়ে তারিখ লিখা ছিলো— ৭এপ্রিল ১৯৪০। সেখানে আমাকে عمدة الآمال والأماني —আশা-আকাঙ্ক্ষার ভরসাস্থল— বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধনে যা প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো অধমের প্রতি হযরতের স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। মাওলানা চিঠিতে ভাইজান আম্মাকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন। নিজের এক রাশ আনন্দ-অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। তাদের পছন্দ, তাদের আনন্দ এবং আমার প্রতি তাদের সমর্থনের তারিফ করেছেন। তিনি তাঁর চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন, এ বিষয়টি আমি অপদার্থটার একটি বরকতময় আঁচলের তলে আশ্রয় লাভের ঝলক প্রদর্শন করছে, যা মাওলানার বিনয় ও উন্নত নৈতিকতার পরিচয় বহন করে। এরপর থেকে ছোট ছোট বিরতি শেষে হযরতের চিঠি পেতে লাগলাম। আর সে সব চিঠিতে আমাকে হযরত এমন এমন উঁচু উপাধিতে ভূষিত করছিলেন যে, তা এখানে উল্লেখ করলে অন্যের জন্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণ হবে আর আমার জন্যে আত্মমুগ্ধ হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি করবে। এ জন্যেই দিল্লি জামে মসজিদের একটি প্রকাশনী থেকে হযরতের চিঠি-পত্র সংকলন বের হওয়ার সময় এ সব উপাধি আমি মুছে দিয়েছিলাম। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত আমার কাছে হযরতের-আসা সব চিঠিই এ সংকলনে ছাপা হয়েছে, যার সংখ্যা ৩৪।

এ সব চিঠি আমার হাতে আসার পর এতবার পড়তাম যে তার অনেক অংশ মুখস্থ হয়ে যেত। দিনের পর পর দিন তা আমার জেবে পড়ে থাকতো, একে-ওকে শোনাতাম। এই চিঠি-পত্র সংকলনের ভূমিকায় বলা হয়েছে—

---

১. বেশ কিছুদিন থেকেই হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. নিজের হাতে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর চিঠিপত্র লিখার দায়িত্বটি পালন করতেন কখনো উপস্থিত লোকজন। কখনো তাঁর খাদেমগণ। কখনো তাঁর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ। আমার এ পত্র দিয়েই হযরতের চিঠিপত্রের সংকলনের সূচনা করা হয়েছে।

'এখানে দাওয়াতের নিয়ম-নীতি ও আদবের কথাই শুধু বলা হয় নি, দাওয়াতের প্রাণ ও মূলনীতির কথাই শুধু আলোচিত হয় নি বরং পাশাপাশি এ সংকলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ও ইসলামের নিগূঢ়তম বাস্তবতাও তুলে ধরা হয়েছে। এ সব চিঠিতে ফুটে উঠেছে—

হযরতের ইয়াকিন ও তাওয়াক্কুল।

ঈমানী চেতনা ও ইসলামী 'গায়রাত'বোধ।

দীনের দরদ ও ফিকির।

দীনের জন্যে তাঁর সীমাহীন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা।

আরো ফুটে উঠেছে—

আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের অতল গভীরতা।

দীনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার গভীর ব্যঞ্জনা।

শরীয়তের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারার কথকতা।

দীনের রুহ্ উপলব্ধি করার সত্যিকার ধারণা।

এ সব চিঠি পড়তে পড়তে মনে হয়—

এ সব যিনি লিখেছেন তিনি আরিফবিল্লাহ— আল্লাহওয়ালা।

দীনকে জীবন্ত করে উম্মতের সামনে পেশ করা তাঁর দায়িত্ব।'[১]

হযরতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ কিছু কারণ

হযরতের প্রতি আমার এ-আকর্ষণ আমাকে বাধ্য করেছে তাঁর সম্পর্কে জানতে। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের পূর্বে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে শেষ করেছিলাম। যেমন–

১. مکتوبات امام ربانی

২. إزالة الخفاء

৩. الصراط المستقيم

৪. منصب الإمامة

---

১. হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর মাকাতিব (ঈষৎ পরিবর্তিত)

ইতিহাস আর সাহিত্যের কিতাব পড়াশুনায় আমার ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও এ যোগ্যতা আমার ভিতরে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারতাম— দু'টি দাওয়াতের মাঝে, দু'টি প্রচেষ্টার মাঝে, দু'টি নেতৃত্বের মাঝে এবং দু'টি চিন্তাধারার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে। যার মধ্যে প্রথমটির উৎস হলো— মেধা, গবেষণা, জানাশুনার বিস্তৃত পরিধি, কোনো বিশেষ দর্শন বা আন্দোলন অথবা অবস্থার প্রতিক্রিয়া। আর দ্বিতীয়টির উৎস হলো কেবলই আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী, তাঁর সকাশে সনিবেদন উপস্থিতি, দু'আ, কুরআনের তিলাওয়াত এবং তরজমা ও তাফসিরে আত্মমগ্নতা, বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে সীরাতে নববী পাঠ করা, সত্যানুসন্ধানের সজীব চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্ঞান-গবেষণায় বিভোরতা এবং রাব্বে কারীমের পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভে ধন্য হওয়া। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.কে দেখে এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম মহাকবি শিরাজির এ কবিতার তাৎপর্য—

ایں ہمہ مستی و مدہوشی نہ حد بادہ بود
باحریفاں انچہ کرد آن نرگس مستانہ کرد

অন্যদিকে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টির কারণে খুব অল্প সময়েই আমার অর্জিত হয়ে গেলো তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য। সেতুবন্ধনের কাজটি করেছে সেই আশ্চর্য সম্পর্ক যা সিলসিলায়ে রশিদিয়ার সমস্ত মাশায়েখ লাভ করেছেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর কাছ থেকে। আর এ অদ্ভুত সম্পর্কের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা তাদের জন্যে একটু কঠিনই বটে যারা হযরতকে কাছ থেকে বেশি দেখে নি।

হযরতের সাথে আমার সম্পর্ক গভীর হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, তখন সাধারণভাবে মাদরাসার ছাত্র ও উলামায়ে কেরাম এ কাজে মনোযোগী হন নি। বরং তাদের এবং মাওলানার মাঝে (মাওলানার বিশেষ বিশেষ ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি এবং মনের সেই দরদ আবেগ ও ব্যাকুলতার কারণে যা প্রকাশ পেয়েছে 'উলুল আযম' পয়গাম্বর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর ভাষায় এভাবে— وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ — আমার বুক সংকুচিত হয়ে আছে। আমি কথাও বলতে পারি না ঠিকমতো। হারুনকেও (আমার সঙ্গে কাজ করার জন্যে) রাসূল হিসাবে পাঠান। দূরত্বের একটা প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছিলো। ঠিক সে সময় দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার মতো বড়

প্রতিষ্ঠানের একজন মুদাররিস ও একদল ছাত্রকে দাওয়াত ও তাবলিগের এ কাজে ধাবিত হতে দেখে বাস্তবে আমল শুরু করে দিতে দেখে এবং বারবার তাঁর খিদমতে হাজির হতে দেখে তিনি ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। এটিকে একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে দেখেছিলেন। এ জন্যে এ দলটির প্রতি তাঁর বিশেষ নজরও পড়েছিলো। আমরা ধন্য হয়েছিলাম তাঁর দু'আ ও নেকদৃষ্টি লাভে। এর ফলে শুধু তাঁরই ফায়দা হলো না, দারুল উলুমের রঙও বদলে গেলো। অন্য রকম এক আমলী পরিবেশ তৈরী হলো, এক নতুন যুগের সূচনা হলো। জোর দিয়েই বলা যায়— নদওয়াতুল উলামা আন্দোলনের কোনো ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

এতো সার্বিকভাবে সবার অবস্থা বললাম। আমার নিজের অবস্থা নিয়ে কী আর বলবো। শুধু মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী'র এই প্রিয় কবিতাপংক্তিটিই আমার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে—

بندۂ عیب دار کس نہ خرد باہزاراں گنہ خرید مرا

একদিন আমি হযরতকে বললাম, 'আমরা যারা নদওয়াতুল উলামার সাথে সম্পর্কিত তাদের অনেকেই অন্যান্য উলামা-মাশায়েখের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম ঐকমত্য ও সহমতের, কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতাপূর্ণ আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। আপনিই প্রথম আমাদের মাথায় স্নেহ-মমতার হাত রাখলেন!' এ কথা শুনে হযরত অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন, 'মাওলানা! আপনি কী বলছেন! আপনারা তো ইলমে নববীর ধারক বাহক! আমাদের তো আলীগড়ের কাউকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়!'

নায়েবে রাসূল এবং হকের দাঈ'র যে মেযাজ ও মানসিকতা থাকা প্রয়োজন হযরত তারই নীতিমালার আলোকে অন্যদের প্রতি ছিলেন কৃতজ্ঞ। স্বীকৃতি প্রদানে অকৃপণ, স্নেহ-মমতার ও উদারতায় অগ্রগণ্য। এ সব গুণের অধিকারী মানুষটি আরেকদিন আমাকে বললেন: 'আমি কেমন করে আপনার শোকর ও তারিফ করবো! তারিফ হলো মহব্বতের উঁচু মাকাম!' আরেকদিন বললেন: 'আপনাকে কী আর বলবো, শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো কুরআন! (আপনার জীবনে) তা বরকতময় হয়ে উঠুক!'

ছাত্রদের দীনি তারবিয়াত এবং দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ

আগেই যেমনটা বলেছি, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার ছাত্ররা এবং উস্তাদদের ভিতরে মাওলানা মুহাম্মদ নাজিম নদভী সাহেব লখনৌতে দাওয়াত

ও তাবলিগের এ কাজে অনেক অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমরা নদওয়া থেকে বৃহস্পতিবার আসরের পর মওসুম অনুযায়ী কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে আশপাশের মহল্লায় চলে যেতাম, পায়ে হেঁটেই যেতাম। এক মসজিদে গিয়ে জমা হওয়ার পর শুক্রবার দিন দলে দলে বিভক্ত হয়ে অন্যান্য মসজিদে চলে যেতাম। এভাবে আশপাশের মহল্লা ও গ্রামে আমরা ছড়িয়ে পড়তাম। এই তাবলিগী সফরে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের অনেক ফায়দা হয়েছে। আমলের উন্নতি হয়েছে। ইসলাহ বা আত্মসংস্কারের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নামাজের প্রতি গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। আল্লাহর যিকিরের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। তাহাজ্জুদের জযবাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক উপকার অর্জিত হয়েছে। সাদাসিধে জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার অনুশীলন হয়েছে, দীনের পথে কষ্ট করার মানসিকতা তৈরী হয়েছে, পারস্পরিক বন্ধনে এসেছে ঘনিষ্ঠতা হৃদ্যতা, আসাতিযায়ে কেরামের সাথেও বেড়েছে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ। নিজেদের দুর্বলতা কোথায়-কোথায় তারও একটা ধারণা হলো। আরো সবাই জানতে পারলো উম্মতের আম তবকার লোকদের কী দুরাবস্থা ও দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা। ফলে তাদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করা একটা জযবা পয়দা হলো সবার মাঝে। এ কাজের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে অনেক ছাত্রের সাথেই এমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠলো যে, তা পরবর্তীতে আমাকে দাওয়াতি কাজে অনেক সহযোগিতা করেছিলো। শুধু তাই নয়, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার তারাক্কির পেছনেও এ সম্পর্কের অনেক অবদান ছিলো।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. যখন ছাত্রদের দাওয়াত ও তাবলিগের ময়দানে এ মেহনতের কথা এবং দীন শেখা ও চর্চায় ছাত্রদের চেষ্টা ও সাধনার কথা জানতে পারতেন, ভীষণ খুশি হতেন। (যদিও বর্তমানে এ ধরনের সফর ও চেষ্টা-সাধনার ব্যাপারে গুরুত্ব নেই বললেই চলে। বরং এর পরিবর্তে মানুষ সফরে বের হলে হয়তো রাজনৈতিক নয়তো বাণিজ্যিক অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেই বের হয়। বর্তমানে বাইরের জীবাণুযুক্ত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার নেতিবাচক প্রভাবও এখন অনুপ্রবেশ করেছে মাদরাসার নিরাপদ বেষ্টনীর ভিতরে। আল্লাহ্ পানাহ।)

হযরত একবার এ সফরের খবর শোনে সীমাহীন খুশি হয়ে আমাকে চিঠি লিখে পাঠালেন এই বলে— 'আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার গচ্ছিতস্থল! নবীবংশের গর্বিত উত্তরাধীকারী! নবুওতের মেহমানদেরকে (ছাত্রদেরকে)

নিয়ে আপনার বাইরে কদম রাখা যেমন একটি মহান কাজ, তেমনি এ কাজের এ ব্যাপারে বর্ণিত উক্তি, সংবাদ ও আয়াতের উপর দৃষ্টি রাখাও একটি আবশ্যকীয় মহান কাজ। তার উপর ইয়াকিন সৃষ্টি করার চেষ্টা করা— তার নিয়মনীতি ও আদবের প্রতি খেয়াল রাখা— এর কামিয়াব ও সফল হওয়ার পূর্বশর্ত।'

তাবলিগের এ ধরনের সফরে অনেক আদব রক্ষা করে চলতে হয়। এর মাঝে একটি আদব হলো নিরর্থক কর্মকাণ্ড ও ফালতু কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। সাধারণত কয়েক মাস পর অথবা কয়েক সপ্তাহ পর নওজোয়ান ছেলেরা তাবলিগের সফরে বের হওয়ার সুযোগ পেতো, একজন আরেকজনের সাথে মতবিনিময়ের উন্মুক্ত সুযোগ লাভ করতো। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওরা নানা আলোচনা ও গল্পে সজীব হয়ে উঠতো। এ থেকে ওদেরকে বিরত রাখা একটু কঠিন বৈ কি। এ জন্যে আমি চিন্তা করে ওদেরকে একটা চমৎকার ইলমী কৌশলে বন্দি করে ফেললাম। আমি ঘোষণা দিয়ে দিলাম— 'এখন আর উর্দু চলবে না। কথা চলবে শুধু আরবীতে!' আলহামদু লিল্লাহ! সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলো এবং আরবীতে কথা বলা শুরু করলো। এতে দু'টি ফায়দা হাসিল হলো। এক. কথা অনেক কমে গেলো। দুই. কুরআন ও হাদীসের ভাষা চর্চা হতে লাগলো। আমি বেশ পুলক অনুভব করলাম। হযরতকেও বিষয়টি চিঠি লিখে জানালাম। জবাবে হযরত লিখলেন—

> 'আরবী ভাষার সুন্নাত যিন্দাহ করছেন জেনে খুব খুশি হলাম! আল্লাহ তা'আলা এ উদ্যোগকে অন্যান্য দীনি মাদরাসার জন্যে নমুনা হিসাবে কবুল করুন!'

হযরতের কাছে চিঠি লিখলে কিংবা গেলে ভীষণ খুশি হতেন। এ খুশির কথা তিনি প্রকাশ করেছেন একাধিক চিঠিতে। এক চিঠিতে হযরত লিখেছেন—

> 'আপনার আগমন সংবাদে আমি সজীবতাবোধ করছি! আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেনো দুনিয়া আখেরাতে আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক অনেক উপকৃত করেন!'

অপর এক চিঠিতে হযরত লিখেছেন—

> 'আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমার হৃদয়ের কিনওয়াল খুলে গেছে!'

আমিও ব্যাকুলচিত্ত ছিলাম হযরতের কাছে ছুটে যেতে। মাস দু'মাস না-যেতেই চলে যেতাম। সফরের খরচ ছিলো। এদিকে আমার বেতন ছিলো কম। তাই ব্যয়-বোঝাটা বহন করতেন ভাইজানই। মেওয়াতে অনুষ্ঠিত সব জোড় ও ইজতেমায় অংশ গ্রহণেরও চেষ্টা করতাম। এ সফরে অধিকাংশ সময় আমার সঙ্গী হতেন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইমরান খান সাহেব। হযরতের সাথে এ সুবাদে তাঁরও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। তাওয়াত ও তাবলিগের এ কাজে অংশগ্রহণ করে তাঁর অনেক ফায়দা হয়েছিলো। পরবর্তীতে তাঁর ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই ভুপালে তাবলিগের ইজতেমা শুরু হয়। তিনিই ছিলেন এর প্রথম আহ্বায়ক ও আয়োজক। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভুপালের ইজতেমাই হিন্দুস্তানে সবচে' বড় ইজতেমা।

শায়খুল হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রহ.-এর সাথে সাক্ষাত

আমি তখন নিযামুদ্দীনেই অবস্থান করছিলাম। সেখানেই প্রথম হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। এর আগে একবার সাহারানপুর সফর করার সুযোগ হলেও হযরত তখন মাদরাসায় ছিলেন না। (সাহারানপুর সফরের আলোচনা পেছনে গিয়েছে।) আসলে দেখা ও সাক্ষাত শেষে এই নিযামুদ্দীনেই তাঁর সান্নিধ্যে আমি ধন্য হবো এটিই মনে হয় কুদরতের ফায়সালা ছিলো।

একদিন আমি বাংলাওয়ালি মসজিদে বসে ছিলাম। হঠাৎ সমকণ্ঠে শোনা গেলো— শায়খুল হাদীস তাশরিফ এনেছেন! উপস্থিত সবাই ছুটে গেলেন দরোজার দিকে, কেউ সড়কের দিকে। আমি গেলাম না। জায়গাতেই বসে রইলাম। বসে থাকার কারণ দু'টি। এক. ভীড় ও জনমিশ্রণ আমার অভ্যাস নয়। দুই. কিছুটা হীনমন্যতায়ও ভুগছিলাম যে, এ ভীড়ের মধ্যে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে পারবো না, তাঁর কোনো রকম মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবো না। যাহোক, আমি জায়গাতেই নীরবে বসে রইলাম। একটু পরই হযরতকে আসতে দেখলাম, সাথে কতো মানুষ। তাদেরই কেউ একজন আমাকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন আমার কেবলই অবাক হওয়ার পালা। তিনি এতো স্নেহ-মমতাভরে আমার দিকে মনোযোগ দিলেন, মনে হচ্ছিলো, আমি যেন তাঁর কতকালের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ! কী গভীরভাবে আমাকে তিনি চেনেন ও জানেন! আল্লাহু আকবার! বড়রা এমনই হয়!

এরপর এ সম্পর্ক কেবলই বাড়ছিলো দিনে দিনে এবং ক্ষণে-ক্ষণে। শায়খ এতো তাড়াতাড়ি আমার উপর উপর নিজের অপরিমেয় স্নেহ-মমতার ছায়া ছড়িয়ে দিলেন যে, মনে হচ্ছিলো আমি এখানে আগে আরো অসংখ্যবার এসেছি। এরপর যখন বারবার সাহারানপুরে আমি যেতে শুরু করলাম, তখন এ সম্পর্ক আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হলো, একটা আলাদা দ্যুতিতে ঝলমল করতে লাগলো। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ব্যক্তিগতভাবে খুব চাইছিলেন আমি যেনো শায়খ যাকারিয়্যা রহ.-এর সাথে বিশেষভাবে যোগাযোগ রাখি, নিয়মিত যাতায়াত করি এবং চিঠিপত্র লেখা অব্যাহত রাখি। আমি তাই করলাম। আমার এতে অনেক ইলমী তরক্কী হলো, শায়খও আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

লখনৌতে তাবলিগের কাজ এবং মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর আগমন

বেশ কিছুদিন দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ সীমাবদ্ধ রইলো দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার ছাত্র-উস্তাদদের মধ্যে। এরপর আস্তে আস্তে তা শহরের ধর্মপ্রাণ ভাইদের মাঝেও পরিচিতি লাভ করলো এবং ছড়াতে শুরু করলো। এরা পূর্ব থেকেই দাওয়াতের ময়দানে আসার এমন সুযোগ সন্ধান করছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই দাওয়াতের আমলে এমন বরকত হলো যে, লখনৌ শহর থেকে জামাতের পর জামাত নিযামুদ্দীন এবং মেওয়াত যেতে লাগলো। দাওয়াতের আমলে লখনৌবাসীদের এই অংশগ্রহণে এতোই খুশি হলেন যে, তিনি নিজেই এবার লখনৌ আসার ইরাদা করে ফেললেন।

১৩৬২ হিজরি রজব / ১৯৪৩ সালে হযরত লখনৌ আসার দাওয়াত কবুল করলেন। ১৮ই জুলাই হযরত লখনৌতে তাশরিফ আনলেন। সঙ্গে ছিলেন হাফেজ ফখরুদ্দীন সাহেব, মাওলানা ইহতেশামুল হাসান কান্ধলভী, মুহাম্মদ শফী সাহেব কোরাইশী এবং হাজী নাসিম সাহেব। মোতিমহল পুলের কাছে এক ময়দানে ইজতেমার আয়োজন করা হলো। হযরত এসে প্রথমেই নফল নামায পড়লেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত বিনয়াবনত ভঙ্গিতে দু'আ করলেন। হযরত মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী ২দিন পূর্ব থেকেই এখানে হযরতের অপেক্ষা করছিলেন। ৮/৯দিন তিনি এখানে হযরতের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন। দ্বিতীয় দিন ইজতেমায় এসে শরীক হলেন শায়খুল হাদীস

হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রহ., হযরত মাওলানা মনযুর নু'মানী এবং সাহারানপুর মাদরাসার অনেক আসাকিযায়ে কেরাম। হযরত মাওলানা আবদুল হক মাদানী সাহেবও তাশরিফ এনেছিলেন।

আফসোসের বিষয় ছিলো এই যে, তখন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় অনভিপ্রেতভাবে একটা ধর্মঘট চলছিলো, যাতে অনেক ছাত্ররাই অংশ নিয়েছিলো। এদেরকে বহিস্কার করা হয়েছিলো। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় পরিবেশ ছিলো ভারি, ছাত্রসংখ্যাও ছিলো বেশ কম। এ কারণে ইজতেমায় ছাত্ররা ব্যাপকভাবে শরীক হতে পারে নি। কিন্তু হযরতের আগমনে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা যেনো নতুন করে প্রাণ ফিরে পেলো। পরিবেশে যেনো নূর ছেয়ে গেলো। এদিকে হযরতেরও দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার আসাতিযার সাথে বিশেষ করে নদওয়াতুল উলামার নাযেম (মহাপরিচালক) মাওলানা হাকীম ডা. আবদুল আলী সাহেবের সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হলো। হযরত একদিন আমাকে বলছিলেন— মুঝে এ্যায়সে জাগা লে চলো জাহাঁ সে দারুল উলুম কা পূরা মা-হাউল নযর আয়ে! —আমাকে এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাও তো, যেখান থেকে পুরা দারুল উলুম দেখা যাবে! আমি তখন হযরতকে নিয়ে গেলাম দারুল উলুমের মূল প্রাচীন ভবনের ছাদে। এখান থেকে সবই দেখা যায়। একদিকে তাকালে চোখে পড়ে গোমতি নদী। আরেক দিকে দারুল উলুমের মসজিদ। আরেক দিকে বিভিন্ন ছাত্রাবাস। আল্লামা শিবলী হোস্টেল। অন্যান্য আরো হোস্টেল। ভবন। ছাদে আমি আর হজরত। আর কেউ নেই। হযরত আমাকে বললেন— 'হযরত! আমি দারুল উলুমের কোনো খেদমত করতে চাই! বলুন তো, কী খেদমত করতে পারি!'

কী বলবো বুঝতে পারছিলাম না। তখন আল্লাহই আমাকে সাহায্য করলেন, পথ বলে দিলেন। বললাম 'শুধু এতোটুকুই যে আপনি মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরকে যে চোখে দেখেন, সে চোখেই দেখবেন দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামাকে এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করবেন!' হযরত তখন অনেক দু'আ করলেন তারপর নিচে নেমে এলেন।[১]

লখনৌ অবস্থানের শেষদিন রাতের ট্রেনে হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা, হাফেজ ফখরুদ্দীন

---

১. হযরতের লখনৌ সফর ও অবস্থানের কথা এবং বিভিন্ন ইজতেমাসহ শীর্যস্থানীয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে হযরতের জীবনচরিত 'হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. এবং তাঁর দীনি দাওয়াত গ্রন্থে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সেখানেই। (পৃষ্ঠা ১২৬-১৩০)

সাহেবসহ সবাই রওয়ানা হলাম রায়বেরেলী। রাতের বাকি অংশ এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত সবাই 'দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ'য় অবস্থান করলেন। হযরত যখন সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর মসজিদে প্রবেশ করলেন, ভীষণ খুশি হলেন। গভীর অভিনিবেশে কুরআন তিলায়াতে মশগুল রইলেন। এক সময় তিনি শায়খুল হাদীসকে লক্ষ্য করে এই মহল্লার প্রতিষ্ঠাতা এবং এ খান্দানের শীর্ষ বুযুর্গ হযরত শাহ আলামুল্লাহ রহ.- কে নিয়ে শ্রদ্ধাভরে অনেক কিছুই বললেন। নিজের আবেগের কথা বলতে বলতে ভীষণ প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তারপর দুপুরের গাড়িতে হযরত সবাইকে নিয়ে লখনৌ ফিরে গেলেন, লখনৌ ষ্টেশন থেকেই কারপুরে রওয়ানা হয়ে গেলেন, কারপুর দু'দিন অবস্থান করে দিল্লি ফিরে গেলেন।

তারজুমানি'র গৌরব অর্জন

লখনৌ অবস্থানকালে বারবার হযরতের বক্তব্য সবার জন্যে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে দেয়ার গৌরব অর্জন হয়েছে। হযরতের বক্তব্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসতো, বিশেষ ভাষায় তা বলতেন তিনি এবং থেমে থেমেও বলতেন না, সাবলীল ভঙ্গিতে বলে যেতেন। এ জন্যে সাধারণ লোকজন তা পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হতো না। এমন কি অনেক বড় বড় আলেম ও শিক্ষিতরাও অনেক ক্ষেত্রে তা উপলব্ধি করতে না-পেরে পূর্ণ উপকৃত হতে পারতেন না। এ অবস্থায় মাওলানা আমাকে দায়িত্ব অর্পণ করতেন সবার সামনে তাঁর বক্তব্য পরিস্কার করে উপস্থাপনের জন্যে, খোলাসা ও সার-নির্যাস বলে দেওয়ার জন্যে। মাঝে মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও হযরত এ কাজের জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিতেন। এমন একটা ঘটনা বলি। একবার এমন এক বিশেষ জলসায় মাওলানা বক্তব্য দিলেন, যেখানে হযরত মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভীসহ শহরের অনেক উকিল এবং শিক্ষিত গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো উপস্থিত অনেকেই হযরতের বক্তব্য পুরোপুরি ধরতে পারছিলেন না। আমি উপস্থিত কারো কারো ইশারায় এবং নিজেও প্রয়োজন অনুভব করে দাঁড়ালাম। তারপর সবার উপযোগী ভাষায় হযরতের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরলাম। এতে উপস্থিত সবাই এমনকি খোদ হযরতও ভীষণ খুশি হলেন। সামনে বেড়ে হযরত আমাকে আরো বললেন— এর সারসংক্ষেপ ছাপার আকারে চলে আসলে ভালো হয়!

একবার লখনৌ থেকে আমি রাতে নিযামুদ্দীনে পৌঁছলাম। ফজরের সময় হযরত আমাকেই নামাজ পড়াতে বললেন। সালাম ফেরানোর পর হযরত বললেন— 'কিছু বলেন!' আমি তাকিয়ে দেখলাম প্রথম কাতারে বসে আছেন ডা. যাকের হোসাইন খান, মুহাম্মদ শফী সাহেব কোরাইশী ও মালিক দীন মুহাম্মদ সাহেব (দিল্লির বিশিষ্ট ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী)সহ আরো অনেকেই। আমি নিবেদন করলাম— 'হযরত এই মুহূর্তে মাথায় কিছুই নেই বলার মতো!' হযরত বললেন— 'আপনি শুরু তো করুন!' আমি শুরু করলাম। মনে হচ্ছিলো, হযরত পূর্ণ মনোযোগে আমার কথা শুনছেন। আমার কথাও আসছে একের পর এক। আমার উপর হযরতের এই আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই পরে আমি একটি পুস্তিকা রচনা করলাম হযরতের দিকনির্দেশনা ও হিদায়াতি বক্তব্যকে সামনে রেখে। নাম দিলাম 'এ-ক আহাম্ দীনি দাওয়াত'— 'একটি গুরুত্বপূর্ণ দীনি দাওয়াত'। হযরত পুস্তকাটি অক্ষরে-অক্ষরে তা আমার কাছ থেকে শুনেছেন, কিছু শব্দ পরিবর্তন করেছেন এবং শেষে অনেক দু'আ করেছেন।

এই আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই হযরত চাইতেন আমি যেনো বেশি বেশি হযরতের কাছে থাকি, তাঁর মজলিসে যেনো শরীক থাকি। একবার কোনো গাশতে অথবা আশপাশের কোনো কাজে যিম্মাহদারগণ আমাকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাওলানা জানতে পেরে বললেন— 'একজন আমার কথা বুঝতো! তোমরা তাকেও পাঠিয়ে দিলে! এখন কার সাথে আমি কথা বলবো!'

তাবলিগী সফর ও ইজতেমা

পারতপক্ষে আমি মেওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ জলসা ও ইজতেমা বাদ দিতাম না। এ ছাড়া হযরতের ইচ্ছায় আমি দীর্ঘ সফরও করেছি। পানিপতে গিয়েছি, কিরনাল গিয়েছি, রুহতক গিয়েছি, মুরাদাবাদও সফর করেছি। এ-সব সফরে বিশেষ করে মেওয়াতের জলসা ও ইজতেমায় আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি হযরতের বুযুর্গী ও কামালাত। এ সব ইজতেমায় ছেয়ে থাকতো আশ্চর্য এক জান্নাতি আবহ। দিল ঠাণ্ডা করে দেওয়া এক স্বর্গীয় জ্যোতিধারা। মনে হতো, এখানে বুঝি ঝরে-ঝরে পড়ছে আকাশের প্রশান্তিগাথা! এমন আল্লাহমুখী পরিবেশ সৃষ্টি হতো যে, মনে পড়ে যেতো পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের মজলিসের বিভিন্ন ঘটনাবলী।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে ভাইজান ডা. হাকীম সায়্যিদ আবদুল আলী সাহেব নিযামুদ্দীনে এলেন। হযরত তাঁর আগমনে ভীষণ খুশি হলেন।

এরপর যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন, হযরত আবৃত্তি করলেন—

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد

দারুল উলুম থেকে দীর্ঘ ছুটি এবং তাবলিগের কাজে গভীর একাত্মতা

দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে আমার ব্যস্ততা ও অংশগ্রহণ অনেক বেড়ে গেলো। স্বাভাবিকভাবেই মনে এলো যে, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলুমের ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে। ঠিকমতো দরসে উপস্থিত থাকা সম্ভব হচ্ছে না। সূচিবদ্ধ জীবন ক্রমেই হয়ে উঠছিলো বিরক্তির কষ্টকর। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের নিগড়ে বন্দি থাকতে আর ভালো লাগছিলো না। দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততা এবং অন্যান্য কারণে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিতে হলো, দারুল উলুমের নিয়মকে এবং নিয়মিত মুলাযামাত বা চাকরী বা খিদমতকে বিদায় জানাতে হবে। এ পর্যন্ত আমি নিজেই ফায়সালা করে নিলাম। হযরতকে কিছুই জানানো হয় নি। হযরতের কাছ থেকে মঞ্জুরি নেয়াটা জরুরী ছিলো (যাঁকে আমি তখন রুহানী মুরুব্বী ও আমীর মনে করতাম)। আমি নিযামুদ্দীন চলে গেলাম।

রাতে আমি হযরতের খিদমতে হাজির হয়ে আমার মনের ঝোঁকের কথা এবং স্বাধীন ও মুক্ত থেকে দীনের খিদমত করার উৎসাহের কথা একে একে তুলে ধরলাম। হযরত বললেন 'আমাদের বুযুর্গানে দীন আয়-উপার্জনের কোনো মাধ্যমকে কিংবা কোনো চাকরি-বাকরি ছাড়ার পরামর্শ তখনই দেন যখন তারচে' উত্তম কোনো মাধ্যম বা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়।' আমি আবারো হযরতকে আমার ইচ্ছে ও সংকল্পের কথা বললাম। কিন্তু হযরত একই উত্তর দিলেন। আমাকে নিরুৎসাহিত করলেন। আমার ধারণা, মাওলানা আমার তবিয়ত আমার সংকল্প ও আমার দৃঢ়তার বিষয়টি পরখ করে দেখছিলেন।

ফজরের নামাজের পর হযরত বয়ান করলেন। তারপর আমাকে বললেন— 'মাওলানা! দারুল উলুম থেকে আপনি কতো পান?' আমি বললাম— 'পঞ্চাশ রুপি!' এটা শোনে হযরত আবেগভরে বলে উঠলেন— 'জ্বি হযরত! এমন হাজার হাজার পঞ্চাশ আপনার গোলামদের পায়ে পড়ে

থাকবে!' এ কথা বলে হযরত আমাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন! সময়টা ছিলো আনুমানিক ১৯৪২/৪৩ সাল। সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বিক্রির কিছু টাকা জমা ছিলো পোষ্ট অফিসে। এ টাকায় সারা বছর আমার ভালোই কেটে গেলো। বছর শেষে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার 'মুহতামিম হযরত মাওলানা ইমরান খান সাহেব হযরত মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান নদভী সাহেবকে উদ্বুদ্ধ করলেন, যাতে তিনি আমাকে আবারো নদওয়ার সূচিবদ্ধ জীবনে ফিরে যেতে বলেন। আমার সংকল্পে বুঝি দুর্বলতাই চলে এলো। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

অবশ্য এতে সায়্যিদ সাহেবের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মানও একটি বিষয় ছিলো। ভাবছিলাম, অর্থনৈতিক টানাটানির মধ্যে এ প্রস্তাব অবশ্যই গায়বী নুসরাত। আমি ১৯৪৩ সালে ১লা ডিসেম্বর পড়ানো শুরু করে দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কী শান! সে বছরটা আরো অর্থকষ্টে কাটলো! সংকল্প থেকে ফিরে আসার জন্যে বড়োই অনুশোচনা হতে লাগলো। ব্যস ৫ই নভেম্বর থেকে আবারো আমি মুলাযামাত বা চাকরি থেকে বিদায় নিলাম। এবার সংকল্প আরো দৃঢ়। অবশ্য এ সময়টাতে আমি বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি। অর্থসঙ্কটও লেগে ছিলো। ঋণের বোঝাটাও বেশ ভারী হয়ে উঠেছিলো। পরে এমন সব প্রস্তাব এলো, যা আমার অবস্থানের অনেক ঊর্দ্ধে। দারুল উলুমে সর্বোচ্চ যে বেতন তারচে' অনেক বেশি। এমন প্রস্তাবের সামনে স্থির থাকা সত্যি শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাঁদের আছে আল্লাহর উপর সীমাহীন তাওয়াক্কুল ও ভরসা। এর জন্যে অনেক উঁচু তবকার ব্যক্তি হতে হবে, আমি মোটেই তা ছিলাম না।

তবে বিবেকের পর্দায় যে প্রশ্নটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তা হলো— যদি কেউ আমার কাছে জানতে চায় কিংবা পরকালে যদি আমি জিজ্ঞাসিত হই— 'তুমি কি নিজের মাদরাসা শুধু এ জন্যেই ছেড়ে দিয়েছিলে যে ওখানে বেতন কম ছিলো আর এখানে প্রবেশ করেছো কি অনেক অনেক বেশি বেতনের লোভে?' তখন আমি কী জবাব দেবো? সত্যি বলতে কি, কখনো কখনো ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুগান্তকারী বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মাদারিসে দীনিয়ার সাথে সম্পর্ক

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা এবং অন্যান্য আরবী মাদরাসার মাঝে (যেমন– দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরসহ আরো

অন্যান্য মাদরাসা) মৌলিক কোনো পার্থক্য না-থাকলেও কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু ছাত্র ও কোনো কোনো উস্তাদের দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে জড়িত হওয়ার কারণে এবং নিযামুদ্দীনে বারবার উপস্থিত হওয়ার কারণে পরস্পরে কাছে আসার একটা সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিলো। হযরতের থাকাকালিন সময়ে নদওয়ার ছাত্রদের জামাত একাধিকবার সাহারানপুর গিয়েছে। কখনো কখনো তারা ওখানে ইজতেমায় শরীক হয়েছে, রাত যাপন করেছে সাহারানপুর মাদরাসায়, সাক্ষাত হয়েছে মাদরাসার দায়িত্বশীল ও কর্তৃপক্ষের সাথে। ছাত্রদেরকে বড়ো স্নেহ-মমতায় গ্রহণ করেছেন তাঁরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত মাওলানা হাফেজ আবদুল লতিফ সাহেব, মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব ও মাওলানা আসআদুল্লাহ্ সাহেবসহ আরো অনেকেই। এতে পারস্পরিক অপিরিচিত ও অজানার যে বাধা ছিলো তা দূর হয়ে গেলো, যে বাধাটা সৃষ্টি হয়েছিলো যোগাযোগ-শূন্যতার কারণে কিংবা পরিবেশগত কারণে।

দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার ছাত্রদের দাওয়াতের এ কাজের সাথে আন্তরিক অংশগ্রহণ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো সেখানকার ছাত্র-উস্তাদদের মধ্যে। তাঁরাও আগের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে পারলেন দাওয়াত ও তাবলিগের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা। অথচ নদওয়াকে তাদের বিবেচনায় একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান মনে করা হতো। সেই নদওয়াই এখন এ কাজে অগ্রণী ভূমিকাই শুধু পালন করছে না বরং অন্যদেরকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে।

নদওয়ার ছাত্র-উস্তাদদের একটি জামাত দারুল উলুম দেওবন্দেও গিয়েছিলো এ দাওয়াত নিয়ে। এই সফরের সুবাদে একইভাবে দুই মাদরাসার মধ্যকার দূরত্ব কমে পরস্পরে আরো অনেক কাছে এসেছিলো এবং নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছিলো। দীর্ঘদিন থেকেই যেটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিলো এক মাসলাক ও এক আদর্শের দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

পেশাওয়ারের ঐতিহাসিক সফর

১৯৪৪ সালের মার্চে (যখন হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. খুব অসুস্থ ছিলেন) পেশাওয়ার সীরাত কমিটির সেক্রেটারি এ আর আরশাদ সাহেবের একটি চিঠি পেলাম। তিনি জানালেন, এ বছর সীরাত কমিটির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এ বছর সীরাত কমিটির বার্ষিক সেমিনারে সীরাত বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। পেশাওয়ার

এবং সেখানকার সীমান্ত এলাকা আপনার কাছে অপিরিচিত নয়। এ এলাকার সাথে রয়েছে আপনার পারিবারিক সম্পর্ক। সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এখানেই তিনি জিহাদ করেছেন। আন্দোলন করেছেন। দাওয়াত দিয়েছেন। তাই এখানে আপনার একবার আসা প্রয়োজন।

আমি পেশাওয়ারের সীরাত কমিটির কথা আগে কখনো শুনিনি। সেক্রেটারি এ আর আরশাদ সাহেবের কথাও শুনি নি। এ ছাড়া হিন্দুস্তানের নামকরা কোনো বক্তাও আমি নই, যাকে দূর-দূরান্ত থেকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। চিঠিতে আরশাদ সাহেব আরো উল্লেখ করেছেন যে, 'প্রতি বছরই সাধারণত অংশ গ্রহণ করে থাকেন হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী এবং হযরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব সাহেব। এ বছর কমিটির সিদ্ধান্ত মুতাবিক দু'জন নদভীকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এর মধ্যে একজন হলেন আপনি আর দ্বিতীয়জন হলেন হযরত মাওলানা ক্বারী শাহ মুহাম্মদ জা'ফর ফলওয়ারাভী নদভী সাহেব।'

জানি না এ চিঠিতে কী আবেদন লুকিয়ে ছিলো। পড়ার সাথে সাথেই একটা আনন্দ মনকে আলোড়িত করে যাচ্ছিলো। পেশাওয়ার সফরের জন্যে মন আঁকুপাঁকু করতে লাগলো। ভাইজানের কাছে অনুমতি চাইতেই পেয়ে গেলাম এবং তিনি বেশ উৎসাহও দিলেন। আমি যথা সময়ে সীরাত কমিটিতে জানিয়ে দিলাম আমার সম্মতির কথা। এদিকে আমাদের প্রিয়জন সায়্যিদ সগীর হাসান সাহেব আমার পেশোয়ার যাওয়ার খবর শুনে মাওলানা আবদুল গাফফার নদভী সাহেবকে আমার পথসঙ্গী বানিয়ে দিলেন। তিনি কিছুতেই আমার একাকী সফরকে পছন্দ করছিলেন না। আমরা সফরের শুরুতেই প্রথমে গেলাম হযরতের কাছে। হযরত দু'মাস ধরে অসুস্থ। অনেক দু'আ করলেন। বিদায়ের সময় বললেন— 'নিজের কাজ কখনো ভুলবেন না!'

দিল্লি থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভেশনে সফর করছিলাম। রাস্তায় আশ্চর্য রকমের ভালো লাগছিলো। পথেই এক ষ্টেশন থেকে শাহ জা'ফর সাহেবও আমাদের সঙ্গী হয়ে গেলেন। লাহোর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলো প্রিয়ভাজন সায়্যিদ আহমদ আল হাসানী। তিনিই পাশের এক রেষ্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাওয়ালেন। তারপর পেশোয়ারের পথে বিদায় জানালেন। পেশোয়ার ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম, গাড়ি কয়েক ঘন্টা লেট এবং গভীর রাত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আরশাদ সাহেব কয়েকজন বন্ধুসহ ষ্টেশনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমরা রাতে ছিলাম সীমান্ত জেলার সংসদ-স্পিকার মালিক খোদা বখসের বাসভবনে।

সীরাত কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে বক্তব্য উপস্থাপিত হচ্ছিলো। আমদের বক্তব্য কিছুই প্রস্তুত করা হয় নি তখনো। আমি নিজের জন্যে এমন একটি বিষয় ঠিক করলাম যা শিক্ষিত শ্রেণীর জন্যে এবং মাদরাসা পড়ুয়াদের জন্যে উপযোগী হলেও সাধারণ মানুষের জন্যে উপযোগী ছিলো না। সেখানে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় পড়াশুনা করে— এমন অনেক যুবক ছাত্রও উপস্থিত ছিলো। তাদের ভিতরে আমি একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। ওরা মনে হয় এই ভেবে ভীষণ প্রভাবিত ছিলো যে, এইবার সেমিনারে নদভী হযরতরাও এসেছেন। ওদের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে, সবাই আশা করছে এবারের নতুন মেহমানরা খুব ভালো করবেন—শ্রোতাদের মন জয় করবেন।

আমি যে বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম, আমার কেনো যেনো মনে হচ্ছিলো, তা ভালো করে ফুটিয়ে তুলতে পারবো না এবং শ্রোতাদেরকেও সন্তুষ্ট করতে পারবো না। মেহমানখানায় এসে ভাবতে বসলাম— কী করা যায়। সামনে কোনো আলো না দেখায় হাত পাতলাম আকাশের মালিকের কাছে। দু'আর ভিতরে আজিব এক অবস্থা তৈরী হলো। আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতার কথা তুলে ধরলাম, সাহায্য চাইলাম। আস্তে আস্তে আমার দু'আ রঙ ছড়ালো। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ছিলো মূল অধিবেশন। সেদিন অফিস আদালত ছুটি ঘোষণা করা হলো। হাজার হাজার মানুষ শহর থেকে এবং আশপাশের অঞ্চল থেকে সমাবেশে অংশগ্রহণ করলো। সম্ভবত সিকান্দর মির্জাও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন (যিনি তখন সরকারের বড় কোনো পদে ছিলেন), সরদার আবদুর রব নাশতারও উপস্থিত ছিলেন। আমি সতর্কতামূলকভাবে সীরাতে তববীর উপর একটা লেখা লিখে নিয়ে এসেছিলাম, যা পরে 'সীরাতে মুহাম্মদীর পয়গাম বিংশ শতাব্দির দুনিয়ার কাছে'— এই শিরোনামে। আমি আলহাজ্ব আলশাদ সাহেবের কাছে এটি পড়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, সাধারণত এ ধরনের জনসমাবেশে লিখিত বক্তব্য শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। শ্রোতারা শুনতে শুনতে অনেক সময় ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না। হিন্দুস্তানের নামকরা এক লেখক এক বছর এসেছিলেন। তিনিও লিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন। কিন্তু শ্রোতারা মোটেই পছন্দ করে নি এবং মনোযোগ দিয়ে শোনে নি।

আমি সবার সামনে দাঁড়ালাম। আল্লাহর উপর ভরসা করে কথা শুরু করলাম। না, লিখিত বক্তব্য আর পাঠ করতে হলো না। একের পর এক

কথা আসতে লাগলো। আমার আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলো 'বদর যুদ্ধ'-এর সেই দু'আ, যা ময়দানের দৃশ্যই বদলে দিয়েছিলো। উম্মতের অস্তিত্বের লড়াইকে বর্ণিল পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দু'আ। اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد —হে আল্লাহ! তুমি এ দলটিকে ধ্বংস করে দিলে কেউ-ই থাকবে না তোমার ইবাদত করার! আমি বললাম— এই দু'আই মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি।

৩১৩ জনের ছোট্ট কাফেলা হাজার জনের সমষ্টির সাথে জয়লাভ করার মানে হলো এ দু'আ আল্লাহ কবুল করেছেন। এ দু'আ তাই মুসলিম উম্মাহর সার্বক্ষণিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এ দু'আতে বলে দেয়া হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর পয়গাম কী হওয়া উচিত। এ দু'আয় আরো ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী! সুতরাং এ দু'আ মুসলিম উম্মাহর সফলতার প্রধান ভিত্তি। এ ভিত্তি না-থাকলে অর্থহীন জীবন। এ জন্যেই নবুওতের পুণ্য যুগে সাহাবায়ে কেরাম পুরোপুরি অনুধাবন করেছিলেন। অপরদিকে কোরাইশ এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আক্রমণ শাণিত করেছিলো, একের পর এক বিধ্বংসী যুদ্ধে মেতে উঠেছিলো।

এরপর আমি এই উম্মাহ অতীতে কেমন ছিলো আর বর্তমানে কোথায় নেমে এসেছে— তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরলাম। এখানে এসে আমার হৃদয়াবেগ কেমন যেনো তোলপাড় করতে লাগলো। বললাম, আজ যদি বদর-ওহুদের নিহত কাফেররা ফিরে আসে আর মুসলমানদের কাছে জানতে চায়, কোথায় হারিয়ে গেলো তোমাদের বৈশিষ্ট্য? কোথায় তোমাদের জীবনের লক্ষ্য, যা প্রতিষ্ঠিত করতে তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছিলো? বলো তো, এখন আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে কী এমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে? আমরা দুনিয়াকে ভালোবাসতাম! তোমরাও তো এখন দুনিয়ার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছো! তোমরা ছুটছো এখন স্বাদ-আহ্লাদ আর আনন্দ-বিনোদনের পেছনে! আরাম-আয়েশে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এখন তোমরা! ধর্ম-বিশ্বাস আর পরকালচেতনা কৈ এখন তো আর তোমাদের তাড়িত করে না আগের মতো! তাহলে বলো, আমরা আর তোমরা আলাদা রইলাম কীভাবে? আমরা আগে যা করতাম এবং চাইতাম তোমরা তো এখন তাই করছো এবং চাইছো!

প্রিয় উপস্থিতি! এমন হলে আমরা কি পারবো তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে!

আমি জানি না, সেদিন এমন সব কথা এমন ভাষায় ও উপস্থাপনায় আমি কেমন করে বলেছিলাম। সাবলীল ভঙ্গিতে বলেই যাচ্ছিলাম, কোনো জড়তা অনুভূত হচ্ছিলো না। আমি যেনো কথা ও ভাবে সাঁতরে বেড়াচ্ছিলাম। উপস্থিত জনতাও মুগ্ধতা নিয়ে শুনছিলেন আমার কথা। সীমাহীন প্রভাবিত হচ্ছিলেন তারা। একজন জানালেন যে, সরদার আবদুর রব নাশতার সাহেব মুখে রুমাল চেপে ভীষণ কাঁদছিলেন। বক্তব্য সমাপ্ত হতেই কয়েকজন আফগান বন্ধু সামনে এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, বলুন জনাব, কী আদেশ! যা ইচ্ছে আদেশ করুন! আমরা আপনার খিদমতে আছি!

এ বক্তব্যটিই পরবর্তীতে আরো কিছুটা বিস্তৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো إلى ممثلي البلاد الإسلامية শিরোনামে।

আলহাজ্ব আরশাদ সাহেব

এখানে একটু আলাদা করে আলহাজ্ব আরশাদ সাহেবের কথা না বললেই নয়। তাঁর দাওয়াতেই আমি এ সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিলাম। সত্যি কথা হলো, আমি সেমিনারে আলহাজ্ব আরশাদ সাহেবকে আবিস্কার করতে পেরে তাঁর সাথে এবং তাঁর কাজের সাথে পরিচিত হতে পেরে ভীষণ আনন্দিত বোধ করেছি। আমি অকপটেই বলছি, আমি জীবনে যাদের দেখে ধন্য, মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছি, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা তাঁর সমৃদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণা আমাকে চমৎকৃত করেছে। আমি মনে করি, এমন সুযোগ্য মানুষের সংখ্যা হাজারে নয় লাখে দুয়েকজন মিলবে। তাঁর সাথে আমার দুর্লভ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত ছিলো।

সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্য পেশোয়ারে একটা দীনি পরিবেশ ও চেতনা সৃষ্টি করলো। বিভিন্ন জায়গায় মুখে-মুখে তা আলোচিত হতে লাগলো। এতে বক্তার ওজন ও অবস্থানও সবার মাঝে বেড়ে গেলো। এই পরিবেশকে আমি কাজে লাগালাম। আমি তাবলিগী উসুল অনুযায়ী দাওয়াত দিতে লাগলাম। সেখানে এক নয়া কলোনীতে —যেখানে অনেক উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবি ছিলেন— সীমান্ত প্রদেশের প্রথম তাবলিগী গাশত হলো। তখন থেকেই সীমান্ত প্রদেশে তাবলিগী কাজের সূচনা হয়। এর পরের মাসেই অর্থাৎ ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে জনাব আরশাদ সাহেব হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর নিকটে দিল্লি নিযামুদ্দীনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমি হযরতকে তাঁর সম্পর্কে একটি পরিচিতিপত্র লিখে দিলাম। সেখানে একটি বাক্য ছিলো এমন

'আরশাদ সাহেব সীমান্ত প্রদেশের শুধু 'রাজুলুন রাশীদ'ই নন, বরং 'রাজুলুন আরশাদ'!'

কিছুদিনের মধ্যেই আরশাদ সাহেব তাবলিগের কাজের সাথে গভীর মিশে গেলেন এবং হযরতের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ অনেক বেড়ে গেলো। হিন্দুস্তানের পেশোয়ার ও কলিকাতা ছাড়াও জাপান ও মক্কা-মদীনায় তিনি তাবলিগের বিশাল কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন। জাপানে এতো সুচারুরূপে তিনি কাজ করেছেন যে, সেখানকার লোকেরা দলে দলে তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছে। হিজাযভূমিতেও এ কাজকে তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিত করেছেন এবং বিশেষ ব্যক্তিদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। তাবলিগের কাজে তিনি আমেরিকাও সফর করেছেন।

এদিকে সৌদি আরবে অটোমেটিক টেলিফোন প্রকল্প চালু হওয়ার পর তিনি সে বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর মর্জি হলে আর কিছুদিন তিনি হায়াত পেলে দাওয়াত ও তাবলিগের অনেক উপকার হতো। কিন্তু আল্লাহর মঞ্জুর ছিলো অন্যকিছু। ১৪ শা'বান ১৩৮৩ হিজরিতে রওজা যিয়ারত শেষে ১৫ই শা'বানের রোযা রেখে নবীপ্রেমের পরশ বুকে নিয়ে তিনি যখন সফর করে জেদ্দার কাছাকাছি এলেন তখনই এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। হারাম শরীফে তাঁর জানাযা শেষে জান্নাতুল মা'আল্লায় শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী এবং হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী রহ.-এর পাশে সমাহিত হন।

কী নসীব! কী সৌভাগ্য! আল্লাহু আকবার!

সীমান্ত প্রদেশের প্রথম সফর

পেশোয়ার সফরে এসে আমার প্রিয় বিষয় 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর ব্যাপারেও উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করলাম। আরশাদ সাহেব পাশে থেকে থেকে অনেক সহযোগিতা করলেন আমাকে। আমি সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.-এর স্মৃতিবিজড়িত সীমান্ত প্রদেশ সফরে বের হলাম। আমি প্রথমেই অকুড়ায় গেলাম। এখানেই সায়্যিদ সাহেবের জিহাদের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছিলো। ময়দানী লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও এখান থেকেই সূচিত হয়েছিলো। এরপর এখান থেকে শাইদূ, সাওয়াবি, তাহসিল মালেরি ও জেলা শহর মারদান-এর একাধিক জায়গায় আমার যাওয়ার সুযোগ হলো। সায়্যিদ

সাহেবের আন্দোলনের সাথে এ সব জায়গার গভীর সম্পর্ক ছিলো। এখানে যে দু'টি জায়গার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তা হলো হান্ড ও পাঞ্জেতার।

হান্ড একটি বিপজ্জনক কৌতুক

মারদান জেলা শহরে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হান্ড শহর। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী'র মতে সুলতান মাহমুদ গাযনভী এই সমুদ্র পথ ধরেই ভারত প্রবেশ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ ভুল করে এর নাম হান্ড না-লিখে লিখেছেন ভ্যান্টেন্ড। সায়্যিদ সাহেবের যামানায় এখানে সরদার খাদি খানের হুকুমত ছিলো। এ স্থানেই সায়্যিদ সাহেব ১২ই জুমাদাল উখরা ১২৪২ হিজরিতে ইমাম ও আমীর হিসাবে বাইয়াত নিয়েছিলেন। সরদার খাদি খান অন্যান্য খানদের নিয়ে তাঁর হাতে বাআয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে খাদি খান বায়আত ভেঙে সায়্যিদ সাহেবের বিরোধীদের সাথে যোগ দেয়। মুজাহিদ বাহিনী শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ.-এর নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। খাদি খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং সে নিজেও নিহত হয়। হান্ড কেল্লাও মুজাহিদদের কব্জায় চলে আসে।[১]

হান্ড পরিদর্শনের ইচ্ছে বেশ প্রবল ছিলো, বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্থানের ছবি তোলার আগ্রহও মনে কাজ করছিলো। এ জন্যে আরশাদ সাহেব আমাদের সাথে একজন লোকও দিয়েছিলেন। আমরা সোজা হান্ড মসজিদে চলে গেলাম। সময়টা ছিলো ১৮ই মার্চ ১৯৪৪। প্রথমেই জানার চেষ্টা করলাম এমন কেউ আছেন কি না যার কাছে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানতে পারবো। একজন সরদার খাদি খানের বংশের একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। লাহোর রেলওয়ের তিনি একজন কর্মকর্তা। আমার কাছে তিনি জানতে চাইলেন— আপনি এখানে কী কীজে এসেছেন? আমি বললাম— 'ইতিহাসের প্রতি আমার এক ধরনের ঝোঁক আছে। এ টানেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। এখানকার ইতিহাসগুলো আমি একটু জানতে চাই!' তিনি বলতে লাগলেন— 'এতোটুকু কাজের জন্যে তো মানুষ এতো দূরের সফর করে না!' এরপর তিনি যোগ করলেন— 'লখনৌতে একজন আছেন আবুল হাসান আলী নদভী। তিনি একটা কিতাব লিখেছেন। নাম 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ'।

---

১. বিস্তারিত সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ গ্রন্থে দেখুন

সেখানে তিনি আমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষ সরদার খাদি খান সম্পর্কে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি কী সব ভুলের শিকার হয়ে এ সব লিখেছেন জানি না।' আমি পাশ কেটে গিয়ে বললাম— 'মানুষ কিতাব লিখেই যাচ্ছে একের পর এক!' তিনি তখন আমার নাম আর জানতে চান নি আমিও জানানোটা প্রয়োজন মনে করি নি। প্রসঙ্গ এভাবেই শেষ হয়ে গেলো। যাইহোক; তিনি আমাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানালেন। সন্ধ্যায় বললেন— 'চলুন আপনাকে সমুদ্রের পাড়টা একটু দেখিয়ে আনি!' আমি এবং মাওলানা আবদুল গাফফার সাহের তার সঙ্গে সমুদ্রের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলাম। মাওলানা আবদুল গাফফার ওজু করতে এক জায়গায় বসে গেলেন।

এদিকে আমি এবং ঐ ভদ্রলোক এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি জানতে চাইলেন— 'আপনার নাম কী জনাব!' আমি বললাম— 'আলী!' তিনি তখন চমকে ওঠে বললেন— 'আপনিই কি সেই আবুল হাসান আলী নদভী!' (পাঠক জানেন নিশ্চয়ই পাঠানেরা সব সময় বন্দুক সাথে রাখেন। তার সাথেও বন্দুক ছিলো। আর জায়গাটাও ছিলো বেশ নিরিবিলি!) আমি বিব্রতবোধ করলাম। বললাম— 'লখনৌ শিয়া-প্রধান শহর। ওখানে অনেক সুন্নীও নিজেদের নাম 'আলী' 'হোসাইন' রাখেন।' তিনি আর কথা বাড়ালেন না। আমরা ওখানে মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরে এলাম।

রাতে দস্তরখানে বসে বেশ অবাক হলাম। তিনি ভীষণ রাজকীয় মেহমানদারির আয়োজন করলেন। পরদিন ছিলো বিদায় নেয়ার পালা। আমি তাকে খুঁজছিলাম বিদায় আরজ করতে। জানতে পারলাম তিনি ক্ষেত-খামারের কাজে একটু বেরিয়েছেন। আমি তাকে খবর দিলাম। তিনি অবিলম্বেই ফিরে এলেন। এলে পরে বিনয়ের সাথে বললাম— 'এখন আমার যেতে হবে। এখন বিষয়টা অস্পষ্ট না রাখা-ই সঙ্গত। আমিই 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ'-এর লেখক আবুল হাসান আলী নদভী!' তিনি এ কথা শুনে আমার সাথে বড়ো ভালো ব্যবহার করলেন। শ্রদ্ধাভরে বললেন— 'এখন তো পরিচয় হলো! আর কয়েকটা দিন থেকে যান! উপযুক্ত মেহমানদারি তো কিছুই করা হলো না!' তিনি নিষ্ঠাভরেই এ আবদার করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব থেকেই সফরসূচী ঠিক করা ছিলো। তাই বিনয়ের সাথে ওযর পেশ করে বিদায় আরজ করলাম। ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম মানেরি।

পাঞ্জতার ও বালাকোটে

মানেরি থেকে রওয়ানা হলাম পাঞ্জতারের উদ্দেশে। পাঞ্জতার ছিলো সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. এবং মুজাহিদ বাহিনীর ৪/৫ বছরের দীর্ঘ অবস্থানস্থল। এ এলাকাটিই ছিলো তার জিহাদী দাওয়াত ও কর্মতৎপরতার বিশেষ কেন্দ্রভূমি। পাঞ্জতার গিয়ে আমি ভীষণ প্রভাবিত হলাম। বিশেষত যখন আমি সেই মসজিদে পা রাখলাম, যেখানে সায়্যিদ সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীরা বছরের পর বছর এখানে নামাজ পড়েছেন। এখানে ঢুকেই এর ভাবগম্ভীর পরিবেশ যেনো আমার ঈমানী উষ্ণতায় অন্য রকমের এক উত্তাপ এনে দিলো। আমার দু'চোখে নেমে এলো আবেগময় অশ্রুধারা। আমার চোখের উষ্ণ অশ্রুতে যেনো ভিজে গেলো শুষ্ক ভূখণ্ড। আমার অশ্রু-উৎসের মুখ যেনো খুলে গেলো। আল্লাহর ভালোবাসায় হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। মন দু'আর প্রতি ঝুঁকে পড়লো এমন আচ্ছন্নময়তায় যে, হারামাইন শরীফাইনে এবং জীবনের কিছু নির্দিষ্ট প্রহর ছাড়া আর কখনো অন্তঃকরণ সঁপে দেয়ার এমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় নি।

সৌভাগ্যক্রমে পাঞ্জতারের সফরের পরপর ভাইজানকে চিঠি লেখার সুযোগ হলো। চিঠি-পত্রের ভিতরে সেই চিঠিটিও পেয়ে গেলাম। পাঠকের সমীপে পেশ করছি :

> 'মুহতারাম ভাইজান! (আল্লাহ তাঁর ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করে আমাদেরকে আরো বেশি বেশি উপকৃত করুন!)
>
> আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ
>
> পরশুদিন মধ্যরাতে আমি প্রথম সফর থেকে নিরাপদেই ফারেগ হলাম। আকোড়া থেকে আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, আশা করি পৌঁছেছে। আমি আকোড়া থেকে হান্ড গিয়েছি। নিহত খাদি খানের বংশধরের সাথেও দেখা হয়েছে। রাতে তার বাড়িতেই মেহমান ছিলাম। তিনি সেখানকার অবস্থা ও ইতিহাস সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছুটিতে এসেছিলেন। তিনি নিজেও সেখানকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহের এবং মহান ব্যক্তিদের

কথা লিখে রেখেছেন। আমার লেখা 'সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ.' থেকেও পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করেছেন।

তিনি আমাকে নানা ঐতিহাসিক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, সব স্মৃতিময় জায়গা পরিদর্শন করিয়েছেন। তাকে আমি নিজের পরিচয় প্রকাশ করি নি। তিনি সায়্যিদ সাহেবের অনেক প্রশংসা করেছেন। তাঁর (সায়্যিদ সাহেবের) নৃত্যনিষ্ঠা আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিমুখতার ভীষণ তারিফ করেছেন। তবে খাদি খানের পক্ষে ওযর পেশ করারও চেষ্টা করেছেন। সায়্যিদ সাহেবের সঙ্গে খাদি খানের বিরোধিতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তার মতে এ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো কিছু ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে। খাদি খানের প্রো-নাতি আমাকে খাদি খানের ভিটা দেখিয়েছেন। আরো বলেছেন অনেক ঘটনা। দেখিয়েছেন অনেক ইতিহাসবিজড়িত স্থান। হান্ড থেকে আমরা মানেরি গিয়েছি।

এ জায়গার উল্লেখ সীরাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ রহ. গ্রন্থে বারবার এসেছে। মানেরিতে আমরা একরাত ছিলাম। পরদিন ভীষণ উৎসাহ ও ব্যাকুলতা নিয়ে আমরা পাঞ্জতারের পথে রওয়ানা হলাম। এটিই সায়্যিদ সাহেব এবং তাঁর সাথীদের মূল কেন্দ্র ছিলো। এলাকাটি মানেরি থেকে থেকে ৮/৯ দূরত্বে সোয়াতে (মিয়া গুল সাহেবের প্রশাসনিক এলাকা) পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দ্বি-প্রহরে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছি। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে আমরা যার মেহমান হয়েছিলাম, তিনি ফতেহ খান সাহেবের প্রো-নাতি দোসত মুহাম্মদ খান সাহেব। উল্লেখ্য যে, ফতেহ খান সাহেবই সায়্যিদ সাহেবকে ঐ এলাকায় আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তাঁর মেহমানদারি করেছিলেন। তাঁর নাতি আতা খান সাহেবের সাথেও দেখা হয়েছে। তাঁর ভাতিজা পছন্দ খান সাহেবের সাথেও কথা

হয়েছে। তাঁর অন্যান্য প্রিয়জনের সাথেও দেখা হয়েছে। ফতেহ খান সাহেবের বংশধর সবাই (১০/১৫ পরিবার) মিলে থাকে পাহাড়ের এক টিলায়। বড়ো সবুজ-শ্যামল নয়নাভিরাম প্রকৃতির মায়া ও ছায়ায় ঘেরা এলাকা। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝরনা। চারপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা উঁচু পাহাড় যেনো এলাকাটিকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছে। এমন এলাকাকেই বানানো যায় ফৌজি নিবাস। এমন জায়গাতেই গড়ে তোলা যায় নয়া আবাদি।

সায়্যিদ সাহেবের পরবর্তীতে এ এলাকা একাধিকবার শত্রুর নিশানা হয়েছে, অনেক ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে, সে সবের চিহ্ন এখনো চোখে পড়ে। ভাঙা কেল্লার অংশ ও পাথরের ঢের ছাড়া সেই জীবন্ত নগরের এখন আর বিশেষ কিছু চোখেই পড়ে না। শুধু সায়্যিদ সাহেবের কিয়ামগাহের একটা সমতল ভূমি এখনো অবশিষ্ট আছে। এখনও তাঁর তাহখানাটি (মাটির নিচে বানানো পাকা ঘর) বিদ্যমান।

কিন্তু এই বিরানময়তা সত্ত্বেও সব জায়গার চেয়ে এই জায়গাটিতে আমি বেশি আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতা অনুভব করলাম। পুরোনো ঐতিহ্যের দৃশ্যাবলীকে চোখের সামনে পেয়ে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। দিল তৃপ্তিতে ভরে গেলো। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলো আগের সেই ছবি। এখানে ছিলেন একদিন সায়্যিদ সাহেব। ছিলেন তাঁর তিনশত মুজাহিদ। সেই পুণ্যবানদের বরকতঘেরা এই জায়গা। তাঁদের ইবাদতে যিকিরে ফিকিরে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র আলোচনায় এ জায়গা ছিলো সব সময় সরব ও মুখর। অনেক খুঁজে দেখলাম, কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি-চিহ্ন ও নিদর্শন পেয়ে যাই কি না! আমাদের মেযবানরাও এ ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পেলাম না। আমরা এই খান্দানের দুই শাখারই মেহমান ছিলাম। ফেরার সময় আমরা পাশের গ্রাম গোরগাশতি গেলাম। সেখানকার গন্যমান্যদের সাথে দেখা হলো। নিজেদেরকে এরা

'হাসানী' বলে দাবি করেন। বড়ো শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালেন আমাদেরকে। এখানে আরো থেকে যেতে ভীষণ পীড়াপীড়ি করলেন। তাঁদের কাছে পুশতু ভাষায় লেখা একটি ইতিহাসনামার সন্ধান পাওয়া গেলো। অবশ্য পাণ্ডুলিপিটি একজন পড়তে নিয়েছিলেন বলে আমরা তখন সেটি আর দেখতে পারি নি। তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেটি আমাকে যথা সময়ে পাঠাবেন।

সবই দেখা হলো। এখন বাকি আছে শুধু বালাকোট। ইনশা আল্লাহ আগামী শনিবার বালাকোট রওয়ানা হবো। এখানেও প্রচণ্ড শীত। লাহোর ও দিল্লি হয়ে আমি শিগগির লখনৌ পৌঁছে যাবো ।আমার সশ্রদ্ধ সালাম রইলো।

আপনার স্নেহাস্পদ
আবুল হাসান আলী'

আমরা হান্ড গিয়েছিলাম ১৮ই মার্চ ১৯৪৪ সালে। মার্চের ২৬ অথবা ২৭ তারিখে আমরা বালাকোটে গিয়ে পৌঁছলাম। বরকতময় ঈমানী কাফেলার সফরের আখেরি মঞ্জিল ছিলো এই বালাকোট, যে সফরের সূচনা হয়েছিলো আমাদেরই প্রিয় মাটি রায়বেরেলি থেকে। এই বালাকোটের পুণ্যভূমির ইঞ্চি-ইঞ্চি মাটি ভীষণ প্রিয়। সফরকালে মনে হচ্ছিলো, এ মাটি যেনো আমাদেরকে আলিঙ্গন করছে। আর দর্শনার্থীদেরকে লক্ষ্য করে আবেগভরে বলছো হযরত মির্যা মাযহার জানজানাঁ'র ভাষায়—

یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے
قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں

প্রিয় দর্শনার্থী! আস্তে আস্তে পা ফেলো!
জানো, কোন্ মহান শহীদদের যিয়ারতে এসেছো!
আদব ও শ্রদ্ধাভরে তাঁদেরকে সালাম বলো!

আরেকটা কথা বলি, কখনো ভুলে যাবে না তাঁদের সেই মহান লক্ষ্যের কথা, যা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা এখানে!

সুহৃদ ছেড়ে ..
স্বদেশ ছেড়ে!
শাহাদতের গভীর তামান্না বুকে নিয়ে!

আমরা সরকারি গেস্টহাউজে অবস্থান নিলাম, যার জন্য আরশাদ সাহেব আগেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। মেহমান হলাম এলাকার কাজী সাহেবের। এখানে কোনো ভ্রমণকাহিনী বা রোজনামচা লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর জন্য তো স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থই রচনা করা আবশ্যক। পাঠকগণ 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণের 'বালাকোটের শহীদদের মর্যাদা ও বার্তা' (পৃ. ৪৫৯-৪৬৩) অংশটি পড়ুন এবং সেই লক্ষ্য ও বার্তাটি তাজা করে নিন, যার জন্য এসব দুঃসাহসী মুমিন ও মুজাহিদগণ নিজেদের রক্ত দ্বারা এ ভূখণ্ডকে সজীব ও সতেজ করেছেন এবং শহীদদের সমাধি-ভাণ্ডার দ্বারা গুলজার বানিয়েছেন। অন্ততপক্ষে একালের মানবতা ও হিন্দুস্তানে ইসলাম-বাগিচার 'মজমুয়া আতর' – যা বিগত কয়েক শতাব্দি যাবত তৈরি হয়নি – এখানকার মাটিতে পাওয়া গেছে এবং মুসলমানদের একটি নতুন ইতিহাস তৈরি হয়ে গেছে।

এ সফরে আমার পুরনো বন্ধু মৌলভী ইহসানুল্লাহ সাহেব পেশোয়ারি নদভীও আমার সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়বার; সম্ভবত তার পরের বছরই স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে ও হাজী নূর এলাহি সাহেব পেশোয়ারির সঙ্গে পুনরায় হাজির হলাম। তারপর এখনও পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের রং ও ঘ্রাণে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ মিলেনি।

ফেরার পথে পেশোয়ার, লাহোর ও দারুস সালাম পাঠানকোটে সম্ভবত এক-দুদিন থাকতে হলো, যেখানে মাওলানা মওদূদী ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। যখন সাহারানপুর ফিরে এলাম, ততক্ষণে এই দীর্ঘ সফরে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারপর এক কি দুদিন নিযামুদ্দীনে মাওলানার খেদমতে অবস্থান করে (যার অসুস্থতার ধারা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল) দ্রুত আপন ঠিকানায় পৌঁছে যেতে চাচ্ছিলাম। কারণ, মাদরাসা থেকে বেরিয়েছি প্রায় এক মাস হয়ে গিয়েছিল। সাহারানপুরে যখন হযরত শায়খের খেদমতে হাজির হলাম, তখন হঠাৎই তাঁর নামে আসা মাওলানা এনামুল হাসান সাহেবের হাতে লেখা একখানা পত্র আমার হাতে পড়ল, যার সর্বশীর্ষে লেখা ছিল وَبِاللّٰهِ فَثِقُوْا وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا (তোমরা আল্লাহর উপর আস্থা রাখো এবং তাঁরই উপর ভরসা করো।) এই পত্রে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, মুবাল্লিগদের যে-দলটি করাচি গেছে, তার পক্ষ থেকে একটি তারবার্তা এসেছে; তাতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদে বড় একটি মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে মাওলানা মুফতী কেয়ায়েতুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা তাইয়েব সাহেব প্রমুখ

অংশগ্রহণ করছেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাবলীগি দাওয়াতকে গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা এবং এ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

আমি পত্রখানা পড়ে কঠিন দ্বিধায় পড়ে গেলাম। সফরের দীর্ঘতা, দারুল উলূমের উপস্থিতির তাগাদা ও নিজের শারীরিক দুর্বলতার প্রতি তাকিয়ে মন চাইল, অপারগতার কথা জানিয়ে দিই। কিন্তু আল্লাহ আমাকে হিম্মত ও তাওফীক দান করলেন এবং হযরত শায়খও ইঙ্গিত দিলেন। আমি সফরসঙ্গী মৌলভী আবদুল গাফফার সাহেব নদভীকে লাখনৌ পাঠিয়ে দিয়ে পরদিনই পাঞ্জাব মেইলে লাহোরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। লাহোর থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব সম্ভলির সাথী হয়ে গেলাম; তিনিও জমিয়তের এই জলসায় অংশগ্রহণ করবেন। জলসায় আমার ওস্তাদের ওস্তাদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীও এসে হাজির হয়েছেন, যিনি কংগ্রেসের প্রথমবারের শাসনামলে মাওলানা আযাদের প্রচেষ্টায় হিন্দুস্তান এসেছিলেন। মাসকয়েক আগে লাখনৌ এসেছিলেন এবং নদওয়ার মেহমানখানায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সাইয়িদ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি উক্ত জলসায় অংশগ্রহণও করলাম এবং বক্তৃতাও দিলাম।

সেখান থেকে আমি দুদিনের জন্য নিউ সাঈদাবাদ হয়ে গোঠপীরজান্ডার বিখ্যাত কেন্দ্র ও পল্লীতে গেলাম, যার সঙ্গে হযরত সাইয়িদ সাহেব ও তাঁর মুজাহিদদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং উক্ত সিলসিলার প্রধান ব্যক্তি হযরত (মাওলানা আহমাদ আলী সাহেবের মাধ্যমে) সিলসিলায়ে কাদেরিয়া রাশেদিয়ার মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত। আমি গ্রন্থাগারটিও দেখলাম। সে-সময় পীর জিয়াউদ্দীন শাহ সাহেব জীবিত ও গদিনশিন ছিলেন। তিনিও আমাকে খুব স্নেহ দেখালেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব ওখানেই মাদরাসার ছাত্রাবাসের উপর তলায় থাকতেন। শারীরিক দুর্বলতা, বার্ধক্য এবং আমার বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমার কাছে আসতেন এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন। আমি তাঁর থেকে তাঁর হিজরতের সফর ও মস্কো অবস্থানের এমন কিছু তথ্য জানতে পারলাম, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

মাওলানার অসুস্থতার শেষ দিন ও মৃত্যু

হায়দারাবাদ ও করাচি থেকে – যেখানে এ-ই প্রথমবার যাওয়া হলো এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান নেওয়া হলো – দিল্লি রওনা হলাম। এতদিনে

মাওলানার অসুস্থতা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমাকে দারুল উলূমে হাজিরি দিতেই হবে বিধায় আমি লাখনৌ চলে এলাম। খুবসম্ভব জুন মাসের শুরুর দিনগুলোতে আমি দীর্ঘ অবস্থানের নিয়তে হাজির হয়ে গেলাম। সে-সময়ে মাওলানা যফর আহমাদ সাহেব থানুবিরও সেখানে অবস্থান ছিল। জুনের ১২ তারিখে শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবও এসে পৌঁছান। এ মাসেই মাদরাসায়ে মুঈনুল ইসলাম-এরও জলসা ছিল। আমিও তাতে শরিক হলাম। শঙ্কা সন্নিকটে মনে হচ্ছিল। আমাকে কয়েকবারই বললেন, আমার আর বাঁচবার আশা নেই। আমি এই রোগ থেকে সেরে উঠব বলে মনে হচ্ছে না।

তবে আল্লাহর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। একদিন বিশেষ কিছু পরিস্থিতির কারণে নানা চিন্তা এসে আমার মাথায় ভিড় জমাল এবং মেজাজটা খুবই খারাপ ছিল। মাগরিবের নামাযের সালাম ফেরানোর সাথে-সাথেই ডাক পড়ল। শায়খ পরম মমতার সঙ্গে আমার মাথায় হাত রাখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত চুলে হাত বোলাতে থাকলেন। তারপর আমি বলতে পারব না, কীভাবে এই দুর্বলতার মধ্যে (যে, মুখ নাড়াতেও কষ্ট হতো) মাথা তুলে আমার কপালে চুমো খেলেন এবং বললেন, তুমি ক্লান্ত হয়ে গেছ; তোমার কোনো সহযোগী নেই। এভাবে তিনি আমাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে থাকলেন।

এ-সময়ে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরিও এসে পৌঁছান (যাঁর আঁচলের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ত হওয়া পরবর্তী সময়ের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং যাঁর সঙ্গে সাহারানপুরে আমার কয়েকবারই সাক্ষাৎ হয়েছিল)। মাওলানা আপন ভক্তদের তাঁর মজলিসে বসার, তাঁর উপস্থিতি থেকে লাভবান হওয়ার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। একবার আমাকে তালাশ করা হলো। আমি মজমা থেকে ঘাবড়ে গিয়ে পুলিশ চৌকির সম্মুখের সড়কে চলে গেলাম। অবশেষে মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব আমাকে খুঁজে বের করলেন। আমি এসে হাজির হলাম। মাওলানা আমাকে ইশারা করলেন, তোমার কান আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আস। তারপর বললেন, মানুষকে যিকিরের তাকিদ করো আর মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি সাহেবের মজলিসে বসার পরামর্শ দাও।

এটি ১৯৪৪ সালের ৮ জুলাইয়ের ঘটনা। ১২, ১৩ জুলাইয়ের মধ্যরাতে নির্ধারিত সময়টি এসে পড়ল এবং ফজরের আযানের আগমুহূর্তে মাওলানার জীবন জীবনের মালিকের হাতে সোপর্দ হয়ে গেল। আজীবনের ক্লান্ত মুসাফির গন্তব্যে পৌঁছে আরামের ঘুম ঘুমিয়ে পড়লেন।

এই দুর্ঘটনা আমার উপর এমন প্রভাব ফেলল যে, আমি দাফনের পর বাঙলাওয়ালী মসজিদ ও শোকসভায় থাকতে পারলাম না। ফলে মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব প্রমুখ কয়েকজন সাথীকে নিয়ে হুমায়ুন কবরস্তানে চলে গেলাম। ঈশার আগমুহূর্তে যখন এলাম, তখন শায়খকে ধৈর্য ও গম্ভীরতার একটি অটল পাহাড় পেলাম, যিনি খোদ আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

এখন মাওলানার অবর্তমানে সান্ত্বনার উপকরণ হলো তাঁর দাওয়াতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একান্ত মনে কাজ করা আর তাঁর স্থলাভিষিক্তদের সঙ্গে, বিশেষ করে সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব ও মুহতারাম ভাতিজা শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, যা আলহামদুলিল্লাহ দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার বিস্তারিত আলোচনা আগামী লেখাগুলোতে আসবে।

একাদশ অধ্যায়

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেবের ওফাতের (জুলাই ১৯৪৪) পর থেকে ১৯৪৭ সালের হজ পর্যন্ত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের স্থলাভিষিক্তি ও খেলাফত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর অসুস্থতার সময় যাদের এ-কাজের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল, যারা মাওলানার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও তাঁর নেসবতের শক্তি সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত ছিলেন এবং তাঁর দাওয়াতের বিস্তৃতি ও প্রতিদিনকার উন্নতি প্রত্যক্ষ করছিলেন, তাঁদের জন্য এ বিষয়টি একটি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল যে, মাওলানার ওফাতের পর (যা কিনা বেশি দূরে মনে হচ্ছিল না) তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এবং কল্যাণ ও বরকতের এই ধারা কীভাবে চালু থাকবে। যাদের বিভিন্ন দাওয়াত এবং রুশ্‌দ ও ইরশাদের সিলসিলাগুলোর ইতিহাসের উপর নজর ছিল এবং তারা জানতেন, সাধারণত এমন সিলসিলা ঐক্যবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ও শক্তিশালী সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, তাঁদের আরও বেশি উদ্বেগ ছিল। তাঁরা তাঁদের এই উৎকণ্ঠার কথা হযরত শায়খুল হাদীছের কাছে ব্যক্ত করলেন। শায়খ সকলের উত্তরে বললেন, আল্লাহর যেসব খাস বান্দা তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দেন, তিনি তাঁদের সম্পদ বিনষ্ট করেন না। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমরা কিছু লোক মিলে তার একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম আর তা ওভাবেই হয়ে যাবে। কখনও এমন হয় যে, হঠাৎ তাঁর লোকদের মধ্য থেকে কোনো একজনের মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এসে যায় এবং তিনি সেই কাজটি সামলে নেন। (সূফীদের পরিভাষায় একেই 'নেসবতের স্থানান্তর' বলে)। আপনারা এর অপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকুন। তবে যদি এমনটি না হয়, তাহলে আমি পরামর্শ দেব, চাচাজানের কবর আর তাঁর হুজরার দরজা-জানালার সুবাদে এখানে আসবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর ইনতিকালের দুদিন আগে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবকে (আরও কয়েকজনসহ) এজাযত ও খেলাফত দান করেছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত বানানো হলো। অনেকের কাছে – যাদের কাছে দাস্তারবন্দি ও স্থলাভিষিক্তির এই সনাতন রীতির পরিচিতি ছিল না – বিষয়টি আপত্তিকর ঠেকল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই আন্দাজ হয়ে গেল যে, তাঁর মাঝে একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে এবং সেসব যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, যা কিনা এই মহান সিলসিলাকে তার মেজাজ এবং তার প্রথম দাঈ ও প্রতিষ্ঠাতার ধারা ও অভিপ্রায় অনুপাতে চালাতে সক্ষম। তদুপরি মেওয়াতের এই অঙ্গন; বরং গোটা সমাজকে আশ্বস্ত ও কর্মতৎপর রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান লোকদের মধ্যে শুধু তাঁর মাঝেই ছিল, যিনি দাওয়াতের মূলধন, তার সফলতার নমুনা এবং কুরবানি ও ঈছারের (নিজের উপর অন্যদের প্রাধান্যদান) জন্য সবার চেয়ে বেশি প্রস্তুত ছিলেন।

আমার অবস্থান ও চিন্তার রীতি

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহ.)-এর ব্যক্তিসত্তার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবোধ, তাঁর দীনের বুঝ ও ইখলাসের উপর পূর্ণ আস্থা, তাঁর কাজের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার উপর বিশ্বাস ও কার্যত অংশগ্রহণ; বরং একজন দাঈ ও মুখপাত্রের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার পাশাপাশি (যা কিনা মাওলানার জন্যও আনন্দ ও প্রশান্তির কারণ ছিল) ঘটনা হলো, আমার মস্তিষ্কের ধাঁচ (যা একটি বিশেষ ইলমি পরিবেশ ও অধ্যয়ন দ্বারা তৈরি হয়েছিল) পরিপূর্ণ পরাজয় বরণ করেনি এবং তার জায়গায় অন্য কোনো মানসিক ও চিন্তানৈতিক ধাঁচ গড়ে ওঠেনি। এমন পরিস্থিতি সেই লোকদের প্রায়ই সৃষ্টি হয়, যাদের মানসিক ও চিন্তানৈতিক ধাঁচ আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে এবং তাঁরা নিজেদের মস্তিষ্ক ও অধ্যয়ন দ্বারা কাজ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অধিক বিশুদ্ধ শব্দে বলতে হলে বলতে হয়, তারা মস্তিষ্কগত আত্মসমর্পণ ও অতীত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেনি। সেজন্য আন্দোলন ও দাওয়াতি মিশনগুলোর জন্য সেই লোকগুলোই বেশি কাজে আসে, যাদের ধাঁচ সেই আন্দোলন ও দাওয়াতে আসার পরে তৈরি হয় এবং তাদের জন্য কোনো চিন্তানৈতিক হিজরত বা সফরের প্রয়োজন পড়ে না।

সৌভাগ্যক্রমে হোক বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ব্যাপারটা তার থেকে ভিন্ন ছিল। আমার একটি চিন্তানৈতিক ও বিদ্যাগত পটভূমি ছিল। সংশোধন ও

সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলো ও তাদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বদের আমি শুধু অধ্যয়নই করিনি; বরং তাঁদের পর্যালোচনা লিপিবদ্ধ করার সৌভাগ্যও আমার নসিব হয়েছিল। প্রতিটি যুগে আমি কুরআন-হাদীছের জ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা এবং লক্ষ্য ও উপকরণের মাঝে পার্থক্য অনুধাবন করতে থাকি এবং আমার জীবন থেকে উন্নতি থেকে অধিক উন্নতির এবং উপকারী থেকে অধিকতর উপকারীর অনুসন্ধানের ধারা কখনও বন্ধ হয়নি। অনুরূপভাবে আমার কাছে প্রতিটি দাওয়াত ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে – যেগুলো দীনের খেদমত ও আল্লাহর বাণীর সমুন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত – উন্নতি, জীবন ও তার সমস্যাবলি সম্পর্কে অবগতি লাভ, সে-সবের বৈধ ও প্রয়োজনমাফিক সমাধান ও জীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালানো জরুরি। অন্যথায় সেই আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান উন্নতি ও জীবন পরিচালনার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, স্থবিরতার শিকার হয়ে যাবে এবং তার উপকারিতা একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আটকে যাবে।

এসব চিন্তাধারা – যা আমার বিশেষ পরিবেশ, অধ্যয়ন ও মানসিক গঠনের ফলাফল ছিল – কোনো কালেই আমার সঙ্গ ছাড়েনি। মাওলানার জীবদ্দশায় আমি মাঝে-মধ্যে নির্জনে বসে ইকবালের এই চরণগুলো আবৃত্তি করতাম–

اس کشمکش میں گزریں میری زندگی

کبھی سوز وساز رومی کبھی پیچ وتاب رازی

'এই দ্বিধার মাঝেই কেটে গেছে আমার জীবনের বহু রাত।
কখনও রুমির পোড়ন-জ্বলনে, কখনও রাযির প্যাঁচ-জটিলতায়।'

কিন্তু মাওলানার নেসবতের শক্তি, অপার মমতা ও কর্মব্যস্ততা তাঁর জীবনের পুরোটা সময়ে আমার এই চিন্তাকে দাবিয়ে রেখেছিল। মাওলানার মৃত্যুর পর বিষয়টি আবার মাথা জাগাতে শুরু করল। বিষয়টি প্রথমে এই রূপ ধারণ করল যে, এ-কাজে – যেটি বর্তমানে প্রায় সমগ্র হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিও অগ্রসর হচ্ছে – আরও বেশি সংগঠিত, কার্যকর ও বিচক্ষণ-শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য স্বস্তিদায়ক ও আকর্ষণীয় বানাতে দাওয়াতের মূলনীতি ও তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে ঠিক রেখে (যেগুলোকে এই আন্দোলনে ছয় নম্বর নামে স্মরণ করা হয়) খানিক পরিবর্তন

ও অনেকগুলো সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন মজলিসে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব ও তাঁর শূরা সদস্যদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কথাও হয়েছে। কিন্তু আমি অনুমান করলাম, তাদের মস্তিষ্ক বিষয়টি আমলে নিতে প্রস্তুত নয় এবং এতে তাঁদের কোনো সমর্থন নেই। সম্ভবত মাওলানার ইনতেকালের পর দাওয়াতের এই প্রাথমিক স্তরে সাবধানতার খানিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল।

আমি বারকয়েক দৃষ্টি আকর্ষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আসল দাঈর মাথায় – যিনি দাওয়াতের মূল চালিকাশক্তি – কোনো প্রয়োজনের অনুভূতি এবং কোনো পরিবর্তনের চাহিদা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকে পরামর্শ দিয়ে কোনো লাভ হয় না। বিশেষ করে সেই লোকদের পরামর্শ, যারা কাজ ও কুরবানিদাতাদের প্রথম সারির লোক নন এবং যারা নিজেদের গোটা জীবনকে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করেননি। অনেক দাঈ ও যিম্মাদার তাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে, যেমন এমন কেউ ইমামকে লোকমা দিল, যে নামাযে শরিক নয় এবং যার লোকমা গ্রহণ করলে নামায ভেঙে যায়।

এই অনুভূতি এবং বারবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা, জামাতের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের বাতেনি ও দাওয়াতি শক্তি এবং তাতে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া, জীবনের পুরোটা সময় এই মিশনের সঙ্গে জড়িত থাকা এমনকি মিশনের জীবন বদলকারী আমল দেখে এ-ধারাটি সেখানেই থামিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করলাম। অবশ্য নিজের মস্তিষ্ককে কাজ করা থেকে বিরত রাখা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, মারকাযের সঙ্গে এই সম্পর্ক ও দাওয়াতের ব্যস্ততা অব্যাহত রাখা হবে। অবশ্য নিজের কর্মপরিধিতে একে অধিক ফলপ্রসূ বানাতে এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল রাখতে এবং দাওয়াত ও তাফহীমে (অপরকে বোঝানো) নিজের জিহ্বাকে ব্যবহার করতে কোনো দোষ তো আর নেই। কুরআনের ভাষ্য 'সবাই যার-যার কাজ করবে। কে কতখানি সঠিক পথে আছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন' এ এক চিরন্তন ও বিশ্বজনীন বাস্তবতা।

লাখনৌর দীনি ও ইলমি মহলে কাজের গ্রহণযোগ্যতা এবং গুরুত্বপূর্ণ তাবলীগি সমাবেশসমূহ

১৯৪৪ সাল থেকে শুরু করে প্রায় ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত এই নীতির উপরই কাজ চলতে থাকে। তার ফলাফল এই ছিল যে, দিল্লির আলেম ও

চিন্তাশীল সমাজ, সরকারি-বেসরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কলেজ-ভার্সিটি থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের এই কাজের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এ-সময়ে লাখনৌ থেকে বিহারের পূর্ব সীমান্ত কটিহার ও পুর্নিতা এবং পাঞ্জাব ও কাশ্মির পর্যন্ত আমার ও আমার সহকর্মী মুহতারাম মাওলানা মানযূর নুমানি সাহেবের নেতৃত্বে অনেক দীর্ঘ ও সফল সফর হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ১৯৪৫ সালের সীমান্ত প্রদেশের তাবলীগি সফর, '৪৬ সালের তহসিল হরিপুর, জেলা হাজারা, তহসিল মরি, তারপর পুঁছ রাজ্য ও কাশ্মিরের সফর। এগুলোও ছাড়াও আছে ১৯৪৫ সালের মুরাদাবাদের বিশাল তাবলীগি জলসা, মেওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ জলসা, ভুপাল, লাখনৌ, কানপুর, সিতাপুরা ইত্যাদির তাবলীগি সমাবেশগুলো। এগুলোতে আমাকেও ভাষণ প্রদান ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত পুঁছ ও কাশ্মিরের তাবলীগি সফর চলতে থাকে। এ-সফরে স্নেহাস্পদ মৌলভী সাইয়্যিদ মুযাফফর হুসাইন শাহ নদবিও আমাদের সঙ্গে ছিল। শ্রীনগরে আমরা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করি। রমজানের দিন ছিল। এ-সফরে মাওলানা আযাদের সঙ্গে নাসীমবাগে – যেখানে মাওলানা বসবাস করতেন – সাক্ষাত করি। এ-সফরে আমাকে পামপুর, কোকরনাগ প্রভৃতি এলাকায়ও যেতে হয়েছে।

বড় তাবলীগি সমাবেশগুলোর মধ্যে রহিমাবাদের বাকিনগরের সমাবেশটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেটি ১৩৬৫ হিজরির জুমাদাসসানির ৩, ৪ ও ৫ (৬, ৭, ৮ মে ১৯৪৬) তারিখে হাজী শায়খ ফায়য়ায আলী সাহেবের দাওয়াত ও প্রচেষ্টায় এবং লাখনৌর জামাত ও মারকাযের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ-সমাবেশে মাওলানা মাদানি (রহ.) ছাড়াও দেশের শীর্ষস্থানীয় বহু আলেম অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব রায়বেরেলিতে আমার বাড়ি দায়েরায়ে শাহ ইলমুল্লায় আগমন করেন। বড় একটি কাফেলা মাওলানার সঙ্গে ছিল। তার এক দিন আগে হযরত শায়খুল হাদীছ ও হযরত মাওলানা রায়পুরি বড়সড় একটি বহর নিয়ে লাখনৌ এসেছিলেন। রবিউসসানির ৮ তারিখে তাঁরা সবাই একটা রিজার্ভ বাসে করে রায়বেরেলিতে আসেন। এই কাফেলায় হযরত রায়পুরি, হযরত শায়খুল হাদীছ ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব ছাড়াও পীর হাশেম জান সাহেব মুজাদ্দেদি (টোন্ডা, সাইদাদ, সিন্ধু), মাওলানা ইহতেশামুল হাসান সাহেব

কান্ধলবি, মৌলভী, যহীরুল হাসান সাহেব কান্ধলবি, মুহাম্মাদ শফী সাহেব কুরাইশি, মাওলানা আবদুল বারী সাহেব নদবি, মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নুমানি শামিল ছিলেন। এই বরকতময় কাফেলাটি হযরত শাহ ইলমুল্লাহ সাহেব (রহ.)-এর মসজিদের সামনে নদীর অপর তীরে অবতরণ করে এবং নৌকায় করে শাহ ইলমুল্লাহর দায়েরায় প্রবেশ করে। এখানে তাঁরা এক রাত দুদিন অবস্থান করে ফিরে যান।

এ-সময়ে বৃহস্পতিবার রাতের তাবলীগি জমায়েতগুলো দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার সুবিশাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো এবং জামাতের লোকজন, দীনি পরিবেশের ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে যার-যার খাবার ও বিছানাপত্র নিয়ে নদওয়া চলে আসত। মাগরিবের পর দাওয়াতি বয়ান হতো, যেগুলো বেশিরভাগ মাওলানা মানযূর নুমানি প্রদান করতেন। সীরাতের একটি কিতাবেরও দরস হতো। জামাতের তাশকীল ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঠিক করা হতো। শেষ রাতের নফল নামায ও যিকিরের ফলে মসজিদে বিস্ময়কর এক নূরানি পরিবেশ পরিলক্ষিত হতো। অনুভূতিসম্পন্ন লোকেরা তাতে প্রশান্তি ও নূর অনুভব করতেন।

আমি ১৯৫১ সালে যখন পুরো একটি বছর ভারতের বাইরে অবস্থান করে এবং মধ্যপ্রাচ্য সফর করে এলাম, তখন যথারীতি এখানে শবগুজারির সুযোগ পেলাম। তখন অনুভব করলাম, যাওয়ার সময় একটি জিনিস এখানে রেখে গিয়েছিলাম আর ফিরে এসে সেটি এখানেই পেলাম। জামাতের লোকদের মাঝে নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, ভালবাসা, বিনয়, অপরের সেবা ও আরাম পৌছানোর জযবা সৃষ্টি হচ্ছিল। শহরের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, খ্যাতিমান আইনজীবী ও বড়-বড় ব্যবসায়ীরাও আসতে শুরু করেছিল। মাদরাসার ছাত্র-ওস্তাদবৃন্দও সাধ্যমতো আসতে লাগল। ফজরের পর আমভাবে তরবিয়তি ধারায় বয়ান হতো আর সাধারণত এই খেদমতটুকু আমাকেই আঞ্জাম দিতে হতো। যেসব ছাত্র বছরের-পর-বছর এই এজতেমায় অংশগ্রহণ করেছে, তারা যখন ফারেগ হয়ে নিজ-নিজ অঞ্চলে আর বিদেশি ছাত্ররা আপন-আপন দেশে ফিরেছে, তখন তাদের মধ্য থেকে অনেকে ওখানে গিয়ে তাবলীগি কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং নদওয়ার এই এজতেমার ব্যাপারে তার উপকারিতাসংক্রান্ত পত্র লিখে আমাদের অবহিত করেছে। কিছুদিন পর ১৯৫৪ সালে এই এজতেমা কাচারি রোডের তাবলীগি মারকাযে স্থানান্তরিত হয়ে গেল, যার ধারা আল্লাহর ফজলে এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

প্রথম হজের সফর ও হেজাযের তাবলীগি ভ্রমণ

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের এই আস্থা-ভালবাসা এবং মারকাযের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগের ফলাফল ছিল, ১৩৬৬ হিজরির শাবান মাসে (জুন ১৯৪৭) মাওলানা সেই পত্রগুলোর ভিত্তিতে, যেগুলো জামাতের যিম্মাদারদের পক্ষ থেকে হেজায থেকে আসছিল এবং যেগুলোতে আমার আগমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজে কাজের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতার আশা ছিল আমার হেজায গমনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। আমি গেলাম এবং সেখানে প্রায় ৬ মাস অবস্থান করে ফিরে এলাম। এই সফরের স্বতন্ত্র আলোচনা ১৩৬৯ হিজরির (১৯৫০) দ্বিতীয় হজসফরের সঙ্গে (যেটি হযরত রায়পুরির সাথে হয়েছিল) পরে সামনে আসবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সফর

নিযামুদ্দীন মারকাযের সঙ্গে সম্পর্ক ও দাওয়াত-তাবলীগের ব্যস্ততার সঙ্গে সম্পৃক্ততার সুবাদে মাওলানার ১৯৪৪ সালের ওফাত থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের হেজায সফর পর্যন্ত সময়কার রোয়েদাদ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর যেহেতু হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত সমাবেশগুলো এবং সে-সবের বয়ানগুলো এই চিন্তা ও অধ্যয়নের ফলাফল ছিল, যা এককভাবে মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতি কাজের ব্যস্ততার সঙ্গে চলছিল, সেহেতু সে-সবের আলোচনা '৫৪-'৫৫ সালের কাহিনীমালায় উপস্থাপন করা হবে। স্মৃতিচারণ ও ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা বিবেচনায় এখানে এমন কটি ঘটনা যুক্ত করা হলো, যেগুলো এই তিন বছরের সময়কালে ঘটেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে ১৩৬৬ হিজরির (১৯৪৬ সাল) রমযান নিযামুদ্দীনে হযরত শায়খুল হাদীছের সঙ্গে কাটানোর ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত। আমি সুরাত, রান্ডির, ডাভেল, বোম্বাই ও হায়দারাবাদ সফর থেকে ফেরার পথে এক-এক দিনের জন্য রায়পুর ও সাহারানপুর হাজির হলাম। সাহারানপুরে এসে জানতে পারলাম, শায়খ রমযান কাটানোর জন্য নিযামুদ্দীন গেছেন। আমি হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর জীবদ্দশায়ও কখনও রমযানে নিযামুদ্দীন আসিনি। মনে ভাবনা এল, দু-তিনটা দিন সেখানে কাটিয়ে এবং শায়খের সাথে দেখা করে আসব। বিদায়ের সময় যখন শায়খের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম, তখন শায়খ বললেন, মৌলভী সাহেব!

আমাদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন? আমি আরও কয়েকটা দিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই দিনগুলোও শেষ হয়ে গেলে এবারও বিদায় নিতে শায়খের কাছে গেলাম। এবার শায়খ এমন কিছু কথা বললেন, যার অর্থ হলো, তিনি চাচ্ছেন, আমি আরও কিছুদিন থাকি। অগত্যা আমি পুরোটা রমযান থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

আমার স্বাস্থ্য ও অবস্থাদির বিবেচনায় এটি বড়ই মুজাহাদা ছিল যে, এই সাহসী লোকদের সঙ্গে – যারা প্রায় সারাটা রাত সজাগ থাকতেন এবং ইবাদাত-বন্দেগিতে কাটাতেন – আমার মতো কমহিম্মত ও কমজোর লোকটির থাকা সহজ ছিল না। শায়খ নিজে রোজ পুরো কুরআন খতম করতেন এবং রাতে এক মিনিটের জন্যও শুতেন না। মাওলানা ইউসুফ সাহেবের ইবাদাত ও দাওয়াতের ব্যস্ততা সাধারণ দিনগুলোর তুলনায় অনেক বেড়ে যেত এবং গোটা পরিবেশের উপর একই অভিরুচি ছায়া বিস্তার করে রাখত। আমিও লাগাতার নির্ঘুম রাত কাটাতে লাগলাম, যার জন্য হযরত শায়খও খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং মাওলানা ইউসুফ সাহেবও বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই অবস্থান দ্বারা আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে হযরত শায়খের নৈকট্য ও বিশেষ মমতার দৌলত আমার নসিব হয়েছে। আমি তাঁর নেসবতের শক্তি ও সোহবতের বরকতের সেসব ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছি, যা বিভিন্ন কিতাবে পড়েছি এবং বুযর্গদের জীবন-কাহিনীতে শুনেছি।

নিযামুদ্দীনে ঈদ পালন করে শায়খ তাঁর রীতি অনুযায়ী রায়পুর চলে গেলেন। আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এবং অপার ভালবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষায় আমাকে হযরত রায়পুরির খেদমতে পেশ করলেন। হযরতের সঙ্গে আমার আন্তরিকতা ও সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল এবং তাঁর বিশেষ মমতাও আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু এই হাজিরির পর থেকে সেই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে গেল।

সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত হায়দারাবাদের সফরও একটি, যেটি মাওলানা মানাযির আহসান গিলানির দাওয়াত ও প্রচেষ্টায় বাস্তবতার মুখ দেখেছিল এবং যার উদ্দেশ্য আব্বাজি (রহ.)-এর কিতাব 'নুযহাতুল খাওয়াতির' ছাপানোর ব্যাপারে দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উছমানিয়ার (যে কিনা কিতাবটি ছাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল) দায়িত্বশীলদের মনে করিয়ে দেওয়া এবং তাগাদা প্রদান।

তখন প্রফেসর ইলিয়াস বারনি সাহেব দায়েরার ব্যাবস্থাপক ছিলেন। এটি আমার হায়দারাবাদের প্রথম সফর ছিল। আর যেহেতু সফরটি ভারতবর্ষের বিভক্তি ও পুলিশ এ্যাকশনের আগে হয়েছিল, তাই আমি সেই মুসলিম রাজ্যটির সর্বশেষ চমক ও বাহার দেখেছি, যেটি কিনা একটি সময় পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমানদের আশ্রয় ছিল এবং হিন্দুস্তানের বেশিরভাগ ইলমি ও ইসলামি প্রতিষ্ঠান তার উদারতা ও সহযোগিতা দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। অনেক আলেমে দীন ও পণ্ডিত লোকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো, এতকাল যাঁদের নাম শুনে আসছিলাম এবং যাঁদের অনেকে 'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)'-এর মাধ্যমে আমাকে জানতেন।

এই সফরের সবচেয়ে বড় উপহার ছিল মাওলানা সাইয়িদ মানাযির আহসান গিলানির (যাঁর আমি মেহমান ছিলাম) ইলমি মাজালিস ও ঈমান-জাগানিয়া সাহচর্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, আমাদের মুহতারাম মাওলানা আবদুল বারী সাহেব নদবির সঙ্গে ওখানে আমার দেখা হলো না। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়ে লাখনৌ চলে এসেছিলেন। যে-মসজিদটিতে (মসজিদে আকসা) উভয় হযরত নামায পড়তেন, আমি সেটি আর তাঁর বাড়িটি দেখিছি শুধু।

এখানে পাঠকদের আমি একটি মজার ঘটনা শোনাতে চাই। এ-সফরে আমার সাথে কোনো শেরওয়ানি ছিল না। শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় পোশাকই ছিল। শেরওয়ানি প্রাচীন রাজ্য হায়দারাবাদে ভদ্র লোকদের উর্দি ছিল, যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা প্রকাশ পেত। কয়েকজন প্রফেসরের সঙ্গে এক-দুবার সাক্ষাতের পরই আমি টের পেলাম, শেরওয়ানি না থাকার ফলে তারা আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তখন আমাদের দারুল উলূমের এক পেশোয়ারি ছাত্র মৌলভী মুহাম্মাদ শরীফ হায়দারাবাদে ছিল। আমি তার শেরওয়ানিটা ধার নিয়ে নিলাম। তারপর দেখলাম, এবার দৃষ্টি বদলে গেছে এবং মানুষ বেশ মর্যাদার সঙ্গে আমার সাথে সাক্ষাত করতে শুরু করেছে।

এ-সফরে শ্রদ্ধেয় ভাই নবাব সাইয়িদ নাজমুল হাসান খান (রজিউদ্দৌলা নবাব সাইয়িদ নূরুল হাসান খান-এর ছোট ভাই)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ব দ্বারা পুরনো আমলের স্মৃতি তাজা করে দিয়েছিলেন। মক্কা মসজিদের খতীব, নদওয়াতুল উলামার সাবেক শিক্ষক কারী ইবরাহীম রশীদ মক্কি ও মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব রহমানির

সঙ্গে এ-সফরে আমার ওঠাবসা হয়। এ-সফরে মৌলভী মুহাম্মাদ ইকবাল হুশিয়ারপুরি (এখন যিনি সূফী ইকবাল নামে পরিচিত এবং হযরত শায়খুল হাদীছের বিশেষ মুজাযদের একজন) আমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন।

একটা ভুল ও তার প্রতিকার

আব্বাজানের ইনতেকালের পর আমি ভাইজানের মমতা ও আঁচলের তলে এমনভাবে থাকলাম, যেভাবে সন্তান পিতার কাছে থাকে। রায়বেরেলিতে তো নিজেদেরই ঘরে থাকতাম। কিন্তু লাখনৌতে ভাইজান থেকে আলাদা হওয়ার কল্পনা-ই করতে পারতাম না। আব্বাজান যেঘরে ফার্মেসি করেছিলেন, লেখালেখি করেছিলেন, নদওয়ার কাজ করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেই ঘরে আমরা থাকতাম। রাস্তার দিকে আব্বাজান যে-কক্ষটিতে থাকতেন, সেটি ছিল আমার থাকার রুম। লেখাপড়ার জন্য, বিশেষ করে লেখালেখির জন্য যদি একাগ্রতা ও নির্জনতার প্রয়োজন হতো, তাহলে মসজিদে চলে যেতাম, যেটি আমাদের ঘরের একেবারে লাগোয়া ছিল। ফরজ নামাযের সময়গুলো ব্যতীত বাকি সময় সেখানে নীরবতা বিরাজ করত। এ সময় পর্যন্ত আমি যেসব গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেছি, সবগুলো এই মসজিদেরই উত্তর-পশ্চিম দিককার জানালার সামনে বসে লিখেছি।

১৯৪৬ সালের শুরুতে যখন আমি দারুল উলূম থেকে চাকরির সম্পর্ক ছেড়ে দিলাম এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে কয়েকটি সবক পড়াতাম, তখন কেন যেন মাথায় একটি চিন্তা এল। দারুল উলূমের মসজিদের সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট যে-ঘরটি নির্মিত হয়েছিল, তাতে আমি ভাইজানের অনুমতি নিয়ে থাকতে শুরু করলাম এবং আম্মাজানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এখানে নিয়ে এলাম। তখন আয়-উপার্জনের কোনো মাধ্যম ছিল না। না কিতাবের কোনো বিনিময়, না মুনাফার কোনো উৎস।

এ-বছরটা অর্থনৈতিকভাবে আমার খুব কষ্টে কাটাল। আমার মনে আছে, একবার আমিনাবাদের চৌরাস্তায় নাজিরাবাদগামী সড়কের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি পকেট থেকে কয়েকবারই ঘড়িটা বের করে কোনো দোকানে নিয়ে বিক্রি করতে চেয়েছিলাম যে, কিছু টাকা পেলে তা দ্বারা কটা দিন চলে যাবে। কিন্তু পরে চিন্তা করলাম, না থাক; দোকানদার হয়ত মনে করবে, আমি ঘড়িটা চুরি করে এনেছি। আমি বেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। দারুল উলূমের দফতর ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিলে আল্লাহ মাফ করুন, আমি কান্ধলার ধনাঢ্য ব্যক্তি মৌলভী জহিরুল হাসান সাহেবের কাছে পত্র লিখলাম এবং কিছু

টাকা ধার চাইলাম। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এবং অতি দ্রুত টাকা পাঠিয়ে দিলেন। এই পুরো বছরটা আমার চরম অস্থিরতার মধ্যে কাটল। আমার বুঝে আসছিল না, এই বেবরকতি কেন।

একদিন জানতে পারলাম, ভাইজান আমার এই আলাদা থাকায় খুব বিষণ্ন এবং ব্যাপারটাকে তিনি ভালো চোখে দেখছেন না। তিনি এই ভেবে যারপরনাই বিচলিত যে, তাঁর জীবদ্দশায় লাখনৌতে থাকা সত্ত্বেও আমি আলাদা থাকার ব্যবস্থা করেছি। আমি তাঁর কাছে কেঁদে-কেঁদে মাফ চাইলাম। তারপর এক বছরের মাথায় আমি নিজেদের পুরনো বাড়িতে ফিরে এলাম। তারপর এমন অর্থসংকট ও পেরেশোনি আর কখনও এসেছিল কিনা আমার মনে নেই।

মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব (রহ.)-এর খেদমতে হাজিরি

আলহামদুলিল্লাহ! তাবলীগ, লেখালেখি, অধ্যাপনার ব্যস্ততা, মারকায নিযামুদ্দীন ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.) এবং বুযর্গানে দেওবন্দ, সাহারানপুর ও রায়পুরের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহেবের সঙ্গে আমার রূহানি সম্পর্ক ও যোগাযোগের ধারা যথারীতি অব্যাহত থাকে এবং তাঁরও আমার উপর মমতা ও করুণার দৃষ্টি ছিল, তাঁর পত্রাবলি দ্বারা যা অনুমান করা যায়। ১৯৪৬ সালে যখন তিনি হজের সফর থেকে ফিরে এলেন, তখন আমি মোবারকবাদ জানিয়ে তাঁকে পত্র লিখলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে লাহোর ডেকে পাঠালেন। আমি হুশিয়ারপুর ও জলন্ধর হয়ে লাহোর গিয়ে হাজির হলাম। মাওলানা একদিন নির্জনে আমাকে তাঁর সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার এজাযত দ্বারা ধন্য করলেন। তার জন্য তিনি মিনার মসজিদে খায়ফ-এ যে দু'আ ও এসতেখারা করেছেন, তাও আমাকে বলে শোনালেন। এর জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ! একপত্রে মাওলানা লিখেছিলেন, 'আপনার প্রতিটি সফলতায় আমার অন্তরে যতখানি আনন্দ লাগে, সম্ভবত দুনিয়ায় এমন আরেকজন লোক নেই, যার জন্য আমার তত আনন্দ অনুভূত হবে। আমার অন্তর আপনার উভয় জগতের উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সব সময় সবিনয় দু'আ করে।' এর থেকেই অনুমান করা যায়, আমার প্রতি মাওলানার মমতা কতখানি ছিল।

পাঞ্জাবের এক আলেম মাওলানা আবদুল হান্নান (সাবেক ইমাম, অস্ট্রেলিয়া বিল্ডিং, লাহোর) বলতেন, আমরা মুলতান জেলে ছিলাম। মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ বুখারিসহ আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত

ছিলেন। কোনো রকম ভূমিকা ছাড়াই মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব এক মজলিসে বললেন, আপনারা মৌলভী আবুল হাসান সাহেবের জন্য দু'আ করুন। আমরা সবাই হাত উঠালাম এবং দু'আ করলাম।

একাদশ অধ্যায়

হজের দুটি সফর

হেজায সফর ও সেখানকার দাওয়াতি কাজের জন্য নির্বাচন

হেজাযে নিযামুদ্দীনের তাবলীগি দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় তো খোদ মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর হেজায সফর (১৩৫৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৩৬ সাল) দ্বারা-ই হয়ে গিয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ আমার গ্রন্থ 'হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহ.) ও তাঁর দীনি দাওয়াত'-এ দেখা যেতে পারে। মাওলানার খুবই আরজু ছিল, যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহাল ছিল যে, 'যদি হিন্দুস্তানের কাজ কিছুটা চাঙ্গা হয়ে যায়, তাহলে আপনি কয়েকজন বিশেষ সহকর্মী নিয়ে ইসলামের আসল মারকাযে গিয়ে এ-কাজের দাওয়াত দেবেন এবং ওখানেও এই কাজটি শুরু করবেন যে, এটি ওখানকারও সওগাত এবং ওখানকার অধিবাসীরা-ই এর বেশি হকদার। তারা 'আমাদেরই সম্পদ আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে' বলে একে স্বাগত জানাবে। তারপর তাদের মাধ্যমে এই ঐশ্বর্য সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ঘরে-ঘরে বণ্টিত হবে।

মাওলানার এই জযবা ও বাসনা তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মতো তাঁর পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের দিকে স্থানান্তরিত হলো। তিনি ১৯৪৫ সালেই কিছু লোককে জামাতবদ্ধ করে হেজাযের উদ্দেশে রওনা করালেন। ১৯৪৬ সালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব বলিয়াবিকে (যিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন) হেজাযের কাজে নিযুক্ত করে দিলেন। ওখানে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও কৃচ্ছ্রতার সাথে কাজ শুরু করে দিলেন। কিন্তু শুরু করার পর এক বছর পর্যন্ত তিনি মুহাজির ও ভারতীয় হজযাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব তাঁর চরিত্র, বিনয়, আলেমদের সম্মান প্রদর্শন, হারাম শরীফ ও তার অধিবাসীদের যথোপযুক্ত মর্যাদাদানের মাধ্যমে আরব জনসাধারণকে কাজের সঙ্গে পরিচিত করলেন এবং একটি সীমানা পর্যন্ত তাদের আপন করে দিলেন। কিন্তু হেজাযের শিক্ষিত শ্রেণী ও

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তখনও এ কাজকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের নজরে দেখা হচ্ছিল না। তার কারণ ছিল, প্রতিটি শ্রেণীর একটি ভাষা, নিজস্ব মন-মানসিকতা ও অপরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর কিছু রীতি-নীতি থাকে, যেগুলোকে বড়-বড় তাওয়াক্কুলওয়ালা দাঈ ও মুরব্বীগণও আপন-আপন কালে উপেক্ষা করেননি। সাইয়িদুনা হযরত আলী মুরতজার মতো নেতৃস্থানীয় ঈমানদার ও তাওয়াক্কুলওয়ালা ব্যক্তি পর্যন্ত বলেছেন–

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟

'মানুষের সঙ্গে তোমরা তাদের জ্ঞান অনুপাতে কথা বলো। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?'

খোদ সাইয়িদুনা আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর মতো আলেমে রব্বানি ও মকবুল বারেগাহে সামদানি তাঁর ভাষণাবলিতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিদ্যুতের মতো ক্রিয়াশীল ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং নিজের সেই সাহিত্যজ্ঞান দ্বারা কাজ নিয়েছেন, যা তৎকালীন বাগদাদের সমাজ ও শিক্ষিত পরিবেশে জরুরি ছিল।[১]

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব এই বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের খেদমতে একের-পর-এক পাত্র লিখলেন যে, এখানে এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যিনি শিক্ষিত সমাজে কার্যকরী পন্থায় এ-দাওয়াতের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন এবং এখানকার যুবসমাজ, শিক্ষিত সমাজ ও রুচিশীল মানুষদের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। এ-কাজের জন্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ সম্ভবত আমার নাম প্রস্তাব করেছেন। কারণ, আরবি সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা তাঁর জানা ছিল। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত এশীয় কনফারেন্সে আমি الى ممثلى البلاد الاسلاميه (ইসলামি দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সকাশে) শিরোনামে আমি একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি, সে বিষয়টিও তাঁর গোচরে ছিল।

আমি সাধারণত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের উপরের কক্ষে থাকতাম এবং প্রায়ই ইলমি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় হতো। বরং

১. হযরত শায়খের ওস্তাদদের মাঝে ইমাম আবু যাকারিয়ার নামও এসেছে, যিনি হামাসার একজন খ্যাতিমান ব্যাখাকার এবং সমকালের সর্বজনমান্য সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিদ ছিলেন।

খোদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব এবং হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.)ও আমার এই অভিরুচি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ততদিনে আমার কিতাব 'মুখতারাত' বের হয়ে গিয়েছিল এবং মাদরাসাগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিল। সেজন্য লটারিতে আমার নামই এল। হযরত শায়খুল হাদীছের পরামর্শে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, আমি হজ ও দাওয়াত-তাবলীগের নিয়তে হেজায সফরে বের হব। আমি আমার মা এবং স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হযরত শায়খুল হাদীছ তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত দূরদর্শিতা ও ব্যাপক অভিজ্ঞাতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিলেন, আমার পরিবারের এমন কেউ আমার সফরসঙ্গী হবে, যে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা আমাকে অবসর রাখবে এবং আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে, যাতে আমি মিশনের প্রতি অধিক-থেকে-অধিকতর সময় ও মনোযোগ দিতে পারি। এর জন্য আমি আমার বড় ভ্রাতুষ্পুত্র মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ ছানী হাসানিকে নির্বাচন করলাম, যে কিনা আমার দীনি ও ইলমি কাজে আমার ডান হাত, বাহুশক্তি ও পরিবারের সর্বাধিক স্নেহভাজন হওয়া ছাড়াও হযরত শায়খুল হাদীছের ছাত্র-মুরীদ হওয়ার মর্যাদায়ও ভূষিত ছিল এবং তাবলীগি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি মাওলানা ইউসুফ সাহেবের একান্ত কাছের লোক ছিল। এই সংক্ষিপ্ত কাফেলায় আরও একজন ব্যক্তিত্ব যুক্ত হলেন। তিনি হলেন 'যাদে সফর'[1]-এর লেখিকা আমার সহোদরা সাইয়িদা আমাতুল্লাহ (ওরফে আয়েশা বিবি)।

এমনিতে প্রতিজন মুসলমানের হজের বাসনা ও আগ্রহ থাকে। কিন্তু সীরাত অধ্যয়ন, হাদীছের দরস ও আরবি ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আমার বিশেষ বাসনা ছিল। মনে আছে, প্রায়ই আমিনাবাদ থেকে দ্রুততার সাথে স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় যখন টাঙ্গা দেখতাম, তখন মনে বাসনা জাগত, এমন একটি দিন কি আসবে, যেদিন আমিও হজের জন্য স্টেশন যাব!

অবশেষে সেই সময়টি এসে গেল, যার জন্য ক্ষণ গণনা করা হচ্ছিল!

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হজের রাস্তা খুলল এক বছর হয়েছে মাত্র। সেজন্য পারমিট নিতে হতো, যা আমি পেয়ে গেলাম। বন্দর নির্বাচনে স্বাধীনতা ছিল– বোম্বাই থেকেও যাওয়া যেত, করাচি থেকেও যাওয়া যেত। তখনও দেশ বিভক্ত হয়নি এবং দূরত্ব ছাড়া উভয় শহর রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে একই ছিল। ঘটনাক্রমে বোম্বাইয়ে আমার এমন কোনো আপন বা পরিচিতজন ছিল না, যাকে কেন্দ্র করে বোম্বাই বন্দরটি

১. এটি ইমাম নববির মকবুল কিতাব 'রিযাজুস সালিহীন'-এর তরজমা

নির্বাচন করব। দিনকতক আগে নিযামুদ্দীনে হাজী আবদুল জাব্বার সাহেব দেহলবির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যিনি করাচির বড় ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন। তাকে কেন্দ্র করেই করাচি বন্দর নির্বাচন করা হলো।

১৯৪৭ সালের ২৬ জুন আমরা লাখনৌ থেকে রওনা হলাম এবং লাহোর স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। ঘণ্টাকয়েক অপেক্ষা করে করাচির জন্য গাড়ি বদল করলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন তুঙ্গে ছিল। (দেশবিভক্তির এক মাস আগের কথা)। এ-কারণে লাহোরে থাকা সত্ত্বেও আমি মাওলানা আহমাদ আলী সাহেবের খেদমতে হাজির হতে পারলাম না। করাচিতে এগারো দিন থাকলাম। হাজী আবদুল জাব্বার, তার ভাই হাজী আবদুস সাত্তার, তাদের পুত্ররা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের মেজবানি-মেহমানদারিতে কোনো প্রকার ত্রুটি রাখেননি।

হেজাযের সফর ও মক্কা-মদীনার অবস্থান

খুবসম্ভব ১৩৬৬ হিজরির ১৯ শাবান (৯ জুলাই ১৯৪৭) করাচি থেকে মোগল লাইনের ইসলামি জাহাজে করে জেদ্দার উদ্দেশে রওনা হলাম। শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ শফী সাহেব কুরাইশির পীড়াপীড়িতে (যিনি নিকট অতীতে হজে গিয়েছিলেন) দুটা টিকিট ফার্স্ট ক্লাসের ক্রয় করলাম, যার ফলে আমরা পুরো একটা কেবিনের সুবিধা পেয়ে গেলাম। আমাদের পাশের কেবিনেই জেদ্দায় কর্মরত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত শাহজাহান আমীর কবীর (ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মিস্টার হুমায়ুন কবীর-এর বড় ভাই)-এর কেবিন ছিল। সিন্ধুর মন্ত্রী মীর গোলাম আলী তালপুর-এর এক নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এ সফরে আমার দুর্বল মা ও তাঁর সঙ্গিনী-সেবিকাদের জন্য সুখ ও আরামের গায়েবি ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধার এমন কতগুলো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, যেগুলো মহান আল্লাহর বিশেষ করুণার ফল মনে হচ্ছিল।

ফার্স্ট ক্লাসের কেবিনগুলোর সন্নিকটে লাইব্রেরি হলে মহিলাদের সমাবেশ হতে লাগল। তাতে একবার আমার বোন রিয়াজুস সালিহীন-এর অনুবাদগ্রন্থ 'যাদে সফর'-এর কিছু লেখা পড়ে শোনালেন। তাতে হজগামী মহিলারা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করল। আমাদের কেবিনের লাগোয়া একটি কেবিনে বোম্বাইয়ের বড় এক ব্যবসায়ী (যাকে খেলনা ব্যবসার রাজা মনে করা হতো) হাজী আহমাদ সাহেব সপরিবারে সফর করছিলেন। তার পুরো পরিবারের; বিশেষ করে তার স্ত্রী ও মায়ের আমার বোনের সঙ্গে এমন সম্পর্ক ও আন্তরিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সারাক্ষণ তার সেবা ও

মনোরঞ্জনের চিন্তায় বিভোর থাকত। পরে এই পরিবারটির করাচি স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া অবধি বছরের-পর-বছর ধরে এ সম্পর্ক বহাল ছিল।

আমরা ১৩৬৬ হিজরির ২৯ শাবান (১৯ জুলাই ১৯৪৭) জেদ্দা পৌঁছে গেলাম। জেদ্দার বন্দরে পা রাখতেই সেই আনন্দ ও অবস্থা অর্জিত হয়ে গেল, যা অনেক খোশনসিব মানুষ হারামাইন শরীফাইন গিয়ে লাভ করে থাকে। আম্মাজানের তো মনের অবস্থা ও আনন্দের আজব হাল ছিল। তখনও যেহেতু হজের দিনগুলো আসতে অনেক দেরি ছিল এবং পুরো তিনটি মাস বাকি ছিল, তাই আমরা মধ্যবর্তী এই সময়গুলো মদীনায় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম। তাতে হযরত শায়খুল হাদীছের ইঙ্গিত ও অভিরুচির দখল ছিল। রমযানের চাঁদ আমরা জেদ্দায়ই দেখেছি এবং দুটি রোযাও সেখানে রেখেছি। আমার মনে পড়ছে, আমি ও স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ছানী চাঁদরাতে সাহরির সামগ্রী আনতে বাজারে গিয়েছিলাম। এক টুকরিওয়ালা বিশেষ এক সুরে হাঁক দিচ্ছিল, تمر تمر یا صائم تمر تمر یا صائم (খেজুর, খেজুর হে রোযাদার! খেজুর, খেজুর হে রোযাদার)। আবেগময় কবিতা শ্রবণে কোনো ভাবপ্রবণ ব্যক্তির উপর কীরূপ ভাব তৈরি হয় তখন আমার কাছে স্পষ্ট অনুমিত হলো!

দ্বিতীয় রোযায় ঠিক তারাবির মধ্যখানে (যা আমি-ই একটা খোলা মাঠে পড়াচ্ছিলাম) আমাদের মদীনা নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস এসে হাজির হলো। আমরা সঙ্গীদের (মুরাদাবাদ ও মেওয়াতের হাজীগণ) নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। এক দিন ও দু-রাতের এ-সফর ও পথের আবেগ-আনন্দময় অবস্থার বিবরণ ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না। আমার নিবন্ধ 'আপনে ঘর সে বাইতুল্লাহ্ তক' এবং 'হুজুর ও সুরুর' দ্বারা কিছুটা ধারণা নেওয়া যেতে পারে কিংবা সেসব পত্র দ্বারা, যেগুলো আমি আমার শায়খকে লিখেছিলাম এবং যেগুলো শুনে হযরত শায়খের রমযানুল মুবারকে সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার শরীর এক-এক বিঘত উপরে উঠে যেত এবং প্রতিটি লোমকূপ থেকে জোশ উথলে উঠত। গ্রীষ্মের রমযান ছিল। কঠিন লু প্রবাহিত হচ্ছিল। মুখে রোযা, দিলে জোশ, চোখে অশ্রু, মুখে দুরুদ। সব দিনই ঈদের দিন, সব রাতই বরাতের রাত। জায়গাও একদম মসজিদে নববীর ছায়ার তলে পেলাম!

মাওলানা মাদানি (রহ.) তাঁর ভাতিজা মাওলানা সাইয়িদ হাবীব সাহেবের নামে একখানা পরিচিতিমূলক পত্র দিয়েছিলেন, যেটি তাঁর হাতে পৌঁছানোর

সুযোগ এখনও পাইনি। মাওলানা ছোট ভাই মাওলানা সাইয়্যিদ মাহমুদ আহমাদ সাহেব আমাদের অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে বরণ করে নিলেন। মাদরাসা শারইয়্যার পুরো একটা ঘর তিনি আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেন, যেটি কিনা মসজিদ থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে ছিল। হারামাইন শরীফাইনের উভয় জায়গায় এবং হেজাযের এই দীর্ঘ সফরে হযরত শায়খের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পেলাম যে, স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ছানি হাসানির সঙ্গ আমাকে একদম অবসর করে দিয়েছে। সে পাঁচ ওয়াক্ত মহিলাদের মসজিদে নিয়ে যেত, যেখানে তারা মহিলাদের জন্য নির্ধারিত অংশে নামায আদায় করত এবং মুয়াজা শরীফে সালাত ও সালাম পাঠ করত।

বাবে জিবরীল থেকে কয়েক পা ব্যবধানে কেবলার দিককার দেওয়ালের একেবারে ছায়ার তলে শায়খুল ইসলাম আরেফ হেকমত বে'র বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদির অনেক বড় ভাণ্ডার মনে করা হয়। তার পরিচালক হলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত শায়খ ইবরাহীম খারবাতলি, যিনি কিছু দিন আগে হিন্দুস্তান এসেছিলেন এবং নদওয়াতুল উলামায় দিনকতক অবস্থান করেছেন। ভাই সাহেব, সাইয়্যিদ সাহেব ও মাওলানা মাসউদ আলী সাহেবের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একদিন তিনি আমাদের পুরো কাফেলাকে আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, গ্রন্থাগারটি যে-বাড়িতে অবস্থিত, সেটির মালিক সাইয়্যিদুনা হযরত হাসান ইবনে আলীর জ্যেষ্ঠ নাতির পুত্র আপনার সম্মানিত দাদা সাইয়্যিদ হাসান মুছান্না। এই তথ্যটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। একটি রাত আপনি এখানে থাকুন।

আমরা তার এই সম্মানজনক প্রস্তাব কবুল করে নিলাম। আম্মাজান ও তাঁর সঙ্গিনীরা নারীমহলেই থাকলেন। আমি ও মুহাম্মাদ ছানি ছাদে জায়গা পেলাম। তার ও সবুজ গম্বুজের মাঝে কয়েক গজের ব্যবধান। আমাদের মতো গুনাহগার ও দূরদেশি লোকদের পক্ষে এটি শুধু গনিমতই নয় – নেয়ামতও বটে।

একটা রাত আমরা মাওলানা সাইয়্যিদ মাহমুদ সাহেবের সেই ঘরটিতে কাটালাম, যেটি অহুদের শাহাদাতগাহের সঙ্গে লাগোয়া ছিল। ওখানে সাইয়্যিদুনা হামযা (রাযি.)-এর কবর মোবারকের সন্নিকটে তুর্কিদের নির্মিত যে-মসজিদটি ছিল, সেখানে আমি 'যাদুল মা'আদ'-এর অহুদের ঘটনাসংক্রান্ত অংশটির সংক্ষিপ্তিকরণের কাজ করেছি। আমি বলতাম আর ছানি লিখত।

যিকাদার ২০ তারিখে এই কাফেলা কিরান হজের ইহরাম বেঁধে পবিত্র মক্কার উদ্দেশে রওনা হলো। প্রথমবারের মতো বাইতুল্লাহ শরীফের উপর চোখ পড়ার এবং বাবুস সালাম থেকে হারামে পা রাখার ফলে যে-অবস্থার সৃষ্টি হলো, (বিশেষ করে আমার সহোদরার) তা উপলব্ধি করা সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যার ওখানকার হাজিরি নসিব হয়েছে। হজের দিনগুলোতে আমরা হারাম শরীফ থেকে বেশ দূরে শামিয়া রিবাত টুঙ্ক নামক মহল্লায় অবস্থান করি। অনেক উঁচু সিঁড়ি অতিক্রম করে ওখানে যাওয়া-আসা করতে হতো। আম্মাজান দুর্বল মানুষ ছিলেন। কিন্তু ঈমানি শক্তি ও আগ্রহ-উদ্দীপনা বার্ধক্যে যৌবনের শক্তি সৃষ্টি করে দেয়। স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ছানি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতিবেলা তাদের সবাইকে হারাম শরীফে নিয়ে তাওয়াফ করাত। আমি দাওয়াতি আমল ও সাক্ষাতের কাজে নিয়োজিত থাকতাম।

১৪ যিলহজ ফেরার সময় বাসওয়ালা মক্কার সীমানা শুরু হতেই এই কাফেলটিকে নামিয়ে দিল। জানা নেই, আম্মাজান কীভাবে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে রিবাত টুঙ্ক পর্যন্ত গেলেন এবং নেমে হারাম শরীফে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলা এই সমস্যার সমাধান এভাবে দিলেন যে, এক হায়দারাবাদি বন্ধু মৌলভী কুরবান মুহিউদ্দীন, যিনি ১৩৫৯ হিজরিতে (১৯৩০ সাল) এক বিপর্যস্ত অবস্থায় লাখনৌ গিয়েছিলেন এবং আমার ভাইজান তাকে তাঁর ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন। তাকে তিনি সহযোগিতার নিয়তে কপি করা ও কেতাবতের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি রিবাত এলেন এবং জোর করে আমাদের মাদরাসা ফাখরিয়া উছমানিয়ার পুরাতন ভবনে – যেটি ঠিক বাবে ইবরাহীমে ছিল এবং তিনি যার মুহতামিম বা নায়েবে মুহতামিম ছিলেন – নিয়ে এলেন এবং কুতুবখানা যে-হলে ছিল, সেটি আমাদের জন্য ছেড়ে দিলেন। তার লাগোয়া একটি কক্ষ ছিল, যেটি আমাদের বাবুর্চিখানায় পরিণত হয়ে গেল। এবার আমরা যেন ঠিক হারাম শরীফের মধ্যেই আছি। হারামের সারিগুলো (হাজীদের আধিক্যের কারণে) তার দেওয়ালের সঙ্গে এসে এমনভাবে লেগে যেত যে, উপরে লাগালাগিভাবে জামাতের সাথে নামায পড়া যেত।

মোটকথা, হজের পর অবস্থানের দীর্ঘ সময়টি – যার মেয়াদ তিন মাসের কম ছিল না – যেন আমরা হারাম শরীফেই কাটালাম এবং সেখান থেকেই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে হিন্দুস্তানের উদ্দেশে রওনা হলাম। করাচির

ভাইজানের পরামর্শে বোম্বাই নামতে হলো। কারণ, করাচি থেকে রেলে করে হিন্দুস্তানের সফর সম্ভব ছিল না। বোম্বাই থেকেও সশস্ত্র পুলিশের প্রহরায় সফর অতিক্রম করলাম। অথচ এই নিয়ম সেকালে রেলে পালন করা হতো।

الى ممثلى البلاد الاسلامية পুস্তিকা

একজন দাঈর জন্য – যিনি নতুন কোনো দেশ বা পরিবেশে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন – দুটি বিষয়ের একটি খুবই প্রয়োজন।

১. পারিবারিক পরিচয়, তার অতীত ইতিহাস, জনসম্পৃক্ততা এবং মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা। কোনো চিন্তাবিদের মতে এ কারণেই নবীগণ নিজ-নিজ সম্প্রদায় ও দেশের খ্যাতিমান ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হতেন।

২. ব্যক্তিগত প্রভাব, যার ফলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে এবং দেল ও দেমাগ তার ক্রিয়া গ্রহণ করবে। এর জন্য প্রয়োজন শারীরিক সৌন্দর্য, জোরদার বক্তৃতার যোগ্যতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য।

প্রথম বিষয়টি আলহামদুলিল্লাহ্ আমার হিন্দুস্তানে অর্জিত ছিল। কিন্তু পবিত্র হেজাযে আমি ছিলাম একজন নবাগত, অপরিচিত ও অখ্যাত পরিবারের সন্তান। (তখনও পর্যন্ত আব্বাজান (রহ.)-এর রচনাগুলো, বিশেষ করে 'নুযহাতুল খাওয়াতির' প্রকাশিত হয়নি।) দ্বিতীয় বিষয়টিতেও আমি স্বল্পপুঁজির লোক ছিলাম। সেজন্য তীব্রভাবে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো যে, যদি আমার কোনো আরবি গ্রন্থ বা পুস্তিকা এই সফরে হাতে থাকত, যেটি পরিচিতির কাজ দিত এবং মনোযোগসহকারে কথা শোনা ও শ্রোতাদের অন্তরে শ্রদ্ধা ও আস্থা তৈরির ক্ষেত্রে পথ সুগম করত। আমি পুরোপুরি চেষ্টা করলাম, আমার الى ممثلى البلاد الاسلامية নিবন্ধটি, যেটি এশীয় কনফারেন্স দিল্লির আরব প্রতিনিধিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তাতে শক্তিশালী সাহিত্য প্রয়োগ করে দাঈর সুউচ্চ অবস্থান থেকে সম্বোধন করা হয়েছিল। (আমার ধারণা ছিল, সেটি অবশ্যই ক্রিয়াশীল হবে)। ভাবলাম, যদি সেটি রওনার আগেই ছাপার অক্ষরে চলে আসে, তাহলে তাকে সাথে করে নিয়ে যাব। পুস্তিকাটি লতিফি প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও বোম্বাই থেকে রওনার আগে বইটি হাতে আসেনি। কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, রওনার একদিন আগে তার একটা প্যাকেট ডাকযোগে করাচি এসে পৌঁছল এবং সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

এই পুস্তিকাটি আলহামদুলিল্লাহ রাস্তা থেকেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। জাহাজ কিছু সময়ের জন্য রীতিবহির্ভূতভাবে কামরান থামল এবং আরব পুলিশ ও স্থানীয় কর্মকর্তারা জাহাজে এল। তাদের মাধ্যমে পুস্তিকাটি শহরের কাজী সাহেব এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আলেমের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

হেজাযে তখনও পর্যন্ত এমনসব দাওয়াতি লিটারেচার অনেক কম পৌঁছেছিল, যেগুলোতে হৃদয়ের বাজনা বাজানো ও মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করার সমান যোগ্যতা বিদ্যমান। যা ছিল, ছিল হয়ত সনাতন ইলমি ভাষায় লেখা নিরেট দার্শনিক বা ফিকহি আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ-পুস্তিকা, যেগুলো থেকে ওখানকার যুবসমাজ, চিন্তাশীল ও রুচিবান ব্যক্তিবর্গ বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিংবা ছিল মিশরের সাহিত্যিকদের নিরেট সাহিত্যবিষয়ক, সমালোচনামূলক এবং নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্যের প্রতি আহ্বানকারী কিংবা বিনোদনমূলক গ্রন্থ, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন। الى مثقفى البلاد الاسلامية – যেটি স্রেফ একটি নিবন্ধ বা পুস্তিকা ছিল – একটি নমুনা উপস্থাপন করল, যাতে দাঈর উঁচু অবস্থান থেকে সম্বোধন করা হয়েছিল। তাতে হৃদয়ের উষ্ণতাও ছিল, আত্মার ব্যাকুলতাও ছিল, বিপ্লবের দাওয়াতও ছিল, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদও ছিল এবং যেটি হীনম্মন্যতা, হতাশা, পাশ্চাত্যের দাপট ও শাসন-সভ্যতার প্রভাব থেকে পুরোপুরি পবিত্র ছিল।

তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, উক্ত মহলটি, যারা আগেই উভয় চিন্তারীতি ও রচনারীতি থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বিশেষত আরব বিশ্বের ও সাধারণত ইসলামি বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে আস্থাশীল ছিল না, তারা আমার পুস্তিকাটি হাতে-হাতে নিয়ে নিল, বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শোনাতে শুরু করল এবং পরিচিতজনদের পড়তে পরামর্শ দিল।

আমার মনে আছে, মসজিদে নববীর হাদীছের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ ও নজদি আলেম শায়খ মুহাম্মাদ আলী আল-হারকান – যিনি আবুদাউদ ও মুসলিম শরীফের দরস দিতেন – একদিন দরস বন্ধ করে নিজে ছাত্রদের এই পুস্তিকাটি পড়ে শুনিয়েছেন। পরে তিনি জেদ্দার কাজী, তার পরে আইন ও বিচারমন্ত্রী এবং অবশেষে রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। অনুরূপ এক তুর্কি আলেম শায়খ উছমান সায়াতি – যিনি জীবিকা উপার্জনের জন্য ঘড়ি মেরামতের কাজ করতেন আর মদীনায় কুরআন মজীদের দরস দিতেন। তুর্কিদের মাঝেও তিনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন – এই পুস্তিকাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হেজায অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

হেজাযের বরকতময় অবস্থান – যার সময়সীমা প্রায় ছমাস ছিল – ওখানকার বরকতময় ব্যস্ততা ও দাওয়াতি কাজের বিস্তারিত বিবরণ না এখানে লিপিবদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য, না এখানে তার জায়গা আছে। তার খানিক বিশ্লেষণ স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ ছানির 'সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলবি (রহ.)'-এ দেখা যেতে পারে।

সারকথা হলো, প্রায় ৩ রমযান থেকে ২০ যিকাদা পর্যন্ত আমরা মদীনায় অবস্থান করলাম। মদীনা তাইয়িবায় তারাবির পর আলেমদের মজলিসে, জুমার পর মাদরাসা শারইয়্যার একটি হলে এবং নগরীর উপকণ্ঠে সমাবেশ, বক্তৃতা ও তাবলীগি কাজ হতো। অবশেষে যিকাদার শেষের দিকে আমরা মক্কা মুযাজ্জমায় চলে এলাম। এখানকার বড়-বড় আলেমদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হলো, যাদের মধ্যে আল্লামা সাইয়িদ আলাবি মাক্কি, শায়খ আমীন কুতুবি, শায়খ হাসান মাশশাত, শায়খ ইবনে আরাবি, শায়খ মাহমুদ শোবল ও শায়খ আবদুর রাযযাক হামযা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সময় হেজাযের যুবসমাজ, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিক শ্রেণীটি আলেমদের পরিবেশ থেকে অনেক দূরে ছিলেন এবং খালেস দীনি আন্দোলন ও দাওয়াতের সঙ্গে একদম সম্পর্কহীন ছিলেন। তার একটি নমুনা হলো, আমি একবার ওখানকার বড়মাপের একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে – যিনি একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং দীনি মাদরাসায় শিক্ষা অর্জন করেছেন – হিন্দুস্তানের দাওয়াতি কাজের বিবরণ ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোচনা তুললে তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'মৌলভী সাহেব! দীনের কথা হারাম শরীফের জন্য রেখে দিন; বলুন, দেশ বিভক্তিতে মুসলমানরা কী-কী ধোঁকা খেয়েছে এবং তাদের বর্তমান পরিস্থিতির কারণগুলো কী?'

মক্কা মুয়াজ্জমার অবস্থানের বড় একটি সুফল হলো শায়খ ওমর ইবনুল হাসান আলুশ শায়খ-এর সঙ্গে পরিচয় হওয়া এবং তার ঘনিষ্ঠতা ও আস্থা অর্জন, যা দাওয়াত ও জামাতের পক্ষে অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। তিনি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর বংশধর ছিলেন। সৌদি সরকারের প্রধান বিচারপতি ও শায়খুল ইসলাম শায়খ আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান-এর (যিনি সরকারের সবচেয়ে বড় দীনি ব্যক্তিত্ব ছিলেন) আপন ভাই এবং রিয়াদে 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন। সৌদি সরকারের পরবর্তী বাদশার একজন পরম বিশ্বস্ত ও

আস্থাভাজন উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার পুস্তিকাগুলো নিজে পড়তেন এবং অন্যদের দ্বারা পড়িয়ে শুনতেন। তাঁর এই সম্পর্ক ও আস্থা সেই লোকদের কথাবার্তাকে ক্রিয়াহীন করে দিল, যারা (বিভিন্ন কারণে) জামাতের ব্যাপারে খারাপ ধারণা ও সংশয় সৃষ্টি করতেন এবং নানা গুজব ছড়াতেন। এ-কাজে শায়খের এতখানি এতমিনান হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি মন খুলে জামাতের সহাযোগিতা করতেন। বাহ্যিক উপকরণ হিসেবে বলতে পারি, যদি শায়খ ওমরের এই কর্মনীতি না হতো, তাহলে সম্ভবত সে-সময় ওখানে স্বাধীনভাবে কাজ করা জামাতের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁর সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহাল ছিল এবং কালে সম্পর্কটি স্নেহ ও মুরুব্বীসুলভ সম্পর্কে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যার অনুমান তাঁর সেসব প্রেমপূর্ণ পত্র দ্বারা করা যেতে পারে, যেগুলো তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

بين الجباية والهداية পুস্তিকা

হেজায অবস্থানের দীর্ঘ সময়টিতে অনুমান হয়ে গেল, এই দেশটি ও এখানকার সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে এবং কীভাবে এমন একটি উন্নয়নশীল, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও দ্রুত পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর অনুগামী রাষ্ট্রগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে, যার জন্য দীনি ও নৈতিক কোনো ব্রেক নেই। আর এসব তার ফলাফল যে, দেশটি সেই আন্দোলন ও দাওয়াতকে ভুলে যেতে শুরু করেছে, যার নামে, যার বরকতে সে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং একটি অসম্ভব বিষয় সম্ভবে পরিণত হয়েছে। আর এখন কিনা সে হেদায়েতের পথের বদলে তহসিলদারির পথে হাঁটতে শুরু করেছে এবং এপথ অবলম্বনের সমস্ত কুফল সামনে আসতে শুরু করেছে।

আমার অবস্থানের সর্বশেষ দিন। হঠাৎ মনে একটি তীব্র চাহিদা জাগ্রত হলো যে, এই বাস্তবতাগুলো আমি একটি পত্রের আকারে প্রকাশ করব এবং শায়খ ওমর ইবনুল হাসান-এর কাছে আবেদন জানাব, সৌদি সরকারের ভাবী বাদশাকে পত্রটি পাঠ করে শোনান। আমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয-এর সেই ঐতিহাসিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যটি – যেটি তিনি তাঁর একজন গভর্নরকে লিখেছিলেন, যিনি অভিযোগ করেছিলেন, নতুন বিজিত দেশগুলোতে মানুষ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণের ফলে রাষ্ট্রের কোষাগারের

উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। কারণ, ইসলাম গ্রহণের পর আর তাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেওয়া যাচ্ছে না, যা কিনা সরকারের আয়ের প্রধান উৎস – উল্লেখ করলাম। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয লিখেছিলেন–

وَيْحَكَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ هَادِيًا وَلَمْ يُبْعَثْ جَابِيًا

> 'আরে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন – খাজনা উসুলকারী বানিয়ে পাঠাননি! যদি সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে যায় আর তার ফলে রাষ্ট্রের কোষাগার শূন্য হয়ে যায় এবং জীবিকার জন্য যদি আমাদের অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে হয়, তবুও আমি খুশী।'

তারপর আমি দুটি সরকারপদ্ধতির মেজাজ, চিন্তানীতি, কর্মনীতি ও মানদণ্ডগত পার্থক্য বোঝালাম, দুয়ের ফলাফল দেখালাম, বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সরকার এখন তহসিলদারির পথে হাঁটছে এবং এ অনেক বড় একটা বিপদের সংকেত। তারপর আমি এই দেশটির কাছে মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি তুলে ধরলাম এবং ইসলামি শাসনের বরকত ও তার সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ও মুসলমানদের ভালবাসার কথা উল্লেখ করলাম।

এই পত্রটি আমি কিছু থাকার জায়গায়, কিছু মক্কা ও জেদ্দার মধ্যখানে বাসে এবং কিছু বন্দরে জাহাজের জন্য অপেক্ষার সময়টিতে লিখেছি এবং সেখানেই মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবের হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি পত্রখানা শায়খ ওমর ইবনুল হাসান-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। পরে আমি তার একটি পত্রে জানতে পারলাম, তিনি পত্রটি বাদশাকে পড়ে শুনিয়েছেন। আহ! যদি এই পত্রটির বাস্তব কোনো ফলাফল দেখতে পেতাম এবং তখন থেকেই পথ বদলের চেষ্টা শুরু হয়ে যেত, তাহলে আজ শুধু সৌদি আরবেরই নয় – সমগ্র মুসলিম বিশ্বের চিত্র অন্যরকম হতো।

দেশবিভক্তি ও তার প্রতিক্রিয়া

আমরা হেজাযেই ছিলাম এবং মদীনা তাইয়্যিবায় মাহে রমযান তার পুরোপুরি বরকত ও মাদানি বৈশিষ্ট্যের সাথে পালন করছিলাম। ঠিক তখন রমযান মাসেই (১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল) হিন্দুস্তানের বিভক্তি এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি আলাদা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়ে গেল এবং সেখানে সেই ছোট কেয়ামত কায়েম হয়ে গেল, যার খবরাখবর পত্রিকা ও

চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছিল। যেমন– আপনারা উপরের আলোচনা দ্বারা জেনে থাকবেন, মাঠের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার ও আমার গোটা পরিবারের; বরং পুরো জামাতের ঝোঁক ছিল জমিয়তুল উলামা ও মজলিসে আহরার-এর দিকে।

আমরা বিভক্তিকে দেশের জন্য ক্ষতিকর মনে করতাম। বিভক্তির আগে এই চিন্তাধারার আলেম ও নেতাদের সাথে; বিশেষ করে মাওলানা মাদানি (রহ.)-এর সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী-সমর্থকরা যে-অভদ্রতাসুলভ ও অমানবিক আচরণ করেছিল, তাতে আমাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত ছিল এবং তাকে আমরা মুসলমানদের জন্য কোনো সুভ লক্ষণ মনে করতাম না। কিন্তু পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্টদের অনুদারতা ও যেসব মুসলমান তাদের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে কাজ করতেন, তাদের সাথে যে-সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণতাসুলভ আচরণ করেছেন, তাও আমাদের জানা ছিল। সেই সুবাদে আমরাও এই গোষ্ঠীটির মনস্তত্ত্ব, চিন্তারীতি ও কর্মপদ্ধতি বুঝবার যোগ্যতা রাখতাম, যারা এদের থেকে বিতৃষ্ণ ও নিরাশ হয়ে অপর একটি কর্মপদ্ধতিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও স্বাধীন সরকার কামনা করতেন এবং তাকে খুবই জরুরি মনে করতেন, যেখানে তারা নিজেদের যোগ্যতা ও শ্রম অনুসারে সম্মানের জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। তারা এই ক্ষুদ্র দলটির প্রতিও সুবিচারমূলক আচরণ করতেন, যাঁরা এমন একটি ভূখণ্ডের বাসনা লালন করতেন এবং তার প্রয়োজনীয়তার প্রবক্তা ছিলেন, যেখানে তারা একটি স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামি জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন এবং ইসলামি শাসনের উপকারিতা বিশ্বকে দেখাতে সক্ষম হবেন।[১]

ঘটনাচক্রে আমরা যেদিন লাখনৌ পৌঁছলাম, সেদিনই (৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮) গান্ধীজির হত্যার ঘটনাটি ঘটে গেল, যার ফলে হঠাৎ করে একসঙ্গে গোটা দেশের চিত্র বদলে গেল এবং মুসলমানদের জন্য মানবহৃদয়ে একটা নরম জায়গা তৈরি হয়ে গেল। অন্তত্তপক্ষে সেই জোশ ও উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে গেল, চিন্তার যোগ্যতা এবং মানবতা ও একই দেশের নাগরিক হওয়ার মর্যাদাকে একদম দাবিয়ে রেখেছিল।

---

১. কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সময় পরও তার কোনো প্রচেষ্টা বাস্তবতার মুখ দেখেনি। নেতারা সেই প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করেননি, যেগুলো সেসব কুরবানি ও ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিকার, যা ভারতের মুসলিম জাতি বরণ করে নিয়েছিল।

মুসলমানদের হীনম্মন্যতা ও হতাশার মোকাবেলা এবং নতুন পরিস্থিতিতে কাজ করার ‘পথের দিশা’

১৯৪৮ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে যখন আমরা হিন্দুস্তান ফিরে এলাম, তখন এখানকার জগতই একদম বদলে গেছে। যেসব মুসলমান এই অঞ্চলে রয়ে গিয়েছিল, (সংখ্যায় যারা ছিল বিরাট একটি দল) অল্প কিছু বাদে তারা সবাই হীনম্মন্যতা ও হাতাশার শিকার ছিল। তাদের জাতীয় নেতা তাদের নিঃসঙ্গ রেখে চলে গেছেন। নিজেদের পয়গাম ও দাওয়াত, নিজেদের জরুরত ও বৈপ্লবিক এবং অসম্ভবকে সম্ভব বানিয়ে দেওয়ার মতো শক্তির সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে, যেটি তাদের মাঝে একজন দাঈ ও চিন্তাশীল হিসেবে গচ্ছিত ছিল, হিন্দুস্তানে তারা কোনো আলো দেখতে পাচ্ছিল না। তারা একটি ঘুরপাকের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

অপরদিকে দেশের অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠর বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা – যারা সরকারের উঁচু-উঁচু পদে ও মন্ত্রিত্বের চেয়ারে অধিষ্ঠিত ছিলেন – তাদের এমন মমতাসুলভ ও মুন্সিয়ানা তরিকায় পরামর্শ দিচ্ছিলেন, যেন এ দেশের সমস্ত মুসলমান মকতবের শিশু। কখনও তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আলাদা সংস্কৃতির মজাক উড়াত, কখনও মুসলমানদের বাইরের পানে তাকনোর ফলে (যার মধ্যে তাদের দীনি কেন্দ্র ও হেদায়াত ও মানবতার উৎস মক্কা-মদীনাও ছিল) তাদের ভ্রূকুঞ্চিত হতো, কখনও উর্দুর জন্য হিন্দী লিখনরীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন, কখনও বিস্ময় প্রকাশ করত যে, হিন্দুস্তানের মুসলমানরা সনাতন হিন্দুস্তানের নামকরা গৌরবময় ব্যক্তিত্বদের জন্য কেন গর্ব করে না এবং কেনইবা তাদের নামে নিজেদের সন্তানদের নাম রাখে না যেমন হিন্দুস্তান ও ইরানের মুসলমানরা সনাতন প্রাচীন ইরান ও আরবের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নামে নাম রাখছে (যেমন রুস্তম, সোহরাব, হাতেম তাঈ), কখনও যমযমের বরকতময় পানি ও আরবের খেজুর (যা কিনা আরবের ফল) দ্বারা ইফতার করা সুন্নত হওয়াকে কেন্দ্র করে তাচ্ছিল্য করত যে, মুসলমানদের এই আচরণ এখানকার পবিত্র নদীগুলোর পানি ও এখানকার মাটিতে উৎপন্ন সুস্বাদু ফল-ফলাদির সাথে নয় কেন?

স্বাভাবিক ও শান্ত পরিস্থিতিতে তো এধরনের পরামর্শ ও অভিযোগ-আপত্তি তেমন একটা গুরুত্ব পায় না এবং বিদ্যা ও চিন্তাগতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু মুসলমানরা তখন যে-মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতির শিকার ছিল, তাতে এসব অভিযোগ-উপহাস কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার নামান্তর ছিল।

এই 'মহৎকর্ম'টিতে আমাদের উত্তর প্রদেশের দুজন দায়িত্বশীল লিডার বাবু পরশুমত দাস টন্ডন (চেয়ারম্যান, আইন পরিষদ, উত্তর প্রদেশ) ও সম্পুর নানন্দজি (তৎকালের শিক্ষামন্ত্রী ও পরে মুখ্যমন্ত্রী) সবার অগ্রগামী ছিলেন। আমি এদের বক্তব্যের জবাবে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক নিবন্ধ লিখেছি, যেগুলো সাপ্তাহিক 'তামীর' ও মাসিক 'আল-ফুরকান'-এ সে-সময়ই প্রকাশিত হয়েছে। এমন একটি পরিবেশে, যেখানে কোনো একটি জাতির উপর মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক রণাঙ্গন থেকে আক্রমণ চালানো হচ্ছিল এবং তার উত্তরদানে কেউ সাহস পাচ্ছিলেন না, সেই পরিস্থিতিতে এ-ধরনের নিবন্ধ ও বক্তব্য উপকারিতা ও প্রতিক্রিয়া থেকে খালি ছিল না। একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে একথাও স্বীকার করে নেওয়া জরুরি যে, সে-সময় মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব সাহারবির (নাযেম, উমুমী জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ) ভাষণ-বক্তৃতা, দুঃসাহসী অবস্থান এবং সংখ্যাগরিষ্টদের নেতা-মন্ত্রীদের চোখে চোখ মিলিয়ে কথা বলাও অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। তার কারণ এই ছিল যে, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে আপন গোষ্ঠীর যে অসন্তোষ ক্রয় করেছিলেন এবং তার যে-মূল্য পরিশোধ করেছিলেন, তা থেকে কংগ্রেসের বড়-বড় লিডারদের পকেট ও আঁচল শূন্য ছিল।

হিন্দুস্তান ফিরে আসার পর ১৩৬৭ হিজরির রমযানে (জুলাই, আগস্ট ১৯৪৮) মনে খুব তাগাদা অনুভূত হলো, ঈদের পর-পরই বিভিন্ন চিন্তাধারার দরদী লোকদের একটি বৈঠকের আয়োজন করব এবং তাদের সামনে দেশ ও মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা ও প্রস্তাবাবলি উপস্থাপন করব। এই অনুভূতিটি আমার এতই তীব্র আকার ধারণ করল যে, তাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। আমি ঈদের চাঁদের মতো সেই দিনটির অপেক্ষা করতে লাগলাম, যেদিন আমি আমার দিলের এই দরদ দরদচেনা লোকদের সামনে মেলে ধরব। ঈদ গত হতেই আমি এজাতীয় মুসলমান পণ্ডিত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের নামে দাওয়াতনামা পাঠিয়ে দিলাম যে, ২০ শাওয়াল (২৬ আগস্ট ১৯৪৮) আপনারা লাখনৌ আসার কষ্টটুকু স্বীকার করুন এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় অনুষ্ঠেয় একটি জাতীয় পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! আমন্ত্রিত বিপুলসংখ্যক লোক তাতে অংশগ্রহণ করলেন। আমি ভূমিকাস্বরূপ তাদের সম্মুখে সেই নিবন্ধটি পাঠ করলাম, যেটি আমি ঈদের পরই এই সভার জন্য দরদের বিশেষ একটি অবস্থায়

লিখেছিলাম, যেটি পরে 'নেশানে রাহ' (পথের দিশা) শিরোনামে কয়েক জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এই নিবন্ধে প্রথমে বিস্তারিতভাবে অতীতের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে এবং সেই আন্দোলনগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের পুনরুত্থানের জন্য নিকট অতীতে জন্ম নিয়েছিল। পাশাপাশি মুসলমানদের সেই প্রতিরোধশক্তি ও জাতীয় মর্যাদাবোধের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে, যা ইংরেজ আমলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করেছে। সাথে-সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও তার আগের যুগের মৌলিক পার্থক্যটিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারপর নতুন যুগের ভয়ানক দিকগুলোও আলোচনা করা হয়েছে এবং সেসব স্পর্শকাতরা ও জটিলতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলোকে জাতীয় এই আমলটি তার বাগে নিয়ে রেখেছিল। সেইসঙ্গে পরিস্থিতির উজ্জ্বল দিকগুলোও সামনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং এই উম্মতকে দাঈ ও নেতৃত্বদানকারী আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, এই শক্তি আজও মোজেজা দেখাতে পারে।

অবশেষে কর্মপদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মিশ্র সভাগুলোতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ, হিন্দী-ইংরেজিতে দাওয়াতি ও পরিচিতিমূলক লিটারেচার প্রস্তুতি, পাশাপাশি গণহারে দাওয়াত-তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথা বলা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে স্বাধীন ইসলামি বিদ্যাপীঠগুলোর প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অবশেষে শেষ কথা হিসেবে নিবন্ধটি এই বার্তাটির উপর সমাপ্ত করা হয়েছে :

> 'সুধীমণ্ডলি! যেসব গায়েবি মদদ ও কুদরতি নেযাম ইসলামের দাওয়াতের রাস্তা পরিষ্কার করছে এবং একজন দাঈ এবং হিম্মত ও ঈমানওয়ালা জামাতের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল-থেকে-উজ্জ্বলতর বানাচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা কিংবা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। তদুপরি যে-মজমাটি এক্ষণে আমার সম্মুখে রয়েছে, তাকে দেখে এখন আর মনে করার কোনোই কারণ নেই যে, যে-দেশে এতগুলো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান আছেন, সেই দেশ থেকে ইসলাম মিটতে পারে। যখনই

কোনো একজন মর্দেখোদা মুমিনের বিশ্বাসের সাথে বলে
দিয়েছে–

أَيَنْقُصُ الدِّيْنُ وَأَنَا حَيٌّ؟

'আমি বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি হবে?" .

তখনই সঙ্গে-সঙ্গে কালের গতি পালটে গেছে এবং ইসলাম বর্জনের প্রতি ধাবমান ধারাটা রোম ও শামের বিজয় এবং বিশ্বময় ইসলাম প্রচারের দিকে বদলে গেছে। যদি মুখলিসদের একটি জামাত আজও সিদ্দীকিয়াতের সর্বনিম্ন প্রত্যয় ও সাহসিকতার সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমরা থাকতে হিন্দুস্তান থেকে দীন মিটে যাবে, এ হতে পারে না', তাহলে নিশ্চিত থাকুন, এদেশ থেকে ইসলাম কোনোদিনও মিটবে না। বরং তার সফলতা, মজবুতি ও প্রসারের জন্য নতুন-নতুন এমনসব পথ খুলে যাবে, যা কারুর কল্পনায়ও নেই।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۝

'তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না।
তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন।
তিনি তোমাদের কর্মফল ক্ষুণ্ন করবেন না।'[১]

এই সমবেশের একটি অধিবেশন সকালে অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে হযরত জিগার মুরাদাবাদিও উপস্থিত ছিলেন। তৃতীয় প্রহরে যখন তার দ্বিতীয় অধিবেশন নদওয়াতুল উলামার মসজিদে অনুষ্ঠিত হলো, তখন জিগার সাহেব ফরমায়েশ করলেন, সকালের নিবন্ধটি আবার পড়ুন। আমি তার ফরমায়েশ তামিল করলাম। হিন্দী ও ইংরেজি লিটারেচার প্রস্তুত করতে অর্থের প্রয়োজন ছিল। জিগার সাহেব সবার আগে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে এক হাজার রুপি দান করলেন। আরও বেশ কিছু ফান্ড জমা হলো। তারপর আমার নিবন্ধগুলোর হিন্দী ও ইংরেজিতে তরজমা হলো। হিন্দীর তরজমার কিছু কাজ মৌলভী আবেদ আলী সাহেব বালহুরি করলেন আর ইংরেজির কিছু করলেন জনাব মাযহারুদ্দীন সাহেব সিদ্দীকি, যিনি আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা বারাবাঙ্কির ফতেহপুর এলাকার বাসিন্দা এবং হায়দারাবাদে পররাষ্ট্র বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। পুলিশ এ্যাকশনের পর নিজের এলাকায় ফিরে এসেছেন।

---

১. সূরা মুহাম্মাদ : ৩৫

হিন্দী পুস্তিকাগুলো ছেপে আসার পর এবার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল সেগুলোর প্রচার করা। দেশীয় ভাইয়েরা (বিশেষ করে সে-সময়) মুসলমানদের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে কমই হাত লাগাত। মুসলমানদের মাঝে না তাদের মার্কেট ছিল, না তার প্রয়োজনের অনুভূতি। ফল এই দাঁড়াল যে, ছাপা বইগুলোর বিশাল একটি ভাণ্ডার কাচারি রোডের তাবলীগি মারকাযে – যেখানে আমি থাকতাম – জমা হয়ে গেল।

মনে চিন্তা এল, মুসলমানদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যে, তারা বইগুলো ক্রয় করে আপন-আপন হিন্দু বন্ধু-বান্ধব ও অফিস-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হাদিয়াস্বরূপ দান করবে। যদি তা হয়, তাহলে আমাদের শ্রমের মূল্য উসুল হয়ে যাবে। আমি কয়েকটি পত্রিকা ও পুস্তিকায় এ ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দিলাম এবং মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মাত্র একজন লোক বই চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। তার নাম ডাক্তার মুহাম্মাদ আবদুল জলীল ফরীদি, যার সঙ্গে আমার তেমন কোনো পরিচয় ছিল না। শুধু এটুকু জানতাম, শহরের তিনি একজন সফল মুসলমান ডাক্তার। পরে খেয়াল এল, এর জন্য আলাদা একটি বিভাগ দাঁড় করাতে হবে। তার জন্য এমন একজন লোক দরকার, যিনি হবেন ইসলামি শিক্ষায় পারদর্শী এবং মিশনের সঙ্গে একমত পোষণকারী ব্যক্তিত্ব। একাজে মাওলানা ইসহাক সাহেব নদবি – যিনি ১৯৪৩ সাল থেকে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষকতার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন – আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। ১৯৪৯ সালের ৬ জুন তিনি দারুল উলূম থেকে ইস্তফা দিয়ে এ কাজের জিম্মাদারি কবুল করে নিলেন। সে-সময় জেপুরে কংগ্রেসের সেশন হলো। মাওলানা দাওয়াতি পুস্তিকাগুলো সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি প্রায় এক বছর এই কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলেন। কিন্তু না মজলিস শহরে উপযুক্ত কোনো জায়গা পেল, যেখানে একটি পাঠাগার স্থাপন করা যায়, না শিক্ষিত মুসলমানরা এ-কাজে যথাযথ উৎসাহ জোগাল। ফলে এ-কাজের আশাব্যঞ্জক সাফল্য পাওয়া গেল না। কিন্তু কাজটির গুরুত্ব, উপকারিতা ও তীব্র প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে না তখন কোনো সংশয় ছিল, না এখনও কোনো সন্দেহ আছে।

হেজায থেকে আসার পর আমি সেখানকার আলেমসমাজ, বন্ধু-বান্ধব ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ অব্যাহত রাখলাম, যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আরব আলেমসমাজ ও লেখক-সাহিত্যিকদের বংশগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত ভদ্রতা ছিল যে, (আমার বারবার

যার অভিজ্ঞতা হয়েছে) তাঁরা এই সম্পর্কটিকে (যার মেয়াদকাল সামান্য ছিল) বরাবর বহাল রাখেন এবং পত্র লিখতে থাকেন।

হেজাযের পবিত্র মাটিতে দাওয়াত ও ফিকিরের যে নতুন বীজ বপন করা হয়েছিল, তাকে টিকিয়ে রাখতে এবং তার গোড়ায় পানি ঢালতে ১৯৪৯ সালে ভাই সাহেবের সিদ্ধান্ত ও সহযোগিতায় দুজন নদবি আলেমকে হেজাযে দীর্ঘ সময় অবস্থানের জন্য নির্বাচন করা হলো, যারা সেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক অটুট রাখবে, যাদের সঙ্গে আমার ১৯৪৭ সালে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং আমাদের দাওয়াতি পুস্তিকাগুলো শিক্ষিতসমাজ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাতে থাকবে, যেগুলো আমি হেজায থেকে ফেরার পর প্রস্তুত করেছিলাম। তারা দুজন হলো মৌলভী মুহাম্মাদ মুঈনুল্লাহ নদবি ও মৌলভী আবদুর রশীদ নদবি। তারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ও ব্যাপক তৎপরতার সাথে এই কাজটি আঞ্জাম দেয় এবং সেই ফিতাটিকে অটুট রাখে, যেটি দাওয়াতের সূত্রে হেজায ও নজদ-এর সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল।

লাখনৌর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও সেগুলোর আরবি অনুবাদ

এ-সময়ে লাখনৌতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক তাবলীগি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলোতে আমি ভাষণ দান করেছি। সেই সমাবেশগুলোর মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ছিল সেটি, যেটি আমি ১৯৪৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের জলসায় 'সুরত ওয়া হাকীকত' (আকৃতি ও প্রকৃত) নামে প্রদান করেছি। তাতে আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এবং নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছি, আকৃতি ও প্রকৃতর মাঝে অনেক ব্যবধান আছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকৃত বড়-বড় আকৃতির উপর জয়লাভ করেছে। শুরু যুগের ইতিহাস দ্বারা আমি ইসলামের বিজয়ের বিস্ময়কর অনেকগুলো ঘটনা উপস্থাপন করেছি। বলেছি, ইসলামের আকৃতি মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহর রহমত, সাহায্য, মানুষ তাদের ভয় ও সমীহ করার ওয়াদাগুলো প্রকৃতের সাথে সম্পর্কিত – আকৃতি, দাবি ও ইতিহাসের সঙ্গে নয়। বাস্তবতা হলো, ইসলামের প্রকৃত দীর্ঘকাল যাবত মাঠে আসেইনি। কাজেই এ-সময় উম্মতের সবচেয়ে বড় খেদমত হলো মুসলমানদের

ইসলামের প্রকৃতের গুণে গুণান্বিত করা এবং তাদের প্রকৃত ইসলামের সাজে সজ্জিত করা। এর মধ্যে আজও শক্তি আছে এবং আজও এর দ্বারা অলৌকিক ঘটনরাসমূহ প্রকাশ পেতে পারে।

আরবিতে এই ভাষণটির তরজমা করেছে আমার স্নেহের ভাতিজা মুহাম্মাদ আল-হাসানি, যার বয়স তখন তেরোর বেশি ছিল না। অনুবাদে ভাষণের সাবলীলতা ও শক্তি পুরোপুরি বিদ্যমান। এর উপর ভিত্তি করে তরুণ ছেলেটার সহজাত যোগ্যতা ও আল্লাহপ্রদত্ত লিখনিশক্তির ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। অনুমান করা যেতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে ও আরবির একজন শক্তিশালী কলামিস্ট ও দাঈ হবে। ছেলেটা নিয়মতান্ত্রিক কোনো শিক্ষা লাভ করেনি। একটা দিনও ও ছাত্র হয়ে কোনো মাদরাসায় অধ্যয়ন করেনি। ভাইজান তাকে সরফ-নাহুর কোনো কিতাব ব্যতিরেকেই কুরআন মজীদ ও আরবি ভাষা শিখিয়েছেন। অবশ্য ও অত্যন্ত মনোযোগ ও আস্থার সঙ্গে আমার নিবন্ধমালা ও আরবি কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেছে এবং সেগুলোর বর্ণনাধারা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করেছে। এই অনুবাদটি بين الصورة والحقيقة নামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে আমি যখন হেজায গেলাম, (যার আলোচনা পরে আসবে) তখন এই পুস্তিকাটি সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঙ্গে পড়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনানো হয়েছিল। কোনো-কোনো আরব পণ্ডিত পুস্তিকাটি এত অধিকবার পড়েছেন যে, তা মুখস্থর মতো হয়ে গিয়েছিল।

এটি ছাড়াও আরবির আরও দুটি পুস্তিকা بين الانسانية واصدقائها ও الى شاطئ النجاة যথাক্রমে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে নদবি ও মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবি অনুবাদ করেছে। এগুলোও আরবি টাইপে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে আরবির মাধ্যমে আরব দেশের আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

আরবদের মাঝে দাওয়াতের জযবা

১৯৪৮ সালে হেজায থেকে ফেরার পর আরবদের তাদের ভাষায় ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহ্বান, শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়; মানববিশ্বে দাঈ ও নেতাসুলভ কর্তব্য পালন, নিজেদের পুরাতন পদমর্যাদা বুঝে নেওয়ার দাওয়াত দেল ও দেমাগে ছেয়ে গিয়েছিল এবং স্নায়ুর উপর এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, একেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু বানিয়ে নেওয়ার

চিন্তা মাথায় আসতে শুরু করল। আমার এই জোশ ও জযবার কিছুটা অনুমান সেই পত্রটি দ্বারা করা যেতে পারে, যেটি আমি বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব নদবিকে ১৩৬৮ হিজরির ৬ শাওয়াল (৩ আগস্ট ১৯৪৯) সেই সময়টিতে লিখেছিলাম, যখন তিনি ইরাকে ছিলেন। তার একটি নির্বাচিত অংশ এখানে উপস্থাপন করলাম :

> 'দীনের বীজ বপনের জন্য এই বিরান খেতে একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। প্রমাণ সম্পন্ন করে দিন। দিন-রাতকে এক করে ফেলুন। হৃদয়কে ভস্ম করে দিন। দেহটাকে গলিয়ে ফেলুন। দেহের রক্ত, কলিজার রক্ত প্রবাহিত করুন এবং এমনভাবে প্রবাহিত করুন, যেন দজলা-ফোরাত পাত্রের সংকীর্ণতা ও পানির স্বল্পতার জন্য মাতম করে। এক-একজন মানুষের কলার ধরে-ধরে বলুন, ও হে আরব মরুর পথভোলা হরিণ! ও হে জগতের সম্ভ্রম! ও হে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা! তুমি কোথায় হারিয়ে গেছ? সাইয়িদুনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর মধ্যরাতের দু'আ ও শেষ রাতের আহাজারি, মুছান্না ইবনে হারিছা (রাযি.)-এর শাহাদাতের রক্ত, আবু উবায়দা আছ-ছাকাফি (রাযি.)-এর পদদলিত হওয়া ও হাড়গোড় ভাঙা, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর পতাকাধারণ, আলী ইবনে আবী তালিব (রাযি.)-এর কলিজার জ্বলন, অশ্রুপাত, ভাষণ ও প্রভাবের ঝড় বইয়ে দেওয়া, শহীদদের সম্ভ্রম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা নাতির পিপাসা, নবীবংশের রক্তের প্রাচুর্য, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মস্তিষ্কের জ্বলন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নবীপ্রেমের অপরাধে সাজাবরণ, ইবনে জাওযি (রহ.)-এর সুন্নতের পক্ষাবলম্বন ও আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর দরদমন্দির সারকথা কি শুধু এই যে, তুমি পথভ্রান্ত নেতাদের সামান্য একজন তল্পিবাহক ও তাদের পথে ধুলা? ইরাকের সেই কবরস্তানে সিঙ্গার ফুৎকার দিন এবং কিয়ামতের শোর ছড়িয়ে দিন।'

নদওয়াতুল উলামার সদস্য ও সেক্রেটারির পদপ্রাপ্তি

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝিতে আমি দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। '৪৯ সালের জানুয়ারিতে মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি (দারুল উলূমের সেক্রেটারি)-এর প্রচেষ্টায় আমাকে সহ-সেক্রেটারি বানানো হয়। তারপর '৫৪ সালে সাইয়িদ সুলাইমান নদবির মৃত্যুর পর ব্যবস্থাপনা পরিষদ আমাকে সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত করে।

হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ও যাওয়া-আসা

আল্লাহপাক হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া সাহেবের মর্যাদা বুলন্দ করুন। তিনি বরাবরই আমাকে হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পরি (রহ.)-এর সাথে সম্পর্ক বাড়ানোর এবং তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার তাকিদ দিতেন এবং লিখতেন, 'এখন এই একটা দোকানই অবশিষ্ট আছে, যেখান থেকে ইখলাস, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও নফসের তরবিয়তের সওদা কিনতে পাওয়া যায় এবং ওখানে এই জিনিসগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুর আলোচনা ও ভাবনা নেই।'

বিভক্তির পর থেকে পাকিস্তান যাওয়া ও নিজের পুরাতন রূহানি মারকাযের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার পথে যে-অসুবিধাগুলো সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আরও বেশি প্রয়োজন তৈরি করে দিল যে, হৃদয়ের উনুনটাকে গরম রাখতে, নফস ও আখলাকের দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং যে-সফরের আমি মুসাফির, তার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে এমনই একটি জায়গা ও এমনই একজন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যেখানে এসব জিনিস পাওয়া যায়।

রায়পুর গেলে আমার অনুভূত হতো, বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদের এই ঘোর অন্ধকার সমুদ্রে – যা কিনা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে – এই একটা দ্বীপই আছে, যেখানে যিকির-ফিকির ছাড়া আলোচনা ও ব্যস্ততার আর কোনো বিষয়বস্তু নেই এবং যেখানকার প্রতিটি পত্র-পল্লব থেকে আল্লাহ্-আল্লাহ যিকিরের আওয়াজ আসছে। বাতেনি কামালাতের উপলব্ধি না তখন ছিল, না এখন আছে। কিন্তু হযরতের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। একটি হলো বিলীনতা, যার নজির অন্তত আমি দেখিনি। দ্বিতীয়টি হলো হৃদয়ের প্রশস্ততা ও বাস্তবপ্রিয়তা, যা কিনা আমি ময়দানের বড়-বড় কর্মী এবং কালের সক্রিয় ও বিশিষ্ট আলেম-রাজনৈতিক নেতাদের মাঝেও (এই স্তরের) দেখিনি। বিশেষ স্বভাবগত গঠন এবং সেই বিস্তৃত ও বিচিত্র

অধ্যয়ন ও পরিবেশ, যার মাঝে আমার মানসিক প্রতিপালন ও পরিগঠন হয়েছিল, তা এই সম্পর্কে আমাকে সহযোগিতা করেছে, যা কিনা দিন-দিন বেড়েই চলছিল যে, এই দৃষ্টি ও হৃদয়ের প্রশস্ততা ব্যতিরেকে আমার মতো মানুষদের জীবন চলতে পারে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি ছিল হযরতের অপার মমতা, যার জন্য মাতৃমমতার চেয়ে বড় আর কোনো উপমা হতে পারে না। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আসবে। হযরতের একটি সফর (১৯৪৬) লাখনৌ, রায়বেরেলির কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। এটি ছাড়াও হযরতের লাখনৌর আরও ছটি সফর হয়েছে। হযরত তাঁর লাখনৌ সফরের সময়, যেটি ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে হয়েছিল, ২৬ এপ্রিল আমাদের রায়বেরেলির বাড়িতে এসেছিলেন। একদিন তিনি হযরত শাহ ইলমুল্লাহ ও সাইয়িদ সাহেব (রহ.)-এর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সম্পূর্ণ ধারণা ও কল্পনার বাইরে আমাকে বললেন, 'আমি আপনাকে চার সেলসেলার সব কটিতে, বিশেষ করে হযরত সাইয়িদ সাহেব (রহ.)-এর সেলসেলায় এজাযত দিলাম।'

হযরত প্রথম দুটি সফরে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার মেহমানখানায় এবং পরের তিনটিতে কাচারি রোডে অবস্থিত তাবলীগি মারকাযে অবস্থান করেন (যেখানে আমি ও মাওলানা মানযূর নুমানি থাকতাম)। হযরত আমার দাওয়াতে লাখনৌ আসতেন। তারপর কদিন পর-পর আমিও রায়পুর যেতাম। তা আমাদের এই রূহানি সম্পর্ককে আরও বেশি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং হযরতের সুদৃষ্টি উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল।

হজের দ্বিতীয় সফর

১৩৬৮ হিজরির (১৯৪৯ সাল) ঘটনা। হযরত রায়পুরি (রহ.) দিল্লির কাসসাবপুরায় মাদরাসা সুবহানিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন। আমিও হযরতের খেদমতে হাজির ছিলাম। তখন একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমাকে হজের সময় পুনরায় হেজায যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো এবং তার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হলো। আমি ভোরের বায়ুসেবনের সময়টিতে হযরতের সঙ্গে ছিলাম। তখন বিষয়টি হযরতের কানে দিলাম এবং হযরতের মনোভাব বুঝতে চাইলাম। হযরত বললেন, আমি যদি বারণ করে দেই, তাহলে মেনে নিতে পারবেন তো? আমি বললাম, পারব হযরত! হযরত আমার মুখের দিকে তাকালেন। আলহামদুলিল্লাহ তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। আলোচনা এ পর্যন্তই শেষ।

১৩৬৯ হিজরির ১০ শাওয়াল (২৭ জুলাই ১৯৫০) রায়পুরের উদ্দেশে লাখনৌ থেকে সাহারানপুর গেলাম। ওখান থেকে রায়পুরগামী বাসে উঠলাম। পথে রায়পুর থেকে আসা একটা মোটরের সঙ্গে ক্রস হলো। দেখলাম, হযরত তাতে বসা। হযরতও আমাকে দেখলেন এবং গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও আমার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে গেলাম। হযরত আমাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। বললেন, আমরা হজে যাচ্ছি। তোমাকে পত্র লিখেছিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

সাহারানপুর পৌছে হযরত সবগুলো আইনি ধাপ, টিকা-ইঞ্জেকশন ইত্যাদি যেমন নিজেরগুলো সেরে নিলেন, তেমনি আমারগুলোও সারলেন। এই সফরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে কঠিন ছিল। হযরত শায়খুল হাদীছ তার সমাধান এভাবে করে দিলেন যে, তিনি তাঁর মরহুমা কন্যার (মৌলভী আহমাদ হাসান কান্ধলবির স্ত্রী) বদলি হজের জন্য আমাকে নির্বাচন করলেন, যিনি এই অল্প কদিন আগে মারা গেছেন। আমার অর্থের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সফরের সময় সম্ভবত জাহাজে অথবা হেজাযে কোনো একসময় হযরত বললেন, এই সফর আমি তোমার জন্য করেছি। হযরতের কথায় সফর মুলতবি করা এবং মনের উপর তার কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে না দেওয়ার এটি ছিল পুরস্কার। কামেল শায়েখগণ এ ধরনের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি এমন ক্ষেত্রে মনে আনুগত্য এবং নিজের ইচ্ছার উপর শায়খের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার তাওফীক ও হিম্মত দান করেছেন।

এ-বরকতময় সফরের বিস্তারিত বিবরণ হযরতের জীবনীতে স্থান পেয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি জরুরি কথা উল্লেখ করছি।

১৩৬৯ হিজরির ২০ যিকাদা (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫০) হযরতের সঙ্গে বোম্বাই থেকে ইসলামি জাহাজে রওনা হলাম। এ সফরে আমার চার প্রিয়ভাজন এই নিয়তে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল যে, হজের পর হেজাযে আরবদের মাঝে দাওয়াতি কাজের জন্য থেকে যাবে এবং আগে থেকে অবস্থানরত দুই নদবি আলেমের (মৌলভী মুহাম্মাদ মুঈনুল্লাহ সাহেব ও মৌলভী আবদুর রশীদ সাহেব) সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশিষ্ট শ্রেণী ও শিক্ষিত সমাজে হিন্দুস্তানের তাবলীগি কাজের পরিচয় প্রদান এবং আমাদের আরবি দাওয়াতি পুস্তিকাগুলো প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। তারা হলো মৌলভী আবদুল্লাহ সাহেব নদবি,

মৌলভী রেজওয়ান আলী নদবি, মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ তাহের মাযাহিরি মনসুরপুরি ও মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে নদবি।

জাহাজ নিয়মের বাইরে হাজী নিতে কিছু সময়ের জন্য মুকাল্লা নোঙর করল। শহর থেকে যেসব অফিসার জাহাজে এলেন, আমি আমার আরবি পুস্তিকাগুলো ওখানকার প্রধান বিচারপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়ার জন্য তাদের দায়িত্ব দিলাম। জাহাজ রওনা হওয়ার আগেই কয়েকজন সিপাই প্রধান বিচারপতির সীল-মোহরকৃত একটি পত্র নিয়ে এল, যাতে আমার এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে এবং আমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

হজ থেকে ফিরে আসার পরবর্তী সময়কার – যার বিস্তারিত বিবরণ জীবনীতে এসেছে – একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহলো, কাবাঘরের চাবি যাঁর কাছে থাকে, তিনি হলেন জনাব শীসি। শীসি সাহেব আপনা থেকেই আমাকে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানালেন এবং এই অনুমোদনও দিয়ে দিলেন যে, আমি যাদের সঙ্গে করে নিতে চাই, তারাও যেতে পারবে। একে আমি হযরতেরই একটি কারামাত মনে করি, যেমনটি না তার আগে কখনও ঘটেছে, না পরে বারবার হাজিরি দেওয়া সত্ত্বেও এই মর্যাদা আমার কপালে জুটেছে।

এ-সৌভাগ্য যে হযরত ও তাঁর সঙ্গীরা-ই অর্জন করেছে তা-ই নয়; বরং অন্য অনেক বন্ধু-সুহৃদও এ-মর্যাদা হাসিল করেছে। আমি যাকেই নিতে চেয়েছি, সে-ই অনুমতি পেয়ে গেছে এবং অতিশয় শান্তমনে কাবার অভ্যন্তরে নফল পড়েছে। অনেক পরিচিতজন, যারা বিষয়টি পরে জানতে পেরেছে, তারা অভিযোগ করল, আমরা তো বঞ্চিত রয়ে গেলাম! আমি মুহতারাম শীসি সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি দ্বিতীয়বার হারামের পুলিশের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করলেন এবং নিজেও এসে হাজির হলেন। আমরা হযরতের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করলাম। আমার জীবনে এটি সবচেয়ে বরকতময় দিন ছিল, যা না তার আগে কখনও এসেছিল, না পরে।

আরও দুটি ঘটনার কারণে এই ঘটনাটির গুরুত্ব ও দুর্লভতা বেড়ে যাচ্ছে। তাহলো, এই ঘটনার পর আরও দুবার সরকারিভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, রাবেতার সদস্যগণ (যাদের মাঝে আমিও ছিলাম) বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে যাবেন। কিন্তু সরকারের পুরোপুরি ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সেই সৌভাগ্য আমাদের নসিব হয়নি। একবার ১৯৬৪ সালে যথারীতি রাবেতার সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। তাঁদের বাইতুল্লাহর দরজার

সামনে বসানো হলো এবং সিঁড়ি লাগানো হলো। নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হলো। কিন্তু সিঁড়ি লাগানোমাত্র ওই সময় মাতাফ ও হারামে যে-লোকগুলো উপস্থিত ছিল, তারা এমনভাবে ভিড় জমাল যে, আমাদের এক-দুজন ব্যতীত – যারা সিঁড়ির কাছাকাছি ছিলেন এবং করিৎকর্মা ও প্রস্তুত ছিলেন – আর একজনও সিঁড়ির কাছে ঘেঁষতে পারেননি।

দ্বিতীয়টি ছিল একবার কাবাঘর ধোওয়ার সময় (যে কাজটি বাদশা ফয়সালকে তাঁর সরকারের লোকদের নিয়ে আঞ্জাম দেওয়ার কথা ছিল)। আমাদের (আমরা কাছেই হোটেল শুবরায় অবস্থানরত ছিলাম) কাছে আমন্ত্রণপত্র এল, আপনারা ইচ্ছা করলে কাবাগৃহ ধোওয়ার কাজে অংশ নিতে পারেন। আমি ও আমার সহকর্মী মাওলানা মনযূর নুমানি আরও কয়েকজন সহকর্মীসহ সৌভাগ্য মনে করে অত্যন্ত আনন্দের সাথে হারাম শরীফে প্রবেশ করলাম। কিন্তু জানতে পারলাম, ততক্ষণে বাইতুল্লাহর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে; এখন আর যাওয়ার সুযোগ নেই।

এ দুটি ঘটনাকে সামনে রেখে যদি আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই মর্যাদা আমার হযরতেরই বদৌলতে নসিব হয়েছিল, তাহলে ভুল হবে না।

এ-সফরে আমার অবস্থান ছিল হযরতের একেবারে সঙ্গে। পিছনে একজায়গায় আমি হযরতের মমতাকে মায়ের মমতার সঙ্গে তুলনা করেছি। এ-সফরে আমি তার বাস্তব নমুনা দেখেছি। নামাযের সময়গুলোতে হযরত হারাম শরীফের একটি তাঁবুতে থাকতেন। দুপুরের খাবারও সেখানেই খেতেন। আমি তাবলীগি সভা-সমাবেশ ও দেখা-সাক্ষাতের মাঝে এমন বিমগ্ন থাকতাম যে, বেশিরভাগ সময় খাওয়ার জন্য আসতে অনেক দেরি হয়ে যেত। এসে তাঁবুতে পা রাখতেই দেখতাম, হযরত বসে আছেন আর সম্মুখে রুমালে কতগুলো রুটি পেঁচিয়ে রাখা। আমাকে দেখে হযরত বলতেন, আলী মিয়া! তোমার খাওয়ারও হুঁশ নেই। এই দেখো; আমি তোমার জন্য চাপাতি নিয়ে বসে আছি। আমি জানি, খামিরি রুটি তোমাকে ক্ষতি করে।

মদীনা যাওয়ার সময় এলে হযরত আমাকে বললেন, ব্যস; হযরত শায়খের আতিথেয়তা ও ব্যবস্থাপনা শেষ হয়ে গেছে;[১] এবার তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। হযরত উড়োজাহাজে করে সফরের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আমার টিকিটও নিয়ে নিলেন। মদীনা তাইয়িবায়ও আমি হযরতেরই সঙ্গে মাদরাসা উলূমে শারইয়্যায় অবস্থান করেছি।

---

১. আমি পেছনে বলে এসেছি, আমার এই সফর ছিল হযরত শায়খুল হাদীছের মরহুমা কন্যার বদলি হজ।

১৩৭০ হিজরির ২০ মুহাররাম (২ নবেম্বর ১৯৫০) হযরত তাঁর রায়পুরি সফরসাথী ও খাদেমদের নিয়ে মুহাম্মাদি জাহাজে করে রওনা হলেন। আমার হেজাযে আরও কিছুদিন থাকার প্রয়োজন ছিল এবং খানিক মিশর সফরেরও নিয়ত ছিল। সে-কারণে ফিরতি সফরে আমি আর হযরতের সফরসঙ্গী হতে পারলাম না। আমরা জেদ্দার বিমানবন্দরে হযরতকে বিদায় জানালাম। পুরনো রীতি অনুযায়ী হযরত মোটরলাঞ্চে বসে জাহাজের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন, যা কিনা একটু পর-পর থামত। হযরতের এক খাদেম রাও ফজলুর রহমান খান রায়পুরি বর্ণনা করেন, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত চোখের সীমানা থেকে আড়াল হওনি, ততক্ষণ পর্যন্ত মোটরলাঞ্চে হযরত বারবার তোমাকে দেখছিলেন।

হেজাযে পশ্চিমা সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব

হেজায অবস্থানকালে আমি একটি বিষয় অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করেছি যে, পশ্চিমা সভ্যতা আরব দেশগুলোকে পুরোপুরি প্রভাবিত; বরং বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে। জাযিরাতুল আরব ও পবিত্র হেজাযের (যার মাধ্যমে দুনিয়া ঈমান ও ইসলামের আলো পেয়েছে এবং এমন একটি উম্মত আত্মপ্রকাশ করেছে, যারা কিনা নেতৃত্বের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল) শিক্ষিত যুবসমাজও যার থেকে বাদ নেই।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে হেজায থেকে আমি ভাইজানকে একটি পত্র লিখেছিলাম। তাতে আমি অবস্থার এই পরিবর্তন এবং আমার ব্যথা ও প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছিলাম। সেই পত্রটি পড়ে আজও বিস্ময়ে হতবাক হই যে, প্রকৃত অবস্থার এমন সঠিক ও বাস্তব চিত্র আমি কীভাবে অঙ্কন করলাম! অথচ ওখানে আমার বারবার যাওয়াও হয়নি, বেশিদিন থাকাও হয়নি। তার একটি নির্বাচিত অংশ আমি এখানে উপস্থাপন করছি :

> '১৯৪৭ সালে আমি প্রথমবার এখানে এসেছিলাম। এখন এলাম '৫০ সালে। এই তিন বছরে সুস্পষ্ট পরিবর্তন অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতা বাজার থেকে নিয়ে মানুষের দেমাগ পর্যন্ত ঝেঁকে বসেছে। জেদ্দা নামতেই এই পরিবর্তনের চিত্র চোখে পড়তে শুরু করল। পরিস্থিতি সম্পর্কে যে-পরিমাণ অবগতি লাভ করা যায়, এই বাস্তবতা তত পরিমাণ উন্মোচিত হতে থাকে। কেউ জানে না,

সুদর্শন আরবি পোশাকের তলে কত দেল ও দেমাগ খাঁটি পশ্চিমা হয়ে গেছে এবং কুরআনি ভাষা কী পরিমাণ পশ্চিমা চিন্তাধারা ও নিরেট বস্তুগত কল্পনার মাধ্যম হয়ে গেছে। অর্থের ধান্দা, বিত্তের পাহাড় গড়ার মানসিকতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। আরবরা এখন পশ্চিমা সভ্যতার ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে উন্নতি করা ব্যতীত জীবনের কল্পনা করতে পারে না। ইসলামি বিশ্বের কেবলা হলো পবিত্র মক্কা ও বাইতুল্লাহ আর ইসলামের কেন্দ্রভূমির কেবলা হলো এখন আমেরিকা। তার ক্রিয়া মহামারির মতো আকাশে ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মোকাবেলায় আমাদের অল্প কটি গ্রন্থ, কয়েকটি সাক্ষাত-মোলাকাত গুটিকতক জামাতের গাশত ও নড়চড় বিলকুল সেই রকম, যেমন সমুদ্রে ঢিল ছোড়ার ফলে হালকা একটা ঢেউ সৃষ্টি হয়। এদিকে নানাজনের সাথে সাক্ষাৎ, সভা-সমাবেশ ও গুটিকতক ব্যক্তিত্বের একাত্মতা ও সহানুভূতি থেকে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত তাদের অবস্থান অনুসন্ধানের চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

হেজাযি লেখক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক

হেজাযে বিশিষ্ট শ্রেণীগুলোর মধ্যে লেখক, সাহিত্যিক ও উচ্চশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত সম্পর্ক তৈরি হয়নি। আমি এমন একজন লোকের সন্ধানে ছিলাম, যিনি এই শ্রেণীগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং তার মাধ্যমে আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করব। তিনি আমরা বিদেশি লোকগুলোর ব্যাপারে তাদের মনে একটি সুধারণা তৈরি করে দেবেন। কারণ, তারা ভারতীয় ও পাকিস্তানি আলেম ও দাওয়াতের কর্মীদের তেমন একটা পাত্তা দিত না। ভাষা ও আধুনিক বর্ণনাধারা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা সব সময়ই একটা আড়াল তৈরি করে রেখেছে। আর এ যুগে যখন ভাষা-সাহিত্য আরও বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে, তখন এই পরদাটা আরও মোটা হয়ে গেছে।

এ লক্ষ্যে আমি ও মুফতী যাইনুল আবিদীন সাহেব – যিনি পাকিস্তানের তাবলীগি জামাতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন – একদিন সৌদি সরকারের ছাপাখানার সহকারী পরিচালক হাফেয সাইয়িদ মাহমুদ সাহেবের

কাছে গেলাম। সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে তার কিছুটা বংশগত সম্পর্ক ছিল। এই আত্মীয়তা ও নিজের দীনি চেতনার সুবাদে আমাদের সঙ্গে তার বেশ আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার কাছে আমরা আমাদের এই প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, আমি আপনাকে এমন একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দেব, যিনি এই জগতের চাবি। তিনি আমাকে শায়খ আহমাদ আবদুল গফুর আত্তার-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যিনি হেজাযের একজন প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক আলেম। আল্লাহপাকের শুকরিয়া যে, তিনি এই যিম্মাদারি মাথা পেতে বরণ করে নিলেন এবং কাছাকাছি একটি তারিখে বুস্তানে বুখারীতে – যেটি মক্কায় বড়-বড় সভা-সমাবেশের জায়গা ছিল – নিজের লেখক-সাহিত্যিক, রেডিও ও সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত বন্ধুদের দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন এবং আমাদেরও দাওয়াত করলেন। আমরা ওখানে পৌঁছে আরব পণ্ডিতবর্গ ও যুবক সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের একটি মজমা দেখতে পেলাম। আত্তার সাহেব তাদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং খাওয়ার পর একটি মজলিস শুরু হলো। সেই আরব সাহিত্যিকদের মাঝে যাদের নাম এক্ষণে আমার মনে আছে, তারা হলেন 'আল-হাজ্জ' পত্রিকার সম্পাদক ও সৌদি সরকারের শূরাসদস্য শায়খ সাঈদ আল-আমুদী, 'আল-মানহাল' পত্রিকার সম্পাদক শায়খ আবদুল কুদ্দুস আনসারি, সাহিত্যিক ও অর্থমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সাইয়িদ আলী হাসান ফাদআক, শিক্ষামন্ত্রণালয় ও রেডিওকর্মকর্তা সাইয়িদ মুহসিন আহমাদ বারদাম ও শায়খ হুসাইন আরব, যিনি পরে হজ ও আওকাফমন্ত্রী হয়েছিলেন। এরা সবাই উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।

সভাটি এভাবে শুরু হলো, যেমন কোনো ছাত্রের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথমত তারা অনুমান করতে চাইলেন, এই মেহমান আরবি ভাষাজ্ঞান ও সাধারণ অধ্যয়ন ও জানাশোনার ব্যাপারে কতটুকু পানিতে অবস্থান করছে। কখনও ডক্টর তাহা ইয়াসীন ও আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ এবং মিশরের নামকরা সাহিত্যিকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং আন্দাজ করা হচ্ছে, আমি এদের কোনো গ্রন্থ পড়েছি কি-না। কখনও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। কখনও পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। কখনও ধারণা নেওয়া হচ্ছে, আমি ইংরেজি জানি কি-না। তখন সেই শিক্ষা ও অধ্যয়নরীতির মূল্য আমার বুঝে এল, যা কিনা আমি হিন্দুস্তানে বসে অর্জন করেছিলাম। এতকাল তার মর্যাদা ও মূল্য আমার জানা ছিল না।

সৌদি রেডিওতে ভাষণ

এই মৌখিক পরীক্ষায় তারা আমাকে কত নম্বর দিয়েছেন, তা আমি জানতে পারিনি বটে; কিন্তু সেখান থেকে অবসর হয়ে তারা আমাকে বললেন, আপনি কি আমাদের সঙ্গে বিনোদনে যেতে পারেন? আমি সম্মতি দিলাম এবং তাদের সঙ্গে গাড়িতে চড়ে বসলাম। তারা আমাকে নিয়ে হঠাৎ একটি হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন। ওখানে আমাকে তারা অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও সৌদি রেডিওর পরিচালক শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর আস সাব্বান-এর কাছে নিয়ে গেলেন, যিনি চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য সে-সময় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর কাছে তাঁরা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আবেদন জানালেন, আমাকে যেন রেডিওতে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর-এর সাথে সাওলাতিয়া মাদরাসার পরিচালক মাওলানা মুহাম্মাদ সালীম সাহেব ইতিপূর্বে একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর সঙ্গে আমার আগেও সাক্ষাত হয়েছিল। ফলে তিনি আবেদনটি খুশি মনে মঞ্জুর করে নিলেন এবং রেডিওর পক্ষ থেকে আমাকে যথারীতি ভাষণদানের ফরমায়েশ করা হলো। আমি চিন্তা-ভাবনা করে بين العالم وجزيرة العرب শিরোনাম ঠিক করে নিলাম। আমার আশা ছিল, এই শিরোনামের আওতায় আমি আমার চিন্তাধারা অত্যন্ত যুৎসইভাবে ব্যক্ত করতে পারব এবং আমার হৃদয়ের কথা দুনিয়ার জবানে এবং পরে তার উত্তর জাযীরাতুল আরবের ভাষায় বলাব।

প্রথম ভাষণটির শিরোনাম ছিল من العالم الى جزيرة العرب। এই ভাষণে মানবজগত জাযীরাতুল আরবের সেসব অবদান ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করার পর – যেগুলো নবীয়ে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তার কাছে এসেছিল এবং সে একটি নতুন জীবন লাভ করেছিল – অভিযোগের ডালি খুলে বসে এবং নিজের আহত হৃদয়কে বের করে সামনে রেখে দেয় যে, এর পরও তার হেদায়াত ও নেতৃত্ব থেকে জাযীরাতুল আরব (যার আকাশে ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছিল) হাত গুটিয়ে নিল কেন? সে পরিষ্কার ভাষায় বলল, আমার তেলের প্রয়োজন নেই, যার দ্বারা আমাদের মেশিনগুলো চলছে। আমার ঈমানের সেই আলো ও উত্তাপ প্রয়োজন, যা একা তোমারই কাছে বিদ্যমান এবং যার দ্বারা দেল ও দেমাগ আলোকিত হয় ও জীবন লাভ করে। তারপর জাযীরাতুল আরবের পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হলো, যাতে ছিল কিছুটা তার ত্রুটির স্বীকারোক্তি, কিছুটা ওজরখাহি ও ওয়াদা।

এই দুটি ভাষণের আগে শায়খ আহমাদ আবদুল গফুর আত্তার-এর পরিচিতিমূলক ও ভূমিকাসুলভ ভাষণ ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! এই ভাষণগুলো অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শোনা হয় এবং যুবসমাজ ও রুচিবান লোকদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই সফল বৈঠক ও রেডিওর ভাষণগুলোর পর হেজাযের সাহিত্য অঙ্গনগুলোতে আমার বেশ পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তরুণ সাহিত্যিক ও লেখকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। কখনও আমি তাদের আমার ঠিকানায় দাওয়াত করতাম, কখনওবা তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মিশর সফর ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ

মিশর আরব বিশ্বের ইলমি ও ফিকরি মারকায

হেজাযের শিক্ষিত যুবসমাজ, সাহিত্যিক ও লেখকদের সঙ্গে মেলামেশার পর আমার কাছে প্রতীয়মান হলো, এরা সবাই মিশরি সাহিত্যিক ও ওখানকার বিদ্বান ও লেখকদের উপর নির্ভরশীল এবং আরবি সাহিত্য ও চিন্তা এমনকি ইসলাম বোঝার ক্ষেত্রেও তাদের ওস্তাদ মানে। তাদের কিছু লোকের মাঝে আমি ইসলামিয়াত ও আত্মবিশ্বাসের ঝলক পেয়েছি। অনুসন্ধানের পর জানতে পারলাম, এটি এখওয়ানের আন্দোলনের ফল। তাদের মধ্য থেকে কেউ-কেউ স্বীকারও করেছেন, যদি ইমাম হাসানুল বান্নার ব্যক্তিত্ব ও তাঁর দাওয়াতের সঙ্গে তাদের পরিচয় না ঘটত, তাহলে তারা নাস্তিকতার শিকার হয়ে গিয়েছিলেন এবং দীনের ভবিষ্যৎ ও মুসলমানদের পুনরুত্থান থেকে একদম নিরাশ হয়ে যেতেন।

হেজাযের এই দ্বিতীয়বারের অবস্থান দ্বারা – যার মেয়াদকাল ছিল চার মাস এবং যাতে শিক্ষিত যুবসমাজ, লেখক ও চিন্তাশীলদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বেশি সুযোগ ঘটেছে – আরব বিশ্বে মিশরের দীনি বিদ্যা ও আরবি সাহিত্যগত কেন্দ্রিকতা ও নেতৃত্বের বিষয়টি অনুমান করতে পারলাম। আরও জানতে পারলাম, রুগ্ন ও অসুস্থ চিন্তা, সাহিত্য, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লিটারেচার এবং তার মোকাবেলায় সুস্থ চিন্তা, সঠিক শিক্ষা ও চিন্তাগত নেতৃত্ব এই দুয়েরই কেন্দ্র ও উৎস হলো মিশর। যদি আরব বিশ্বে কোনো বস্তুর প্রসার ঘটানোর, বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার এবং তার মাঝে কোনো পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন করতে হয়, তাহলে তা মিশরেরই পথে সম্ভব। তখন মিশর সফরের গুরুত্ব ও উপকারিতার বিষয়টি আমার পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল এবং আমি তার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে ফেললাম।

কিন্তু এ নিঃস্ব মানুষটার কাছে তার কোনো উপকরণ ছিল না। হিন্দুস্তানে আমার যেসব বন্ধু-বান্ধব ও মুরুব্বীর কাছে পত্র লিখতাম, সেগুলোতে আমার এই মনোবাঞ্ছার কথা ফুটে উঠেছিল। আমার মুহতারাম ভাই সাহেব, হযরত

শায়খুল হাদীছ ও অন্য আরও কয়েকজন হৃদয়বান বন্ধুর অন্তরে জযবা পয়দা হলো যে, তাঁরা আমার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রত্যেকেই জবাবি পত্রে আমাকে সাহস জোগালেন এবং এত পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন যে, তা দ্বারা আমি দুজন সহকর্মীর সাথে পানির জাহাজে করে মিশর যেতে পারব এবং কিছু দিন সেখানে থাকতে পারব।

মিশরের মাটিতে

১২ রবিউছছানি ১৩৭০ হিজরি (২০ জানুয়ারি ১৯৫১) আমি স্নেহাস্পদ মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদবি ও মৌলভী আবদুর রশীদ নদবিকে নিয়ে এক ইতালীয় জাহাজে করে জেদ্দা থেকে সুইসের উদ্দেশে রওনা হলাম। এই সফরে আমি ডায়েরি লেখা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলাম। সফর শুরু হওয়ামাত্র সেই ডায়েরির প্রথম পাতায় যা কিছু লিখেছিলাম, তার দ্বারা সফরের পেক্ষাপট ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুমান করা যেতে পারে :

> 'জাযীরাতুল আরব! আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি; কিন্তু বিরক্ত হয়ে নয় এবং আজীবনের জন্যও নয়। এই সফরও তোমারই আত্মীয়তা এবং তোমারই সেই সেই প্রিয় পরিবারটির সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে, যারা রেড সী ও রোমসাগরের কূলে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তাদের কাছে তোমার সালাম পৌঁছাব আর পরিসংখ্যান নেব, তোমার থেকে আলাদা হওয়ার পর কালের অপনীতি তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে এবং দাওয়াত ও পয়গামের পবিত্র আমানতের সঙ্গে তারা কেমন ব্যবহার করেছে।'

কায়রোতে আমরা ছয় মাসের কিছু দিন কম সময় অবস্থান করি। এই সফরের পুরো রোজনামচা, সাক্ষাতগুলোর ধরন, বক্তৃতার সারমর্ম, বিভিন্ন মহলের সাথে সম্পর্কস্থাপন, দীনি দাওয়াত ও হিন্দুস্তানের পরিচিতির পুরো কাহিনী আমার مذكرات سائح في الشرق গ্রন্থে এসে পড়েছে, যার উর্দু তরজমা মৌলভী শামসুল হক নদবি 'শারকে আওসাত কী ডায়েরী' (মধ্যপ্রাচ্যের ডায়েরি) নামে লিখেছেন, যেটি পুস্তাকারে বাজারে এসেছে।

নাসেরি যুগের আগের মিশর

মিশরের এই সফর ও অবস্থান দাওয়াত, ইলম ও আরবি সাহিত্য সর্বদিক থেকেই অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। এটি সেই যুগ ছিল, যখন মিশর

তার সেই আসল আকৃতিতে বিদ্যমান ছিল, যা দীর্ঘকাল যাবত চলে আসছিল। মতপ্রকাশ, বক্তৃতা ও সাংবাদিকতার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তখন তুঙ্গে ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোও স্বাধীন ছিল। বিগত প্রজন্মের কতগুলো মূল্যবান মাথা এবং প্রাচীন আধুনিক শিক্ষার উন্নত কীর্তি বিদ্যমান ছিল। এমন বেশ কজন চিন্তাশীল, লেখক ও সাহিত্যিক জীবিত ও কর্মতৎপর ছিলেন, যারা বিশেষ ধারার অধিকারী ও পুরোপুরি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন এবং যাঁদের অনুসরণকে সিরিয়া, ইরাক, হেজায, নজদ ও দূরপ্রাচ্যের তরুণ সাহিত্যিকরা গর্বের ধন ও মূল্যবান সম্পদ মনে করত। তাঁদের মাঝে ডক্টর আহমাদ আমীন বেক, ডক্টর তাহা ইয়াসীন পাশা, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, ডক্টর মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল, তাওফীক আল-হাকীম, আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, মানসুর ফাহমি পাশা ও ফিকরি আবাযা পাশার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শীর্ষ আলেমদের মাঝে শায়খুল আযহার শায়খ আবদুল মজীদ সালীম, শায়খ মাহমুদ শালতুত, শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ, আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান বান্না সাআতি (ইমাম হাসান আল-বান্নার পিতা), শায়খ হামেদ আলফাকী, শায়খ আবদুল ওয়াহহাব বেক খাল্লাফ, শায়খ যাহেদ আল-কাওছারী, শায়খ মুহাম্মাদ আল-খাযির হুসাইন, শায়খ মুহাম্মাদ আল-লাতীফ দাররায, ডক্টর আবদুল্লাহ দাররায, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী ও শায়খ মুস্তফা সাবরী আফেন্দী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামি নেতাদের মধ্যে (যাঁদের মাঝে অনেকে আপন মাতৃভূমি ও বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন) মুফতী সাইয়িদ আমীন আল-হুসাইনি, প্রখ্যাত মুজাহিদ আমীর আবদুল করীম রায়ফী, সাইয়িদ মুবাশশির আত-তারাযী (তুর্কিস্তানি), আবদুর রহমান আযযাম পাশা (সেক্রেটারি জেনারেল আরব লীগ), জেনারেল সালেহ হারব পাশা (চেয়ারম্যান, আম জমিয়াতুশ শুববান আল-মুসলিমীন), আমীন মাহমুদ খাত্তাব (চেয়ারম্যান, আল-জমিয়াতুশশারইয়্যা), হুসাইন ইউসুফ (চেয়ারম্যান, শাবাব সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ) ও মুহাম্মাদ আলী আলুবা পাশা (প্রাক্তন আওকাফমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হিযবুল আহরার) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাদের কথা ভুলবার মতো নয়।

ইসলামি ধারার সাহিত্যিক ও দাঈদের মাঝে ওস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন আল-খাতীব, সাইয়িদ কুতুব, মুহাম্মাদ আহমাদ বেক আল-গামরাবী, মাহমুদ

মুহাম্মাদ শাকের, আহমাদ আশ-শারবাসী, মুহাম্মাদ আল-গাযযালী, ফরীদ ওয়াজদী, সাঈদ রমযান ও সালেহ আল-আছমাবী (সম্পাদক, আদ্দাওয়া) তালিকার শীর্ষে রয়েছেন। মিশরের নতুন প্রজন্মের অভিভাবক এবং আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কারের দাঈদের মাঝে একা আহমাদ লুতফী আস-সাইয়িদ পাশা, প্রেসিডেন্ট মাজমা ফুয়াদ আল-আউয়াল-এর নামই যথেষ্ট।

সংগঠনের মধ্যে আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন, শাবাব সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ, জমিয়াতুশ-শুব্বানুল মুসলিমীন, মেসের আল-ফাতাত, জমিয়াতু আনসারিস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যা, আল-জমিয়াতুশশারইয়্যা, জমিয়াতুল আশীরাতুল মুহাম্মাদিয়্যা, জমিয়াতু মাকারিমিল আখলাক কর্মতৎপর ছিল। যুবসমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝে গ্রহণযোগ্য পত্রিকাগুলোর মাঝে ডক্টর আহমাদ আমীন-এর আছছাকাফা ও ওস্তাদ আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত-এর আর-রিসালা একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যজগতের মর্যাদা রাখত এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করত। এটি শাহ ফারুকের আমল ছিল। নৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল বটে, যা কিনা পারিবারিক শাসন ও বিত্তশালী ও স্বাধীনচেতা শাসকদের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সেকালে মিশরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, দীন ও আলেম-সমাজের মর্যাদা, আল-আযহারের প্রভাব, জনমনে সরলতা, ইসলামি চেতনা ও ভ্রাতৃত্বের ঝলক চোখে পড়ত এবং দেশে ইসলামি ও আরবি চরিত্র, উদারতা, প্রেম-ভালবাসা ও আবেগ-উচ্ছ্বাস পাওয়া যেত, যা কিনা দীর্ঘকাল যাবত মিশরের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চলে আসছিল।[১]

তখনও পর্যন্ত মিশরে নাসেরি আমলের ঝড় শুরু হয়নি, যার ফলে শিক্ষা, সাহিত্য, ইসলামি চিন্তা ও স্বাধীন রাজনীতির সবুজ-সতেজ বৃক্ষ পত্র-পল্লব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল এবং গোটা দেশের উপর বিপ্লবের এমন একটা ঝাড়া-মোছার কাজ হয়ে গেল, যার ফলে ধুলা-বালি ছাড়া কোথাও জীবন ও প্রাণবন্ততার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। মহান আল্লাহর হেকমতই বলতে হবে যে, তিনি আরব জাতীয়তা ও শিক্ষাগত সমাজতন্ত্রের একটা ঝড়োহাওয়া দ্বারা (যেটি ১৯৬০-৬১ সালে দিগন্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং গোটা আরব বিশ্বকে নিজের আক্রমণে আওতায় নিয়ে নিয়েছিল) কয়েক বছর আগে আমাকে মিশর, সুদান ও সিরিয়া ভ্রমণ ও সেই দেশগুলোতে কিছু দিন থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল।

---

১. মিশরে ১৯৫২ সালে সেনাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং মুহাম্মাদ নাজীব ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে জামাল আবদুন নাসের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

শিক্ষা ও সাহিত্যের অঙ্গনগুলোতে পরিচিতি ও মতবিনিময়

কায়রো পৌঁছে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব বলিয়াবি – যিনি একটি দাওয়াতি কর্মসূচিতে সুদান গিয়েছিলেন – এসে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। আমরা কয়েকটা দিন আল-আতাবাতুল খাযরার আল-বারলিমান হোটেলে অবস্থান করি। তারপর আমরা একটি সংগঠনের দফতরে – একটি মানি একচেঞ্জ মার্কেটের দোতলায় যার অবস্থান ছিল – গিয়ে উঠলাম। কায়রোর এই ঝঞ্ঝাট ও কোলাহলপূর্ণ শহরে আমরা কয়েকটা অখ্যাত-অপরিচিত যুবকের কাছে এমন কিছু ছিল না, যা ওখানকার শিক্ষা, সাহিত্য ও দাওয়াতি মহলগুলোকে আমাদের প্রতি মনোযোগী করে তুলবে। আমি এই দলটির মুখপাত্র ৩৬-৩৭ বছরের এক ক্ষীণকায় যুবক। গায়ে হিন্দুস্তানি পোশাক। না আযহারের অনুরূপ আলেমানা বেশ, না আধুনিক শিক্ষিত ও বিত্তশালী 'আফেন্দী'দের স্যুট-বুট, তুর্কি টুপি। আর থাকার জায়গাটাও নিলাম বড় কোনো হোটেলের পরিবর্তে (যা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মেহমানদের সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রমাণবহ ও মাপকাঠি) একটি ইসলামি সংগঠনের সাধারণ অফিসে, যেখানে না আছে আগন্তুকদের স্বাগত জানাতে কোনো কক্ষ, না খাওয়া ও শোওয়ার জন্য আলাদা কোনো কামরা, না প্রয়োজনীয় কোনো ফার্নিচার। অবস্থাটা পুরোপুরিই এমন ছিল যে, আমরা যদি কায়রোতে কয়েক মাস কাটিয়ে নিজেরা ওখানকার শিক্ষা ও সাহিত্যের পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়ে ফিরে আসতাম, তাহলে কারও কানেরও খবর হতো না। কারণ, নওবতখানায় তোতার বুলি শোনে কে?

কিন্তু মহান আল্লাহ আগে থেকেই আমাদের এই অবস্থান থেকে উপকৃত হওয়ার সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। প্রথম বিষয়টি হলো, আমাদের ওখানে পৌঁছার আগেই আমার লিখিত ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল?) গ্রন্থটি শিক্ষাবিদ, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামি দাওয়াতের মহলগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিল এবং চমৎকার একটি স্থান তৈরি করে নিয়েছিল। এটি আমার জন্য একটি ভিজিটিং কার্ড ও একটি পরিচিতির মর্যাদা রাখত। অধিকাংশ স্থানেই শুধু আমি ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -এর লেখক পরিচয়টুকুই যথেষ্ট হতো। অপরদিকে বিভিন্ন সভা-সমবেশে ভাষণ-বক্তৃতার এমন ধারা শুরু হয়ে গেল, যার ফলে মিশরের তরুণ ও নতুন-পুরাতন মহলগুলোতে শুধু যে আমি পরিচিতই হয়ে উঠলাম, তা-ই নয় – আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হলাম এবং আমার কথায় ওজন তৈরি হয়ে গেল।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও নিবন্ধ

এই ধারাবাহিকতায় দারুশশুব্বান আল-মুসলিমীন (মিশরের সর্ববৃহৎ ইসলামি প্লাটফর্ম)-এর আবদুল হামীদ সাঈদ হলে আমার বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এখানে আমি العالم على مفترق الطرق (দোরাস্তার উপর দাঁড়িয়ে বিশ্ব) নামে ভাষণ প্রদান করি। এই সমাবেশে জামেয়া আযহার-এর বেশ কজন শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং মিশরের একাধিক চিন্তাবিদ ও লেখক উপস্থিত ছিলেন। ভাষণটি মিশরের সাধারণ রীতি অনুযায়ী আগে থেকে লিখিত ও প্রস্তুতকৃত ছিল না – ছিল উপস্থিত ও তাৎক্ষণিক, যা কিনা মিশরের লোকদের জন্য একজন অনারব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। ভাষণটি আমার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে (যেমনটি আমি 'মুযাক্কিরাত'-এ উল্লেখ করেছি) অতন্ত সফল ও মানসম্পন্ন ছিল না। কিন্তু মিশরের আলেম ও যুবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। ভাষণটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। আমার এই ভাষণের পরে জামেয়া আযহার-এর এক ওস্তাদ শায়খ আহমাদ আশ-শারবাসী, লেখক ও সাহিত্যিক আবদুল মুতাআল আস-সায়ীদী, এখওয়ানুল মুসলমীন-এর লেখক ও মুখপাত্র শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযযালী ও আরেক লেখক ওস্তাদ আবদুল মুনঈম খাল্লাফ আপন-আপন ভাষণে এর চমৎকার পর্যালোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় আয়োজনটি এই হলো যে, জামইয়াতুশশুব্বান আল-মুসলিমীন-এর প্রধান আল-লিওয়া সালিহ হারব পাশা আমার জন্য একটি সংবর্ধনা ও পরিচিতিসভার আয়োজন করেন। সেখানে বেশ কজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমীর আবদুল করীম খাত্তাবী, মিশর সরকারের সাবেক মুফতী শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ, জামেয়া আযহার-এর দীনি শাখার পরিচালক শায়খ আবদুল লতীফ দাররায ও জমিয়তে ওলামায়ে আযহার-এর প্রধান শায়খ মুহাম্মাদ আশ-শারবীনী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

এই সমাবেশে আমি হিন্দুস্তানের সংস্কারক ব্যক্তিবর্গ, দাওয়াতি কর্ম ও তার বিভিন্ন স্তর ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করি এবং তাকে আমার দেশের একটি বার্তা হিসেবে মিশরের আলেমদের সম্মুখে উপস্থাপন করে বলি, আমি যদি আপনাদের সম্মুখে আরব বিশ্বেরই কোনো বিষয় উপস্থাপন করি, তা হলে হয়ত আপনার বলবেন, এ তো আমাদেরই সম্পদ আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। সেজন্য আমি ইসলামের ইতিহাস, দীন ও ইসলামের খেদমতের সেই অধ্যায়টি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম, যার উপর হয়ত আজও আপনাদের চোখে পড়েনি। এই নিবন্ধটি আমার কায়রো

অবস্থানকালেই الدعوة الإسلامية وتطوراتها في الهند নামে প্রকাশিত হয় পাঠকসমাজে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

এই দুটি জায়গা ব্যতীত আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করি। একটি 'ইকবালের কাব্যচর্চা ও পয়গাম' নামে মিশরের ঐতিহাসিক ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম-এ। অপরটি 'ইকবালের পরিপূর্ণ মানুষ' শিরোনামে জামেয়া ফুয়াদ আল-আউয়াল (কায়রো ইউনিভার্সিটি)-এ। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ছাড়াও ওখানকার প্রায় সবকটি সংগঠন-সংস্থা, দাওয়াতি মারকায, শাবাব সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ, জামইয়্যাতু আনসারিস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যা, আল-জামইয়াতুশ শারইয়্যাহ, জামইয়াতুল আশীরাতিল মুহাম্মাদিয়্যা, জামইয়্যাতুল আখলাক ও আর-রাবিতাতুল ইসলামিয়্যায় ভাষণ প্রদান করি। এর ফলে এসব সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর কর্ণধারদের পরিচয় লাভ করি, তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগের সূত্র তৈরি হয়।

ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাত-যোগাযোগ ও অঞ্চলভিত্তিক সফর

সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জামেয়া আযহার-এর ছাত্ররাও – যারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলো থেকে এসে এখানে সমবেত হয়েছে এবং আযহার-এর ছাত্রাবাস ও হোটেলগুলোতে অবস্থানরত ছিল – আমার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল এবং আমি বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করি।

এটি একটি বৃহৎ মানবভাণ্ডার, যারা কিনা আযহার-এর নামে এবং তার দীনি ও ইলমি আন্তর্জাতিক খ্যাতির সুবাদে কায়রো এসে জড়ো হয়েছে। এর দ্বারা শুধু আফ্রিকা মহাদেশেই নয় (যেখানকার ছাত্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল) বরং গোটা আরব ও ইসলামি বিশ্বেরও বড় একটি অংশে মুসলমানদের সংশোধন ও দীনি শিক্ষা, চরিত্রগঠন ও নির্ভুল ইসলামি নেতৃত্বের কাজ নেওয়া যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তাদের মানসিক প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন ও নেতৃত্বের যোগ্যতা তৈরির কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। ছাত্রাবাস ও হোটেলগুলোতে এবং খোদ আযহার-এ তাদের একথা বলবার মতো কেউ নেই যে, তোমরা এই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বন করলে বেশি-বেশি উপকৃত হতে পারবে, আপন-আপন দেশে গিয়ে তোমাদের এই কাজগুলো করতে হবে এবং সেখানে গিয়ে তোমাদের যেসব সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, এখানে থাকতেই তার জন্য তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। তারা স্বাধীনভাবে সময় কাটায়, চলাফেরা করে। এমনকি চাইলে সবকে না বসলেও

কোনো সমস্যা নেই। শহরের যেকোনো বিনোদন অনুষ্ঠান, যেকোনো আড্ডা ও ক্ষতিকর আসরে অংশগ্রহণ করা এবং সেখানকার পরিস্থিতি ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান।

আমি তৎকালের শায়খুল আযহার শায়খ আবদুল মজীদ সালীম-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করি এবং তাঁকে কিছু পরামর্শ প্রদান করি। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রস্তাবনাটি লিখিত আকারে আমাকে দিন। তিনি রইসুল বা'ছাত শায়খ মাহমুদ শালতুতকে জরুরি নির্দেশনা দিলেন, যেন আমার থেকে তিনি লেখাটি নিয়ে নেন এবং বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। আমি প্রস্তাবনা তৈরি করে শায়খ শালতুত-এর হাতে হস্তান্তর করেছি। কিন্তু জানি না, তার ফল কী ফলেছে।

আযহার-এর ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে তুরস্কের ছাত্রদের সঙ্গে – যারা আতাতুর্ক-এর পর এ-ই প্রথমবার দীনি শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে এসেছে এবং বেশিরভাগই তারা হোটেল বাগদাদে থাকত – আমার যোগাযোগ অব্যাহত রইল। তাদের মাঝে আমি একাধিক ভাষণ প্রদান করেছি। তাদের মাঝে বেশ কটি যুবক খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ মনে হলো। তাদের অনেকে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং এখন তারা তুরস্কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দীনি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

তাদের ছাড়াও সিরীয়, ইন্দোনেশীয় ও অস্ট্রেলীয় ছাত্রদের মাঝেও আমি বেশ কটি ভাষণ প্রদান করি। আযহার-এর কুল্লিয়াতুশশরীয়া ও কুল্লিয়াতুদ্দীন-এর ছাত্ররা আমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে ফেলে। তাদের আবাসিক হলে আমার বারবারই যাওয়া হয়েছে এবং তারাও আমার কাছে অবলীলায় বহুবার আসা-যাওয়া করতে থাকে।[১]

এসব সংস্থা-সংগঠন ছাড়াও এখওয়ান (যার স্বতন্ত্র আলোচনা সামনে আসবে) আমার অনেকগুলো সফরের কর্মসূচি তৈরি করে। এই কর্মসূচিতে তাদের বিশেষ মুখপাত্র ও দাঈ শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযযালী

---

১. তাদের মাঝে একজন ছাত্র ছিল ইউসুফ আল-কারজাবী, যে কিনা এখন আল্লামা ডক্টর ইউসুফ আল-কারজাবী নামে পরিচিত। এখন তিনি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়াতুশশরীয়ার প্রিন্সিপ্যাল ও 'ফিকহুয যাকাত'-এর বিখ্যাত লেখক। আরেকজন ছিল আবদুল্লাহ আল-আকীল, যে কিনা এখন কুয়েতের আল-আওকাফ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা।

বাধ্যতামূলকভাবে আমার সঙ্গে থাকতেন। এই ধারাবাহিকতায় আল-কানাতিরুল খায়রিয়্যাহ্, তানতা, হাম্মুল, হুলওয়ান, সানতারিস, আল-মাহাল্লাতুল কুবরা, নাকলা, আযীযিয়া, কাবিসনা ও নাবুরদায় দাওয়াতি ও তাবলীগি সফর হয়। আল-মাহাল্লাতুল কুবরায় – যেটি মিশরের সর্ববৃহৎ শিল্পনগরী – আমরা নাবুরদার জন্য একটি জামাতও বের করেছি।

আমার মরহুম ভাইজানের ইসলামি বিশ্বের উপর ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁর পড়াশোনাও ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। হৃদয়টা তাঁর ইসলামের দাওয়াত ও সমুন্নতির চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। ছাত্রজীবনে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত তাঁর সাবজেক্ট ছিল ভূগোল। সেই সুবাদে ভূগোল সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা ছিল। আর ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও আগ্রহে তিনি জাযিরাতুল আরব ও ইসলামি দেশগুলোর ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেসব অঞ্চলে ইসলামের পুনর্জাগরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। লাখনৌতে বসে তিনি আমাকে একের-পর-এক পত্র লিখছিলেন, যাতে আমার মাঝে মিশরের দাওয়াত ও নেতৃত্বসুলভ গুরুত্ব ও আফ্রিকায় দাওয়াতের বিস্তৃত ময়দান বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং আমি চেষ্টা করি, যেন মিশরের দীনদার শ্রেণিটি আফ্রিকায় দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব বরণ করে নেয়। তাঁর সেসব পত্রের একটি নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরলাম :

> 'আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আফ্রিকাকে ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত করে দেন এবং তোমাকে তার উসিলা বানিয়ে আপন শান অনুযায়ী বিনিময় দান করেন। অনেকগুলো দেশ এমন আছে, যেখানে প্রাচীন যুগ থেকেই সভ্যতা চলে আসছে। যেমন–হিন্দুস্তান। এমন দেশগুলোতে অমুসলিমদের অহমিকা সত্য গ্রহণের পথে বড় বাধা। আফ্রিকায় মিশর ব্যতীত অন্য সবগুলো রাষ্ট্র আজীবনই সভ্যতাশূন্য এবং এখনও পর্যন্ত তার বড় একটি অংশ একদম প্রাথমিক অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং ধর্মীয় সভ্যতার সাথে একেবারেই অপরিচিত। যেন গোটা মহাদেশটাই একটা সাদা পাত। যুক্তি বলছে, সত্যগ্রহণে তাদের মাঝে এমন যোগ্যতা আছে, যেমনটি আরব জাহেলিয়াত, বর্বর ও তুর্কিদের মাঝে ছিল। মহান আল্লাহ তোমার প্রচেষ্টাগুলো কবুল করে নিন এবং

আফ্রিকাবাসীর হৃদয়গুলোকে সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। মিশর হলো আফ্রিকার দ্বার। মিশরবাসী যদি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায় এবং আপন দেশে বসেও প্রতিটি মওকা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে এবং পার্শ্ববর্তী অমুসলিম দেশগুলোতে তাবলীগের জন্য বেরিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়, তাহলে ইনশআল্লাহ একদিন গোটা আফ্রিকা ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে।'

'শোনো হে মিশর!'

কায়রো পৌঁছার দিনকতক পরই আমি অনুভব করলাম, মিশরে আমাকে এমনভাবে কথা বলতে হবে, যেন তার মর্যাদা ও পয়গামের কথা মনে এসে পড়ে এবং তার অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমি তো আরব বিশ্বে; বরং ইসলামি বিশ্বে নেতৃত্বসুলভ ভূমিকা পালন করতে পারি। পাশ্চাত্য থেকে আমি কী নিতে পারি এবং তার বিনিময়ে পাশ্চাত্যকে কী দিতে হবে, যার ফলে সে জীবনের নতুন পথের সন্ধান পাবে এবং সে সেই পঙ্কিলতা থেকে বেরিয়ে আসবে, যার মধ্যে সে ধসে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মিশরকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। এই কাজটি একা মিশরই আঞ্জাম দিতে পারে, যে কিনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মোহনায় অবস্থান করছে এবং দুটি সভ্যতা এসে একটি অপরটিকে জড়িয়ে ধরছে। তাছাড়া এক্ষণে একটি চিন্তানৈতিক সুয়েজখালের প্রয়োজন, যে কিনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে সমতামূলক বিনিময়ের মাধ্যম হবে। প্রাচ্যের ভালো-ভালো জিনিসগুলো (যার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হলো ইসলামের পয়গাম) পাশ্চাত্যকে দেবে আর পাশ্চাত্য থেকে সেই জিনিসগুলো নেবে, যেগুলোতে তারা সবার অগ্রগামী। অর্থাৎ প্রযুক্তি, আধুনিক বিদ্যা ও শিল্প।

আমি এ লক্ষ্যে একটি নিবন্ধ লেখা শুরু করলাম। তাতে তথ্য-উপাত্তের এমন আনাগোনা অনুভব করলাম, যেমনটি অতীতে আমি কমই অনুভব করেছি। তাতে শুরুতে আমি পূর্ণ উদারতার সঙ্গে মিশরের শিক্ষা ও ধর্মীয় সেবা, প্রচার-প্রসারের বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ, শিক্ষা ও সাহিত্যের জয়, জামেয়া আযহার-এর শানদার ইতিহাস, ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামপ্রচারে তার কীর্তির স্বীকৃতি প্রদান করলাম। তারপর বললাম, মিশর! তোমার দুটি হাত আছে। এক হাতে তুমি উপকারী জিনিসগুলো নাও আর অপর হাতে সঞ্জীবনী দ্বারা

পাশ্চাত্যের আঁচল ভরে দাও। তবে এই নববী কৌশল সবসময় মনে রেখো যে, 'উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম'।

তারপর আমি সেই দুর্বলতাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে, যেগুলো বিগত শাসনামলে লাগামহীন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সাংবাদিকতার ফলে জন্ম নিয়েছিল মিশরকে পৌরুষত্বের গুণাবলি ও ইসলামি চরিত্র অবলম্বন এবং সেই বিষয়গুলো থেকে নিজেদের সুরক্ষার আহ্বান জানিয়েছি, যেগুলো বিগত জাতিগুলোর পতন ও অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। তারপর বলেছি, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পৃথিবীর সুবিশাল একটি মহাদেশ (আফ্রিকা) নির্বাচন করেছেন। কাজেই এখানে তাকে দাঈ ও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা আবশ্যক, যেখানকার বহু অঞ্চলে এখনও মূর্তিপূজা ও জাহিলি বোধ-বিশ্বাস বিদ্যমান। কিন্তু আজও বহু জাতির হৃদয় সাদা পাতের মতো, যেগুলোর উপর কোনো কষ্ট ব্যতিরেকেই চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব।

এই নিবন্ধটি – যেটি আমি রাতের বৃহৎ অংশ এবং সকালের কিছু সময় ধরে বসে প্রস্তুত করেছি – মিশরের প্রচারবহুল পত্রিকা 'আর-রিসালা'য় প্রকাশিত হয়। দিনকতক পর আমি তাকে একটি পুস্তিকার আকারে মিশরেই اسمعي يا مصر! (শোনো হে মিশর!) শিরোনামে প্রকাশ করেছি। বের হওয়ার সাথে-সাথে পুস্তিকাটি হাতে-হাতে চলে যায় এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পাঠ করা হয়। তার অল্প কদিন পরই সাইয়িদ কুতুবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, আমি আপনার اسمعي يا مصر! পুস্তিকাটি পড়েছি। আল্লাহ্ করুন, মিশর যদি আপনার আহ্বান শুনত!

আরও কয়েকটি পুস্তিকা

এটি ছাড়া আমার আরও তিনটি পুস্তিকা সে-সময় প্রকাশিত হয়। একটি হলো المد والجزر في تاريخ الاسلام দ্বিতীয়টি شاعر الاسلام الدكتور محمد اقبال অপরটি হলো সৌদি রেডিওতে প্রদত্ত দুটি ভাষণের সমষ্টি بين العالم وجزيرة العرب এই পুস্তিকাগুলোর মাধ্যমে – যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকদের সামনে পেশ করা হয়েছিল – আমার চিন্তাধারা প্রচার পেয়েছিল এবং আরব বিশ্বের বিদ্বান ও সাহিত্য মহলে আমি পরিচিত হয়েছিলাম।

বিশেষ যোগাযোগ

মিশরের নামকরা সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে ডক্টর তাহা হুসাইন পাশা (যিনি সে-সময় শিক্ষামন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন এবং বেশিরভাগ সময় বিদেশ

সফরে থাকতেন) আর ডক্টর মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকেল (যার সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়ার কারণ এই মুহূর্তে মনে নেই) ব্যতীত প্রায় সব কজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং এদের অনেকেরই আমার সমাবেশগুলোতে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছিল, যার আলোচনা উপরে করেছি। ঘটনাক্রমে তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ও যোগাযোগ হয় ডক্টর আহমাদ আমীন বেক-এর সঙ্গে, যিনি আমার ماذا خسر العالم গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। আলেমদের মধ্য থেকে শায়খ হাসনাইন মুহাম্মাদ মাখলূফ ও শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের-এর সঙ্গে, নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে আল-লিওয়া সালিহ হারব পাশা ও মুফতী আমীন আল-হুসাইনীর সঙ্গে, শিক্ষকদের মধ্য থেকে ডক্টর মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা (শিক্ষক, কুল্লিয়াতু উসুলুদ্দীন) ও ডক্টর আহমাদ আশশারবাসীর সঙ্গে, সংগঠনের মধ্য থেকে আল-ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও তার তরুণ নেতা ও দাঈদের সঙ্গে।

মিশরের 'এখওয়ানুল মুসলিমীন' ও তার সঙ্গে সম্পর্ক-যোগাযোগ

যখন মিশর সফরের প্রোগ্রাম হলো, তখন আমার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, আমি এখওানের আন্দোলন অধ্যয়ন করব এবং তার সম্পর্কে সরাসরি জানার চেষ্টা করব। শায়খের পুরাতন বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত, তাঁর হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের সঙ্গে দেখা করব এবং এই মহান দাওয়াতের মূলনীতি ও তার সফলতার কারণগুলো অবহিত হব। ১৯৪৯ সালে শায়খের শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে গেল। কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে, সে-সময় শায়খের পুরাতন সহকর্মীবৃন্দ ও তাঁর শিষ্য-বন্ধুদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই জীবিত ছিলেন। আমার আরবি গ্রন্থ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين যেটি আমার মিশর সফরের অল্প কদিন আগে প্রকাশ পেয়েছিল, এখওয়ানের মহলে ব্যাপকহারে পড়া হয় এবং এখওয়ান তাকে পরম উদারতার সঙ্গে তাদের বিশেষ তাবলীগি লিটারেচারের তালিকায় যুক্ত করে নেয়। এই গ্রন্থটি আমার পরিচিতির বিশেষ মাধ্যম ছিল। তদুপরি একজন ভারতীয় মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও একটি খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এখওয়ানের জন্য (যে কিনা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও পরিচিতি-সহযোগিতার সর্ববৃহৎ দাঈ) আমার প্রতি আকর্ষণের অনেক বড় কারণ ছিল। শায়খ সম্পর্কে আমার ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত জানা-শোনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় ছিল তাঁরই পিতা শায়খ আহমাদ আবদুর রহমান আল-বান্না, যিনি অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর

গৌরবময় সন্তানের ব্যাপারে সমস্ত জরুরি ও খুঁটিনাটি তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছেন। তা ছাড়া শায়খের সহপাঠী, সহকর্মী ও এখওয়ানের মুরুব্বী ওস্তাদ বাহী আল-খাওলী (তাযকেরাতুদ্দুআত-এর লেখক) এই অধমের বিশেষ বন্ধুদের একজন ছিলেন। তিনি একজন বন্ধু, সহকর্মী, প্রত্যক্ষদর্শী ও সমসাময়িক ব্যক্তি হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়া আমাকে শুনিয়েছেন।

এ দু-বুযুর্গ ছাড়া আরও এমন কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়, যারা শায়খের বিশেষ আস্থাভাজন, সেক্রেটারী ও ডান হাত ছিল। যেমন– আদ্দাওয়ার সম্পাদক ওস্তাদ সালেহ্ উছমাবী, হাইকোর্টের বিচারপতি ওস্তাদ মুনীর দাল্লা, ওস্তাদ আবদুল হাকীম আবিদীন, ওস্তাদ সাঈদ রমজান, ওস্তাদ ফরীদ আবদুল খালেক। এদের থেকেও আমি শায়খের জীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা দিক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করেছি। আমার অনুভূতি হলো, এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের পর এখন আর আমি শায়খের সাক্ষাৎ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত নই। এদের মাধ্যমেই আমার শায়খকে অনেকখানি দেখা হয়ে গেছে।

এদের থেকে আমি যা কিছু শুনেছি এবং খোদ শায়খের যেসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখেছি, তাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন, আল্লাহ যাঁদের কোনো আন্দোলন ও দাওয়াতি মিশন চালাতে ও কোনো যুগে ইসলামি বিপ্লব তৈরি করার জন্য সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে নেতৃত্বের বিস্তৃত ও নানামুখী যোগ্যতা দান করেন, আলোকোজ্জ্বল মস্তিষ্ক, প্রেমময় ও দরদী হৃদয়, সাহিত্যপূর্ণ ভাষা, হৃদয়জয়ী চরিত্র, মনোহারী ব্যক্তিত্ব এসব ছিল তাঁর সৃষ্টিগত উপাদানের অংশ। আমি যখন ইকবালের এই কবিতাটি পাঠ করি, তখন অবলীলায় চোখের সামনে শায়খ হাসানুল বান্নার ব্যক্তিত্ব ভেসে ওঠে এবং প্রতীয়মান হয়, ইকবাল তাঁকে দেখেই বলেছিলেন–

نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز
یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لئے

'দৃষ্টি উন্নত, কথা মনোহারী, হৃদয় চিত্তাকর্ষক। এটিই হলো
আমীরের সফরের পাথেয়।'

দুর্ভাগ্যবশত আমার মিশর সফরের সময়টায় এখওয়ানের আন্দোলন নিষিদ্ধ ছিল এবং তারা কোনো সভা-সমাবেশ করতে পারছিল না। কিন্তু

এখওয়ান নেতাদের আমার প্রতি যে-আস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তার বদৌলতে তাদের বিশেষ-বিশেষ সভাগুলোতে আমার অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছে। আমি তাদের পরিস্থিতি ও চিন্তাধারার বিবরণ শোনার এবং নিজের ক্ষুদ্র চিন্তাধারা পেশ করার মওকা পেয়েছি। এক মজলিসে – যেখানে এখওয়ানের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন – আমাকে যথারীতি আমার চিন্তাধারা উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়। সেদিন আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছি, তারা তাকে এতই মূল্যায়ন করেন যে, আমার বক্তৃতাটি তারা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করে সংগঠনের সকল নেতা-কর্মীর হাতে-হাতে পৌঁছিয়ে দেন। সংগঠনের কার্যক্রম পুনর্বার নিষিদ্ধ হওয়ার আগে-আগে তার তিনটি এডিশন নিঃশেষ হয়ে যায়। সেই পুস্তিকাটির নাম اريد ان اتحدث الى الاخوان (আমি এখওয়ানের সঙ্গে কথা বলতে চাই)। এতখানি উদারতা অন্য কোনো দীনি ও রাজনৈতিক সংগঠনের আছে কিনা আমার জানা নেই।

সে-সময়ে আমার শায়খ মুহাম্মাদ আল-গাযযালীর (যিনি এখনওয়ানি লিটারেচারের সবচেয়ে বড় লেখক) সঙ্গে মিশরের পল্লী অঞ্চলগুলোতে বারবার যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। প্রতিটি জায়গায়-ই আমি এখওয়ানের দীনি জযবা, আতিথেয়তা, ইসলামপ্রিয়তা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও উদারতার এমনসব দৃশ্য দেখেছি, যা আমার সারা জীবন মনে থাকবে এবং যেগুলো দ্বারা আমি শায়খ হাসানুল বান্নার প্রশিক্ষণ-প্রভাব, তাঁর মানুষ গড়া ও চরিত্র গঠনের ধরন অনুমান করেছি আর জানতে পেরেছি এই লেলিহান অগ্নিশিখাটি কী পরিমাণ ঈমানি উত্তাপ সৃষ্টি করে গেছেন। এই আন্দোলনের অধ্যয়ন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছে থেকে দেখার পর আমি বিশেষভাবে যে দিকগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, সেগুলো নিম্নরূপ–

১. এই আন্দোলন এমন একটি জাতি ও সমাজে – যেটি কিনা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক সংস্কৃতির দোষ-ত্রুটি দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল এবং তার আগে তুর্কি সালতানাত ও একনায়কতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে 'ডিক্টেটর শ্রেণি'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল – এমন কর্মশক্তি, ত্যাগের জযবা, সরলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যার নজির একালে পাওয়া কঠিন। তারই এক নেতা শায়খ বাহী আল-খাওলীর ভাষায় এই সংগঠন একটি নরম-নাজুক দেহে একটি নবজীবন সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাদের এই কর্মশক্তি, জযবা ও ঈগলি শান দেখতে হলে ওস্তাদ কামেল

শরীফ-এর الاخوان المسلمون فى حرب فلسطين (ফিলিস্তিন যুদ্ধে এখওয়ানুল মুসলিমীনের ভূমিকা) শীর্ষক বইটি পড়া দরকার।

২. অপর যে-বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে, তা হলো এখওয়ানের হৃদ্যতা, জোশ ও পারস্পরিক সম্পর্ক। এমন সুদৃঢ় আত্মীয়তা, আন্তরিকতা, সচ্চরিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধন আমি অন্যান্য দাওয়াত-সংগঠনে কমই দেখেছি। এখওয়ানের আন্দোলন এমন একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে, যার প্রতিজন সদস্য অন্য সদস্যকে আপন ভাই মনে করে এবং একজন অপরজনের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকে। কোনো একটি মিশরি পত্রিকা একবার ব্যাঙ্গ করে লিখেছিল (আমি মনে করি, এটি চরম এক স্বীকৃতি) 'যদি শায়খ হাসানুল বান্নার এস্কান্দারিয়ায় হাঁচি এসে পড়ে, তাহলে আসওয়ানে (মিশরের দক্ষিণ সীমান্ত) ইয়ারহামুকাল্লাহুর আওয়াজ গুঞ্জরিত হয়ে উঠবে।' শুধু নিজেদের 'মুরশিদে আম'[১]-এর জন্যই নয় – দলের প্রতিজন কর্মীর জন্যই এই জযবা ও কর্মরীতি। তারা সাধারণত পরস্পর 'তোমার দীনি ভাই অমুক' বলে পরিচিত হয়। তাদের কর্মরীতি ও আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তারা এই দীনি ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস রাখে এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে।

৩. তৃতীয় যে-বিষয়টি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে, তা হলো, জীবনের সঙ্গে এই আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জীবন থেকে সে দূরে সরে থাকে না; বরং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলে, তার সমস্যাবলির সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। জনসাধারণ ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। জনজীবনে সে হস্তক্ষেপ করে চলে, তার দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দেয় এবং পায়ে-পায়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার চেষ্টা করে। আমি মনে করি, এই সংগঠনটির সফলতা, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় এর বিরাট দখল রয়েছে।

৪. তার একটি সমুজ্জ্বল দিক হলো, সে দীনি ও ইলমি বিরোধ-বিসম্বাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টিকে তার দুর্বল দিকগুলোর মধ্যেও গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু যদি মুসলিম বিশ্বের বর্তমান ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতন, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার আক্রমণ ও মুসলমানদের মানসিক বিক্ষিপ্ততাকে সামনে রাখা হয়, তাহলে একে একটি ইসলামি দাওয়াতের জন্য সৌভাগ্যই মনে করতে হবে যে, সে তার সময় ও

১. এটি এখওয়ানের দলের প্রধানের উপাধি

শক্তিকে নিরেট সংশোধন, গঠনমূলক কাজ ও মৌলিক দাওয়াতের মিশনে ব্যয় করছে।

৫. এখওয়ান আন্দোলনের সবচেয়ে সফল ও উজ্জ্বল দিকটি হলো, সে মিশর (তার অনুকরণে অন্যান্য আরব দেশগুলোতেও) ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতার ধারা থামিয়ে দিয়েছে এবং ইসলাম অবমাননা ও ধর্মদ্রোহিতার যে-ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। মিশরের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা ভালো করেই জানেন, এই দেশটিতে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা ছিল। মিশরের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বক্তারা সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে একটা রণাঙ্গন তৈরি করে রেখেছিল এবং ফরাসি বিপ্লবের পতাকাবাহীদের মতো তারা গোটা মিশরের ইসলামি সোসাইটিকে নিজেদের 'উন্নয়নবাদী' সাহিত্য, চিন্তাধারা, গবেষণা ও বিদ্রূপ দ্বারা গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল এবং প্রতারণার উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করছিল। সংঘবদ্ধ এই রণাঙ্গনটার বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী, এমনকি জামেয়া আযহারে পর্যন্ত আওয়াজ তোলার কারুর সাহস ছিল না। এখওয়ানের বিরুদ্ধবাদীরা পর্যন্ত স্বীকার করছে, এখওয়ানের আন্দোলন এই মোর্চাটাকে দুর্বল ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। সাহিত্যের বড়-বড় নেতারা প্রকাশ্যে নাস্তিকতার দাওয়াত প্রদান ও ইসলামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এখনওয়ান আত্মমর্যাদাশীল যুবসমাজ ও মুসলমানদের মাঝে এমন একটি বাহিনী তৈরি করে দিল যে, তাদের বিপরীতে ইসলামবিরোধীরা রণাঙ্গন থেকে পিছপা হতে বাধ্য হলো। সেই সঙ্গে তারা ইসলামপ্রিয় সাহিত্যিক, সমালোচক, লেখক ও বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের এমন একটি জামাত তৈরি করে ফেলল, যারা আপন-আপন বিদ্যায় ইসলামবিরোধীদের মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখেন। এখওয়ানের এই কীর্তি এত বড় যে, যারই অন্তরে ঈমানের আলো আছে, সে-ই তা স্বীকার করতে বাধ্য। আমার সামনে সেই দেশগুলোর বিগত জীবন ও বর্তমান ধর্মীয় ও চিন্তাগত বিপ্লবের চিত্র বিদ্যমান। এখওয়ান নতুন প্রজন্মের মন-মস্তিষ্ককে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং একজন ঈমানদারকে কীভাবে বুক ফুলিয়ে চলা শিখিয়েছে, মিশরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করার ফলে আমার তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। অতীতে যারা ইসলামের কথা বলতে, দীনি কর্মকাণ্ড পালন করতে লজ্জা ও হীনম্মন্যতা অনুভব করত, এখন তারা অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করছে। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফলে হিন্দুস্তানে একবার একভাষণে আমার মুখ

থেকে অজান্তে বেরিয়ে এসেছিল, 'এখওয়ানকে সে-ই ভালবাসবে, যার অন্ত রে ঈমান আছে এবং তাকে সে-ই ঘৃণা করবে, যার অন্তরে নেফাক আছে।'

ইসলামের ইতিহাসে যেসব অপরাধ ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা মিল্লাতে ইসলামিয়ার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে এবং ইতিহাসের ধারা পাল্টে দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটা হলো শায়খ হাসানুল বান্নার হত্যার ঘটনা। এই ঘটনাটা অন্ততপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যকে একজন পরম উপকারী ও হিতকামী ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে এবং একটি সুস্থ ধারার দীনি বিপ্লব থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

ঘটনা হলো, এখওয়ান যদি প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নিতে আরও কটা দিন বিলম্ব করত (কিংবা এই প্রকাশ্য রাজনীতিতে না জড়াত) এবং নিজেদের দাওয়াতি কাজ পূর্ণ শক্তিতে জারি রাখত, তাহলে আরব দেশগুলোতে একটি ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যেত এবং একটি নতুন জীবন তৈরি হয়ে যেত। আমি একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি, জীবনের শেষ দিনগুলোতে শায়খ হাসানুল বান্না স্বয়ং এই বলে প্রচণ্ড ব্যথা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন যে, আমাকে সময়ের আগেই রাজনীতির মাঠে অবতীর্ণ হতে হলো! আমার আঁচলে রাজনীতির কাঁটা বিদ্ধ হয়ে গেল! তিনি তীব্রভাবে কামনা করতেন, যদি পুনর্বার আমি নির্ভেজাল দাওয়াতি ও তরবিয়তি কাজের মওকা পেয়ে যেতাম এবং দল ও সর্বসাধারণের মাঝে সেই যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যার পরে তারা সব ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সক্ষম হতো এবং প্রতিটি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতো পারত!

সুদানে

২৮ শাবান ১৩৭০ (৩ জুন ১৯৫১) আমরা কায়রো থেকে শাল্লালের উদ্দেশে রওনা হলাম। ফেরাউনদের লীলাভূমি মিশরের উঁচু অঞ্চল সাঈদ-এর আকসারের পথে আমরা শাল্লাল গিয়ে উপনীত হলাম, যেখানে রেলের সফর শেষ হয়ে গেছে। হালফা উপত্যকায় যাওয়ার জন্য আমরা জাহাজে আরোহণ করলাম। ১৩৭০ হিজরির ১লা রমযান (৬ জুন ১৯৫১) আমরা রেলে চড়ে ২রা রমযান (৭ জুন ১৯৫১) খার্তুম পৌঁছে গেলাম। সুদানের প্রখ্যাত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা সাইয়িদ মীর গনী পাশার মেহমান হয়ে আমরা তাঁর এক ভক্ত শায়খ তাইয়িব আবদুল মাকসুদ-এর বাড়িতে অবস্থান নিলাম। এই সফরে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব আমার সঙ্গে ছিলেন। খার্তুমে আমরা দশ দিন ছিলাম। রমযান মাস ছিল এবং সুদানে প্রচণ্ড গরমের মৌসুম। কিন্তু

তারপরও আমরা এই সংক্ষিপ্ত সফর থেকে পুরোপুরি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলাম। সুদানের দাঈ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাইয়িদ আলী মীর গনী পাশা, ওস্তাদ ইসমাঈল বেগ আযহারী (যিনি পরে সুদানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন), শায়খ শাওকী আসাদ (জমিয়াতুত তাবশীর আল-ইসলামীর সেক্রেটারি), জামে মসজিদের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ আওজ ও শ্রমিকনেতা এবং সুদানের জমিয়াতুশ শুব্বানিল মুসলিমীন-এর প্রেসিডেন্ট আলহাজ মুহাম্মাদ মুসা সুলাইমান-এর সঙ্গে আমি দীর্ঘ সাক্ষাৎ বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ লাভ করেছি। তাঁদের সামনে আমি হিন্দুস্তানে দাওয়াতি কাজের বিবরণ তুলে ধরেছি। এই তরতাজা জাতিটির (যে কিনা তখনও পর্যন্ত ইসলামি ও আরবি চরিত্রের ধারক ছিল। কিন্তু শিক্ষা ও রাজনীতিতে মিশর দ্বারা প্রভাবিত ছিল) দায়িত্ব-কর্তব্য, আফ্রিকায় ইসলামি দাওয়াতের ব্যাপক সম্ভাবনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি তাদের বলেছি, সুদান ও আফ্রিকা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রায় প্রতিটি মহাদেশ আপন-আপন কর্তব্য পালন করে ফেলেছে এবং নিজ-নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বাকি আছে শুধু আফ্রিকা, যাকে মহান আল্লাহ্ নেতৃত্বের মর্যাদা ও দাওয়াতের কাজ সোপর্দ করতে পারেন। কিন্তু তা তখন সম্ভব হবে, যখন সুদানি ভাইয়েরা তাদের মর্যাদা ও মূল্য বুঝতে সক্ষম হবেন এবং তাকে ভালোভাবে কাজে লাগাবেন।

দামেশকে

১২ রমযান ১৩৭০ (১৭ জুন ১৯৫১) সুদান সফর শেষ করে কায়রোর উদ্দেশে রওনা হলাম এবং ১৭ রমযান (২২ জুন) কায়রো পৌঁছে গেলাম। সেখানে দুদিন অবস্থান করে ১৯ রমযান (২৪ জুন) আমরা বিমানযোগে দামেশকের উদ্দেশে রওনা হলাম। মাত্র দু-ঘণ্টায় আমরা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে এশিয়া মহাদেশে পৌঁছে গেলাম এবং দামেশকের সেই ঐতিহাসিক প্রিয় মাটিতে পা রাখলাম, যেটি একদল মহান সাহাবার সমাধি ও বড়-বড় অলী ও আলেমদের জন্মভূমি।[১]

---

১. ঐতিহাসিকদের মতে মক্কা-মদিনার পর এত সংখ্যক সাহাবা কোথাও সমাধিস্থ হননি, যে-সংখ্যক দামেশকে তথা শামে সমাধিস্থ হয়েছেন। শামের মাটিতে সমাধিস্থ সাহাবাদের মধ্যে আল্লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়াযযিন হযরত

সিরিয়ার আলেমসমাজ ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং ধর্মীয় ও শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন

দামেশক পৌঁছে আমরা হোটেল 'কাসরুল উনদুলুস'-এ উঠলাম (যেটি দামেশকের কেন্দ্রীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ অঞ্চল মুরজায় অবস্থিত)। দিনকতক পর আমি বন্ধুবর সাইয়িদ মাহমুদ আল-হাফিয-এর পীড়াপীড়িতে তাঁর শশুর শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আস-সালাহী – যিনি প্রেসিডেন্ট ভবনের মসজিদের ইমাম এবং নগরীর উল্লেখযোগ্য নেক ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন – এর বাড়িতে গিয়ে উঠতে বাধ্য হলাম। ওখানে নিজবাড়ির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল। আমরা সিরিয়ার সর্বমোট ৪৮ দিন অবস্থান করি। তার মধ্যে দামেশক অবস্থানের সময়কাল ছিল ২৪ দিন। সংখ্যার হিসাবে এ তেমন দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু ব্যস্ততা ও উপকারিতার দিক থেকে ছিল খুবই ব্যাপক। এই দেড় মাস সময় থেকে আমরা যত বেশি সম্ভব স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করি। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাগত, দীনি ও সাহিত্যবিষয়ক অঙ্গনগুলোর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচয় ও মতবিনিময়ের চেষ্টা করি। রাজনৈতিক ও সরকারি মহল মিশরেও আমাদের কর্মপরিধির বাইরে ছিল, এখানেও বাইরেই থাকল। আলেমদের মধ্যে শায়খ মক্কি আল-কাত্তানি, শায়খ আহমাদ আদ-দাকার, আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বাহজা আল-বায়তার, শায়খ আবুল খায়ের মায়দানি, ডক্টর মুস্তাফা আস-সিবায়ি, ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল-মুবারক, ওস্তাদ মুস্তাফা আহমাদ আয-যারকা, শায়খ মুহাম্মাদ আহমাদ দাহমান, ডক্টর আবুল ইয়াসীর আবিদীন (আল্লামা শামির নাতি ও প্রজাতন্ত্রের মুফতী), শায়খ আহমাদ কাফতার ও শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ বুরহানি; সাহিত্যিকদের মধ্যে বিখ্যাত কবি মুহাম্মাদ আলী আল-হাওমানী, ওস্তাদ

বিলাল হাবশি (রাযি.), আমীনুল উম্মত হযরত আবু উবায়দা (রাযি.), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.), হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.), হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাযি.), হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.) ও হযরত দিহয়া কালবি (রাযি.)-এর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিজ্ঞ আলেম ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে ইবনুস সালাহ যাহাবি ও মিযযি; ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনে খাল্লিকান, ইবনে আসাকির ও ইবনে কাছীর; আয়েম্মায়ে ইসলামের মধ্য থেকে নববি, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম; শীর্ষস্থানীয় সুফিয়ায়ে কেরামদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে আদহাম, বায়েজিদ বোস্তামি ও শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি এবং মুজাহিদীনে ইসলামের মধ্য থেকে নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সালাহুদ্দীন আইউবি এই দামেশকেরই মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন।

তাইসীর যাবয়ান, মুহাম্মাদ কামাল খাতীব; লেখক-গবেষকদের মধ্যে আল্লামা মুহাম্মাদ কুর্‌দ আলী, ওস্তাদ মুহাম্মাদ আযা দারুযা, ওস্তাদ খলীল মরমদ বেগ ও আল্লামা শায়খ আবুদল কাদের মাগরিবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তরুণ ও সুস্থ চিন্তার অধিকারী শিক্ষকদের মধ্যে সাইয়িদ আবদুর রহমান আলবানির সঙ্গে বিশেষভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দামেশক সফরের এই পুরো সময়টিতে তিনি আমার একজন স্বেচ্ছাসেবী সেক্রেটারি হিসেবে আমার পদপ্রদর্শনের ভূমিকা পালন করেন এবং আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ও চিন্তাশীল যুবক ছিলেন।

দামেশক ও সিরিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমি দামেশকে এখওয়ানুল মুসলিমীন-এর কেন্দ্র জামে আদ-দাক্কাক, সিরিয়ার বিখ্যাত ও প্রাচীনতম একাডেমি আল-মাজমাউল ইলমী, বিখ্যাত লাইব্রেরি ও দুলর্ভ গ্রন্থাবলির ভাণ্ডার কুতুবখানা জাহিরিয়া, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ দারুল হাদীছ – যেখানে ইমাম নববী হাদীছের দরস দিতেন – ও ঐতিহাসিক পর্যটনকেন্দ্র গুতায়ে দামেশক ভ্রমণ করি। সিরীয় পার্লামেন্টের গোলযোগপূর্ণ একটি অধিবেশনেও আমি অংশগ্রহণ করেছি।

বাইতুল মুকাদ্দাস ও আল-খলিল

বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে মসজিদে আকসা পরিদর্শনের সৌভাগ্যও আমি অর্জন করি। রমযানের শেষ দিনটি কাটিয়ে ওখানেই আমি ঈদের নামায আদায় করি। ওখানে নিজ দেশের জনপ্রিয় মুসলিম নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহারের কবর যিয়ারত করি। বরকতময় নগরী আল-খলিলেও দুদিন অতিবাহিত করি। বাইতুল লাহ্‌ম-এর পাশ দিয়েও পথ অতিক্রম করি। 'আল-হাইয়াতুল ইল্‌মিয়্যা আল-ইসলামিয়্যা'র সম্মেলনে অংশগ্রহণ করি। আল-কুল্লিয়্যাতুল ইল্‌মিয়্যা আল-ইসলামিয়্যাও পরিদর্শন করি। দামেশকের আল-জামইয়্যাতুল গারা, আন-নাদিল আরাবী ও জমিয়ত আত-তামাদ্দুনুল ইসলামীর সভাগুলোতেও অংশগ্রহণ করি।

অপরাপর ঐতিহাসিক নগরী ও স্থানসমূহ

নগরী ও স্থানসমূহের মধ্যে হেমস, হামাত, মাআররাতুন নুমান ও হালব ভ্রমণ করি এবং তুরস্কের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যাই।

জর্ডান ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ্

বাইতুল মুকাদ্দাসের সুবাদে যে সফর করা হয়েছিল, তাতে ফেরার পথে পূর্ব জর্ডানের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। আমাদের আগমনের সংবাদ তিনি আফগান রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মাদ সাদেক মোজাদ্দেদির মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। আমার সঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ সাদেক মোজাদ্দেদির পরিচয় ঘটে মিশরে, যার সম্মানজনক আতিথেয়তায় আমরা মসজিদে আকসায় রমযানের শেষ দিনটি কাটিয়েছিলাম। ওমানে আমরা আমাদের মেজবানের বাড়িতে ছিলাম এবং খাওয়ার জন্য দস্তরখানে বসে পড়েছিলাম। ঠিক এমন সময় প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক এল। আমরা ওখানে চলে গেলাম এবং তাঁর সঙ্গে খানা খেলাম। তাঁর সঙ্গে আমি দাওয়াতি আন্দাজে তাঁর বংশ, অতীত ইতিহাস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসার অভিভাকত্বের জিম্মাদারি ও তার দাবিসমূহকে সামনে রেখে অকপট কথা বলেছি।

তিন দিন পর তাঁর সঙ্গে আবারো দেখা হলো। আমরা দুজন নগরীর জামে মসজিদে নামায পড়লাম। আমার উপর তাঁর চোখ পড়ে গেল। তিনি দুপুরের খাবারে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন। সে কদিনে তিনি আমার গ্রন্থ 'মা যা খাসিরাল আলামু' পড়ে ফেলেছেন, যেটি আমি বিগত সাক্ষাতের সময় তাকে হাদিয়া দিয়েছিলাম। বইটির উপর তিনি পর্যালোচনা করলেন। আমি তাঁকে মসজিদে আকসার দেখভাল ও শরণার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানালাম এবং আরও দুটি পুস্তিকা 'বাইনাল আলামি ওয়া জাযীরাতিল আরাবি' ও শায়িরুল ইসলামি আদ-দাকতূর মুহাম্মাদ ইকবাল' উপহার দিলাম। পরবর্তী জুমায় তিনি মসজিদে আকসায় নামায পড়তে গেলেন আর ওখানেই তাকে শহীদ করে দেওয়া হলো, যার সংবাদ আমি জুমার দিনই দামেশকের 'মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি' জামে মসজিদে শায়খ আহামাদ কাফতার-এর দরসে বসে পেয়েছি।

ফিলিস্তিন ট্রাজেডির ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন

ওমান ও বাইতুল মুকাদ্দাস সফরে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সেই বেদনাদায়ক বাস্তবতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছি, যেগুলো কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করে জানা সম্ভব ছিল না। তার সারকথা হলো, ফিলিস্তিন সমস্যা একটা নাটক ছিল, যাকে ইংরেজ ও তার

দোসররা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিল। এই নাটকের চরিত্র ছিল আরব দেশ, আরব বাদশা ও আরব সরকারগুলো। নাটকটা দেখানো হয়েছে ফিলিস্তিনের মঞ্চে। আর আরব বিশ্ব ও ইসলামি বিশ্বের চোখে ধুলা দিয়ে ব্রিটেন ও ইহুদিদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এটা একটা সুপরিকল্পিত নিখুঁত স্কীম ছিল। মুসলমানদের এই লাঞ্ছনা ও অবমাননায় স্বাধীন ফিলিস্তিনি জাতি সবচেয়ে বেশি নির্দোষ। মূলত ফিলিস্তিনের রক্তের দায়ভার আরব সরকারগুলো, তার নেতৃবর্গ ও আরব লীগের কাঁধে। অনেকে কেঁদে-কেঁদে অবমাননার এই উপাখ্যান শুনিয়েছেন। তাঁদের মাঝে মসজিদের আকসার ইমাম, সেখানকার বাসিন্দা, প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আরবরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি নিজেও মসজিদের আকসায় কয়েকদিনকার অবস্থানের সময় ফিলিস্তিনিদের অসহায়ত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের হৃদয় ভাঙা ছিল, মাথা অবনত ছিল। আমি তাদের মনভাঙা ও আহত পেয়েছি। তারা যখন এই কাহিনীর বর্ণনা দিত, তখন তাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত এবং হৃদয় শোকাহত হয়ে উঠত। আরব নেতৃবৃন্দের উপর থেকে তাদের আস্থা উঠে গিয়েছিল।

ফিলিস্তিন সমস্যার উপর ভাষণ

সিরিয়া সফরে আমি যেসব ভাষণ-বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ লাভ করেছি, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই নিবন্ধটি, যেটি আমি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একটি বিশেষ মজলিসে পাঠ করেছি। এই নিবন্ধটি আমি ওমান ও বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের মধ্যখানে প্রস্তুত করেছিলাম। তার শিরোনাম ছিল شهادة العلم والتاريخ في قضية فلسطين বা 'ফিলিস্তিন সমস্যায় জ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য'। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্টান ভাইস চ্যান্সেলর ওস্তাদ কুস্তুন্তিন যুরাইক, এই ট্রাজেডি বিষয়ে যার একটি পুস্তিকা বের হয়েছিল 'মা'নান নুকবা' নামে। সভায় বিপুলসংখ্যক শ্রোতা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিশাল হলটি কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল। সিরীয় পার্লামেন্টের স্পীকার ডক্টর মারুফ আদ-দাওয়ালিবি, পাকিস্তানে নিয়োজিত সিরীয় রাষ্ট্রদূত ওমর বাহা আল-আমীরী, বেশ কজন পার্লামেন্ট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও শিক্ষাবিদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দামেশকের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মধ্যে ছিলেন আল্লামা বাহজা আল-বাইতার, ওস্তাদ সাঈদ আল-আফগানী, ওস্তাদ নাযির আল-মিসরী, ওস্তাদ আমীন আল-মিসরী, শায়খ আহমাদ কাফতার, শায়খ মক্কী কাত্তানী ও শায়খ

আহমাদ লাদকার প্রমুখ। আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজা আল-বাইতার শ্রোতাদের সামনে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমার নিবন্ধ পাঠের পর ডক্টর মুস্তফা আস-সিবায়ী বিশেষ ধারায় তার উপর পর্যালোচনা করেন এবং নিবন্ধের মৌলিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। নিবন্ধে আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, যেগুলো ফিলিস্তিন ট্রাজেডির জিম্মাদার। তার প্রথমটি ছিল নিজেদের নীতি ও বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং জীবনের বাজি লাগানোর চেতনা হারিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়টি ছিল সেই মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার অনুপস্থিতি, যাকে কবি ইকবাল নির্ভীকতা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয়টি হলো, আরব সরকার ও জাতিগুলোর মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি চোখে পড়ছে না, যার মন ও মস্তিষ্কের উপর ফিলিস্তিত সমস্যা ছেয়ে যাবে এবং সালাউদ্দীন আইউবির মতো তার এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে, যার কথা তাঁর সেক্রেটারি ইবনে শাদ্দাদ এভাবে বর্ণনা করেছেন– 'মনে হচ্ছিল, মায়ের কোলে তার একমাত্র শিশুসন্তানটিকে কেউ হত্যা করে ফেলেছে!' ফিলিস্তিনের সমস্যা যখনই সমাধান হবে এভাবেই হবে – কনফারেন্স, রেজুলেশন ও তোশামোদের দ্বারা এর সমাধান হবে না।

সিরিয়ার অন্যান্য ভাষণগুলো

এই ভাষণটি ছাড়াও আমার যে-ভাষণটি দামেশকের দীনি ও ইলমি মহলে ভালো প্রভাব ফেলেছিল, সেটি হলো الهيئة العلمية الاسلامية। জমিয়াতুত তামাদ্দুন আল-ইসলামী ও আল-জমিয়াতুল গারায় আমি ভাষণ প্রদান এবং নিজের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ লাভ করেছি। আলেমদের সামনে আমি সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা, তাদের দাওয়াত প্রদান করা, ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এ-কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছি এবং সেই আশঙ্কাগুলো চিহ্নিত করেছি, যেগুলো জনসাধারণ থেকে দূরে থাকা, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের মাঝে দীনি ও নাগরিক অনুভূতি তৈরি না করার ফলে সৃষ্টি হতে পারে। দামেশকের এক ভাষণে আমি বলেছি, যে-শ্রেণিটির হাতে এখন রাষ্ট্রগুলোর লাগাম, ইসলাম পুরোপুরি তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করেনি। একটি জীবনব্যবস্থা ও জীবনরীতি হিসেবে ইসলামের উপর তাদের অতটুকু ঈমান নেই, যতখানি আছে পশ্চিমা সভ্যতার রীতি-নীতি ও তার উপকারিতার উপর। সেইসঙ্গে বেশিরভাগ আরব দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক

অনুভূতি ও সচেতনতায় এখন নাবালকের স্তরে রয়েছে। তারা বন্ধু-শত্রুর পার্থক্য বোঝে না। জাতির সামগ্রিক বিবেক এখনও জাগ্রত হয়নি। আর তা যতক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না।

এই ভাষণগুলো ছাড়াও একদিন (২৩ শাওয়াল ২৭ জুলাই) আমি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদে জুমার খুতবাও প্রদান করেছি। সেই ভাষণে আমি তরুণ ছাত্রদের বয়স, মন-মানসিকতা ও শিক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সম্বোধন করেছি।

হযরত খালেদ সাইফুল্লাহর নগরী হেমসে ভাষণ

হেমসে (যেটি ইসলামি বিজয়মালার বড় একটি কড়া এবং সাইফুল্লাহ খালেদ-এর সমাধি) ১৯৫১ সালের ২৯ জুলাই এখওয়ানুল মুসলিমীন-এর কেন্দ্রীয় অফিসে আমি একটি জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করি। উক্ত ভাষণে আমি সিরিয়ার, বিশেষ করে হেমসের ঐতিহাসিক নগরী সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের ইতিহাস তুলে ধরেছি এবং বলেছি কীভাবে আমাদের শৈশবে আমাদের পরিবারে ওয়াকিদির 'ফুতুহুশ শাম'-এর কাব্যানুবাদ 'সিমসামুল ইসলাম' পাঠ করার প্রচলন ছিল এবং সেটি আমাদের ঈমানের উন্নতি ও অগ্রগতিতে অংশ নিয়েছিল। আমি বলেছি, শাম ও হেমসের অধিবাসীরা! এই ইতিহাস তোমাদের দেশে তৈরি হয়েছে। সেই ইতিহাস ভারতীয় মুসলমানদের ওখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিটির জাতীয়তা, চরিত্র ও দর্শনে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। আজও সে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ঈমানের উন্নতি, আত্মার সজীবতা ও হৃদয়ের উষ্ণতার উৎস। ইসলামি বিশ্বের আবারও একজন সাইফুল্লাহর প্রয়োজন। আপনারা ইসলামি বিশ্বকে তার সেই হারানো তরবারিটি উধার দিতে পারবেন কি? ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অভাবটা হলো, প্রকৃতর বদলে আকৃতি তার স্থান দখল করে নিয়েছে। তার নবজীবন ও নতুন শক্তির একটি-ই পথ আছে। আর তা হলো, সে আকৃতির বদলে প্রকৃত হয়ে যাবে।

আমার এই ভাষণটি হেমসবাসীদের অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন ছিল। ফলে তা শ্রোতাদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

হালবের এক জনাকীর্ণ সভায় আমি একটি জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেছি। তাতে আমি অতীতে বিশ্বের মাঝে আরবদের আধিপত্য লাভের রহস্য এবং প্রথম যুগের ইসলামের দাঈ ও বিজেতাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছি,

যারা জাযীরাতুল আরব থেকে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং বিশ্বকে মানুষের গোলামি, বিভিন্ন ধর্মের অবিচার ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে সত্য দীন, নিরেট একত্ব এবং আত্মা ও হৃদয়ের বিস্তৃত দিগন্তের দিকে সরিয়ে আনতে বের হয়েছিলেন। তারপর বলেছি, আরবরা তাদের বিশ্বজনীন কেন্দ্রের দিকে কীভাবে ফিরতে পারে। আরবরা জাতীয়তার স্লোগানের সাথে আত্মিক নেতৃত্ব ও বিশ্বজনীন কর্তৃত্বের আশা করতে পারে না। যদি এমনটা করে, তাহলে সেই জাতিগুলোরও তাদের পুরোনো জাতীয়তার কথা মনে পড়ে যাবে, যেগুলো পরিত্যাগ করে তারা ইসলামি ঐক্য ও মানবীয় ভ্রাতৃত্বের বৃত্তে প্রবেশ করেছিল।

নানাজনের কবর যিয়ারত

হেমসে আমি সাহাবাদের মধ্য থেকে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ; খলীফাদের মধ্য থেকে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয; পীর-মাশায়েখদের মধ্য থেকে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী; বিশ্বখ্যাত আলেমদের মধ্য থেকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে কাইয়েম এবং মুজাহিদদের মধ্য থেকে সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির কবর যিয়ারত করি এবং ফাতেহা পাঠ করি। হামাতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফিদা হামাবি ও মাআররাতুন নুমানে প্রখ্যাত কবি আবুল আলা মাআররির কবরেও গিয়েছি, যার কাব্যসংকলন আমি ছাত্রজীবনেই অনেক কষ্ট করে পড়েছি এবং তাঁর অনেকগুলো কবিতা মুখস্থ ছিল।

হেজায প্রত্যাবর্তন ও নানা ব্যস্ততা

১২ আগস্ট ১৯৫১ আমি দামেশক থেকে বিমানযোগে মদিনার উদ্দেশে উড়াল দেই। এই পুরো সফরে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব বলিয়াবি আমার সঙ্গে ছিলেন। মদিনায় আমি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ রাবে নদবি ও মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ তাহেরকে পেয়ে যাই। কয়েকদিন মদিনায় অবস্থান করে আমরা মক্কা চলে আসি, যেটি কিনা আমার এই পুরো সফরের শেষ গন্তব্য ছিল। মক্কায় পাঁচ মাস অবস্থান করি। এ-সময়ে আমার তৃতীয় হজের সৌভাগ্য নসিব হয়। এ-হজে শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নুমানি সাহেবও শরীক ছিলেন এবং সময়টা ছিল প্রচণ্ড গরমের।

হজের পর আমি মক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থান করি। এ-সময়ে সেই বন্ধুদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক ও যোগাযোগের নবায়ন হয়ে যায়, যা কিনা মক্কায়

অবস্থানকালে বিশেষভাবে বোস্তানে বুখারীর সম্মেলনের পর তৈরি হয়েছিল। সৌদি রেডিওতে আমি আরও দুটি ভাষণ দেই। এক ভাষণে 'মিন গারে হেরা' (হেরা গুহা থেকে) শিরোনামে আমি আলোকপাত করি, ইসলামের সুপ্রভাতের উদয়ে পৃথিবীতে কেমন আলো বিস্তার লাভ করেছে, মানবতার জটিল-জটিল সমস্যাগুলো কী সমাধান পেয়েছে এবং তার নানা ধরনের ও বিপুলসংখ্যক অনাচারের কোন চাবিকাঠি তৈরি হয়েছে, যা আজও মানবীয় জীবনের মূল চাবি, নবুওতের পাঠশালা নানা প্রয়োজনের জন্য কীরূপ মানবীয় মডেল তৈরি করে এবং তাঁদেরকে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে কীভাবে মোতায়েন করেছিল এবং তাঁরা কেমন বিপ্লব সাধন করেছিলেন। এটি মূলত রেডিওর ডাইরেক্টর শায়খ মুহাম্মাদ শাত্তার দেওয়া বিষয়বস্তু 'আল-কাজায়া ইনসানিয়্যা ওয়া হুলূলুহা ইসলামিয়্যা' (মানবীয় সমস্যাবলি ও তার ইসলামি সমাধান)-এর পরিবর্তিত নাম ছিল। কারণ, হেরা গুহা-ই মানবতার সৌভাগ্যের শুভসকালের উদয়স্থল এবং নতুন মানবেতিহাসের সূচনা ছিল।

অপর ভাষণটির শিরোনাম ছিল 'ইকাবল : তাঁর জীবন, তাঁর বার্তা'। যার উদ্দেশ্য ছিল আরব তরুণ-যুবকদের ইসলাম অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী করে তোলা। এগুলো ছাড়াও আমার আরেকটি নিবন্ধ ওখানকার একমাত্র আরবি পত্রিকা 'আল-বিলাদুল ইসলামিয়্যা'য় كيف توجه المعارف (শিক্ষার পলিসি ও কর্মপদ্ধতি) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আরো কয়েকজন লেখকও এ বিষয়ে কলম ধরেছিলেন, যাঁদের মধ্যে শায়খ আলী আল-হারকান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আল-মা'হাদুস সাউদী ও তাহযীরুল বা'ছাত এবং তায়েফের কুল্লিয়াতুশ শরীয়ায় আমি ভাষণ প্রদান করি।

তায়েফের সফরও একটি স্মরণীয় সফর ছিল, যেটি শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর আস-সাব্বান-এর আমন্ত্রণ ও আতিথেয়তায় অনুষ্ঠিত হয়। এই স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে নদবি ও মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদবি আমার সঙ্গী ছিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যান শায়খ আহমাদ আবদুল গফুর আত্তার। আমরা তায়েফের বিখ্যাত হোটেল আত-তাইসীর-এ অবস্থান গ্রহণ করি। তায়েফ গভর্নরের একটি বিশেষ নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণের সুযোগও আমার ঘটেছিল।

মক্কায় ওয়াদিয়ে ফাতেমায় একটি তাবলীগি সফর হয়। এই সফরে হেজাযের খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষিত যুবকরা অংশগ্রহণ করে। হেজাযের এই দীর্ঘ অবস্থানের পর অক্টোবর ১৯৫১ আমরা জাহাজে করে হিন্দুস্তান ফিরে আসি। ফেরার পথে মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া ফারুকি এলাহাবাদি ও মুহাম্মাদ রাবে নদবি আমার সঙ্গে ছিল। সমুদ্র শান্ত ছিল।

মওসুম ছিল আরামদায়ক। এভাবে প্রায় ১৩-১৪ মাস পর হেজায ও প্রাচ্য সফর থেকে আমি স্বদেশে ফিরে আসি।

লাখনৌ স্টেশনে তাবলীগি বন্ধুবর্গ ও লাখনৌর বন্ধু-সুহৃদদের বিরাট একটি দল আমাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিল। তারা আব্দার জানাল, স্টেশনের সন্নিকটস্থ মসজিদে আমি আমার এই সফরের সারনির্যাস শোনাব। আমি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম এবং ইকবালের দুটি চরণ আবৃত্তি করলাম–

سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشۂ سیماب

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

'মিশর-ফিলিস্তিনে আমি সেই আযান শুনিনি, যে আযান পাহাড়গুলোকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

যে-সেজদায় মাটির আত্মা কেঁপে উঠত, সেই সেজদা আজ মাথা কুটে মরে মিম্বর-মেহরাবে।'

মাওলানা মাদানির একটি পত্র

এখানে হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর একটি পত্র সংযুক্ত করছি, যেটি তিনি আমার ভাইজানের নামে লিখেছিলেন। ভাইজান দয়াপূর্বক মিশরে আমার সামান্য দাওয়াতি প্রচেষ্টার সংবাদ একটি পত্রের মাধ্যমে মাওলানাকে দিয়েছিলেন, যাতে শুনে তিনি খুশি হন এবং আমার জন্য দু'আ করেন। ১৩৭০ হিজরির ১৫ রবিউল আউয়ালে লেখা পত্রখানা আমি এখানে তুলে ধরলাম, যাতে তাকে আমি নিজের জন্য একটি সুসংবাদ ও তাবাররুক মনে করি।

> 'মুহতারামুল মাকাম যীদা মাজদুকুম
>
> আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার পত্র পেয়ে আমি খুবই খুশি হয়েছি। মৌলভী আলী মিয়া সাহেবের খবরাখবর আমি তাবলীগে মুরুব্বী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব ও অন্যান্য হযরতগণ থেকে জেনে আসছিলাম। কিন্তু আপনার পত্রে বিস্তারিত জানতে পারলাম এবং আরো অধিক আশ্বস্ত হলাম। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তাঁকে কল্যাণের চাবিকাঠি ও অন্যায়-অকল্যাণের প্রতিরোধক বানান। আর হযরত সাইয়িদ সাহেব শহীদ সিররুহুল আযীয-এর

সংস্কারমূলক মহান সেবার পতাকাবাহী বানিয়ে সরাসরি আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতরাজি দ্বারা ধন্য করেন। আমীন।

ওয়াসসালাম

নঙ্গে আসলাফ হুসাইন আহমাদ গুফিরা লাহু

১৫ রবিউল আউয়াল, ১৩৭০ হিজরি।

চতুর্দশ অধ্যায়

মিশ্র সভা-সমাবেশ, কয়েকটি সফর ও নতুন কিছু রচনা (অক্টোবর ১৯৫১—এপ্রিল ১৯৫৬)

মিশ্র সভা-সমাবেশ এবং মানবতা ও চরিত্র বিষয়ে কতগুলো ভাষণ

সেই চিন্তারীতির ফলাফল – যেটি তার কার্যকারিতা পরিত্যাগ করেনি এবং আশপাশের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি থেকে চক্ষু বন্ধ করেনি; অতীতের অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও ভবিষ্যতের নানা শঙ্কাও যার সামনে ছিল – আমার তাবলীগি সফর ও সেই সভা-সমাবেশগুলোতে, যার নেতৃত্ব সেকালে আমার ও মাওলানা মানযূর নুমানি সাহেবের হাতে একটি নতুন দিক ও শাখা বাড়িয়ে দিল। তা ছিল সেসব মিশ্র সভা-সমাবেশ, যেগুলোতে অমুসলিম, বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের গুরুত্বের সঙ্গে দাওয়াত দেওয়া হতো এবং তাদেরকে, তাদের মন-মানসিকতাকে সামনে রেখে সেই ভাষায় বক্তৃতা করা হতো, যেটি তাদের জন্য বেশি-বেশি বোধগম্য ও আকর্ষণীয়। সেজন্য তাতে ইংরেজির প্রতিশব্দ এবং হিন্দির সহজ ও প্রচলিত শব্দমালা ব্যবহার করা হতো।

আমাদের এই পদক্ষেপের পেছনে যে-চিন্তাটা কাজ করেছিল, তা হলো, ভারতে বাস করে ভারতের (অমুসলিম) সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করা যায় না, যারা সর্বাবস্থায় দেশটির প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং ভবিষ্যতেও করবে এবং যারা শুধু ইসলামের বিশ্বাস, স্বরূপ ও আবেদনের সঙ্গে অপরিচিতই নয়; মুসলমানদের বোধ-বিশ্বাস, তাদের জীবনের ভিত্তি ও তাদের (ব্যাপক অর্থে) সভ্যতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অনবহিত এমনকি বীতশ্রদ্ধও বটে। তদুপরি রাজনীতিতে দলীয় বিভাজন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও অদূরদর্শী বক্তাদের উত্তেজনাকর বক্তৃতা তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে অনীহ ও বদগুমান করে তুলেছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করা এবং তাদের কিছু শোনা ও জানার মওকা না দেওয়া আপন জাতির পক্ষেও বিপজ্জনক এবং দেশের পক্ষেও ক্ষতিকর। এই ভুল অনেক আগ থেকেই চলে আসছে। তারই ফলে যখন মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল, তখন

সঙ্গে-সঙ্গে সবই গেল আর মনে হলো, মুসলমান এদেশে শূন্যের উপর ভাসছে কিংবা তারা আলাদা একটা দ্বীপে বাস করছে।

কিন্তু তখন এই অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনোযোগ আকর্ষণ ও তাদের বিবেক পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র পথ ছিল জীবনের সার্বিক সমস্যা, মানবতা, নৈতিকতা ও দেশের স্বার্থের আলোচনা এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান ও বিপদাপদে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ দেখানো। এই পন্থাটি-ই তাদের ইসলামের অধ্যয়ন, মুসলমানদের বোঝা, তাদেরকে তাদের সঠিক মর্যাদা প্রদান ও আল্লাহপ্রদত্ত এই সম্পদ (মুসলমানদের উপস্থিতি) দ্বারা উপকৃত হওয়ার – যারা এই দেশটির শুধু ইতিহাসই নয়; বরং ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে – তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

কিন্তু এই কাজটি খুবই স্পর্শকাতর ছিল। এর জন্য অনেক যোগ্যতা, সাবধানতা, মত প্রকাশের ক্ষমতা ও শ্রোতাদের মনস্তত্ত্ব বোঝার প্রয়োজন ছিল। সামান্য অসাবধানতার ফলে দাওয়াতের এই মিশন সাম্প্রদায়িকতার পথ সুগম করতে পারে। অপরদিকে শ্রোতাদের সেই আগ্রহকে নিঃশেষ করে দিতে পারে, যা তাদেরকে আমাদের জলসায় টেনে এনেছে। সেজন্য এই নাজুক কাজটি বেশির ভাগ আমি আর কমের ভাগ মাওলানা মানযূর সাহেব নুমানি আঞ্জাম দিতেন। আর আল্লাহর শোকর যে, এই মিশন খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

মিশর ও সিরিয়া সফর থেকে ফেরার পথে লাখনৌর তাবলীগি জামাতের ব্যবস্থাপনায় আমীনুদ্দৌলাহ পার্কে – যেটি ঝান্ডেওয়ালা পার্ক নামেও পরিচিত এবং যেখানে খেলাফত আন্দোলনের সময় থেকে নিয়ে এ-যাবত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং গান্ধিজি ও মতিলাল নেহেরু থেকে শুরু করে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও জওহার লাল নেহেরু সব সময় ভাষণ দিয়েছেন – একটি সাধারণ ও মিশ্র সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুসলিম-অমুসলিম সবাই অংশগ্রহণ করে। এখানে আমি 'আল্লাহর আনুগত্য ও প্রবৃত্তিপুজা' শিরোনামে সেই দুটি সমান্তরাল জীবনদর্শন ও বিশ্বজনীন ধর্মগুলোর উপর ভাষণ প্রদান করি, যেগুলো পৃথিবীকে বিভক্ত করে রেখেছে এবং আমি জীবনের উপর উভয়ের প্রতিক্রিয়ারও ব্যাখ্যা দিয়েছি।

অনেকের ধারণা, এই সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, যেমনটা বড়-বড় রাজনৈতিক নেতার এমনকি জওহর লাল নেহেরুর সমাবেশেও দেখা যায়নি। আল্লাহর মেহেরবানিতে হৃদয়ে বিষয়বস্তুর এমন উদয় ও ভাষণে এমন সাবলীলতা ও জোশ ছিল যে, তখন শ্রোতাদের মাঝে

যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে 'পিনপতন নীরবতা' দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বহুসংখ্যক রিকশাওয়ালা – যাদের স্টান্ড নিকটেই ছিল – যাত্রী নিতে অস্বীকার করে দিল এবং দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনতে থাকল। এই জলসার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল – আমার জন্য যেটি খুবই গুরুত্ববহ – যে, আমার মরহুম ভাইজানও পার্শ্ববর্তী একটি ভবনে বসে আমার তাকরির শুনছিলেন এবং এতে কোনো সংশয় নেই, তিনি তাঁর শ্রম ও মানসিক প্রশিক্ষণের জন্য খুবই আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়ে থাকবেন।

তারপর যথারীতি এ-ধারা শুরু হয়ে গেল। ৯ জানুয়ারি ১৯৫৪ গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল লাখনৌ-এ একটি ভাষণ প্রদান করি। এই সভায় শহরের নেতৃস্থানীয় ও অমুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের বিরাট একটি দল অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাবলীগি সফরে ইউপির পূর্বাঞ্চলীয় জেলা জৌনপুর, গাজিপুর আজমগড় ও গোরখপুরে এই ধারায় আরও চারটি ভাষণ প্রদান করি। শিরোনাম থেকেই (যার সবিস্তার বিবরণ এই অধ্যায়ে পেশ করা সম্ভব নয়) এ-ভাষণগুলোর মেজাজ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আন্দাজ করা যেতে পারে। শিরোনামগুলো নিম্নরূপ :

১. অবক্ষয়ের মূল হলো অনাচার ও পাপপ্রবণতা।
২. পৃথিবীর উপর আজ স্বার্থপরতা ও দুশ্চরিত্রতার শীতল বায়ু ছেয়ে আছে এবং গায়ে চাদর জড়িয়ে তাকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না।
৩. মানুষ আত্মপুজারিও, আত্মভোলাও।
৪. পৃথিবীতে বর্তমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত এটি নয় যে, মন্দ দূরীভূত হোক; বরং দ্বন্দ্বটা হলো, মন্দাচার আমার তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় হোক।
৫. উন্নত চারিত্রিক মূল্যবোধ হৃদয়ের মাঝে হারিয়ে গেছে; কিন্তু আমরা তাকে তালাশ করছি বাইরে।

প্রতিটি ভাষণের পরিসমাপ্তি এমন একটি বিষয়বস্তুর মাধ্যমে হতো, যার দ্বারা আসমানি হেদায়াতের প্রয়োজনীয়তা, নবুওতের কদর ও অবস্থান এবং তার সর্বশেষ কাঠামো ইসলাম অনুসন্ধানের স্পৃহা তৈরি হয়।

পরবর্তী বছর; মানে ১৯৫৫ সালে আবারও তাবলীগি সফরে মিশ্র সমাবেশের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন জায়গায় যেসব ভাষণ প্রদান করি, সেগুলোর শিরোনাম ও স্থান নিম্নরূপ :

১. জীবনে ব্যক্তির গুরুত্ব : আমাদের সংশোধনমূলক কাজগুলোতে বড় একটি শূন্যতা (টাউন হল, জৌনপুর)।
২. একটি পবিত্র ওয়াক্ফ ও তার মুতাওয়াল্লী (বলথরা রোড)।

৩. বর্তমান সভ্যতার ব্যর্থতা : উপলক্ষ্য ও লক্ষ্যের ভারসাম্যহীনতা (ভিক্টোরিয়া পার্ক, বেনারস)।

৪. দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা (আমীনুদ্দৌলা পার্ক, লাখনৌ)।

এই ভাষণগুলোর সময় মানুষের প্রভাবিত হওয়ার বেশ কটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে, এখানে যেগুলোর উল্লেখ অযৌক্তিক হবে না এবং যার দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, উল্লিখিত সাবধানতাগুলো বজায় রেখে যদি এই ধারা অব্যাহত রাখা যেত, আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের সঙ্গ দিত, তাহলে শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট একটি খেদমতই আঞ্জাম পেত না; বরং এই দেশটিরও সবচেয়ে জটিল সমস্যাটার সমাধানের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু – যেমনটি আপনারা সামনের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন – কিছু সমস্যা, এ বিষয়ের উপর সতর্ক ও ক্রিয়াশীল বক্তার দুষ্প্রাপ্যতা কিংবা অপ্রাপ্যতা এবং আমার ঘন-ঘন বিদেশ সফর ও শিক্ষাগত ব্যস্ততা এই ধারাটিকে অব্যাহত থাকতে দিল না।

একবার আমি সেওয়ানে রাতের মিশ্র সভায় যথারীতি বক্তৃতা করে বসতে চাচ্ছিলাম। এমন সময় জলসা থেকে একাধিক শোর উঠল, আরও বলুন; আমরা আরও শুনতে চাই। আমি বললাম, আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিনা প্রয়োজনে বক্তব্য চালু রাখা আমার অভ্যাস নয়। একথা বলেই আমি বসে পড়ছিলাম। ঠিক এমন সময় এক প্রবীণ হিন্দু 'ওয়ানডারফুল, ওয়ানডারফুল' (বিস্ময়কর! বিস্ময়কর!) বলে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল এবং বলল, আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমি শঙ্কা বোধ করলাম, পাছে লোকটা এমন কিছু বলে ফেলে কিনা, যার ফলে জলসায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে আমরা তাকে ভদ্রতার সাথে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ততক্ষণে লোকটি মঞ্চের কাছাকাছি চলে এল। শহরের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি বললেন, ইনি একজন সফল আইনজীবী এবং এখানকার প্রজা সোসালিস্ট পার্টির সেক্রেটারি বা সভাপতি। আমরা তাকে মাইক দিলাম। তিনি বললেন–

> 'আমি আমার জীবনে দুটি ভাষণ শুনেছি, যেগুলো সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হয়েছে। একটি হলো, মিস্টার সি.আর দাস-এর ভাষণ। অপরটি আজকের এই মাওলানা সাহেবের। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহেব (তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাক্যটি বলার চেষ্টা করছিলেন, যেটি

আমার বক্তৃতায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু বলতে পারলেন না।) খোদার সত্য নবী। মাওলানা সাহেব! আপনার কাছে শুধু মুসলমানদেরই নয় – আমাদেরও হক আছে। আমরা আপনাকে আগামীতেও এখানে আসবার জন্য কষ্ট দেব।'

এই অভিজ্ঞতা ও পদক্ষেপ ১৯৭৪ সালে 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে নিল, যার অভিজ্ঞতা বিগত অভিজ্ঞতাগুলোরই মতো সফল হলো এবং এই আন্দোলন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি, সুবিচার ও শান্তিপ্রিয় অমুসলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাঝে ইসলাম ও সীরাত অধ্যয়নের আগ্রহ ও চেতনা সৃষ্টি করে দিল। হিন্দুস্তান মানবীয় সংকট, চারিত্রিক বিপর্যয়, মানুষের জীবন ও সম্পদের মর্যাদা ও নিরাপত্তাহীনতা, স্বার্থপরতা ও ঐশ্বর্যপূজার উন্মাদনার কারণে যে-শঙ্কার সম্মুখীন, তার ভয়ংকর চিত্র উপস্থাপন ও দেশটিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার আহ্বানের প্রেক্ষাপটে কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু এমনও পর্যন্ত বলেছেন, আজ মনে হলো, এই দেশটিকে রক্ষা করার চিন্তা আমাদের চেয়ে মুসলমানদের বেশি।

দারুল উলূম দেওবন্দের একটি ভাষণ

প্রাচীন ও শক্তিশালী দীনি, ইল্‌মি ও একাধিক যৌথ বাস্তবতা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রজীবনের সেই চারটি মাস ব্যতীত, যে-সময়টিতে মাওলানা মাদানি (রহ.)-এর দরসে হাদীছে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছি; এক-দুটি সফর ব্যতীত দারুল উলূম দেওবন্দে সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ থাকেনি। তার চেয়ে বেশি যোগাযোগ ছিল আলীগড় ইউনিভার্সিটির সঙ্গে। ওখানে ছাত্রদের ইউনিয়নে বক্তৃতা করার জন্য বারবারই যাওয়া হয়েছে। ইসলামিয়াত ও দর্শন শাখার পক্ষ থেকেও একাধিক ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেগুলোতে ইউনিভার্সিটির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কারণ যা-ই থাকুক দারুল উলূম দেওবন্দের প্রশাসন কিংবা ছাত্রদের পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি, যার ফলে ওখানে গিয়ে আমি বক্তৃতা করার সুযোগ লাভ করব।

হঠাৎ একবার গায়েবিভাবে তার একটি ব্যবস্থা হয়ে গেল। তা এভাবে যে, দারুল উলূমে সাজ্জাদ লাইব্রেরি নামে ছাত্রদের একটি সংঘ ছিল, যার সঙ্গে বেশিরভাগ বিহারি ছাত্ররা সম্পৃক্ত ছিল। তাদের কারও-কারও আমার ব্যাপারে বিশেষভাবে জানাশোনা ছিল।

তারা ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে আমাকে দেওবন্দ আসার এবং সাজ্জাদ লাইব্রেরি আয়োজিত একটি জলসায় বক্তৃতা করার কিংবা নিবন্ধ পাঠ করার আমন্ত্রণ জানাল। আমি যাতে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করি কিংবা কোনো ওজর-অজুহাত না দেখাই, সেজন্য তারা মাওলানা মাদানি ও মাওলানা এযায আলী সাহেব (আমি যাদের বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম) দ্বারা একটি সুপারিশি পত্রও লিখিয়ে পাঠিয়ে দেয়। সেই পত্রটি এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। এখানে আমি সেটি হুবহু তুলে ধরলাম :

> 'জনাব মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া সাহেব যীদা মাজদুহু!
>
> দারুল উলূমের ছাত্রবৃন্দ ও সাজ্জাদ লাইব্রেরির সদস্যরা অত্যন্ত জোরালোভাবে কামনা করছে, তারা আপনার মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়াত দ্বারা উপকৃত হবে। আশা করি, আপনি তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিয়ে কৃতার্থ করবেন।
>
> ওয়াসসালাম
>
> নঙ্গে আসলাফ হুসাইন আহমাদ গুফিরা লাহু
>
> ২০, জুমাদাল আউয়াল, '৭৩ হিজরি (১৪ জানুয়ারি ১৯৫৪)।'
>
> 'মাওলানা মাদানি সাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত।'
>
> মুহাম্মাদ এযায আলী আমরোহি
>
> ২০, জুমাদাল আউয়াল, '৭৩ হিজরি।'

আমন্ত্রণটা যখন পেলাম, তখন আমি প্রচণ্ড হার্টের সমস্যায় ভুগছিলাম। বসে কাজ করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। কিন্তু তারপরও আমি ছাত্রদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিলাম। সম্মেলনটা ছিল মার্চ মাসে। আমি 'তালেবানে উলূমে নবুওত কা মাকাম আওর উন কী যিম্মাদারিয়াঁ' (নবুওতি শিক্ষার ছাত্রদের মর্যাদা ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য) শিরোনামে একটি নিবন্ধ তৈরি করতে শুরু করলাম। হার্টের সমস্যার কারণে তার বৃহৎ অংশ অনেক কষ্ট করে লিখিয়েছি। এই নিবন্ধে দীনি মাদরাসাগুলোর প্রকৃত অবস্থান ও তার শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ও সজাগ করার চেষ্টা করেছি। বোঝাতে চেয়েছি আধুনিক যুগ তাদের থেকে কীরূপ প্রত্যাশা রাখে এবং এ যুগে দীনের দাওয়াত ও মানুষকে তা বোঝানোর জন্য কোন ধরনের মানসিক,

চিন্তানৈতিক, বিদ্যাগত, চারিত্রিক ও আত্মিক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। এই নিবন্ধটির প্রাণ ও তার মূল চিন্তা-চেতনা অনুমান করতে তার দুটি নির্বাচিত অংশ এখানে উপস্থাপন করছি। মাদরাসার (ধর্মীয় শিক্ষা ও মুসলমানদের দীনি ও চিন্তানৈতিক নেতৃত্বের কেন্দ্র) যিম্মাদারি ও তার ভারবহনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছি :

> 'জগতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি কেন্দ্র ও প্রতিজন ব্যক্তির বিশ্রাম ও ছুটির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মাদরাসার কোনো ছুটি নেই। দুনিয়াতে প্রতিজন মুসাফিরের জন্য বিশ্রাম আছে। কিন্তু এই মুসাফিরের জন্য বিশ্রাম হারাম। জীবন যদি থেমে থাকত, দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে মাদরাসাও চলতে-চলতে শ্বাস নিয়ে নিত। কিন্তু জীবন যখন চলমান, তখন মাদরাসায় স্থবিরতা ও ছুটির অবকাশ কোথায়! তাকে পায়ে-পায়ে জীবনের পরিসংখ্যান নিতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিগুলোতে তাকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। নতুন-নতুন ফেতনার মোকাবেলা করতে হবে। স্খলিত পাগুলোকে পথের উপর তুলে আনতে হবে। টলটলায়মান পাগুলোকে আঁটসাঁট করে দিতে হবে। সে যদি জীবন থেকে পেছনে পড়ে যায় কিংবা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে কিংবা কোনো মনযিলে অবস্থান গ্রহণ করে বা কোনো একটি স্থান যদি তার মনঃপুত হয়ে যায়, তাহলে কে জীবনকে সঙ্গ দেবে? কে তাকে নেতৃত্ব দেবে? মুহাম্মাদি পয়গাম তাকে কে শোনাবে? মাদরাসার ছুটি গ্রহণ ও নেতৃত্ব থেকে পাশ কাটানো, কোনো মনযিলে অবস্থান গ্রহণ আত্মহত্যার সমার্থক এবং মানবতার সাথে বিশ্বাসঘাতকার শামিল। কোনো আত্মসচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ মাদরাসা এর কল্পনাও করতে পারে না।'

জীবনের সঙ্গে ইসলামি জ্ঞানের সম্পর্ক এবং তার জন্য আমাদের পূর্বসূরীগণ যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

> 'প্রিয় ছাত্র ভাই ও বন্ধুগণ! নবুওত আমাদেরকে যে-জ্ঞান ও যেসব রীতি-নীতি দান করেছে, তার মাঝে একটি বিন্দু-বিসর্গও রদবদল করার সুযোগ নেই। আপনাদের পূর্বসূরীদের সংস্কারমূলক কীর্তি যে, সে-সবের মধ্যে তাঁরা

কোনো বিকৃতি বা রদবদল হতে দেননি এবং জ্ঞানের এই ভাণ্ডারটিকে আমাদের হাত পর্যন্ত কোনো প্রকার কাটছাট ব্যতিরেকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

'কিন্তু এ-বাস্তবতাও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সেই পূর্বসূরীগণ এ-ভাণ্ডারটিকে জীবনে স্থানান্তরের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা আপন-আপন মেধা ও মেহনত দ্বারা একে একটি জীবন্ত, কার্যকর ও ক্রমবিকাশমান জ্ঞানভাণ্ডার প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা তার এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, তাঁদের সমসাময়িক প্রজন্মের মস্তিষ্ক তাকে অনায়াসে গ্রহণ ও হজম করে নিয়েছে এবং তাঁরা নিজেদের সময়, জ্ঞানগত স্তর আর এই ভাণ্ডারের মাঝে কোনো তারতম্য ও ব্যবধান অনুভব করেনি। তাঁদের মাঝে আসল শরীয়ত, দীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কুরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে পর্বতের মতো দৃঢ়তা ও সিসার মতো কাঠিন্য ছিল। কিন্তু তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ফুলের মতো নমনীয়তা এবং রেশমের মতো কোমলতা ছিল। তাঁদের কর্ম মূলত হযরত আলী মুরতজা (রাযি.)-এর সেই বিজ্ঞোচিত নির্দেশনার প্রতিফলন ছিল যে, তিনি বলেছিলেন :

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ؟

"মানুষের সঙ্গে তোমরা তাদের জ্ঞান অনুপাতে কথা বলো। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?"

সেজন্যই তাঁরা প্রতিটি যুগের জ্ঞানের স্তর অনুপাতে দীনের ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন এবং সময়ের মনস্তত্ত্ব ও প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ রেখেছেন।'

এই জলসা ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দারুল উলূমের ছাত্রদের বিরাট একটি দল অংশগ্রহণ করে এবং তারা অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে আমার বক্তব্য শোনে। এই নিবন্ধে আমি নিত্যনতুন আন্দোলনগুলোর সাথে গভীর ও সমালোচনামূলক অবগতির প্রয়োজনীয়তা, নতুন অধ্যয়নের জটিলতা ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর আলোকপাত করেছি। তদুপরি দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি ও আরবি ভাষায়

দক্ষতা অর্জনের উপরও জোর দেওয়া হয়। অবশেষে বিশুদ্ধ বোধ-বিশ্বাসের সুরক্ষা এবং নতুন যুগের নতুন-নতুন ফেতনাগুলোর জন্য এক-একজন ছাত্রকে কর্মজীবনে সেকান্দরি প্রাচীরে পরিণত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিবন্ধের ইতি টানা হয়। এই নিবন্ধে এমন বুনিয়াদি ও জরুরি কথাবার্তা এসে পড়েছে যে, যদি আমার সাধ্যে কুলোয়, তাহলে আরবি মাদরাসাগুলোর (বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার মাসলাকের অনুসারী অপরাপর সমস্ত মাদরাসার) ছাত্রদের জন্য শিক্ষা সমাপণের আগে এটি আরেকবার পড়ে নেওয়া জরুরি সাব্যস্ত করে দেব।

এ-সম্মেলন ও নিবন্ধের মাধ্যমে দারুল উলূমের ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কের নবায়ন হয়ে যায়। তার কিছু দিন পর আমাকে ওখানকার সিলেবাস সংশোধন কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। মাওলানা সাইয়িদ সুলায়মান নদবির মৃত্যুর কারণে এই পদটি শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ভাই সাহেব মরহুমের ওফাতের পর (যিনি দারুল উলূমের একজন বিশিষ্ট ছাত্রও ছিলেন এবং মজলিসে শুরার সদস্যও) তাঁর জায়গায় সদস্যপদের জন্য আমাকে বেছে নেওয়া হলো, যার ধারা এই মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

কিছুদিন পর পুনরায় আমার (১২ আগস্ট ১৯৭২) দারুল উলূমের ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ ঘটে। আমি 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও তার জবাব' শিরোনামে একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করি। এই ভাষণটিও আলাদা পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'পাজা সুরাগে যিন্দেগী' নামক সংকলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সফর

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বছরের-পর-বছর কেটে গেল; কিন্তু পাকিস্তান যাওয়ার সুযোগ এল না। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু খতমে নবুওত আন্দোলনের সুবাদে লাহোর প্রভৃতি শহরে মার্শাল ল' জারি ছিল। বিধায় আমি দিল্লি থেকেই ফিরে এলাম। ১৩৭৩ হিজরিতে (১৯৫৪ খ্রি.) হযরত রায়পুরি পাকিস্তান সফররত ছিলেন এবং সে-বছর রমযান মাস ঘোড়াগলিতে (কোহমরি) কাটাবেন বলে সিদ্ধান্ত ছিল। মনে পাকিস্তান সফর এবং হযরতের সঙ্গ ও সাহচর্যে রমযান কাটানোর বাসনা বিরাজ করছিল। একসময় এ-বাসনা শক্তিশালী প্রত্যয়ে পরিণত হয়ে গেল। আমি ১৩৭৩ হিজরির শাবান মাসের (মে ১৯৫৪) কোনো এক তারিখে একা লাখনৌ থেকে লাহোরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

লাহোরে দু-তিন দিন আমার বন্ধুবর হাজী আরশাদ সাহেবের কাছে অবস্থান করে – এ সময়ে কয়েকবারই মাওলানা আহমাদ সাহেব লাহোরির সাক্ষাতের মর্যাদা ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও মুরুব্বিয়ানাসুলভ মমতার সৌভাগ্য আমার নসিব হয়েছে – রাওয়ালপিন্ডির পথে মরির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। হযরত মুহাম্মাদ শফী কুরাইশি সাহেব ও মালিক মুহাম্মাদ দীন সাহেবের আতিথেয়তা ও ব্যবস্থাপনায় আমি ঘোড়াগলিতে থাকতে লাগলাম। একশোরও বেশি মেহমান ছিল। পাহাড়ের চূড়ায় একটি সরগরম খানকার দৃশ্য ছিল। এই দৃশ্য আমাকে গিয়াসপুরের চিশতি এবং মাকান শরীফ (গুরুদাসপুর জেলা) ও চিতলিকবর দিল্লির নকশবন্দি খানকাগুলোর স্মৃতি তাজা করে দিয়েছিল। মাওলানা সাইয়িদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারির পুত্র মৌলভী সাইয়িদ আতাউল মুনয়িম কুরআন শরীফ শোনাতেন। আলেম ও নেককার লোকদের বিশাল একটি সমাবেশ ছিল। সবাই দিন-রাত ইবাদাত, নফল নামায ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল।

আমার অবস্থান শ্রদ্ধেয় চাচা আলহাজ সাইয়িদ মুহাম্মাদ খলীল সাহেব নাহটুরি ও তাঁর পুত্র সাইয়িদ মুহাম্মাদ জামীল সাহেবের সঙ্গে একই কক্ষে ছিল। ইফতার, খাবার তারাবীহ হযরতের সঙ্গে হতো। আমি হযরতের বিশেষ মমতা দ্বারা সিক্ত ছিলাম। ঈদের পর রাওয়ালপিন্ডিতে দিনচারেক অবস্থান করে লাহোর এসে পড়লাম। ওখানে আরশাদ সাহেবের কাছে আনারকলিতে টেলিগ্রাফ অফিসের কোয়ার্টারে অবস্থান নিলাম। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করলেন, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব নদবি আমার এই পাকিস্তান সফরের দুমাস আগে ১৬ মার্চ ১৯৫৪ এই নশ্বর জগত ত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে চলে গেছেন! বললেন, তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আপনারা দুজন মিলিত হয়ে কতই-না আনন্দিত হতেন!

মাওলানা মাসউদ আলম সাহেব তো আখেরাতের সফর বরণ করে নিয়েছেন; কিন্তু অপর এক বন্ধু, আমার বহু বছরের সহকর্মী মাওলানা মুহাম্মাদ নাযেম নদবি আলহামদুলিল্লাহ জীবিত ছিলেন। আমি যতবার পাকিস্তান এসেছি, সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি ভাওয়ালপুর থেকে সফর করে আসতেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করে বিগত দিনগুলোর স্মৃতি তাজা করে দিতেন।

লাখনৌ ও রায়বেরেলির পর লাহোর আমার সবচেয়ে আপন শহর। ওখানে আমি ছাত্রজীবনেরও একটি আনন্দময় সময় কাটিয়েছি এবং বিভিন্ন সময়ে লাগাতার কয়েক মাসের দীর্ঘকাল এখানে অতিবাহিত করেছি। তার

সঙ্গে আমার শৈশব ও যৌবনের, ইলমি ও রূহানি উপকারের অনেক স্মৃতি বিজড়িত। শাহ্ আজিমাবাদির এই চরণদুটি আমার অবস্থার অনুরূপ ছিল :

ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ

ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں

'এই গলির প্রতিটি অণুর সঙ্গে আমি পরিচিত।

বহুকাল এপথে আমি এসেছি, গিয়েছি।'

পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তখন যদিও আমার বিরোধ ছিল এবং আমি মুসলমানদের সবটুকু শক্তি হিন্দুস্তানে থেকে দীনের প্রচার, একটি উন্নততর নৈতিক, আত্মিক, মানবীয় ও ইসলামি জীবনের নমুনা কায়েম করে ওখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহজাত দীনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার কাজকে বেশি জরুরি ও উপকারী মনে করতাম এবং আমার নিকট তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর এখন তার বিরোধিতা ও অকল্যাণ কামনার পরিবর্তে তার জন্য শুভকামনা ও উন্নতি-অগ্রগতির দু'আ করছিলাম।[১]

পাকিস্তান এসে আমি কোনো এক সুযোগে বলেছি, 'ওছমানি সাম্রাজ্যের পতনের পর ইসলমি জগতের কোনো দেশ, মিল্লাতে ইসলামিয়ার কোনো একটি ভূখণ্ড, কোনো একটি পরিবার এমন পজিশনে নেই যে, ইসলামি বিশ্বের কোনো একটি সমস্যায় নিজের রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে পারে। এই খেদমত এখন পাকিস্তান (যদি সে সেই শর্তগুলো পূরণ করে, যেগুলো একটি নির্ভেজাল ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য জরুরি) আঞ্জাম দিতে পারে।'

আমি লাহোরে এই শখ নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলাম যে, নিজের শুরু জীবনের সেই স্থানগুলো দেখব, যেখান দিয়ে আমি বহুবার পথ অতিক্রম করেছি। কিন্তু নগরীটা আমার কাছে অনেক বদলে-যাওয়া মনে হলো। আগের চেহারা এখন আর নেই। আমি বন্ধুদের বললাম, লাহোরের আগেকার সেই রওনক, সেই ভিড়ভাড় তো দেখতে পাচ্ছি না। তারা বললেন, না; সব কিছুই তো এখন আগের তুলনায় উন্নত।

---

১. মাওলানা আযাদের মতো অবিভক্ত হিন্দুস্তানের সমর্থক ও দেশপ্রেমিক নেতা – যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিলেন – পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর একাধিকবার বলেছেন, এখন যখন পাকিস্তান হয়েই গেছে, তখন একে কীভাবে সমৃদ্ধ ও উন্নত করা যায় সেই চেষ্টা করা উচিত।

লাহোরের দ্বিতীয় সফর

পরবর্তী বছর; মানে ১৯৫৫ সালের গ্রীষ্মকালে আবারও লাহোর গেলাম। স্নেহের ভাগিনা মৌলভী সাইয়িদ মুহাম্মাদ ছানী আমার সঙ্গে ছিল। এই সফরে লাহোরে সেই ঐতিহাসিক বন্যা হলো, যেটি আমাদের এখানকার ১৯১৫ সালের প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। লাহোর শহরের বহু সড়ক পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। আমি পেশোয়ার-কোহাটের সফরে ছিলাম। সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর পাণ্ডুলিপিটি বাদামিবাগে অবস্থিত সুলতান ফাউন্ডারির একটি আলমারিতে রেখে গিয়েছিলাম, যার অবস্থান ছিল নিম্ন এলাকায়। বন্যার খবরাখবর রেডিওতে প্রচার হচ্ছিল। মনে হঠাৎ ফিরে আসবার তাগাদা জন্মে গেল। বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করল, দশ-এগারো বছর পর এসেছেন; দশটা দিনও তো থাকা দরকার। আমি তাদের আব্দার-অনুযোগ উপেক্ষা করে লাহোরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। ট্রেন যখন লাহোর স্টেশনে পৌছল, তখন বিপদের সাইরেন বাজছিল। এটি সর্বশেষ ট্রেন ছিল, যাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সুলতান ফাউন্ডারির সামনের সড়কে পানি উঠে গিয়েছিল। এই পেরেশানির মধ্যে আমি তালা ভেঙে পান্ডুলিপিটি বের করলাম এবং মালরোডে অবস্থিত ডক্টর আসলাম সাহেবের বাড়ির উপর তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ওখানে থাকতেই দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার শায়খুল হাদীছ মাওলানা শাহ হালীম আতা সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ পেলাম। তিনি ১৩৭৫ হিজরির ২০ সফর মোতাবেক ১৯৫৫ সালের ১৯ অক্টোবর ব্রেন স্ট্রোকজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু ইলমি ও দীনি ক্ষতির পাশাপাশি একটা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দুর্ঘটনাও ছিল। সে-সময়ই স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়া মরহুমের প্রকাশিত আরবি পত্রিকা 'আল-বা'ছুল ইসলামী'র প্রথম সংখ্যাটি আমার হাতে পৌঁছয় এবং কপিটি হাতে পেয়ে আমি সীমাহীন আনন্দিত হই যে, এমন দাওয়াতি পত্রিকার খুবই প্রয়োজন ছিল।

জামেয়া সালাফিয়ায় একটি মানপত্র

লাহোরের শুরুর দিককার সফরগুলোর মধ্য থেকে কোনো এক সফরে আমার এক বন্ধু মাওলানা আতাউল্লাহ জাইফ সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা ভালবাসার খাতিরে জামেয়া সালাফিয়ায় (শিশমহল রোড, লাহোর) আমার সম্মানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং জামায়াতে আহলে হাদীছের

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের – যাঁদের মধ্যে বেশ কজন নদওয়া-ফারেগও ছিলেন – আমন্ত্রণ জানালেন। আমার জন্য এ-বিষয়টি কোনো অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর ছিল না যে, সাইয়িদ সাহেবের জামাতে উভয় চিন্তা ও উভয় শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত এবং নেতৃত্ব, লক্ষ্যের অভিন্নতা, নিষ্ঠা ও সত্যিকার রূহানিয়াত তাদের পরস্পর দুধ-চিনি বানিয়ে রেখেছিল। আমাদের পরিবারেও এ-ক্ষেত্রে সেই সাম্প্রদায়িকতা পাওয়া যেত না, যার অভিজ্ঞতা আমি বাইরে বের হয়ে অর্জন করেছি। স্বয়ং আমার দুজন ওস্তাদ শায়খ খলীল ইবনে মুহাম্মাদ আরব ও শায়খ তকিউদ্দীন আল-হিলালী এই মাসলাক ও জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আমার হাদীছের শায়খ ও ওস্তাদ মাওলানা হায়দার হাসান খান সাহেব টুঙ্কি গোড়া হানাফী ছিলেন। এই ওস্তাদগণের শিষ্যত্বও আমার মাঝে একটি ভারসাম্য ও উদারতা তৈরি করে দিয়েছিল। সে-কারণে এই দাওয়াত ও সম্মাননা গ্রহণ করে নিতে কোনো দ্বিধা হয়নি। কিন্তু আমি বিস্মিতও হলাম এবং অনুতপ্তও হলাম তখন, যখন ওখানে আমাকে একটি মানপত্র পেশ করা হলো এবং মাওলানা সাইয়িদ দাউদ গযনবি সাহেব (যিনি প্রকৃতপক্ষে আমার ওস্তাদ ও মুরুব্বীদের কাতারে বসবার উপযুক্ত ছিলেন) নিজে পত্রটি পাঠ করেন। এটি তাঁর বিনয়ের পাশাপাশি হযরত সাইয়িদ সাহেব ও তাঁর বংশ-মাসলাকের সাথে রূহানি সম্পর্কের ফল ছিল। তাঁর পুত্র মাওলানা সাইয়িদ আবুবকর গযনবিও আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর পত্রগুলো পাঠ করলেই বিষয়টি অনুমান করা সম্ভব হবে।

'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' সিরিজ গ্রন্থটি লেখার সূচনা

বেশ কিছুদিন যাবত মনে একটি ভাবনার উদয় হচ্ছিল (এবং শিক্ষিত শ্রেণি ও দীনদার যুবকদের মাঝে বসে অভিজ্ঞতাও হয়েছিল) যে, ভালো-ভালো সুশীল সমাজগুলোতে ধারণা জন্মে গেছে, ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে সংশোধন, সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্নরূপে পাওয়া যায় না। বরং তার মাঝে অনেক বড় ও দীর্ঘ ফাটল দেখা যায়, যা কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েক শতাব্দির পর কিছু ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে আসছেন, যাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও শক্তিগুলোর সঙ্গে পাঞ্জা পরীক্ষা করেছেন এবং কোনো একজন উঁচুকায় ও পর্বতসম ব্যক্তিকে খর্বকায় কতগুলো মানুষের দীর্ঘ সারিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বলে দেখা যাচ্ছে। অন্যথায় সচরাচর দুর্যোগের বান, ক্ষমতা ও সময়ের তাল ও রুচির সঙ্গে ভেসে যাওয়া আলেম, মাশায়েখ, লেখক ও চিন্তাবিদরা-ই চোখে পড়ছে।

বিষয়টা (যেমনটি আমি 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছি) চোখের দেখায় খুবই সাধারণ মনে হচ্ছে; কিন্তু এর ফলাফল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এটি ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও যোগ্যতার ব্যাপারে এক ধরনের কুধারণা ও হতাশা, যা কিনা প্রতিটি যুগে প্রয়োজনের মানুষ ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রপথিকদের জন্ম দিয়ে আসছে এবং যার নজির অন্য কোনো ধর্ম বা জাতিতে পাওয়া যাবে না। এটা হীনম্মন্যতা ও মানসিক বিপর্যয়ের কুফল, যার জন্য ইসলামের জীবন সঞ্চালন ও ব্যক্তি তৈরির ক্রটি দায়ী নয় – এটা ইসলামের ইতিহাস রচনার ধারা ও বিন্যাসের ক্রটি, যা কিনা সরকার, রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। সে ইসলামের ইতিহাস, নবজাগরণ ও সংশোধনকে বিন্যস্ত ও ইলমি ধারায় উপস্থাপন করার চমৎকার কোনো চেষ্টা করেনি। সংক্ষেপে, এটা ইতিহাসের ক্রটি নয় – ইতিহাস লেখকদের ক্রটি।

হযরত একবার বাহাট-এ শাহ মাসউদ সাহেবের বাড়িতে অবস্থানরত ছিলেন। এক অমুসলিম – যে কিনা সবে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছে এবং রায়পুর আসা-যাওয়া করছে – প্রভাতের বায়ুসেবনের সময় হযরতের সঙ্গে ছিল। হযরত তাকে উদ্দেশ করে বললেন, ইসলামের সত্যতার এটিও একটি প্রমাণ যে, ইসলামের যেকালে যে-ধরনের কর্মীর প্রয়োজন হয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের তৈরি করে আসছেন এবং যেযুগে যে-ধরনের ফেতনা মাথা জাগিয়েছে, তার মোকাবেলার জন্য আল্লাহ উপযুক্ত ব্যক্তিত্বদের সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হযরতের সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটি আমার সম্মুখে ঐতিহাসিক ও ইলমি সাক্ষ্যমালার একটি বাহিনীকে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল এবং এ-বিষয়ে বিস্তারিত লেখার অনুপ্রেরণা তৈরি করে দিল।

ঘটনাক্রমে ১৩৭২ হিজরির মুহাররমে (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) লাখনৌ-এ জামাতে এসলাহ ও তাবলীগ-এর পক্ষ থেকে একটি আলোচনার আয়োজন করা হলো। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা হলো, জামাতের দায়িত্বশীলদের সম্মুখে এমন কয়েকটি জরুরি শিরোনাম ও বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করা হবে, যার ফলে তাদের মানসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ে। এই ধারাবাহিকতার একটি শিরোনাম 'সংশোধন ও সংস্কারের ইতিহাস এবং তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বগণ' আমার ভাগে পড়ে। প্রায় এক সপ্তাহ এ বিষয়ের উপর আলোচনা চলতে থাকে। তখন শুধু একটা ডায়েরি সামনে থাকত। তাতে কিছু শিরোনাম ও ইঙ্গিত থাকত, যার সাহায্যে আমি বক্তৃতা করতাম। জামাতের এক বন্ধু আবদুস সামাদ সাহেব বেরেলবি

অনেক কষ্ট করে সেই বক্তৃতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন। যখন তার পান্ডুলিপিটির উপর চোখ বোলালাম, তখন প্রতীয়মান হলো, যদি তার উপর ইলমি ও ঐতিহাসিক ধারায় মেহনত করা হয় এবং তাকে গ্রন্থের রূপ দেওয়া হয়, তাহলে বড় একটি উপকারী কাজ হবে। এই কাজটি করে ফেলতে পারলে শুধু এসলাহ ও দাওয়াতের ইতিহাসই সংকলিত হবে না, বরং প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলমানদের চিন্তানৈতিক ও জ্ঞানগত উত্থান-পতনের ইতিহাসও অস্তিত্বে এসে পড়বে।

আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজটি শুরু করে দিলাম। শুরু করার পর এবার কাজটির জটিলতা, ইতিহাসের হারিয়ে-যাওয়া-কড়াগুলো পুনরুদ্ধার করে আনা, তাদের একটাকে আরেকটার সঙ্গে জোড়ানোর নাজুক ও কঠিন দায়িত্ব অনুমান করতে পারলাম। কিন্তু ততক্ষণে বিষয়টি আমার মন-মানসিকতা ও স্নায়ুর উপর চেপে বসে গেছে এবং সমুদ্র থেকে কম্বল উদ্ধারকারীকে কম্বলই ধরে ফেলেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, শ্রদ্ধেয় মুরশিদ হযরত রায়পুরি (রহ.) মারকাযে উপস্থিত। আর আমি-ই আসল মেজবান। কিন্তু সকালবেলার জরুরি কাজগুলো থেকে অবসর হয়ে মারকাযের উপর তলায় চলে যাচ্ছি আর হযরতের খাওয়ার সময় পর্যন্ত লেখার কাজে ব্যস্ত থাকছি। কয়েকবার মাথায় ভাবনা এল, হযরত তো আমার অনুপস্থিতি টের পেয়ে থাকবেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশান্ত হয়ে যেতাম যে, এই প্রচেষ্টার ফলাফল যখন সামনে আসবে, তখন হযরতই সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন।

প্রথম খণ্ডটি ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসেই সমাপ্ত হয়ে গেল। তাতে একটি সুদীর্ঘ ও তথ্যবহুল ভূমিকা ছাড়াও – যাতে সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের ইতিহাসে তার ধারাবাহিকতা এবং অপরাপর ধর্মগুলোর ইতিহাসে ব্যক্তিত্বের অভাবকে ধর্মগুলোর ঐতিহাসিক তথ্যাটি দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে – হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)–এর সংশোধন ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাসমূহ (প্রথম হিজরি সন) থেকে নিয়ে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর (সপ্তম হিজরি সন) সংস্কারমূলক ও বৈপ্লবিক চিন্তার কীর্তির রোয়োদাদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ-গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড়-এর চেয়ে অধিক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়টি চোখে পড়ছিল না। (তখনও অবধি মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম অস্তিত্বে আসেনি)। আমি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা শাহ মুঈনুল্লাহ সাহেব নদবিকে ব্যাপারটি অবহিত করলাম। তিনি

পরম শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে দারুল মুসান্নিফীন-এর পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। অবশেষে ১৯৫৫ সালে বইটি মুদ্রিত হয়ে হাতে এল এবং ইলমি ও ইসলামি অঙ্গনগুলোতে আশানুরূপ সাড়া জাগাল।

যেমনটি আমি উপরে বলে এসেছি যে, এ বইটির সবচেয়ে বেশি কদর আমার মুরশিদে মুহতারাম হযরত রায়পুরি (রহ.) করেছেন। এখানে আমি হযরতের কয়েকটি চিঠির একাধিক চয়ন উদ্ধৃত করলাম। ১৯৫৬ সালের ২০ অক্টোবরের এক চিঠিতে হযরত লিখেছেন :

> 'অধম আজকাল আপনার গ্রন্থ 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' শ্রবণ করছি। বইটি আমি শাহ সাহেবের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছি। মাশাআল্লাহ অনেকই ভালো গ্রন্থ। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আপনি অনেক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে গ্রন্থটি লিখেছেন। বাস্তবিকই এটি আপনার একটি অপার ও অমর কীর্তি। মহান আল্লাহ বইটি কবুল করুন। কী আর বলব; এই গ্রন্থটি লেখার কাজে আপনার আগ্রহের বিষয়টি আমি কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারছি।'

১৯৫৬ সালের ২৮ নভেম্বরের এক চিঠিতে তিনি মাওলানা রুম (রহ.)-এর সেই কবিতাগুলো উল্লেখ করার পর, যেগুলো তিনি হযরত শামসে তাবরীয (রহ.)-এর ভালবাসায় বলেছিলেন, লিখেছেন :

> 'আপনার কিতাবটি এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো শুনছিলাম। কিন্তু আজা কাজী এহসান সাহেব চেয়ে বসলেন এবং নিয়ে গেলেন। কিতাবটি যতই পড়ি, তৃপ্ত হতে পারি না।'

অপর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> 'খুবই ভালো হবে যদি কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রকাশিত হয়ে যায়।'

লেখক আলেমদের মধ্যে মুহতারাম মাওলানা সাইয়িদ মানাযির আহসান গিলানি কিতাবটির সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন, যিনি বোধহয় মুসলিম বিশ্বে; অন্তত হিন্দুস্তানে এ-বিষয়ে লেখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখতেন এবং যার লেখনি থেকে খোদ লেখক অনেক উপকৃত হয়েছেন। মাওলানা বইটি পেয়ে যে-পত্রটি লিখেছেন, তার একটি চয়ন এখানে তুলে ধরলাম :

"দাওয়াত ও আযীমত'-এর ইতিহাস পেয়েছি। নিজের হারানো বস্তু হাতে ফিরে এসেছে। আল্লাহ্ই জানেন, কতবার পড়ে এর দ্বারা উপকৃত হতে থাকব। পড়ছি; কিন্তু মন ভরছে না। আল্লাহ্-ই জানেন, আমার কত স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার দ্বারা পূরণ হবে।'

আলহামদুলিল্লাহ! ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে এর দ্বিতীয় খণ্ডটি সমাপ্ত হয়ে গেল, যেটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ এবং শুধুই তাঁকে নিয়ে লেখা। তার প্রথম মুদ্রণটিও দারুল মুসান্নিফীন, আজমগড় থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মাঝে একাধিক দীর্ঘ সফর ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ছয় বছরেরও বেশি সময় বিরতি পড়ে গেছে। যেহেতু হযরতের জানা ছিল, এই খণ্ডে সুলতানুল মাশায়েখ খাজা নিযামুদ্দীন মাহবুবে এলাহির আলোচনা আসবে, তাই এই খণ্ডটির জন্য তাঁর আরও বেশি তাড়া ও আগ্রহ ছিল। বাইরে থেকে এসে যখনই হযরতের খেদমতে হাজির হতাম, প্রথম প্রশ্নটি করতেন, তৃতীয় খণ্ডটি সমাপ্ত করে ফেলেছেন? কোনো-কোনো সময় যিকির ও সুলুকের কাজে নিজের ত্রুটি ও শূন্যতার অভিযোগ করলে উত্তরে তিনি শুধু বলতেন, 'আপনি তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত'-এর তৃতীয় খণ্ডটি শেষ করে দিন।'

এদিকে আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, কলম যেন আমার থমকে গিয়েছিল এবং এ বিষয়টির সঙ্গে আমি সম্পর্কহীন হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সমস্ত বাহিনী-ই আল্লাহর। তিনি আয়োজন করে দিলে বান্দার আর কোনো সমস্যা-ই থাকে না। ১৯৬১ সালে রায়বেরেলি জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল। আমাদের বাড়িগুলো নদীর কূলেই ছিল। অগত্যা আমরা পার্শ্ববর্তী উঁচু এলাকা ময়দানপুর গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় নগরী ও লাখনৌ-এর সঙ্গে যোগাযোগ হয় বন্ধ ছিল, নতুবা অনেক দুষ্কর ছিল। আমার আবুতাম্মাম-এর কথা মনে পড়ে গেল। আবুতাম্মাম এক বিদ্বান মেজবানের বাড়িতে আটকা পড়ে 'দেওয়ানে হামাসা' গ্রন্থটি রচনা করে ফেলেছিলেন। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় আমারও 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত'-এর তৃতীয় খণ্ডটি লেখার কাজে হাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। সে-সময় আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি (ছানির কারণে) অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। স্নেহাস্পদ সাইয়িদ মুশাররফ আলী নদবি কপি ও অনুলিপির দায়িত্ব বরণ করে নিল আর আমি একটি ডায়েরির সাহায্যে – যার মধ্যে 'সীয়ারুল আওলিয়া' প্রভৃতির নোট ছিল – গ্রন্থটি

লেখাতে শুরু করে দিলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ সময়ে হযরত সুলতানুল মাশায়িখ-এর অংশটুকু সমাপ্ত হয়ে গেল।

এ সময়ে যদি কোনো কিতাবের বেশি প্রয়োজন দেখা দিত, নদওয়াতুল উলামার বিশাল কুতুবখানা থেকে চেয়ে পাঠাতাম এবং ব্যবস্থাও হয়ে যেত। আমি একটি পত্রের মাধ্যমে হযরতকে অবহিত করলাম, আপনার আদেশ পালিত হয়ে গেছে। বন্যার যন্ত্রণা দূর হওয়ার পরপরই আমি হযরতে দরবারে হাজির হলাম। আমাকে দেখামাত্রই হযরত বইটি শোনার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। আমি শুরু করলাম। প্রতিদিন যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত, আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকল। কক্ষে অন্ধকারের কারণে মাঝে-মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে কিতাবটি পড়া হতো। শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো কাজ সে-সময়ে হয়নি।

আক্ষেপের বিষয় হলো, এই কিতাবটির দ্বিতীয় খণ্ড – যেটি হযরত মাখদূমুল মুল্‌ক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরিকে নিয়ে রচিত – হযরতের জীবদ্দশায় সমাপ্ত করতে পারিনি। হযরত যে-রোগে মারা গেছেন (আগস্ট ১৯৬২), সে-সময় আমি লাহোর অবস্থানকালে এই খণ্ডটি রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তার প্রথম অংশটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরতের স্বাস্থ্য ও রোগের ধরন এমন ছিল যে, এই পাণ্ডুলিপিটি তাঁর সামনে পেশ করা সমীচীন মনে করিনি। হযরতের ওফাতের পর ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে এই খণ্ডটি মজলিসে তাহ্‌কীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম-এর পক্ষ থেকে (যেটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল) প্রকাশিত হয়। মজলিস কিতাবটির প্রথম দুটি খণ্ডও প্রকাশ করে এবং তার কয়েকটি এডিশন বিক্রি হয়ে যায়।

চতুর্থ খণ্ডটি রচনায় – যেটি শুধু হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানিকে নিয়ে রচিত হবে – আরও বেশি সময় লেগে গেল। কারণ, এটি বিগত খণ্ডগুলোর তুলনায় আরও বেশি স্পর্শকাতর ও দুষ্কর ছিল। আঠারো বছরের দীর্ঘ বিরতির পর এই কাজটি আঞ্জাম দেওয়ার তাওফীক হলো। আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ এই তিনটি খণ্ড আরবিতে এবং চারটির সব কটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে গেছে। এখন বাকি আছে শুধু পঞ্চম খণ্ডটি, যেটি হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবি (রহ.) এবং তাঁর পুত্রগণ ও খলীফাদের নিয়ে রচিত হবে। সম্ভবত ভারতের বাইরের সেই ব্যক্তিত্ব ও তাদের কীর্তিমালাও এই খণ্ডটিতে স্থান পাবে, যারা শাহ সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁদের মাঝে ও শাহ সাহেবের দাওয়াত ও এসলাহের মাঝে অনেকখানি মিল পাওয়া যায়।

সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর কাজ আলহামদুলিল্লাহ আগেই সমাপ্ত হয়ে আছে। সংশোধন ও সংস্কারের এই ইতিহাস ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমার কলম থেকে তার পরেরও বেশ কজন শীর্ষস্থানীয় দাওয়াতি ও এসলাহি ব্যক্তিবর্গের জীবনী বের হয়েছে, যা উল্লিখিত মনীষীবর্গের পরবর্তী যুগের এসলাহি, তরবিয়তি, রূহানি ও দাওয়াতি মেহনতগুলোর উপর আলোকপাত করছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দামেশক ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বক্তৃতার ধারা এবং সিরিয়া, লেবানন ও তুরস্ক সফর

দামেশক ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণপত্র

মিশর ও সিরিয়া সফর করে এসেছি পাঁচ বছর হলো। বাহ্যত মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোর সফরের কোনো মওকা বা উপলক্ষ্য ছিল না। হেজায ও আরবের সঙ্গে আমার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এখন পত্র কিংবা নতুন কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকা। কিন্তু হঠাৎ ১৯৫৫ সালের জুন মাসের শেষের দিকে বন্ধুবর ডক্টর মুস্তফা আস-সিবায়ীর পত্র পেলাম, যার সঙ্গে সিরিয়া সফরকালে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার 'মাযা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমীন'-এর খুবই ভক্ত ছিলেন আর আমি তাঁর পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও ঈমানি চেতনায় ভরপুর রচনা 'আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিততাশরীয়িল ইসলামী' দ্বারা – যেটি এ-বিষয়ের উপর অদ্বিতীয় গ্রন্থ – খুবই প্রভাবিত ছিলাম। তিনি সিরীয় পার্লামেন্টের সদস্য, একটি ইসলামি দলের প্রেসিডেন্ট, এখওয়ানের পৃষ্ঠপোষক ও দামেশক ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি আইনের প্রফেসর ছিলেন।

এই পত্রে তিনি খুবই আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে আমাকে অবহিত করেছেন, অনেক চেষ্টার পর দামেশক ইউনিভার্সিতে কুল্লিয়াতুশ শরীয়া (শরীয়ত অনুষদ) খুলে গেছে এবং তার ফলে সিরিয়ার দীনি অঙ্গনগুলোতে একটি আনন্দের ঢেউ খেলে গেছে। পত্রে তিনি আরও লিখেছেন, অনুষদের কমিটি আমার দায়িত্বে এই খেদমত সোপর্দ করেছেন যে, আমি আপনার কাছে বাসনা ও আবেদন পৌঁছিয়ে দেব, দু-বছর কিংবা এক বছরের জন্য তাতে পাঠদানের দায়িত্ব বরণ করে নেবেন এবং এখানে আসতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার যা-যা শর্ত বা দাবি-দাওয়া আছে তাদের জানাবেন। এই চিঠির গায়ে ২২ শাওয়াল ১৩৭৪, ১২ জুন ১৯৫৫ তারিখ এবং শরীয়ত অনুষদের প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁর স্বাক্ষর ছিল।

পত্রের জবাবে আমি তাঁকে এই সাফল্যের জন্য মোবারকবাদ দিলাম এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাঁর স্টাফদের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং বছরদুয়েক হিন্দুস্তান থেকে (যেখানে কাজের বিরাট ময়দান ও মুসলমানদের অনেক বড় জিম্মাদারি রয়েছে) দূরে থাকতে পারব না বলে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু এই আশ্বাস দিলাম যে, একটা সীমিত ও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আসব এবং কোনো একটি বিষয়ের উপর সুবিন্যস্ত ধারায় নিবন্ধাদি পাঠ করব। কলেজের কমিটি আমার এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে নিলেন এবং সিরিয়া প্রজাতন্ত্রের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট শুকরি আল-কাওতালী আমার ভিজিটর প্রফেসর হওয়ার কাগজে স্বাক্ষর করে দিলেন।

ডক্টর মুস্তফা আস-সিবায়ী ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালের এক পত্রে আমাকে এই মঞ্জুরির সংবাদ প্রদান করেন এবং আমার এই প্রস্তাবনাকে মঞ্জুর করে নিলেন যে, আমি ইসলামের ইতিহাসের বৈপ্লবিক, সংশোধন ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলো এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের উপর লেকচার দেব। আমি এ বিষয়টি এজন্য বেছে নিলাম যে, এই শিরোনামে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির যুবক ছাত্র, স্কলার ও শিক্ষকদের সামনে নিজের ইতিহাস অধ্যয়নের সেই ফলাফল ও সারাংশ উপস্থাপন করতে পারব, যা এই ইতিহাসনির্মাতা ভূখণ্ডে নতুনভাবে দীনি চিন্তা, কর্ম, সংশোধন ও অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উৎসাহিত করতে পারবে।

এ সময়ে আমি রায়পুর হাজির হলাম। বিষয়টি হযরতের গোচরে দিয়ে তাঁর অনুমতি চাইলাম। হযরত খুশি মনে অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং এর জন্য খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তার পরক্ষণেই ইউপির পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে আমার একটি তাবলীগি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের কথা ছিল। এ-প্রোগ্রামেরই সুবাদে আমি রায়বেরেলিতে ছিলাম। এমন সময়ে আমার কাছে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে মঞ্জুরি ও একাত্মতার সংবাদ এল। হাতে সময় খুবই কম ছিল। খুবসম্ভব তিন সপ্তাহের বেশি ছিল না। আমি লাখনৌ ফিরে গিয়ে নিবন্ধাদি প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিলাম। যেহেতু ঠিক এ বিষয়টিরই উপর তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত প্রথম খণ্ডটি সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, সেহেতু নতুন করে মেহনত করার প্রয়োজন ছিল না। আমি তাকেই ভিত্তি বানিয়ে আরবি সূত্রগুলোকে সামনে রেখে নিবন্ধগুলো লেখানোর কাজ আরম্ভ করে দিলাম। একাজের জন্য স্নেহাস্পদ মৌলভী সাঈদুর রহমান নদবির প্রাথমিক দুটি ঘণ্টা খালি করিয়ে নিলাম। সে সকালবেলা মারকাযে চলে আসত। আমি যা কিছু লিখতাম, সেগুলোকে সে কপি করত। এভাবে

লেকচারের বৃহৎ অংশটি প্রস্তুত হয়ে গেল। যেটুকু অবশিষ্ট রইল, সেটুকু দামেশক পৌঁছে সমাপ্ত করে ফেলব বলে ঠিক করলাম। সিদ্ধান্ত হলো, ১৩৭৫ হিজরির (এপ্রিল ১৯৫৬) শাবান মাস থেকে এই লেকচারের ধারা শুরু হয়ে যাবে।

এই বাস্তবতাটিকে আমি লুকোতে চাই না যে, একটি উন্নত আরব দেশের একটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এমন আমন্ত্রণ আসাতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং একে আমি একটি ইলমি সম্মাননার সমার্থক মনে করেছি। আমি আমার সীমিত যোগ্যতা এবং নিজের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম না। সেকারণে আলহামদুলিল্লাহ! কোনো আত্মপ্রবঞ্চনা ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হইনি। একে আমি স্রেফ মহান আল্লাহর একটি পুরস্কার, আম্মাজানের দু'আর কবুলিয়াত, ভাইজানের মমতা ও ওস্তাদগণের মেহনতের ফলই মনে করতাম। কিন্তু এর জন্য মনে স্বভাবগতভাবে যে আনন্দিত হওয়ার কথা ছিল, তা অস্বীকার করি না। আমার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে, তারাও সম্পর্কের পরিমাণ অনুযায়ী আনন্দিত হলেন এবং আমাকে তারা মুবারকবাদ দিলেন। এখানে শুধু মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি (রহ.)-এর একটি পত্রের (৯ জানুয়ারি ১৯৫৬) অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি, যেটি তিনি পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর লিখেছিলেন। তার প্রতিটি বর্ণ তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, বিনয় ও চারিত্রিক উচ্চতার প্রমাণ বহন করছে :

> "আল-জমিয়তে'; পরে আবার 'মদীনা'য়ও সেই ঐতিহাসিক মর্যাদার সংবাদটি পড়লাম, যেটি কয়েক শতাব্দি পর হিন্দুস্তানের অর্জিত হলো। আল্লামা ছফিউদ্দীন বাদাউনির পর সম্ভবত আপনি-ই দ্বিতীয় ভারতীয় আলেম, যাকে সিরিয়ায় পড়ানো এবং নিজের বিদ্যা দ্বারা সিরীয়দের উপকার পৌঁছানোর সুযোগ মিলল। বরং ছফী হিন্দি তো নিজের থেকে গিয়েছিলেন; কিন্তু আপনাকে ওখানকার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় তলব করেছে। দুয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান আছে। এই মর্যাদা শুধু আপনার ব্যক্তিত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র ভারতীয় আলেমদের জন্য এটি গৌরবের পুঁজি। আহ! আল্লাহ যদি আমাদের মাঝে আপনার মতো আরও লোক তৈরি করে দিতেন! ডক্টর সাহেব ও আপনার পুরো পরিবারের খেদমতে মোবারকবাদ

পেশ করতে গিয়ে আমি যে-আনন্দ অনুভব করছি, ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ-ই জানেন তার পরিমাণ কতখানি। জানি না, কবে নাগাদ রওনা হবেন। আপনি ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়িম (রহ.)-এর বাড়িতে যাচ্ছেন। জানি না, কী পরিমাণ ইলমি উপঢৌকন দ্বারা আপনি ভারতীয় আলেমসমাজকে ধন্য করবেন। আল্লামা শামির কাছে ফিকহি কিতাবাদির ভাণ্ডার হিন্দুস্তান থেকে গিয়েছিল। আমার জন্য এটি নতুন বিদ্যা, যেটি আপনারই মাধ্যমে আমি লাভ করেছি। এবার শামির জন্মভূমি থেকে তার বিনিময় হাসিল করে নিন।'

দামেশকে

সৌভাগ্যক্রমে সেই এপ্রিল মাসেই, যেমাসে আমার সফরের প্রোগ্রাম ছিল বোম্বাই থেকে দামেশকের জন্য প্রথমবারের মতো এয়ার ইন্ডিয়ার সরাসরি সার্ভিস শুরু হয়েছিল। আমার রওনার তারিখও সেটিই ছিল, যেটি তার উদ্বোধনের দিন ছিল। সৌদি রাষ্ট্রদূত বন্ধুবর শায়খ ইউসুফ আল-ফাওযানের সুপারিশ ও প্রচেষ্টায় তার প্রথম শ্রেণির একটা সিট আমি পেয়ে গেলাম। এটি আমার প্রথম দীর্ঘতর আকাশভ্রমণ ছিল। দিল্লি থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর বিমানে করে আমি বোম্বাই পৌঁছলাম এবং সেখান থেকে মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে দামেশকের উদ্দেশে রওনা হলাম। পথে ভোর হয়ে গিয়েছিল এবং সূর্য উদিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আমি পশ্চিম দিকে যাচ্ছিলাম, তাই যখন দামেশকের বিমানবন্দরে পৌঁছলাম, তখনও ওখানে সূর্যোদয় ঘটেনি। এটি হিন্দুস্তান ও সিরিয়ার মধ্যকার প্রথম উড়াল ছিল, তাই তার ভিডিওচিত্র ধারণ করা হলো, যার খবর আমার কাছে ছিল না। কিন্তু দিনচারেক পর লাখনৌবাসী কোনো একটি সিনেমায় এই ফিল্ম দেখল এবং বিমান থেকে অবতরণরত আমাকে দেখল। পরে আমার আপনজনদের জানাল, তারা আমাকে দামেশকে দেখেছে।

বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানাতে ডক্টর মুস্তফা আস-সিবায়ী তাঁর একাধিক বন্ধু-সুহৃদ ও দামেশক ইউনিভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষক, যাদের দুজনের নাম আমার মনে আছে, ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল-মুবারক ও ওস্তাদ মুস্তফা আহমাদ আয-যারকাকে নিয়ে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পরম আগ্রহ ও হৃদ্যতার সাথে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং আমার আগমনে

পরম আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাঁদের সঙ্গে দারুল উলূমের তিন স্কলার যুবক সাইয়িদ রেজওয়ান আলী নদবি, সাইয়িদ ইজতিবা নদবি ও মুহাম্মাদ রাশেদ নদবি উপস্থিত ছিল, যাদের জন্য আমার প্রচেষ্টায় শরীয়ত অনুষদ শিক্ষাভাতা মঞ্জুর করেছিল এবং তারা এই অনুষদের প্রথম ব্যাচের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিল।

মওসুমটা ছিল খুবই আরামদায়ক। শীত-শীত ভাব ছিল। সিবায়ী সাহেব আমাকে ইউনিভার্সিটির মেহমান হিসেবে আল-ইয়ারমুক হোটেলে নিয়ে তুললেন। ওখানে দিককতক অবস্থান করে আমি আমার পুরাতন ঠিকানা শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আস-সালাহীর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তার তিন দিন পরই সিবায়ী সাহেব এক শিক্ষাসফরে ইউরোপ যাওয়ার ছিলেন, যার প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তিনি পরদিন দুপুরের খাওয়ায় আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন এবং অফিসিয়াল কার্যক্রম আমারই সামনে সম্পন্ন করিয়ে দিলেন। আমার লেকচারের ধারা শুরু হয়ে গেল।

প্রথম লেকচারটি ২২ শাবান ১৩৭৫ হিজরি মোতাবেক ৪ এপ্রিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ বুধবার ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় হলে অনুষ্ঠিত হয়, যার শিরোনাম ছিল التجديد والمجددون في تاريخ الاسلام (ইসলামের ইতিহাসে সংস্কার ও সংস্কারকগণ) ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ছাত্রদের ছাড়াও ইউনিভার্সিটির শিক্ষকমণ্ডলি, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আগ্রহী শিক্ষিত সমাজকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হল কানায়-কানায় ভরে গিয়েছিল। উপরের গ্যালারিতে ছাত্রী ও মহিলারা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, খোদ আহ্বায়ক ও আয়োজক ডক্টর সিবায়ী অনুপস্থিত ছিলেন, যার জন্য তাঁর নিজেরও মনে অনুশোচনা ছিল। সিদ্ধান্ত হলো, প্রতি বুধবার আমার লেকচার হবে এবং এর জন্য নতুন আমন্ত্রণপত্র জারি করা হবে। মোট আটটি লেকচার হলো। সর্বশেষটি অনুষ্ঠিত হলো ১৯ শাওয়াল ১৩৭৫ হি., মোতাবেক ৩০ মে ১৯৫৬ খ্রি., যার শিরোনাম ছিল حجة الاسلام الغزالي (مصلحا اجتماعيا) (হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালি [সমাজসংস্কারক হিসেবে]) ।

লেকচারে আগমনের ধারা যথারীতি অব্যাহত থাকল। হল যেন উপস্থিত লোকদের ঠাঁই দিতে পারছিল না। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল, দামেশকের বিশিষ্ট স্কলারগণ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষকমণ্ডলি; যেমন– ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল-মুবারক, ওস্তাদ মুস্তফা আহমাদ আয-যারকা, ডক্টর মুহাম্মাদ মারূফ আদ-দাওয়ালিবী প্রমুখ; আলেমদের মধ্য থেকে আল্লামা মুহাম্মাদ

বাহজা আল-বায়তার প্রমুখ সাধারণ ছাত্র-যুবকদের মতো নিয়মিত লেকচারে অংশগ্রহণ করতেন। তার চেয়েও বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তৃতীয় লেকচার থেকে – যেটি ১৯ এপ্রিল ১৯৫৬ তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল – রমযান শুরু হয়ে গেল। 'ইমাম হাসান বসরি ও তাঁর খলীফাগণ' শীর্ষক এই লেকচারটি ১৩৭৫ হিজরির ৯ রমযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রমযানে তিনটি লেকচার অনুষ্ঠিত হলো। রাত সাড়ে আটটায় শুরু হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সভার রওনককে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো না।

শেষ লেকচারের আগে ১৫ শাওয়াল ১৩৭৫, মোতাবেক ২৬ মে ১৯৫৬ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর আহমাদ আস-সাম্মান-এর পক্ষ থেকে মেহমানের সম্মানে দামেশকের সর্ববৃহৎ হোটেল নাদিশ-শারক-এ দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হলো, যাতে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও বহুসংখ্যক সম্মানিত ব্যক্তি আমন্ত্রিত হন। সৌভাগ্যক্রমে আলজেরিয়ার মুজাহিদ ও বিজ্ঞ নেতা আল্লামা মুহাম্মাদ বাশীর আল-ইবরাহীমি সে-সময় দামেশক সফররত ছিলেন। তিনিও এই ভোজসভায় অংশগ্রহণ করেন। এভাবে আল-হামদুলিল্লাহ! অত্যন্ত সুনামের সাথে লেকচারের এই ধারা সম্পন্ন হলো। আমি জোর করে একটি ক্লাসও নিলাম। এই ক্লাসে আমি ছাত্রদের সাথে পরিচিত হলাম এবং তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বললাম।

দামেশকের এই তিন মাসের অবস্থানে (যার মধ্যে দুমাস কেটেছে লেকচার ও সেগুলোর প্রস্তুতির কাজে) দামেশকের আলেমসমাজ, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, ইসলামি আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর নেতৃবর্গ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ ও ওঠাবসা চলতে থাকে। সম্পর্কের ধরন এমন হয়ে গিয়েছিল যে, গোটা রমযানে মাত্র দু-তিন দিন আমার অবস্থানের জায়গায় (শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আস-সালাহীর বাড়ি) ইফতার ও আহারের সুযোগ ঘটেছে। প্রতিদিন কোনো-না-কোনো বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াত থাকত। সৌভাগ্যক্রমে আমার পরম বন্ধু ডক্টর সাঈদ রমযানও দামেশকেই অবস্থানরত ছিলেন এবং সেখান থেকেই তাঁর স্বনামধন্য পত্রিকা 'আল-মুসলিমূন' বের করতেন। তাঁর ওখানকার ব্যাপার-স্যাপার তো ছিল একদম পরিবারের মতো। বেশিরভাগ সময়ই দীর্ঘ রাত পর্যন্ত মজলিস চলত, যাতে ইসলামি চিন্তা-চেতনার বহুসংখ্যক যুবক ও আলেম অংশগ্রহণ করতেন। তারাবির আয়োজন (সেসব দেশে 'আলামতারা কাইফা' ধরনের তারাবির প্রচলনের কারণে) ঘরেই করা হতো। স্নেহাস্পদ মৌলভী রেজওয়ান আলী নদবি এক পারা শোনাত, যা আমাদের আরব বন্ধুদের জন্য (এখওয়ান

ব্যতীত, যাদের মারকাযে যথারীতি খতম তারাবিহ হতো) একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

সিরিয়ার এক আরেফ বুযুর্গ শায়খ আহমাদ আল-হারূন

মিশরের এক সেনাকর্মকর্তা মাহমুদ আল-গাররাব – যিনি জামাল আবদুন নাসের-এর ক্ষমতায় আসার পর সিরিয়া চলে এসেছিলেন – আমার কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। তিনি কয়েকবারই আমাকে উৎসাহ দিলেন যে, এখানে একজন আরেফ, বুযুর্গ ও শায়খ আছেন, যিনি বর্তমানে শায়খে আকবর শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবির জ্ঞানের সবচেয়ে বড় ডুবুরি ও গবেষক। রাতে তাঁর মজলিস বসে। আপনি সুযোগ করে একবার তাঁর ওখানে চলুন। রমযানের নানা ব্যস্ততা ও শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে আমি অপারগতা প্রকাশ করতে থাকলাম।

কিন্তু তার বারংবার পীড়াপীড়ির কারণে এবার আমার না বলতে লজ্জা বোধ হলো। তাই একদিন তারাবির পর তার সঙ্গে চলে গেলাম। দেখলাম, একটা কক্ষে একটা মজলিস চলছে, যাতে শহরের বিত্তবান ও বড়-বড় ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেছেন। একজায়গায় এক বুযুর্গ চুপচাপ বসে আছেন। মজলিসের রং আমাদের এখানকার পীর-মাশায়েখদের মজলিসগুলো থেকে ভিন্ন প্রকৃতির মনে হলো। এখানে লোকেরা হাসছে, কথা বলছে আর শায়খের উপদেশ শোনার পরিবর্তে বেশিরভাগ লোকই নিজেরা কথাবার্তা বলছে। এর জন্য শায়খও কোনো বিরক্তি প্রকাশ করছেন না।

মজলিস সমাপ্ত হলে একব্যক্তি বলল, এই মজলিসে শায়খ আবুল হাসান আলী নদবি উপস্থিত আছেন। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তিনিও যেন কিছু বলেন। আমি বললাম, আমি তো শায়খের কাছে উপকৃত হতে এসেছি। এখানে আমার কথা বলার সুযোগ কোথায়? লোকেরা পীড়াপীড়ি করল। ফলে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে আমি কী আর বলব। আপনাদের শুধু একটা গল্প শোনাচ্ছি।

একব্যক্তির মহামূল্যবান কিছু খাঁটি মুক্তা হাতে এল। অভিজ্ঞ লোকেরা বলল, এগুলোর মধ্যে ছিদ্র করতে হবে। অন্যথায় এগুলো কাজে লাগাতে পারবেন না। এই নাজুক কাজটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন, যিনি মুক্তায় ছিদ্র করতে জানেন। একাজের জন্য সে একজন জহুরিকে খুঁজে বের করল এবং কাজ করতে পুরো দিনের জন্য তাকে ঘরে নিয়ে এল। কিছু মানুষ আছে; তাদের বেশি কথা বলার অভ্যাস। মুক্তার

মালিক এই লোকটিও এই বেশি কথা বলা রোগের রোগী ছিল। সে জহুরিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী-কী বিদ্যা জান? কোন-কোন কাজে তোমার পারদর্শিতা আছে? কথায়-কথায় তথ্য বেরিয়ে এল, সে গানও গাইতে জানে।

গৃহকর্তা তাকে গান গাওয়ার ফরমায়েশ করল। জহুরি গান গাইতে শুরু করল। ততক্ষণে বেলা সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং দিনটা শেষ হয়ে গেল। এবার জহুরির বিদায় নেওয়ার পালা। বলল, আমার ফিসটা দিন; এবার আমি যাই। গৃহকর্তা বলল, ফিস আবার কীসের? এখনও তো তুমি মুক্তার গায়ে হাতও লাগাওনি। আমি তো তোমাকে মুক্তায় ছিদ্র করাবার জন্য এনেছি। কাজ না করেই তুমি কীসের ফিস চাচ্ছ?

জহুরি বলল, আমার দিন তো পুরোটা তোমার ঘরেই কেটেছে আর আমি তোমার ফরমায়েশ তামিল করেছি। এ হলো আমার সময়ের মূল্য। তুমি মুক্তায় ছিদ্র করিয়েছ, না গান শুনেছ তা আমার দেখবার বিষয় নয়। আমার ফিস তো অবধারিত হয়ে গেছে। অবশেষে গৃহকর্তাকে ফিস আদায় করতেই হলো আর মুক্তা ছিদ্রবিহীনই রয়ে গেল।

আমি বললাম, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলি! আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আমাদের ব্যাপারটাও এমন হয়ে যায় কিনা যে, আমরা একজন আল্লাহর অলীর দরবারে তাঁর কথা শুনতে এবং তাঁর আলোচনা দ্বারা উপকৃত হতে আসি। কিন্তু এসে তাঁর কথা শোনার পরিবর্তে উলটো নিজেরা কথা বলে সময় কাটিয়ে দেই আর মজলিস সমাপ্ত হয়ে গেলে শূন্য হাতে ফিরে যাই।

মনে হলো, আমার এই আবেদনে শায়খ তাঁর হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও বাস্তব পরিস্থিতির চিত্র অনুভব করেছেন। যে-কথাটি তিনি নিজের মুখে বলতে চাচ্ছিলেন না, সেটি আমার মুখ থেকে বের করালেন। এই মজলিসের পর আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক বেড়ে গেল। তিনি কারও কাছে খুবই কম যেতেন। কিন্তু আমার ঠিকানায় সময় পেলেই আপনা থেকে চলে আসতেন এবং মাঝে-মধ্যে আমাকে দামেশকের গ্রীষ্মকালীন পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে – যেখানে তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও ভক্ত-মুরিদদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে যেতেন – আমার ঠিকানায় এসে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। বারবার সাক্ষাতের পর বুঝতে পারলাম, আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি একাডেমিকভাবে শিক্ষার্জনের সুযোগ পাননি। সম্ভবত স্বাক্ষরজ্ঞান আছে এটুকুই। কিন্তু গভীর ইলম ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটাতেন। শায়খে আকবরের উলূম ও মাআরেফের বিদ্যায় তো তিনি সমকালের দুর্লভ

ব্যক্তিত্বদের একজন। পাশাপাশি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকেও খুবই মূল্যায়ন ও মর্যাদা দিতেন।

তাঁর বাতেনি অন্তর্দৃষ্টি ও কাশফের বিষয়টির অভিজ্ঞতা আমার এভাবে হয়েছে যে, আমার শায়খে আকবরের 'রুহুল কুদুস' গ্রন্থটির প্রয়োজন দেখা দিল। মুখতারাত-এর জন্য তার থেকে কিছু অংশ নিতে চাচ্ছিলাম। পুস্তকটি ছিল দুষ্প্রাপ্য এবং একমাত্র তাঁরই কাছে ছিল। তিনি বইটি আমাকে দিলেন। আমি বললাম, এর গায়ে হাদিয়ার কিছু শব্দ লিখে দিন। আমাকে তিনি শুধু আবুল হাসান নদবি নামেই জানতেন – আমার বংশগত পরিচয় তাঁর জানা ছিল না। যখন তিনি লিখতে শুরু করলেন, হঠাৎ মাথা তুলে আমাকে বললেন, তুমি অমুক বংশের নাকি? আমি বললাম, হাঁ; হিন্দুস্তানের মানুষ এমনই মনে করে এবং আমাকে এই পরিচয়েই ডাকে। তিনি বললেন, হাঁ; এইমাত্র খুশবু এল।

দামেশক থেকে চলে আসার পরও তাঁর পত্র আসতে থাকে এবং তাঁর কতক ভক্ত- মুরিদ তাঁর উপদেশমালা আমার কাছে পাঠাতে থাকে। সিরিয়া থেকে চলে আসার পর আমি জানতে পারলাম, দামেশকের সুস্থ চিন্তার শিক্ষিত সমাজ – যারা এত কাল তাঁর সম্পর্কে অনবহিত ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, আমার যাওয়া-আসার কারণে তাঁর প্রতি তাদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। বিশেষ করে ডক্টর মুস্তফা আস-সিবায়ী তাঁর ওখানে হাজিরি দিতে শুরু করলেন এবং তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন। অবশেষে তাঁর অসিয়ত মোতাবেক তাঁকে শায়খের পার্শ্বে দাফনও করা হয়।

রেডিওতে দুটি ভাষণ

দামেশক সফরকালে দামেশক রেডিও স্টেশন থেকে দুটি ভাষণ প্রদানেরও সুযোগ পেলাম। খুবসম্ভব আমার কোনো-না-কোনো সুহৃদ রেডিওর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারা আমার ঠিকানায় এলেন এবং রেডিওতে কয়েকটি ভাষণ প্রদানের ফরমায়েশ করলেন। আমি প্রথম ভাষণটি اسمعي يا سورية (শোনো হে সিরিয়া!) নামে প্রদান করি, যার শুরুতে আমি সিরিয়ার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা এবং দীনি ও রূহানি সম্পর্কের ইতিহাস শোনালাম, যারা সূচনা শৈশব থেকেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর শামের সেই মহান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করলাম, (যাদের একটি বড় অংশ সাহাবা কেরাম ও ইসলামের অপরাপর শীর্ষ ব্যক্তিত্বগণ রয়েছেন) যাঁরা শামের মাটিতে সমাধিস্থ এবং তার গর্ব, শোভা ও সৌন্দর্যের কারণ।

জগত কোন্-কোন সুবাদে শামকে স্মরণ করে এবং তার কাছে বিগত ইতিহাস ফিরিয়ে আনার দাবি জানায় এই ভাষণে আমি তা-ও ব্যক্ত করেছি। তারপর বলেছি, এর বিগত মর্যাদার রহস্য কোথায় ছিল এবং কীভাবে সে পৃথিবীর একটি বৃহৎ অংশকে নিজের করুণার আঁচল ও দয়ার ছায়ায় নিয়ে নিয়েছিল আর এখন কীভাবে সে পুনরায় সেই মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে। কোনো জাতি ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তা দ্বারা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। মর্যাদা লাভ করতে হয় বিশেষ বার্তা, দাওয়াত, সদুদ্দেশ্য ও মানবতার সেবার মাধ্যমে। হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সিরিয়াকে এপথে চেষ্টা করা দরকার। বর্তমান বিশ্বের মুক্তি এর মাঝে নিহিত যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাকে বিদ্যমান আপদগুলো থেকে মুক্তি দিতে পরস্পর সহযোগিতা করবে। প্রাচ্য করবে তাদের ঈমানের মাধ্যমে আর পাশ্চাত্য করবে তাদের শৃঙ্খলা ও আধুনিক বিদ্যার মাধ্যমে। এই কল্যাণমূলক কাজে সিরিয়া যথাযথভাবে অংশ নিতে পারে।

শেষে বলেছি, হিন্দুস্তান মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ছাকাফির মাধ্যমে ইসলামের যে-নেয়ামতটি সবার আগে লাভ করেছিল, সে ছিল উমায়্যা খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক-এর সময়কার এক সেনাপতি ও দাঈ। ওলীদ-এর সিংহাসন এই দামেশক নগরী ছিল। এই ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি সেই উপকারেরই একটি জবাব এবং ভক্তি-ভালবাসার বিনিময়।

দ্বিতীয় ভাষণটি প্রদান করেছি محمد اقبال في مدينة الرسول (ইকবাল রাসূলে শহরে) শিরোনামে। এই ভাষণে 'আরমুগানে হেজায'-এর সেই আবেগময় কবিতাগুলোকে আরবিতে ভাষান্তর করে ইকবালের মদিনা সফরের কাহিনী শোনানো হয়েছে, যেটি তিনি জযবা ও আবেগের পালকে উড়ে কল্পনার জগতে সম্পাদন করেছিলেন। এই ভাষণটির উরদু তরজমা মুহাম্মাদ মিয়ার কলমে 'কারওয়ানে মদীনা'য় 'ইকবাল ঐশ্বর্যের দুয়ারে' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লেবানন ও তুরস্ক সফর

দামেশক অবস্থানকালের অবসর সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি দামেশকের বাইরে দুটি সফর করলাম। একটি লেবাননের, একটি তুরস্কের। ১৯৫১ সালের সিরিয়া সফরে দুটিরই মওকা পেয়ে গেলাম। দামেশক ইউনিভার্সিটির প্রথম লেকচারের পর – যেটি ২২ শাবান ১৩৭৫ হিজরি, ৪ এপ্রিল ১৯৫২ সালে হয়েছিল – দ্বিতীয় লেকচারের তারিখ ছিল ২৯ শাবান,

১১ এপ্রিল বুধবার। মধ্যখানে এক সপ্তাহের বিরতি। বৈরুত দামেশক থেকে তেমন দূরে নয়। আমি সফরের নিয়ত করে ফেললাম এবং পুরোনো এখওয়ানি বন্ধু ওস্তাদ সাদুদ্দীন আল-ওয়ালীলির কাছে আবেদন জানালাম, আপনিও চলুন। আমরা বৈরুতের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং ঘণ্টাকয়েক সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। লেবাননে চার দিন থাকলাম। এ-সময়ে আমরা নগরীর ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ভ্রমণও করলাম। ইমাম আওযায়ির কবরও যিয়ারত করলাম। ওখানকার দীনি ও ইলমি ব্যক্তিত্ব এবং দীনি আন্দোলনগুলোর নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে তাহরীকে ইবাদুর রহমান-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা মুহাম্মাদ ওমর দাউক, লেবানন সরকারের মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ আলায়া, শরয়ী উচ্চ আদালতের প্রধান শায়খ শফীক ইয়ামুত, খ্যাতনামা নওমুসলিম লেখক ও চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আসাদ (যিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোড টু মক্কা'র দ্বিতীয় খণ্ড লেখার কাজে বৈরুত অবস্থান করছিলেন), খ্যাতনামা মুসলমান সমাজীর সদস্য ও দাঈ ডক্টর মুস্তফা আল-খালিদি, প্রখ্যাত আলজেরীয় মুজাহিদ ওস্তাদ আল-ফাজীল আল-ওয়ারতলানী উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মারকাযে ইবাদুর রহমান, আল-কুল্লিয়াতুশ শারইয়্যা, খালিয়াতুল মালিক সাউদ (যেটি বৈরুতের ইসলামি মারকায, লেকচার হল ও ইসলামি অনুষ্ঠানাদি পালনের একটি জায়গা) পরিদর্শন করলাম।

আমরা এক দিনের জন্য সিরিয়ার বিখ্যাত ইসলামি ও ঐতিহাসিক নগরী তারাবলিসও গেলাম, যেটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সিরিয়া থেকে ছিন্ন হয়ে লেবাননের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে।

পথে আল্লামা সাইয়িদ রশীদ রেজার জন্মভূমি কালমুন হয়ে অতিক্রম করলাম। রোম সাগরের কূলে মনোরম দৃশ্যাবলির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা তারাবলিস পৌঁছলাম এবং মারকাযে ইবাদুর রহমান-এ অবস্থান নিলাম। তারাবলিসে আমরা আল-কুল্লিয়াতুশ শারইয়্যাহ, মারকাযুল মাওলাবিয়্যাহ, মাদরাসা ইবনে খালদুন, মাদরাসুল গাযযালী প্রভৃতি পরিদর্শন করলাম। ওখানে যুবকদের এক সমাবেশে আমি একটি ভাষণও দিয়েছি।

তারাবলিস থেকে ফিরে এসে খালিয়্যাতুল মালিক সাউদ-এ বিশিষ্টজনদের এক মজমায় আমি ভাষণ প্রদান করেছি, যার বিষয়বস্তু ছিল 'জাতিগুলো সংস্কৃতির উপর ভর করে বেঁচে থাকতে পারে না – বাঁচে আদর্শের উপর ভিত্তি করে আর আত্মা ও বৈশিষ্ট্যাবলি তাদের প্রহরী ও সহযোগীর ভূমিকা পালন করে।'

লেবাননের এই সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে আমি দ্বিতীয় লেকচারের সময়ের আগেই দামেশক পৌঁছে গেলাম।

দামেশক ইউনিভার্সিটির লেকচার থেকে অবসর হয়ে ২ যিকাদা ১৩৭৫, ১২ জুন ১৯৫৬ দুই সপ্তাহের সময় বের করে তুরস্কের উদ্দেশে রওনা হলাম। হালবে এক সপ্তাহ অবস্থান করলাম, যেখানে এখওয়ানের মারকাযে حاجتنا إلى إيمان جديد (আমাদের নতুন ঈমানে প্রয়োজনীয়তা) শিরোনামে একটি ভাষণ দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। ভাষণটি ছিল পুরোপুরি দাওয়াতি আন্দাজের এবং আরবদের উদ্দেশে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষার একটি বক্তব্য, যাতে অনেক কঠোরতাও ছিল। কিন্তু মজমা গভীর মনোযোগসহকারে শুনছিল। মনে হচ্ছিল, এই স্পষ্ট ভাষণ তাদের হৃদয়ের তার ছিঁড়ে দিয়েছে। তাতে আরব জাতীয়তার অনেক সমালোচনা ছিল এবং যেন আরবি ধারায় বলা হয়েছিল, আপনারা যদি আরব জাতীয়তাকে নিজেদের দীন ও ঈমান বানিয়ে নেন, তাহলে ধরে নেব, আপনারা উপমহাদেশের মুসলমানদের সাথে – যারা তাদের পুরো ইতিহাসে ইসলামি জাতীয়তার সাথে সম্পৃক্ত আছে – 'চারশো বিশ' করেছেন যে, আমাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন আর নিজেরা পুরোনো জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে গেলেন।

ভাষণ শেষ হলে মনে মহব্বতের দরিয়া উপচে উঠেছে। কোনো মজমা এরূপ মন উজাড় করে তার হৃদ্যতা প্রকাশ করেছে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকবে। এটি আরবদের পরম উদারতার প্রমাণ, যার দৃষ্টান্ত (এমন কঠোর সমালোচনার মুহূর্তে) কোনো জাতি ও দেশে পাওয়া দুষ্কর।

হালব থেকে হায়দারাবাদ পাশা পর্যন্ত (যা কিনা তুর্কি সীমান্তের রেলওয়ে স্টেশন) তাউরুস এক্সপ্রেসে করে সফর হলো। তুরস্কের এই দুই সপ্তাহের সফরে আমি ইস্তাম্বুল (কুস্তুন্তুনিয়া), আঙ্কারা ও কাওনিয়া (মাওলানা রোম (রহ.)-এর বাসভূমি ও সমাধি) পরিদর্শন করলাম। ইস্তাম্বুলে গিয়ে যে-বন্ধুদের কাছে অবস্থান নেওয়ার এবং তাদের সহযোগিতা পাওয়ার আশা ছিল, স্টেশনে তাদের পাওয়া গেল না। ফলে পেরেশানি ও দুর্গতির সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটা ঘটে গেল, যেমন বিব্রতকর ঘটনা এ যাবত জীবনে আর কখনও ঘটেনি। তারপর আল্লাহপাকের সাহায্য যেভাবে এল এবং যে-ভালবাসা, আতিথেয়তা, উদ্যম ও ইসলামি চেতনার এই সফরে অভিজ্ঞতা হলো, তাও আমি প্রত্যক্ষ করলাম। তুরস্কের মাটির রং-ঘ্রাণও দেখলাম, যা কিনা শহীদদের রক্তে বারবার রঞ্জিত হয়েছে এবং কয়েক শতাব্দি যাবত ইসলামি বিশ্বের সম্ভ্রম, ইউরোপের ক্রুশেডীয় রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি পেরেক,

হারামাইন শরীফাইনের প্রহরী, পবিত্র ভূমিসমূহ ও আরব দেশগুলোর সুরক্ষা প্রাচীরের ভূমিকা পালন করে আসছে। শেকওয়া তুর্কমানীও দেখলাম এবং এই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতিটির শাহিন-শাহবাজদেরও দেখলাম। তারপর আতাতুর্কের ইসলামি ও আরবি চিহ্নগুলো একদম মিটিয়ে দেওয়ার প্রত্যয়দীপ্ত ও সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফলও দেখলাম। লিখনরীতি বদলে যাওয়ায় ইসলামি সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ইসলামি কুতুবখানা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দৃশ্যও অবলোকন করলাম। এই সফরের বিস্তারিত বিবরণ ও ধারাবাহিক রোজনামচা আমার লিখিত গ্রন্থ 'দো হাফতা তুরকী মে' তে এসে পড়েছে। কাজেই এখানে তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

দামেশকের মুতামারে ইসলামী (ইসলামি কনফারেন্স)

তুরস্ক সফর থেকে ফিরে আসামাত্র দামেশকের মুতামারে ইসলামি (ইসলামি কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত হলো, যার আহ্বায়ক ছিলেন আমাদের প্রিয় বন্ধু ও ভাই ডক্টর সাঈদ রমযান আর ব্যবস্থাপক ও সহযোগী ছিলেন ডক্টর মুহাম্মাদ মারুফ আদ-দাওয়ালীবি। কনফারেন্স ২৬ জুন ১৯৫৬ থেকে শুরু হওয়ার ছিল। আমি ২৫ তারিখের মধ্যরাতে দামেশক পৌঁছি। সকালে তার প্রথম অধিবেশন ছিল। এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন আরব দেশ থেকে বিশিষ্টজনেরা এসেছিলেন। পাকিস্তান থেকে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব, মাওলানা সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি ও মাওলানা যফর আহমাদ আনসারি এসেছিলেন। প্রথম অধিবেশনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডক্টর মুহাম্মাদ নাসের সভাপতি আর মাওলানা সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি ও আমি সহসভাপতি নিযুক্ত হলাম। এই কনফারেন্সে আমার নিবন্ধ পাঠ করার কথা ছিল এবং ওয়াদাও করে গেছি। কিন্তু নিবন্ধ লেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। আমি সকাল-সকাল উঠে নিবন্ধ প্রস্তুত করে ফেললাম, যার শিরোনাম ছিল ارتباط قضية فلسطين بالوعي الاسلامي (মুসলমানদের ইসলামি চেতনার সঙ্গে ফিলিস্তিন সমস্যার সম্পর্ক)।

এই নিবন্ধে দেখানো হয়েছে, ফিলিস্তিন সমস্যায় তার নেতৃবৃন্দ ও সহানুভূতিশীলগণ ইসলামি বিশ্ব থেকে যে-সহযোগিতা, সমবেদনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আশা রাখছেন এবং যেটি এই সমস্যার সমাধানে একটি কার্যকর অস্ত্র ও বিশ্বজনমতের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি, তার সমগ্র ভিত মুসলমানদের ইসলামি চেতনা ও জাতীয় অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। আর আমাদের নেতৃবৃন্দ ও এই সমস্যার প্রতিনিধিদের জানা নেই, ইসলামি বিশ্বে

এ ক্ষেত্রে কতখানি ধস ও পরিবর্তন এসে পড়েছে, এই চেতনা কী পরিমাণ শীতল হয়ে গেছে, এই অনুভূতি কতখানি দুর্বল হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমাদের নেতৃবৃন্দ ও যারা এই সমস্যার সমাধানের ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন, তাদের ভাবতে হবে। কারণ, এটিই প্রতিটি সমস্যার সমাধান এবং প্রতিটি তালার চাবি। ইসলামি বিশ্বের পুনরুত্থানের জন্য তাদের নতুনভাবে চেষ্টা চালানো প্রয়োজন। তারপর আমি সংক্ষেপে তার কর্মরীতি ও প্রকৃত উপকরণের আলোচনা করি।

আমি খুবই তাড়াহুড়ার মধ্যে নিবন্ধটি লিখে ফেলি। কনফারেন্সের মহাসচিব সঙ্গে-সঙ্গে এটি সাইক্লোস্টাইল করিয়ে আনান। আমি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় অধিবেশনে এটি পাঠ করি। কনফারেন্স এদিক দিয়ে সফলতা লাভ করল যে, বিভিন্ন দেশের ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই ঐতিহাসিক নগরীতে এসে সমবেত হয়েছেন এবং একজন অপরজনের সাথে মিলিত হয়েছেন। সিরিয়া সরকারও তাঁদের জন্য (ডক্টর মুহাম্মাদ মারুফ দাওয়ালীবির প্রভাবে) নানা সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করে রেখেছেন। ২৮ জুন পার্লামেন্টের স্পীকার ডক্টর নাযেম আল-কুদসির পক্ষ থেকে (যিনি একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন) এবং শেষে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট শুকরি আল-কাওতালীর পক্ষ থেকে কনফারেন্সের অতিথিদের জন্য অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার আয়োজন হলো। অতিথিদের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের দেখার জন্য আল-কুরাল আমালিয়া পর্যন্ত একটা রেলভ্রমণেরও ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু দীনিয়াতের শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত একটি বক্তৃতা প্রোগ্রামের কারণে এই সফরে আমি অংশ নিতে পারিনি।

দামেশক অবস্থানের শেষ দিন ও রওনা

দামেশকের প্রায় তিন মাসের অবস্থান জীবনের সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক দিন ছিল, যা কিনা আজও পর্যন্ত (হারামাইন শরীফাইন বাদে) কোথাও পাইনি। মানসিক আনন্দ-প্রসন্নতা, শারীরিক সুস্থতা, আবহাওয়ার কোমলতা, বন্ধুদের ভালবাসা-উদ্দীপনা, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও একধরনের বিশেষ আত্মিকতা (যা সাধারণত সাহাবা কেরাম ও আওলিয়ায়ে এজামের সমাধি ও ইসলামি জিহাদ ও বিজয়মালার কেন্দ্রভূমি হওয়ার কারণে ছিল) সব মিলে সুখ ও আনন্দের একটি বিস্ময়কর পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল। খোদ দামেশক ও সিরিয়াবাসীর জন্যও সেই সময়টি খুবই আনন্দদায়ক ও ইসলামি আমেজ ও চেতনায় টইটম্বুর ছিল। তারপর ওখানেও

বিপ্লবের চক্কর চলে এল এবং দেশটি স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে গেল। এখন তো দেশটি একটি অমুসলিম ও ইসলাম-দুশমন সরকারের পাঞ্জায় আটকে আছে। আল্লাহ যদি এই পরিস্থিতি থেকে দেশটিকে উদ্ধার করেন!

দামেশকের সফর ও অবস্থান দ্বারা বড় একটি উপকার এই হলো যে, আল-মাজমাউল ইসলামী আমার পিতাজি (রহ.)-এর একটি কিতাব 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ ফী আনওয়ায়িল উলূমি ওয়াল মা'আরিফ'-এর মুদ্রণের দায়িত্ব বরণ করে নিয়েছিল এবং ১৯৫৮ সালে বইটি الثقافة الاسلامية في الهند (হিন্দুস্তানে ইসলামি সংস্কৃতি) নামে প্রকাশ করে ফেলে। এই গ্রন্থটি হিন্দুস্তানের ইসলামি রচনাবলির ডাইরেক্টরি এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে এখানকার আলেমদের খেদমতের এলবাম।

'আল-মাজমাউল ইলমী দামেশক'-এ বেশ কবার যাওয়া হলো, যার নাম শৈশব থেকেই শুনে আসছিলাম এবং যার সদস্যপদ একজন আলেম ও গবেষকের জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় মনে করা হতো। আমাদের দেশের দুজন পণ্ডিত তখনও অবধি তার সদস্য ছিলেন। একজন আল্লামা আবদুল আযীয আল-মায়মানী আর অপরজন মাসীহুল মুল্ক হাকীম আজমল খান। তার প্রেসিডেন্ট খলীল মরদম বেগ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমার হিন্দুস্তান ফিরে আসার পর এই একাডেমি আমাকে তার সদস্য বানিয়ে নেয় এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সনদ আসে।

আতাতুর্ক সম্পর্কে সত্য উচ্চারণ এবং মাওলানা মাদানির সত্যপ্রিয়তা

হিন্দুস্তান ফিরে আসার পর আমি ভাষণ-বক্তৃতায় ও আলাপচারিতায় কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া অবলীলায় ব্যক্ত করতে শুরু করলাম এবং তার সম্পর্কে এখানকার ইসলামপ্রিয় লোকদের সাধারণত যে-ধারণা ছিল এবং তার 'সংস্কার অভিযানে' তুরস্কের যে-ক্ষতি হয়েছিল, আত্মিক ও শিক্ষাগত কুফল সামনে এসেছিল, সেগুলো আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে শুরু করলাম। একা লিখনরীতি বদলে যাওয়ায় যে বিরাট ক্ষতি হয়েছিল, দার্শনিক ঐতিহাসিক টুইন বি তার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন, 'এখন আর কোনো রাষ্ট্রের গ্রন্থভাণ্ডার বা গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলার দরকার নেই (যার ফলে অযথা দুর্নাম কুড়াতে হয়)। কোনো জাতির লিখনরীতি বদলে দেওয়া-ই যথেষ্ট।'

আমার এই পর্যালোচনা ও সমালোচনা, সেই লোকগুলোর কাছে খুবই অপ্রীতিকর ঠেকল, যারা কামাল আতাতুর্ককে তুরস্কের মুক্তিদাতা এবং মানবীয় মর্যাদা ও ইসলামি খেদমতের সুউচ্চ আসনে তুলে রাখেন। তারা প্রকাশ্যে আমার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তার বিপরীতে আমার প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই মাওলানা মাদানি (রহ.) লাখনৌ এলেন। আমি তাঁর কাছে তুরস্ক সফরের পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করলাম এবং আতাতুর্কের ইসলামনির্মূল পলিসির কথা অবহিত করলাম। মাওলানা তার সমর্থনে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। না তাঁর চেহারায় সামান্যতম অসন্তোষও দেখা গেল না। মনে হলো, তাঁর সুস্থ বিবেক তৎক্ষণাৎ এই বাস্তবতাগুলো মেনে নিয়েছে এবং তিনি 'সত্য যেদিকে যায়, আমিও সেদিকে আছি' নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

মাওলানার এই সত্যপ্রিয়তা আমার উপর বিরাট প্রভাব ফেলল যে, তাঁর কাছে মাপকাঠি হলো ইসলাম। না রাজনৈতিক সফলতা, না সামরিক বিজয়, না পাশ্চাত্য শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা বা ক্ষতিসাধন করা।

আক্ষেপ হলো, তার অল্প কদিন পরই (ডিসেম্বর ১৯৫৭) মাওলানা এ-জগত থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। আমি তাঁর কাছে একজন ভক্ত হিসেবে সময়ে-সময়ে হাজিরা দিতাম। মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে রোগী দেখার নিয়তে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। আমি সব সময়ই মাওলানাকে একজন মুখলিস, চরিত্রবান ও সুযোগ্য আলেমে দীন হিসেবে মূল্যায়ন করে আসছি এবং একটি মুহূর্তের জন্যও তাতে কোনো দ্বিধা বা সংশয় জাগেনি।

বাগদাদে

আমি জুলাইয়ের কোনো এক তারিখে দামেশক থেকে রওনা হলাম। দামেশক থেকে আমি বাগদাদ ও করাচির পথ অবলম্বন করলাম যে, কখনও আমার বাগদাদ যাওয়া হয়নি। শৈশব থেকেই যে-নামটি মক্কা-মদিনার পর সবচেয়ে বেশি কানে পড়েছিল, সেটি হলো বাগদাদ। কায়েদায়ে বাগদাদীর সুবাদে (বর্তমানকার মুসলমান শিশুরা ইসলাম শিক্ষার একেবারে শুরুতেই যেটি হাতে নেয় এবং বিসমিল্লাহ বলেই যার পাঠ শুরু করে) বাগদাদ শব্দটি দ্বারা কান ধন্য হয়।

বাগদাদে শুধু দু-তিন দিন অবস্থান করার সুযোগ পেলাম। এটুকু সময় এই নগরীর মর্যাদা, বিস্তৃতি ও ওখানকার নিদর্শনাদির তুলনায় খুবই কম ছিল। কিন্তু 'নাই মামুর চেয়ে কালা মামু ভালো' বিবেচনায় এটুকুও অনেক

গনিমত ছিল। এখানে এসে আমি সাইয়িদুনা আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর প্রতি বিশেষ টান ও ভক্তি-ভালবাসা অনুভব করলাম। আর এটি বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণ, আমার প্রথম সেলসেলা কাদেরি-ই ছিল। কুলজিনামার গ্রন্থাদি থেকে প্রতীয়মান হয়, আমাদের পূর্বপুরুষ সাইয়িদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মাদ আল-মাদানি হযরতের ভাগিনা ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানে আমি হযরত মারুফ কারখি, ইমাম আবুহানিফা, ইমাম মূসা কাজেম, সালমানপাক গিয়ে হযরত সালমান ফারেসি (রাযি.)-এর কবর যিয়ারত করেছি। ঐতিহাসিক নগরী মাদায়েনও দেখেছি, যেটি ইরানিদের রাজধানী ছিল।

এই সফরে দীর্ঘ ২৩ বছর পর আমার ওস্তাদ ডক্টর তকিউদ্দীন হেলালির সাক্ষাতলাভে ধন্য হয়েছি, যিনি তখন বাগদাদে অবস্থানরত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি প্রায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমার কণ্ঠ শুনে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে চিনে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং একাধারে ওস্তাদ ও পিতাসুলভ মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন। আমি বললাম, ছাত্রজীবনে আপনি আমার ভুল শুধরে দিতেন। এখন আমি আপনাকে একটি আরবি পুস্তিকা পড়ে শোনাব; আমি সেটির ভুল-ত্রুটি শুধরে দিন। তিনি স্নেহের ভাষায় সম্মতি ব্যক্ত করলেন। আমি আমার 'আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়্যা ফিল হিন্‌দ ওয়া তাতাওয়ারাতুহা' পুস্তিকাটি পড়ে শোনালাম। এক-দুটি আরবি তারকীব সম্পর্কে তিনি বললেন, এটি আধুনিক তারকীব। পুরাতন যুগের আলেমরা এই তারকীব এভাবে আদায় করতেন। এক-দুটি উপকারী পরামর্শও দিলেন।

আমার অবস্থান ছিল জমিয়তে আনকাযে ফিলিস্তিন-এর দফতরে। এখওয়ানিরা আমার উপস্থিতি থেকে স্বার্থ নিতে (সফরের সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও) সেই দফতরেরই সুপরিসর আঙিনায় একটি জলসার আয়োজন করল। আমি 'আসল সংকট ঈমান ও আখলাকের' শিরোনামে বক্তৃতা করলাম। এই ভাষণটি একটি পুস্তিকার আকারে বাগদাদ থেকে প্রকাশিত হলো।

করাচিতে

বাগদাদ থেকে ৮.০.এ.সি বিমানে করে – যেটি লন্ডন থেকে আসছিল – কয়েক ঘণ্টা বিলম্বে করাচি পৌঁছলাম। ওখানে শ্রদ্ধেয় চাচা আলহাজ সাইয়িদ খলীল সাহেব নাহটুরি, তাঁর পুত্র সাইয়িদ মুহাম্মাদ জামীল সাহেব (একাউন্টেন্ট জেনারেল, পাকিস্তান) ও আমার স্নেহের ভাই সাইয়িদ আহমাদ

আল-হাসানী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে আহমাদ যৌক্তিকভাবেই আশাবাদী ছিল, আমি তার ঘরে গিয়ে উঠব। কিন্তু আমি মুনশী সাহেবের সম্মানে এবং তাঁর পিতাজির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর বাড়িতে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলাম। মোটামুটি তিন দিন ওখানে থাকলাম, যেখানে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হতে থাকল, যাদের অধিকাংশ করাচিরই অধিবাসী।

একদিন সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত ওস্তাদ জাওয়াদ আল-মুরাবিত (যার সঙ্গে আমার জেদ্দায় দেখা হয়েছিল) আমার সম্মানে দূতাবাসে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, যেখানে আল্লামা মুহাম্মাদ বাশীর আল-ইবরাহীমি – যিনি করাচি সফরে এসেছিলে – ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরিও অংশগ্রহণ করেছেন।

করাচির এই সফরে মাহের আল-কাদেরির সঙ্গে আমার প্রথমবারের মতো সাক্ষাত হলো, যিনি কয়েকবার জামীল সাহেবের বাড়িতে এসেছিলেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হলো, এই সফরে আমার ইলমি মুরুব্বী ও ওস্তাদ খলীল আরব সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমি আমার চোখদুটোকে আলো আর হৃদয়টাকে আনন্দ দ্বারা ধন্য করেছি, যিনি বিভক্তির পর করাচি চলে গিয়েছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তাঁর এই অযোগ্য শিষ্যটার (যাকে তিনি আপন ছেলের মতো স্নেহ করতেন) এই মর্যাদা দেখে আনন্দিত হয়ে থাকবেন এবং একে তিনি তাঁরই শিক্ষা ও নিষ্ঠার ফয়েজ মনে করে থাকবেন।

আমি করাচি থেকে দিল্লি হয়ে লাখনৌ এসে পড়লাম। এভাবে এই সফরটি আমার অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হলো। সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য – শুরুতেও, শেষেও।

ষোড়শ অধ্যায়

হিন্দুস্তানের অবস্থান, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ॥ রেঙ্গুন ও কুয়েত সফর (১৯৫৬–১৯৬২)

সমকালীন মাশায়েখের খেদমতে

দামেশক থেকে হিন্দুস্তান ফিরে আসার পর '৫৬ ও '৫৭ হিজরি এই দুটি বছর তাবলীগি সফর, লেখালেখি, সাহারানপুর, রায়পুর ও দিল্লির সফরের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করি। দারুল উলূমে কয়েকটা সবকও আমি আমার দায়িত্বে রেখেছিলাম। তার অধ্যয়ন ও প্রস্তুতির সময় (যার জন্য প্রায়ই আমাকে রাতেও বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও সূক্ষ্ম টীকা-টিপ্পনি দেখতে হতো। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা তীব্রভাবে অনুভব হলো। ভাইজানের পরামর্শে সিতাপুর গিয়ে ডাক্তার দেখালাম। জানতে পারলাম, ছানি খানিকটা বেড়ে গেছে। যদিও এখনও পুরোপুরি পোক্ত হয়নি; কিন্তু অপারেশন হতে পারে। কিন্তু সে-সময় সাবধানতার খাতিরে অপারেশন করালাম না। অবশ্য সরাসরি নিজে লেখার পরিবর্তে অন্যকে দিয়ে লেখানোর ধারা শুরু করে দিলাম। এই রীতি দৃষ্টিশক্তি ঠিক হওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

সমাকলীন শায়খদের খেদমতে আমার মুরশিদ ও মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি ও প্রথম সারির শায়খ হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরি সাহেব ব্যতীত (যাঁদের খেদমতে হাজিরি দেওয়া দেশ বিভক্তির পর দুষ্কর হয়ে পড়েছিল) কিছুদিন পর-পর হাজিরা চলতে থাকল। সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ছিল হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের সঙ্গে। রায়পুর আসা-যাওয়ার সময় তাঁর খেদমতে হাজির হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। শায়খের সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়া, অপার মমতা ও বিদ্যাগত মিল এই সম্পর্ক ও যোগাযোগ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই মমতা ও ভক্তিরই ফল ছিল যে, শায়খ তাঁর সমগ্র আরবি রচনায় এবং যেসব কিতাব তিনি তাহকীক ও পরিপূর্ণ করেছেন, সেগুলোতে জোর করে আমার

থেকে ভূমিকা লিখিয়ে নিয়েছেন। আমার প্রতি তাঁর মমতা, হৃদ্যতা ও অনুগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর জীবনীতে দেখা যেতে পারে, যেটি এই সম্প্রতি আমারই কলম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর একটি পত্রের সংক্ষিপ্ত চয়ন উদ্ধৃত করছি, যাকে শায়খের জীবনীতে সংযুক্ত করতে সংকোচ অনুভব হয়েছিল। কিন্তু নিজের জীবনীতে নেয়ামতের প্রকাশ হিসেবে সন্নিবেশিত করতে কোনো সমস্যা মনে করি না :

> 'দু'আগুলোতে না মক্কায় আপনাকে ভুলতে পেরেছি, না মদিনায়। মনে নেই, কবে দুরুদ ও সালামে আপনার কথা স্মরণ করিনি। আপনিও অস্বীকার করতে পারবেন না, যতখানি আন্তরিকতা আমার আপনার সঙ্গে, ততখানি অন্য কারও সঙ্গে নেই।'

শায়খুল হাদীছ ছাড়া সমকালীন শায়খদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ছিল ভুপালের হাকীম ও আরেফ শায়খ হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাদ্দেদির সঙ্গে। ভুপালের বাৎসরিক তাবলীগি এজতেমার সুবাদে আমি প্রায় প্রতি বছর ভুপাল হাজির হতাম। বংশ ও সেলসেলার সূত্রে; তদুপরি পুরনো বন্ধু মাওলানা হাফেয ইমরান খান সাহেবের হযরতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের কারণে হযরতের ওখানে হাজিরি দিতে শুরু করলাম। খুব দ্রুত হযরতের সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। এজতেমার সময় তিনি বিশেষভাবে আমাকে তলব করতেন এবং আমার গিয়ে হাজির হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন।

আমিও হযরতের বয়ান-বক্তৃতায়, উক্তিমালায় তাছাওউফ ও ইহসানের সূক্ষ্ম বিষয়াদি ও দুর্লভ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াও জীবনের গভীর অধ্যয়ন, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণির গভীর জানাশোনা ও তাদের দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে একালের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করা এবং তাকে একটি দীপ্যমান বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করা, ভাঙা মনগুলোকে সান্ত্বনা প্রদান এবং দৃষ্টান্ত ও ছোট-ছোট উপমার মাধ্যমে গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে বর্ণনা করার এমন আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও তার এমন মনকাড়া নমুনা প্রত্যক্ষ করলাম, যার নজির অন্তত বস্তুবাদের এই যুগে চোখে পড়ে না।

হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবের পর আমার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ও ভক্তি-ভালবাস ছিল মাওলানা অসিউল্লাহ সাহেব ফতেহপুরির সঙ্গে, যিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)-এর শীর্ষস্থানীয়

খলীফাদের একজন ছিলেন এবং দেশ বিভক্তির পর অন্তত হিন্দুস্তানে তাঁর শীর্ষস্থানীয় খলীফা ও তাঁর দীক্ষারীতির ধারক ও বাহক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে খোদ তাঁর মাতৃভূমি ফতেহপুর গিয়ে হাজির হলাম এবং প্রথম হাজিরিতেই তিনি এমন বিশেষ মমতা প্রদর্শন করলেন যে, আমি বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে গেলাম। মাওলানা ফতেহপুর স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে ঘোরখপুর, পরে এলাহাবাদ – যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলে – কিছুদিন পরপর হাজির হতে থাকলাম। বোম্বাই অবস্থানকালেও – যেখান থেকে শেষে মাওলানার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল – হাজিরি দিতে থাকি। এলাহাবাদ গেলে মাওলানারই মেহমান হতাম এবং মাওলানার মমতার বিস্ময়কার ধরন ও আচরণ দেখতাম। পত্রযোগাযোগও চলতে থাকল। এক পত্রে তিনি লিখেছেন :

> 'যেসব আলেম আমার কাছে আসা-যাওয়া করে, আমার মনের ঝোঁক তাদের সবার চেয়ে বেশি জনাবের প্রতি।'

১৯৬৭ সালের নভেম্বরে সর্বশেষ হেজায-সফরের সময় – যেটি তাঁর আখেরাতের সফর প্রমাণিত হলো – তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হলো। আমাকে তিনি নিজের গদির উপর বসালেন এবং অতিশয় গোপনীয়তার সঙ্গে নিজের ঠোঁটদুটো আমার কানের কাছে এনে বললেন, 'দু'আ করো যেন হাজিরি হয়ে যায়।' কিন্তু জাহাজেই তিনি বাইতুল্লাহর বদলে বাইতুল্লাহর মালিকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আকস্মিক ঘটনাটি ঘটে গেল। নিজের মুখঃনিসৃত বাক্যটির রহস্য তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

মাওলানা অসিউল্লাহ সাহেব (রহ.) ছাড়া থানুবি সেলসেলার অপর এক বুযুর্গ হাজী আবদুল গফুর সাহেব জুধপুরির সঙ্গেও আমার ভক্তি-সম্পর্ক ছিল। একবার বন্ধুবর মাওলানা মানযূর নুমানি সাহেবের সাথে জুধপুর গিয়ে দিনদুয়েক তাঁর খেদমতে 'আশরাফ মনযিলে' কাটিয়ে এসেছি। তাঁর সরলতা, নম্রতা, মমতা এবং পরিবার ও আশপাশের পরিবেশে তাঁর তরবিয়ত ও সাহচর্যের বরকত দেখেছি। থানুবি সেলসেলা ও তার মেজাজ-রুচির একাধিক উত্তম বৈশিষ্ট্য তিনি নিজের মধ্যে চুষে নিয়েছিলেন।

তাঁদের পর মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব ফুলপুরি পূর্বসূরীদের স্মৃতি ও শীর্ষস্থানীয় শায়খদের নমুনা হিসেবে রয়ে গেছেন। যখনই তাওফীক হয়, তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে আল্লাহর যিকির, আখেরাতের ফিকির এবং বিনয় ও নিষ্ঠার সেই নমুনা ও দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি, যা এখন শুধু কিতাবের মাঝেই পাওয়া যায়।

আমার নিজের শহর লাখনৌয়ে দুজন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁদের খেদমতে হাজির হলে কিছু অর্জন করা যেত। একজন হলেন মাওলানা শাহ ওয়ারেছ হাসান সাহেব, যিনি শাহ পীর মুহাম্মাদ সাহেবের টিলায় বাস করতেন। তিনি আমাদের লাখনৌ শহরের বিপুলসংখ্যক উকিল, ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী লোকদের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে এই সমাজের এই শ্রেণিগুলোতে অনেক সংশোধনের কাজ হয়েছে এবং দীনদারি তৈরি হয়েছে। তিনি হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর মুরীদ এবং শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। আমার পিতাজি ও ভাইজানের সাথে তাঁর ভালো পরিচয় ছিল। আমি তাঁর খেদমতে তেমন হাজির হতে পারিনি। সেটি ছিল আমার ছাত্রত্ব ও শিক্ষকতার সময়। কিন্তু যখনই হাজির হলাম, খানদানি বুযুর্গদের মতো মমতা প্রদর্শন করলেন। আর যখন জানতে পারলেন, আমি কুরআনের দরস দিচ্ছি, তখন আরও বেশি করুণা দেখালেন, সাহস দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন।

অপরজন ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেব ফারুকী (রহ.), যাঁর সাথে আমার পুরনো রূহানি ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর পিতা মৌলভী নাযের আলী সাহেব আমার আব্বাজানের মামা হযরত মাওলানা সাইয়িদ আবদুস সালাম সাহেব মুজাদ্দেদির (খলীফায়ে খাস হযরত শাহ আহমাদ সাঈদ সাহেব দেহলবি মুজাদ্দেদি) মুরীদ ও মুজায ছিলেন। মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেবের এই সেলসেলার সকল বুযুর্গের সাথে সাধারণভাবে এবং হযরত মাওলানা আবদুস সালাম সাহেবের সাথে বিশেষভাবে পরম ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের সুবাদে তিনি আমাদের বংশের প্রতিজন সদস্য বরং প্রতিটি শিশুকেও শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

আমারই আবেদনে একবার তিনি আমার সঙ্গে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর কাছে নেজামুদ্দীন গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ সুন্নীদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সৃষ্টি করা, তাঁদের হক ও মাকাম সম্পর্কে পরিচিত করা এবং শিয়াবাদের প্রভাবগুলো দূর করার ক্ষেত্রে তাঁর থেকে অনেক সংস্কারমূলক খেদমত নিয়েছেন। তাঁর যে-কটি চরিত্র বিশেষভাবে আমাকে তাঁর প্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট করেছে, সেগুলো প্রথমত তার সরলতা, বিনয় ও নম্রতা। দ্বিতীয়ত, তাঁর হাক্কানি ও রাব্বানি ওয়ায। তাঁর ওয়ায-বয়ান পূর্বসূরীদের মতো সব ধরনের বাচালতা ও লৌকিকতা

থেকে পবিত্র, বিশ্বাসের সংশোধন, ফরজসমূহের পাবন্দি ও আখেরাতের আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল।

এই বিবরণটা এজন্য লিখে দিলাম যে, মিশর, সিরিয়া ও তুরস্কের মতো উন্নত দেশগুলো এবং ওখানকার; এমনকি হিন্দুস্তানের উন্নত-থেকে-উন্নততর শিক্ষা ও সাহিত্যবিষয়ক অঙ্গনগুলোতে শরিক হওয়ার সুবাদে এবং নিজের অধ্যয়ন, লেখালেখি ও সেই অস্থিরতার সাথে – যে কিনা কখনও আমার সঙ্গ ছাড়েনি – হৃদয়ের ঔষধবিক্রেতা এবং এশক ও এখলাসের দোকানগুলোতে যথারীতি সম্পর্ক রেখে চলছিলাম যে, বস্তুবাদ ও জ্ঞানের এই আকাল যুগে এই একটি বিষয়ই আমাকে রক্ষা করতে পারে।

কাদিয়ানি মতবাদের উপর গ্রন্থ রচনা

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ, ১৯৫৮ সালের জানুয়ারির শুরুর দিকে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনায় লাহোরে একটি মজলিসে মুযাকারাতে ইসলামী (ইসলামি মতবিনিময় সভা) অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ অংশগ্রহণ করেন। আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছা সত্ত্বেও আমি উল্লিখিত তারিখগুলোতে গিয়ে হাজির হতে পারিনি। কারণ, সে-সময় আমি বারার-এর একটি দীর্ঘ ও অতি প্রয়োজীয় সফরে ছিলাম। এই সফরে তাবলীগি দাওয়াতের পাশাপাশি 'পয়ামে ইনসানিয়াত'-এর সভা-সমাবেশও চলছিল, যা কিনা খুবই সাফল্য অর্জন করছিল। বারার-এর কোমল ও উর্বর মাটি এবং ওখানকার মানুষগুলো দুটি কর্মসূচিকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। সফর শেষে আমি ভুপালের বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করি। এভাবে লাহোরের মুযাকারাতে ইসলামীর তারিখগুলো পার হয়ে গেল।

মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের একাধিক আলেম ও চিন্তাবিদ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুস্তানি আলেমদের কাছে জানতে চাইলেন, কাদিয়ানি মতবাদের উপর আরবিতে এমন কোনো গ্রন্থ আছে কি, যার মাধ্যমে তার স্বরূপ ও ইতিহাস জানতে পারব? আলেমগণ এমন কোনো গ্রন্থ পেশ করতে পারেননি, যেটি আধুনিক মন-মস্তিষ্ককে সামনে রেখে মধুর ও সাহিত্যপূর্ণ সাবলীল আরবিতে লেখা হয়েছে। হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি সে-সময় লাহোরে অবস্থানরত ছিলেন। কাদিয়ানি মতবাদে ইসলামের জন্য তিনি সেই শঙ্কা অনুভব করতেন, যা কিনা সম্ভবত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরি ও মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির পর আর কোনো ওলামা-

মাশায়েখের মাঝে কমই থেকে থাকবে। তিনি আমার আগমনের খবর পেয়ে গেলেন। হযরত তীব্রভাবে আমার আগমনের অপেক্ষায় উদগ্রীব ছিলেন এবং বলে রেখেছিলেন, এ-কাজটি সম্পাদনের জন্য আমি তাকে শক্তভাবে ধরব। আমি এসে হাজির হলে তিনি আমাকে কাজটি করার জন্য সরাসরি আদেশ দিলেন। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, কে যেন আমার মাথার উপর একটা পাহাড় রেখে দিয়েছে। কারণ, এই গলিটা আমার একদম অপরিচিত ছিল। আমি না তখনও এ বিষয়ের কোনো গ্রন্থ পড়েছি, না এই মতবাদের খণ্ডনে কিছু দেখেছি।

১৯৫৩ সালে যখন পাকিস্তানে খতমে নবুওতের আন্দোলন চলছিল এবং সামরিক শাসন জারি ছিল, সে-সময় আমি আরবিতে القاديانية ثورة على النبوة المحمدية শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখে মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের বন্ধু ও বুযুর্গদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যেগুলো তাঁরা আপন-আপন দেশে প্রচার করে দিয়েছিলেন। রাবেতা আলমে ইসলামীও নিবন্ধটি বিপুল সংখ্যায় প্রচার করেছিল। কিন্তু সেটি ছিল একটি ভাসাভাসা পরিসংখ্যান, যার উৎস ছিল উরদুর গোটাকতক পুস্তিকা। প্রথমে আমি বলেছি, আমি আরবদের মন-মানসিকতা ও আরব বিশ্বের চিন্তার রীতি আমার জানা। তাই আমি গ্রন্থটির একটি কাঠামো তৈরি করে দেব। ভালো হবে, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরি – যিনি উঁচু মানের আলেম, মুহাদ্দিছ এবং আরবিতে গ্রন্থ রচনায় পুরোপুরি যোগ্য – কাজটি সম্পাদন করে দেবেন। কিন্তু সম্ভবত হযরতেরই আন্তরিক তাওয়াজ্জুহর ফল ছিল যে, আমার মন নিজেই বদলে গেল এবং আমি কাজটির জিম্মাদারি কবুল করে নিলাম।

আমি দীর্ঘ এক মাস সুফি আবদুল হামীদ সাহেব মরহুম (সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, পাঞ্জাম)-এর কুঠিতে, যেখানে হযরত অবস্থানরত ছিলেন এই ইলমি ও তাসনীফি এতেকাফে এমনভাবে কাটিয়ে দিলাম, যেন দুনিয়ার কোনো খবরই ছিল না। মির্জা সাহেবের সবগুলো বই পড়েছি। নোট নিয়েছি। প্রায় ২৩-২৪ দিনে আরবিতে القادياني والقاديانية (কাদিয়ানি ও কাদিয়ানি মতবাদ) নামে প্রস্তুত হয়ে গেল, যার কয়েকটি এডিশন বোম্বাই, লাখনৌ, জেদ্দা ও মদিনা থেকে বের হয়েছিল এবং আরব বিশ্বে তার ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। এ-কাজটি ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পন্ন হয়েছিল।

পরবর্তী বছর আবার যখন লাহোর হাজির হলাম, তখন হযরত বইটিকে উরদুতে অনুবাদ করার আদেশ দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই বইটি উরদুতে অনূদিত হয়ে গেল। এই গ্রন্থটির ভিত তৈরি হয়েছে

বিতর্কসুলভ জোশের বদলে ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য; তিরস্কার-ভর্ৎসনার পরিবর্তে প্রমাণ ও সাক্ষের উপর। কাদিয়ানিয়াতের সরকারি মুখপত্র 'আল-ফজল' আমার এই বইটির উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিল–

> 'স্বীকার না করে উপায় নেই, পুরো গ্রন্থটি (এ বিষয়ের অন্য সকল গ্রন্থের বিপরীতে) গম্ভীর ও মার্জিত ভাষায় লেখা হয়েছে। শুধু তার নামটা আপত্তিজনক ও উত্তেজনাকর।'

আমি এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ রেখেছি যে, যে-ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রকাশ নিজের কলম থেকে হতে পারে, তা যেন পাঠকদের হৃদয়ে বইটির উপাদান থেকে আপনা-আপনি-ই সৃষ্টি হয়। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহি সাহেব 'মিছাক'-এ তার উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'বিস্মিত হয়ে হয়, লেখকের যেখানে ক্ষোভ আসবার কথা ছিল, সেখানেও তার মনে কোনো ক্ষোভ আসেনি।'

হযরত এই কাজটির সম্পন্ন হওয়ায় খুবই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। অনেক সময় হাতে নিয়ে উপস্থিত ভক্ত-মুরিদদের বলেছেন, তোমরা এই কিতাবটি ক্রয় করো এবং পড়ো।

আমি পুরোপুরি আশাবাদী, এই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আমি হযরতের অন্তরকে আনন্দ দিয়েছি, তাঁর দু'আ নিতে সক্ষম হয়েছি এবং এই সামান্য সেবাটুকু তাঁর আরও নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

হায়দারাবাদ সফর

১৯৫৮ সালের নভেম্বরে জামে মসজিদ সেকান্দরাবাদে (হায়দরাবাদ) অনুষ্ঠেয় সীরাত মাহফিলের – যেটি ওখানে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো – আমন্ত্রণ এল। এ-সম্মেলন কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন সেকান্দরাবাদের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এইচ. এম হুসাইন। জামেয়া উছমানিয়ার দীনিয়াত বিভাগের প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ আলী তাকে পরামর্শ দিলেন, এবার যেন এই মাহফিলে আমাকে দাওয়াত করা হয়। এ-ও বলে দিলেন যে, যতক্ষণ-না তাবলীগি জামাতের পক্ষ থেকে এর সুপারিশ করা হবে এবং চেষ্টা চালানো হবে, তিনি আসবেন না। অনেক দিন হলো আমার হায়দরাবাদ যাওয়া হয়নি। তার সঙ্গে আমার পুরনো ও আত্মীয়তাসুলভ সম্পর্ক ছিল। সেটি ছিল মুসলমানদের অনেক বড় একটি সংস্কৃতিক কেন্দ্র। আমি দাওয়াত কবুল করে নিলাম। জামাতের বন্ধুরা খাইরিয়াতাবাদের মসজিদের সম্মুখস্থ এক বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং আমার এই সফর ও অবস্থানকে উপকারী ও ফলপ্রসূ বানানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন।

সেকান্দরাবাদ জামে মসজিদে বিশাল এক মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব – যার সঙ্গে আমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না – মাহফিলে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে অভিনব এক ধারায় বক্তৃতা করলেন। আমার পরিচয়ে তিনি গতানুগতিক নিয়মে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। বললেন, আল্লাহর ঘরে কোনো মানুষের পরিচয় প্রদান শোভা পায় না। আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাদের এধরনের নানা নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং নিজের একজন বান্দাকে এমন-এমন তাওফীক দান করেছেন।

আল্লাহর শান দেখুন, এই ভাষণের পর একটি জামাতের সঙ্গে আমি হায়দরাবাদের একটি জেলা; সম্ভবত নেযামাবাদের এক প্রোগ্রামে গেলাম। এইচ. এমন হুসাইন সাহেবও আমার সঙ্গে ছিলেন। ওখান থেকে ফিরে এসে দেখলাম, বাজার বন্ধ; একটা দোকানও খোলা নেই। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব মারা গেছেন; কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জানাযা সেকান্দরাবাদ জামে মসজিদে আসবে। আমরা ওখানে পৌঁছে গেলাম। মাওলানার শ্বশুর নবাব হাকীম মাকসুদ জঙ্গ সাহেব আমাকে জানাযার নামায পড়াতে আদেশ করলেন। মনে হলো, কুদরত তারই আয়োজন করে রেখেছিল।

সেকান্দরাবাদের সীরাত মাহফিল ছাড়াও হায়দরাবাদের বন্ধুরা বিভিন্ন ইলমি ও দীনি অঙ্গনে নানা প্রোগ্রাম তৈরি করে রেখেছিলেন। একদিন প্রিন্স মুকাররম জাহ বাহাদুর (মীর উছমান আলী খানের বড় পৌত্র) আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। সেখানে প্রফেসর ইলিয়াস বারনি সাহেবের সঙ্গেও আমার দেখা হলো। আমি তার 'কাদিয়ানি ধর্মমত' গ্রন্থটির ব্যাপারে নিজের প্রতিক্রিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম, যার থেকে আমি আমার 'কাদিয়ানিয়াত' নামক গ্রন্থটির কাঠামো তৈরির কাজে সহযোগিতা নিয়েছি। তিনি আমার সেই নিবন্ধগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করলেন, যেগুলো আমি হিন্দুস্তানি মুসলমান, তাদের দীন, শিক্ষা ও দেশের সেবার মানসে রচনা করেছি এবং সেগুলোর কতগুলো 'রাহনুমায়ে দাকান'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত' প্রতিষ্ঠা

১৯৫৮ সালে বন্ধুবর সাঈদ রমযান – যিনি 'আল-মুসলিমূন' পত্রিকাটি দামেশক থেকে বের করছিলেন – ডক্টরেট করতে জার্মানি চলে যান। যাওয়ার আগে তিনি আমার কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, তার অনুপস্থিতিতে আমি

যেন 'আল-মুসলিমূন-এর সম্পাদকীয় লিখে দেই। আমি মাসকয়েক তার এই আব্দার রক্ষা করি। এই ধারাবাহিকতায় প্রথম সম্পাদকীয়টি লিখলাম 'রিদ্দাতুন জাদীদাহ' শিরোনামে, যেখানে আমি মুসলিম বিশ্বে নতুন এক ধরনের ধর্মত্যাগের প্রবণতা চিহ্নিত করেছি। এটা সেই ধর্মত্যাগ, যা প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক আক্রমণের পেছনে-পেছনে এসেছে। নবুওতের যুগ থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে যত ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছে, এটা হলো সবচেয়ে বড় ও জঘন্য। এ হলো ধর্মহীনতার ধর্ম, যেটা মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণিটির বিপুলসংখ্যক লোককে গ্রাস করে নিয়েছে। কিন্তু বিগত ধর্মত্যাগী আন্দোলন ও ঢেউয়ের বিপরীতে যারা এই ধর্মত্যাগ অভিযানের আওতায় চলে আসে, তারা মন্দির বা প্যাগোডায় যায় না, নিজেদের ধর্মত্যাগের ঘোষণা দেয় না এবং তাদের ইসলামি সমাজ এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে না, তাদের বয়কট করে না।

এ বিষয়টির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে ডক্টর রফিউদ্দীন সাহেবের একটি নিবন্ধ পড়ার পর। ওখান থেকে মৌলিক ধারণা নিয়ে আমি বিষয়টিকে খোলাসা করেছি, বিশ্বময় ধর্মহীনতার এই সয়লাবের রহস্য বর্ণনা করেছি এবং পরে তার প্রতিকারের পন্থা, নতুন শক্তিশালী ঈমানের দাওয়াত ও তার জন্য নতুন ইলমি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, নতুন চিন্তা-চেতনাকে সামনে রেখে শক্তিশালী লিটারেচার প্রস্তুতির উপর জোর দিয়েছি এবং সেই সঙ্গিন পরিস্থিতির চিত্র অঙ্কন করেছি, মুসলিম বিশ্ব যার শিকার।

এই নিবন্ধটি দুটি কিস্তিতে 'নতুন ধর্মত্যাগ' ও নতুন দাওয়াত' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পরে এটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে ردة ولا ابا بكر لها (ধর্মত্যাগের প্রবণতা আছে; কিন্তু তার মোকাবেলার জন্য আবুবকর নেই) শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হাজার-হাজার কপি ছাপা হয় এবং মিনা-আরাফাতে পর্যন্ত বিতরিত হয়। ধারণা করা যেতে পারে, আমার কোনো নিবন্ধ, পুস্তিকা বা গ্রন্থ এত বিপুল সংখ্যায় না প্রচারিত হয়েছে, না এত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। 'আল-ফুরকান'-এর সম্পাদক মৌলভী আতীকুর রহমান সম্ভলি উরদুতে তার অনুবাদ করেছেনে এবং 'নয়া তুফান আওর উসকা মোকাবেলা' (নতুন ঝড় ও তার মোকাবেলা) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।[1]

---

১. এ ক্ষেত্রে একটি মজার ঘটনা না বলে পারছি না। সম্ভবত ১৯৬৪ সাল ছিল। রাবেতার সভা চলছিল। আমরা রাবেতার কেন্দ্রীয় অফিসে (পবিত্র মক্কায়) বসা

এই নিবন্ধটি লেখার ও প্রকাশিত হওয়ার পর তীব্রভাবে অনুভব করলাম, বিশ্বাসগত ও সংস্কৃতিক এই ধর্মত্যাগ, এই চিন্তানৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের মোকাবেলার জন্য একটি নতুন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, যে-প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ের উপর কাজ করবে। আমার এই অনুভূতিরই ফলাফল হিসেবে ১৯৫৯ সালে 'মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলামী' (একাডেমি অফ ইসলামিক রিচার্স এন্ড পাবলিকেশন্স) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম ডক্টর মুহাম্মদ আসেফ কুদওয়াই লিখিত 'মাকালাতে সীরাত' প্রকাশ করে। আমার এই লাইনগুলোর লেখার সময় পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬৮ তে পৌঁছে গেছে। বললে অত্যুক্তি হবে না, অন্তত ইংরেজিতে এই অনুন্নত উপমহাদেশে কোনো প্রতিষ্ঠান দাওয়াতি ও ইলিম আন্দাজ, উন্নত ও মানসম্পন্ন ইংরেজিতে দীন ও শরীয়ত, ইসলামের আকায়েদ ও আরকান, হাদীছ, সীরাত, খুলাফায়ে রাশেদীন, ইসলামের ইতিহাস, সংশোধন ও সংস্কার সর্বোপরি হিন্দুস্তানে ইসলাম ও মুসলমানদের গঠন ও সেবামূলক কাজের পরিচিতিতে তার চেয়ে বেশি লিটারেচার প্রকাশ করেনি। ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আরব দেশগুলোতে তার গ্রন্থগুলো আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ছিলাম। এমন সময় সভাকক্ষের দরজা ফাঁক করে এক শিয়া আলেম প্রবেশ করল। আমি যেহেতু লাখনৌর অধিবাসী ছিলাম, তাই সঙ্গে-সঙ্গে চিনে ফেললাম, ইনি কোনো শিয়া মুজতাহিদ হবেন। মুফতী সাইয়িদ আমীন আল-হুসাইনি (যিনি দিনকতক ইরান অবস্থান করে এসেছেন) এগিয়ে গেলেন এবং লোকটিকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর একজন-একজন করে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন, ইনি সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদী, ইনি অমুম, ইনি অমুক। যখন আমার পালা এল, তখন বললেন, ইনি শায়খ আবুল হাসান নদবি।

নবাগত এই লোকটি ছিলেন (আয়াতুল্লাহ) রুহুল্লাহ খোমেনি। আমার নাম শুনে তিনি বলে উঠলেন, হাঁ-হাঁ; আমি আপনার পুস্তিকা ردة ولا ابا بكر لها, পড়েছি। আমার মতে বইটির নাম হওয়া দরকার ছিল ردة ولا ابا حسن لها,(ধর্মত্যাগের প্রবণতা আছে; কিন্তু তার মোকাবেলার জন্য আবুল হাসান নেই)। আবুল হাসান বলতে তিনি হযরত আলী (রাযি.)কে বুঝিয়েছেন। আমি উত্তর দিলাম, আরবি ভাষার বাকরীতি এটি নয়। আরবির বাকরীতি হলো قضية ولا ابا حسن لها (জটিল কেইস; কিন্তু তার মীমাংসার জন্য আলী নেই)। আলোচন্য পুস্তিকাটির জন্য ردة ولا ابا بكر لها, (ধর্মত্যাগের প্রবণতা আছে; কিন্তু তার মোকাবেলার জন্য আবুবকর নেই) নামই যথাযথ। আমার এই উত্তরের পর তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

এই সবগুলো কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর সাহায্যে এত সামান্য পুঁজি এবং এত সীমিতসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে, যা সহজে বিশ্বাস করা দুষ্কর।

মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের সমস্যার সাথে সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা

চিন্তাধারায় যে-প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল এবং যে-পরিবেশে আমি প্রতিপালিত হয়েছি, আলীগড় ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়িদ আহমাদ খানের দীনি চিন্তাধারা, গবেষণা, পশ্চিমা সভ্যতার ও শাসনের ব্যাপারে তার অবস্থান, শিক্ষাবিষয়ে তার পলিসি এবং যে-ধারায় তিনি এম.এ.ও কলেজটিতে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, তার সঙ্গে আমার পুরোপুরি ঐকমত্য কখনও ছিল না। স্যার সাইয়িদের নামে আমার শ্রদ্ধেয় পিতাজির লিখিত একটি দীর্ঘ পত্র – যেটি আমাদের দীনি ও ইলমি অঙ্গনের প্রকৃত চিন্তাধারা ও অনুভূতির মুখপত্রের ভূমিকা পালন করছে – 'হায়াতে আবদুল হাই'-এ হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি, আমার বংশ ও নদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীলগণ মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়কে মুসলমানদের এমন একটি মহামূল্যবান জাতীয় সম্পদ মনে করেছি, যার উপর ১৮৫৭ সালের পর শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানদের উন্নততর নানা শক্তি ও মেধা ব্যয় হয়েছে এবং হিন্দুস্তানি মুসলমান (হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও) ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর সন্তানদের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ, তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার কারখানা ও তাদের ইলমি ও আমলি প্রতিভাগুলোকে বিকশিত করার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মনে করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে দেশের সংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাদের হাতে আসবার ছিল। একারণে এই বাস্তবতার উপর যাদের চোখ ছিল, তাদের পক্ষে একে উপেক্ষা করা কোনো কালেই সম্ভব ছিল না।

আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে আমার আনাগোনা ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেবের ভাইস চেন্সেলরির শেষ আমল থেকে শুরু হয়েছিল এবং তার ধারা আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। ডক্টর যাকির হুসাইন খান (ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট)-এর ছোট ভাই ডক্টর ইউসুফ হুসাইন খান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালনকালে ('৫৮-'৫৯) আমি যখন আলীগড় গেলাম, তখন তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন এবং ব্যক্তিগত আসরগুলোতে সেই শঙ্কাগুলোর কথা ব্যক্ত করলেন, যেগুলো প্রতিজন

অনুভূতিপ্রবণ ও দরদী মুসলমানদের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল। অপরদিকে বন্ধুবর ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন সাহেব কুরাইশি ও শ্রদ্ধেয় যফর আহমাদ সিদ্দীকি সাহেবের কারণে – আলীগড়ের সঙ্গে যাঁদের হৃদ্যতা-ই নয়–রীতিমতো আসক্তি ছিল – আলীগড়ের সমস্যাবলির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা ও তার সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল।

বদরুদ্দীন তাইয়িবজি যখন ১৯৬২ সালে উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব বুঝে নিলেন, তখন আমি তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলাম, যাতে আমি ইউনিভার্সিটির গুরুত্ব ও তার পদের মর্যাদা ও স্পর্শকাতরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যার দ্বারা তিনি অনেক প্রভাবিত হয়েছেন।

তারপর যখন ইউনিভার্সিটির সংখ্যালঘু চরিত্র ও তার সেসব মৌলিক লক্ষ্য, যার জন্য তাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল এবং চিন্তা-চেতনা ও চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসাত্মক আন্দোলনগুলোর কেন্দ্রে পরিণত হতে চলল, তখন এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজটি লাখনৌ থেকে উচ্চকিত হলো। গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হলে এ বিষয়ের উপর প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হলো, যাতে আমি ভাষণ দিয়েছি। তারপর লাখনৌ-এর আলীগ মহল – যাদের মাঝে হাজী শফীকুর রহমান সাহেব এডভোকেট, আলহাজ মাসউদ হাসান এডভোকেট, ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন সাহেব কুরাইশি ও যফর আহমাদ সিদ্দীকির ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। পরে তাকে একটি আন্দোলন ও সংগঠনের রূপ দেওয়া হলো এবং সে-সময়ই 'এস.ও.এস ফর মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়' নামে একটি প্রভাবশালী ও চিন্তাজাগানিয়া পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো, যার উপর দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতাদের অনেকের স্বাক্ষর ছিল, যাদের মাঝে আমার ভাইজানও ছিলেন। এই আন্দোলনের সাথে আমার সহযোগিতা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং আমি তাকে প্রতিটি যুগে মুসলমানদের একটি বড় সেবা ও সময়ের দাবি মনে করেছি।

বর্মা সফর

দারুল উলূম নদওয়ার (যার সহকারী পরিচালক এবং তার চেয়েও বেশি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে আমার উপর যিম্মাদারিও ছিল) আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল হতে চলছিল। দেশ বিভক্তির পর ভারতীয় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং উপায়-উপকরণ ও আয়-উপার্জন কমে গিয়েছিল। হিন্দুস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বর্মা

এমন একটি দেশ ছিল, যেখানে হিন্দুস্তানি (বিশেষ করে গুজরাট, সুরাট ও তার আশপাশের অঞ্চলসমূহ) বহু মুসলমান ব্যবসায়ী বংশপরম্পরায় বাস করছিল এবং বাণিজ্যেও আলহামদুলিল্লাহ সফল ছিল। স্বদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানকেও তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা করে আসছিল। সৌভাগ্যক্রমে দেওবন্দের এক আলেমে দীন কারী আবদুর রহমান সাহেব কাসেমি ব্যক্তিগত পরিচয় ও সম্পর্কের সূত্রে আমাকে রেঙ্গুন সফরের দাওয়াত দিলেন, যাতে ওখানকার ইলমি ও দীনি মহলগুলোতে নতুন উদ্দীপনা ও জাগরণ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি দারুল উলূমের প্রতিও ওখানকার বিত্তবান দানশীল লোকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে।

দারুল উলূমের হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শক্রমে এবং ভাইজানের অনুমতি ও নির্দেশনায় (যিনি সে-সময় ব্লাডপ্রেসারের কঠিন রোগী ছিলেন) আমি স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মুঈনুল্লাহ নদবিকে সঙ্গে করে সফরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ১৯৬০ সালের ১৮ ডিসেম্বর আমরা রেঙ্গুন পৌঁছে গেলাম। পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট করা হলো, 'স্বাধীন বর্মায় এর আগে কোনো আলেমের এমন সংবর্ধনা দ্বিতীয়টি আর হয়নি।' কারী আবদুর রহমান সাহেব কাসেমি, মাওলানা ইবরাহীম আহমাদ সাহেব মাযাহিরি, ও মুফতী মাহমুদ দাউদ সাহেবের সুদৃষ্টি ও প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনের দীনি অঙ্গনে আমাদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার দিনকতক হাজী আবদুল মজীদ সাহেব সুরাটির বাড়িতে, পরে বন্ধুদের পরামর্শে হাজী আহমাদ আলী মুকাতির কুঠিতে অবস্থান গ্রহণ করি, যিনি বড় একটি নাইলন ফ্যাক্টরির মালিক ও শহরের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন।

রেঙ্গুনে আমি এক মাসেরও বেশি সময় অবস্থান করলাম। এ-সময়ে কয়েক ডজন নয়, কয়েক কুড়ি বক্তৃতা করলাম, যেগুলোতে আমি এই দেশটিতে ইসলামের সুরক্ষা ও প্রসার এবং এখানকার জনগোষ্ঠীকে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করার অতি প্রয়োজনীয় কাজটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছি এবং পরিষ্কার ভাষায় বলেছি, যদি একাজটি আপনারা না করেন, তাহলে এখানকার মুসলমানদের কপালে দুর্ভোগ আছে। তখন না তাদের ব্যবসা ও স্বচ্ছলতার কোনো নিরাপত্তা থাকবে, না তাদের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। প্রথম ভাষণটি হলো রেঙ্গুনের খ্যাতনামা সুরাটি মসজিদে।

এ ভাষণে আমি এই জাতিটির ইবরাহীমি যুগ ও নবুওতে মুহাম্মদির সঙ্গে আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করে ইবরাহীমি ও মুহাম্মদি সভ্যতার স্বরূপ বর্ণনা করেছি এবং বলেছি, দেশপ্রেম ও ইবরাহীমি-মুহাম্মদি সভ্যতার মাঝে কোনো

বিরোধ নেই। মিল্লাতে ইবরাহীমি কারুর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তার বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি ভাষার ছায়ায় করা যেতে পারে। আরবির পর সব ভাষা-ই সমান। সেজন্য বর্মি মুসলমানদের বর্মি ভাষায় পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করা ও ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি। একথা জেনে আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, হযরত থানবি (রহ.) যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁরও প্রথম ওয়াজ এই মসজিদে হয়েছিল এবং আলোচনা মিল্লাতে ইবরাহীমির উপর হয়েছিল।

রেঙ্গুন পৌঁছে আমি সর্বপ্রথম যে-কাজগুলো করেছি, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, প্রথম সুযোগেই হিন্দুস্তানের সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ যফরের কবর যেয়ারত ও ফাতেহাখানি, যেখানি দাঁড়ানোর পর আমার হৃদয়ের ক্ষত ও মস্তিষ্কের ঐতিহাসিক অঙ্কন তাজা হয়ে গিয়েছিল। বর্মায় অবস্থানকালে আমি বিশেষভাবে দুটি স্থান ভ্রমণ করেছি। একটি হলো মান্ডলে আর অপরটি মিমিউ। এই সফরে আমার বর্মার মন্ত্রী রশীদ সাহেবের সাথে বিশেষভাবে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। নদওয়াতুল উলামার জন্য বেশ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয় বটে; কিন্তু তার কম অংশই আমি হিন্দুস্তান আনতে সক্ষম হই। নদওয়তুল উলামার আর্থিক উপকারিতা তো কমই হলো; কিন্তু বর্মার দীনি ফায়েদা আল্লাহর ফজলে অনেক হলো। কয়েক বছর পর এখনও ওখানকার অনেক বন্ধু-সুহৃদদের পক্ষ থেকে দীনি যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের ফিরে আসার অল্প কদিন পরই ওখানে সামরিক বিপ্লব ঘটল এবং কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতায় এল। তারপর সেই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল, যার আশঙ্কা আমি তাদের ব্যক্ত করে হুশিয়ার করে এসেছিলাম। এটি কোনো অলৌকিক বিষয় ছিল না। পবিত্র কুরআনের সামান্য বুঝ আর ইতিহাসের অধ্যয়নই আমাকে সেদিকে রাহবরি করেছিল। বর্মার মানুষ এখন আমার সেই বয়ানগুলো শোনে আর বিস্মিত হয়।

স্বাধীন ভারতে দীনি শিক্ষার বিরাট উদ্যোগ ও প্রাদেশিক দীনি শিক্ষা কনফারেন্স

হিন্দুস্তান স্বাধীন হওয়ার পর এই ভূখণ্ডে ইসলামি জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন-মৃত্যুর ফয়সালাকারী বিষয় দাঁড়াল মুসলমানদের নতুন প্রজন্মের মৌলিক ইসলামি বোধ-বিশ্বাস ও নিজেদের জাতীয় স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য ধরে রাখা, যা কিনা ভারত একটি সেকুলার (ধর্মহীন) রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ধর্মহীন রাষ্ট্রে

মুসলমান শিশুদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ছিল না। আইনত এই আচরণ সবগুলো গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের বেশিরভাগ লোক সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য বিধায় স্বভাবত তাতে সবগুলো গোষ্ঠীর সঙ্গে এক রকম ও সমান কর্মনীতি অক্ষুণ্ন রাখা খুবই কঠিন ছিল। সেইসঙ্গে মুসলমানদের ব্যাপারে অতীতের নানা তিক্ততা, পাকিস্তানের অস্তিত্ব লাভ, হিন্দু জাগরণের উপস্থিতি এবং ধর্মহীন সিলেবাসের প্রণেতাদের হিন্দু মন-মানসিকতা সব মিলে বিষয়টিকে জটিল বানিয়ে তুলেছিল। তার ফল এই দাঁড়াল যে, বিভক্তির পরমুহূর্তে বেসিক পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু দেবমালার কথা ও মোশরেকানা কাহিনী ও পাঠ স্পষ্ট চোখে পড়তে শুরু করল। আমরা দেখতে পেলাম, যদি এই ধারা আরও বছরকয়েক চালু থাকে, তাহলে মিল্লাতে ইবরাহীমি ও উম্মতে মুহাম্মাদীর নতুন প্রজন্ম ইসলামের নির্ভেজাল একত্ববাদের বিশ্বাসের সঙ্গে অপরিচিত এবং প্রকাশ্য শিরক ও কুফরি আকিদার অনুসারী কিংবা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে করবার মতো কাজ ছিল দুটি। একটি নেতিবাচক, একটি ইতিবাচক। নেতিবাচক হলো, আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাতাম, শিক্ষানীতিতে আপনারা নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মহীন ও নিরপেক্ষ হোন এবং সবগুলো গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান আচরণ করুন। তদুপরি সিলেবাসকেও ইংরেজ আমলের মতো সেকুলার বানিয়ে নিন, যার পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সাধারণ জ্ঞান কিংবা কুকুর-বিড়ালের নির্দোষ ও অক্ষতিকর কাহিনী থাকত বটে; কিন্তু কোনো ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হতো না।

ইতিবাচক হলো, বেসিক ও মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা মুসলমানরা আপন সন্তানদের জন্য নিজেরাই করে নেবে। এর জন্য তারা নিজেরা মকতব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে নেবে, যাতে মাতৃভাষা উরদু ও দীনিয়াতের প্রাথমিক শিক্ষা থাকবে এবং মুসলিম শিশুদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামি ভাবধারা আমরা নিজেরাই তৈরি করে নেব।

কাজী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসী

এই আশঙ্কাটা সর্বপ্রথম পরিষ্কারভাবে কাজী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসী সাহেব অনুভব করেছিলেন, যিনি একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও কংগ্রেসি মুসলমান ছিলেন। ইউপি এ্যাসেম্বলির সদস্যও ছিলেন। আবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বাস্তির একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভিতরের লোক হওয়ার সুবাদে, বিশেষভাবে দীর্ঘদিন এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান থাকার

ফলে এবং নিজের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, বাস্তববাদী চিন্তা-চেতনা, ইসলামি মন-মানসিকতা ও অনুভূতির কারণে তিনি এই শঙ্কাটা তাড়াতাড়ি অনুভবই করেননি; বরং বিষয়টা তার চিন্তা-চেতনা ও স্নায়ুর উপর এমনভাবে চড়ে বসেছিল যে, তিনি নিজের সবটুকু শক্তি, সবটুকু মেধা এর জন্য কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি নিজের জেলার সীমানাতেই নীরবে এই শঙ্কার মোকাবেলা ও স্থানে-স্থানে মকতব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

একটি দুর্লভ সম্পদ তার হাতে এসে গেল, যার ফলে তাঁর সাধারণ চাঁদার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তাহলে 'মুষ্টিচাঁদা'। তিনি আন্দোলন চালালেন, প্রতিটি ঘরে রান্না করার সময় এক মুঠ আটা বা চাল একটা হাঁড়িতে তুলে রাখবেন। এই চাল-আটা বিক্রি করে স্থানীয় মকতবের খরচ চালানো হবে। তিনি এই সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে দীর্ঘদিন যাবত একাজটি করতে থাকলেন। কিন্তু যখন মাওলানা মানযূর সাহেব নুমানি, আমি ও অন্য কয়েকজন বন্ধুর সামনে বিষয়টি স্পষ্টরূপে ধরা দিল, তখন আমরা তাকে বাধ্য করলাম, আপনি আপনার এই কাজের সীমিত পরিধির বাইরে পা রাখুন এবং কাজটি অন্তত প্রাদেশিক পরিসরে আঞ্জাম দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

আমাদের বলার পর তিনি রাজি হয়ে গেলেন এবং ৩০, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৯ ও ১লা জানুয়ারি ১৯৬০ এই তিন দিন বাস্তিতে একটি প্রাদেশিক দীনি কনফারেন্স আহ্বান করেন। এই কনফারেন্সে তিনি শুধু প্রদেশই নয় – প্রদেশের বাইরে থেকেও বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিতবর্গ, শিক্ষার সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা রাখেন এমন ব্যক্তিদের, জাতীয় ও ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের আমন্ত্রণ জানান। এই প্রথম কনফারেন্সটির সভাপতিত্ব করার জন্য লটারিতে আমার নাম উঠে এল। ফলে এর জন্য আমাকেই নির্বাচন করা হলো। তাড়াহুড়ার কারণে আমি সাহারানপুর ও হারদুইর মধ্যকার রেলে বসেই ভাষণ লিখলাম, যেটি ছাপা হয়ে গেল এবং মৌলভী উবাইদুর রহমান সাহেব এডভোকেট বাস্তি খুবই মানসম্পন্ন ভাষায় ইংরেজি অনুবাদ করলেন, যিনি ইংরেজির খুবই ভালো একজন সাহিত্যিক ও নিবন্ধকার ছিলেন।

এই কনফারেন্স ও ভাষণ এ ক্ষেত্রে একটি মাইলফলকের মর্যাদা রাখে এবং হিন্দুস্তানি মুসলমানদের জাতীয় স্বকীয়তা ও তাদের মৌলিক

সমস্যাবলির ইতিহাস লেখকগণ তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ভারত বিভক্তির পর বড়জোর দু-একটি আন্দোলন পাওয়া যাবে, যেগুলো দীনি শিক্ষাবিষয়ক কাউন্সিলের মতো নিরেট মৌলিক ও সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছিল।

যফর আহমাদ সিদ্দীকি সাহেব

দীনি কাউন্সিল উত্তরপ্রদেশ একজন সুযোগ্য ও একনিষ্ঠ নেতা এবং তার প্রতিষ্ঠাতা-মহাসচিব কাজী মুহাম্মাদ আদীল আব্বাসি সাহেব একজন কর্মতৎপর সহকর্মী ও সহযোগী যফর আহমাদ সিদ্দীকি সাহেব (আলীগ) এডভোকেট সিতাপুরির আদলে পেয়ে গেছে। তিনি ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে দীনি শিক্ষা কাউন্সিল-এর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিজের সফল ব্যবসা ওকালতি ত্যাগ করে এবং সিতাপুর থেকে লাখনৌ স্থানান্তরিত হয়ে নিজের গোটা জীবন ও সবটুকু শক্তি মুসলমানদের দীনি শিক্ষার সমস্যার সমাধান ও দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। তিনি একজন সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবীর মতো পূর্ণ সরলতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রত্যয় নিয়ে দীনি শিক্ষা কাউন্সিলের গরিবানা দফতর ৯৯, গোয়েন রোড, লাখনৌ-এ অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং সবগুলো নৌকা পুড়িয়ে দিয়ে এমন একটি সমস্যার আস্তানায় এসে পড়লেন, যা কিনা তার মতে মুসলমানদের জীবনমৃত্যুর ইস্যু ছিল।

এই দীনি শিক্ষা ইস্যু ছাড়াও তিনি মুসলিম ইউনিভার্সিটির সংখ্যালঘু চরিত্রের সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি, মুখপাত্র ও তার জন্য নিবেদিত ছিলেন। এই অবিরাম প্রচেষ্টা ও কর্মব্যস্ততার মাঝেই তার উপর পক্ষাঘাত ব্যাধির আক্রমণ হলো এবং প্রায় দু-বছর এই রোগে আক্রান্ত থেকে ৪ অক্টোবর ১৯৮০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন এবং জন্মভূমি সিতাপুর জেলার রামাভারিতে সমাধিস্থ হন।

১৯৬১ সালের ৪ ও ৫ জুন এই প্রাদেশিক দীনি শিক্ষা কনফারেন্স লাখনৌতে এবং সে-বছরই ১১ ও ১২ নভেম্বর রাজস্থানের টুংক-এ, ২০ ও ২১ জুন এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারই আমি সভাপতি হিসেবে কনফারেন্সে ভাষণ প্রদান করি, যেটি আগে থেকে ছাপানো থাকত। এই ভাষণগুলো শুধু পরিস্থিতির সঠিক ও নির্ভুল প্রতিচ্ছবি, মুসলমানদের জযবা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব হিসেবেই নয়; খোদ ভারত

সরকারের শিক্ষামন্ত্রলায় ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর হিতকামনা, পথনির্দেশ ও দেশপ্রেমের দিক থেকেও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্ববহ।

কেরালার একটি সফর ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

১৩৬০ হিজরির ১৮ শাবান (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১) কালিকটে নদওয়াতুল মুজাহিদীন-এর বার্ষিক সভা ছিল, যেটি কেরালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কর্মতৎপর দাওয়াতি, তালীমি ও এসলাহি সংগঠন। সংগঠনের দায়িত্বশীলদের পীড়াপীড়ি ও কয়েকজন বন্ধুর সুপারিশে আমি তাতে সভাপতির দায়িত্ব নিতে সম্মত হলাম এবং আরবিতে (কারণ, এই অঞ্চলে উরদু না থাকার মতো) ভাষণ প্রস্তুত করলাম। এই ভাষণে আমি ইবরাহীমি মিল্লাত ও ইসলামি সভ্যতার মৌলিক উপাদান ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করলাম এবং তাকে শক্তভাবে ধারণ করা ও তার উপর অটল থাকার দাওয়াত দিলাম। একটি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে – যে কিনা নিজে একটি দর্শন, ইতিহাস ও সভ্যতা লালন করে – সত্য-সঠিক ধর্মের অনুসারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য, পথের দুর্গমতা, সঠিক কর্মপদ্ধতি, দাওয়াত ও দাঈর অনিবার্য গুণাবলি কী ও কেমন হবে এই ভাষণে তার বিবরণ প্রদান করেছি। নিবন্ধে আমি বলেছি, প্রতিটি যুগের মতো এ যুগেও এই দীনের দাওয়াত (যার প্রতিষ্ঠা হযরত ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে আর সংস্কার ও পূর্ণতার কাজ খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে) অপেক্ষা বেশি উপযোগী দাওয়াত, যে-সমাজ ও সভ্যতার ভিত ইসলাম রেখেছে, তার চেয়ে ভালো ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ দ্বিতীয়টি হতে পারে না।

এই দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, মানবতার মর্যাদা, সব মানুষের হেদায়াতের চিন্তা ও সর্বজনীনতা। আলেমসমাজ ও ধর্মের ব্যাখাতাদের এখানে কতখানি গভীর বুঝ ও মনের প্রশস্ততার সঙ্গে কাজ নিতে হবে এবং পরিস্থিতির প্রতি কী পরিমাণ লক্ষ রাখতে হবে আমি তাও তুলে ধরলাম। অবশেষে আমি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও সুন্নতের অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরলাম এবং খুঁটিনাটি মতভিন্নতাকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিলাম। এই নিবন্ধটি ملة ابراهيم وحضارة الاسلام নামে আরবি টাইপে ছাপা হয়েছে। তার উরদু অনুবাদও 'মুকাম্মাল দীন, মুকাম্মাল তাহযীব' (পূর্ণাঙ্গ দীন, পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ভাইজানের মৃত্যু ও জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা

১৯৬১ সালে ৭ মে ভাইজানের মৃত্যুর সেই ঘটনাটা ঘটল, যা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এই ঘটনায় আমি এতিমির সেই অবস্থাটা অনুভব করলাম, যা বয়স কম হওয়ার কারণে পিতাজির মৃত্যুতে অনুভব করতে পারিনি। এই দুর্ঘটনা আমার জন্য আরও বেশি মর্মান্তিক হয়ে উঠল এ কারণে যে, রায়পুর-সাহারানপুরের সফরের কারণে আমি না মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম, না কাফন-দাফনে অংশ নিতে পেরেছি। সেদিনই আমি সাহারানপুরে গুরুতর ও নাজুক অবস্থার তারবার্তা পেয়েছি। সংবাদ পেয়ে প্রথম গাড়িতেই (সন্ধ্যায় দোহরা এক্সপ্রেসে করে) লাখনৌর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। এ-সফর আমি যেভাবে পার করেছি এবং পথ যেভাবে অতিক্রম করেছি, আল্লাহ্ তেমন দিন যেন আমার জীবনে আরেকটি না দেন। সংঘটিতব্য মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কল্পনায় মনটা আমার ধুকপুক করছিল। ভয় করছিলাম, নিজেই আবার কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যাই কিনা।

লাখনৌ পৌঁছলে স্নেহাস্পদ মৌলভী মুঈনুল্লাহ এবং আরও কয়েকজন লোককে প্লাটফর্মে উপস্থিত পেলাম, যারা ঘটনা সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলল না। শুধু বলল, আপনাকে রায়বেরেলি যেতে হবে। আমি সবকিছু বুঝে ফেললাম। বাইরে সিদ্দীক হাসান সাহেবের (আইসিএস) মোটর দাঁড়ানো ছিল। আমি যখন রায়বেরেলি গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সবই সম্পন্ন হয়ে গেছে। দাফনের কাজ সমাধা হয়েছে তিন ঘণ্টা আগে। আমি এতক্ষণ যাবত যে-কান্না দমিয়ে রেখেছিলাম, স্নেহাস্পদ মুহমাম্মা মিয়াকে দেখার পর তা উথলে উঠল। এধরনের ঘটনা (সফর ও অনুপস্থিতিতে পিতা বা কোনো মুরুব্বীর মৃত্যু ও কাফন-দাফন) ভাইজানের সঙ্গে পিতাজির ব্যাপারে ও আমার দাদা মৌলভী হাকীম সাইয়িদ ফখরুদ্দীন সাহেবে (রহ.)-এর সাথে তাঁর পিতা সাইয়িদ আবদুল আলী সাহেবের ব্যাপারে ঘটেছিল।

এখানে আমি প্রখ্যাত উরদু সাহিত্যিক মাওলানা আবুদল মাজেদ সাহেব দরিয়াবাদির শোকপত্রটি তুলে ধরছি যে, এই পত্রটি পরিস্থিতি ও আবেগের পূর্ণ প্রতিচিত্র।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দরিয়াবাদ

৯ মে, ১৯৬১

ভাই আমার!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

মুমিনের মৃত্যুর প্রকৃত রূপ আমার চেয়ে আপনি ভালো বোঝেন। তাই শোকপত্রে আপনাকে কিছু বলা লোকমানকে ডাক্তারি শেখানোর সমার্থক। কিন্তু আপনি মারেফাতের যে-স্তরেই পৌঁছে থাকুন-না কেন মানুষ তো বটে যেমন আমি একজন মানুষ। আবার আপন ভাইয়ের মৃত্যুশোকের অভিজ্ঞতা সদ্যই অর্জিত হয়েছে।

গোশত-চামড়ার তৈরী অন্তরের পক্ষে কীভাবে সম্ভব সে পাথরের তৈরী হয়ে যাবে! এ কী করে সম্ভব যে, মানুষ স্বভাবগত বেদনার চূড়ান্ত তিক্ততা ও খোঁচা অনুভব করবে না! কয়েক যুগ বা কয়েক বছরের ঘটনা নয় – এই সাম্প্রতিক কালের ঘটন যে, আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে আপনি আমাকে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। আজ হুবহু সেই মনযিলে আপনি নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন!

মরহুম আপনার ভাই-ই ছিলেন না – পিতার মতো মমতাও তাঁর আপনার মাথার উপর ছিল সে আমি জানি। আপনার মনের মাঝে কীরূপ ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তা আপনি-ই ভালো জানেন। পরীক্ষা সত্যিই কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু পাত্রও তো আপনার তেমনই বড় ও আলিশান। ইনশাআল্লাহ আপনি পুরোপুরি ধৈর্যই নয় – আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির উপরও দৃঢ়পদ থাকবেন এবং খোদ আপনি নিজের সত্তা দ্বারা মরহুমের ছেলেমেয়েদের জন্য ধৈর্য ও দৃঢ়তার নমুনার ভূমিকা পালন করবেন। মরহুমের সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক ছিল বটে; কিন্তু আমার জন্যও তিনি ভাইয়ের চেয়ে কম ছিলেন না। আর একথা বললে আশা করি বেশি বলা হবে না যে, যেভাবে আপনি আজ মরহুম পিতার মৃত্যু পুনর্বার অনুভব করছেন, তেমনি আমিও আমার মরহুম ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যথা নতুনভাবে অনুভব করছি।

যাহোক, যাঁর হেকমত এই সময়টি এনে দিয়েছে, তাঁরই রহমত একে হটিয়ে দেবে। শুধু আপনি কেন, গোটা খাতুন মঞ্জিল (লাখনৌতে মাওলানা ও তাঁর পরিবারের বাসগৃহ),

কি বড়, কি ছোট সবাই একজন শ্রেষ্ঠতম ও মমতাময় চিকিৎসক থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। আর আপনার পারিবারিক দায়িত্বও হঠাৎ করে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। যিনি সবার ছোট ছিলেন, তাঁকে সবার বড় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকেই পরিবারের ও বংশের অফিসার হয়ে জীবন কাটাতে হবে।

ইনশাআল্লাহ! এ সপ্তাহেই সরাসরি দেখা করে আপনার শোকের অংশীদার হব। যে-মেয়েগুলোর আজ অবধি মায়ের দাগ তাজা ছিল, তাদের উপর কত দ্রুত ব্যথা ও বেদনার আরেকটা পাহাড় এসে চেপে বসল!

ওয়াসসালাম

দু'আপ্রার্থী

আবদুল মাজেদ।'

কুয়েত সফর

ভাইজানের মত্যুর পর – যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নদওয়ার পরিচালক ছিলেন – অনেক বড় জিম্মাদারি আমার উপর এসে পড়ল। ১৯৬১ সালের ১৮ জুন পরিচালনা পরিষদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ-বৈঠকে নদওয়াতুল উলামার পরিচালক পদের জন্য আমাকে নির্বাচন করা হয়। ফলে আমার দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। দারুল উলূমের আর্থিক অবস্থা যথারীতি দুর্বল হতে থাকল। বর্মার সফরও (সবগুলো অর্থ আনতে না পারার কারণে) এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো ফলপ্রসূ হয়নি। ওদিকে কুয়েতে (যেটি পেট্রল উৎপাদনকারী একটি ধনী রাষ্ট্র এবং সেইসঙ্গে আরবি ভাষা ও দীনের সুবাদে ওখানে নদওয়াকে পরিচিত করে তোলা খুবই সহজ ও ক্রিয়াশীল ছিল) কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষী – যাদের মাঝে খানডুর অধিবাসী ডক্টর আবদুল লতীফ সাহেব একজন, যার দুই পুত্র কিছুদিন দারুল উলূম অবস্থান করে গেছে – আমাকে কুয়েত যাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ডক্টর সাহেব আরবিতে তেমন দক্ষ ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি বেশিরভাগ কুয়েতের এক মুখলিস, দীনদার, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শায়খ আবদুর রাযযাক আস-সালিহ-এর উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যিনি আগে থেকেই আমার আরবি রচনাগুলোর মাধ্যমে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং নিজেও আমার আগমনের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি ওয়াদা দিয়ে রেখেছিলেন, নদওয়ার

প্রতিনিধিদল এলে তিনি তার প্রভাবাধীন অঙ্গনে নদওয়ার আর্থিক সহযোগিতার জন্য সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা চালাবেন এবং এই সফর সর্বদিক থেকে সফল হবে। আমি শর্ত দিলাম, ওখানে গিয়ে এর জন্য আমি কারও কাছে যাব না; যা-যা করবার সবই তাদের করতে হবে, যা বলবার সবই তাদের বলতে হবে। আমার সফর হবে দীনি দাওয়াতি। মহানুভব ও সাহসী মেজবানগণ আমার সবগুলো শর্ত মেনে নিলেন।

আমি আমার দুজন সহকর্মী মৌলভী মুঈনুল্লাহ নদবি ও মুহাম্মাদ রাবে নদবিকে সাথে নিয়ে ১৯৬২ সালের ২৪ জানুয়ারি বোম্বাই বিমানে করে রওনা হলাম। আমার আহ্বায়ক ও মেজবান দুজনই বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাদের দুজনের সঙ্গে তৃতীয় আরেকজন যোগ দিলেন। তিনি কুয়েতে অবস্থানরত এক নজদি আলেম শায়খ আবদুর রহমান আদ-দাওসারী, যিনি একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলমান, বিজ্ঞ আলেম ও কর্মতৎপর দাঈ।

কুয়েতে আমি একটি হোটেলে অবস্থান নিলাম। কিন্তু খানা-নাস্তা (গোশত সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে, যেগুলো বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে আসত) ডক্টর আবদুল লতীফ সাহেবের বাড়িতে হতো। ডক্টর সাহেব ও শায়খ আবদুর রাযযাক আস-সালিহ সহযোগিতায় কোনো ত্রুটি করেননি। শায়খ আবদুর রাযযাক আস-সালিহ-এর মজবুত দীনদারি, সৎ ও তাকওয়ার কাজে জযবা, নিষ্ঠা ও লিল্লাহিয়াত দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। আমাদের তিনি কোথাও যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে দেননি এবং সফরটিকে নদওয়াতুল উলামার আর্থিক সাহায্যের দিক থেকে পুরোপুরি সফল করে তুলেছিলেন। রমযানের প্রথম দশকও আমি ওখানেই কাটালাম। ওখানকার ইলমি ও দীনি অঙ্গনগুলোর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলতে থাকল। কয়েকটি জুমার খুতবা ও একাধিক ভাষণ প্রদানেরও সুযোগ পেলাম।

সেমা ও কাওয়ালির আসরে হাল আসার কাহিনী তো অনেকই শুনেছি। কিন্তু দীনি আলোচনা ও ওয়াজের মাহফিলে হাল আসার এবং নিজের অজান্তে শ্লোগান তোলার ঘটনা ওখানে প্রত্যক্ষ করলাম। জুমার নামাযের পর বড় একটি মজলিসে আমি বক্তৃতা করছিলাম। বক্তব্যের ধরন ছিল ঠিক পেশোয়ারের বক্তৃতার মতো যে, যদি কুরাইশ কাফেররা যদি বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা দেখত, তাহলে তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত। বলত, আমাদের মোটেও ধারণা ছিল না, মুসলমান দুনিয়া ও ক্ষমতার অন্বেষণকারী হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে তো তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল একটি বিশেষ দাওয়াত, বিশ্বাস, তাওহীদ ও একটি নতুন সীরাত ও জীবনরীতির উপর ভিত্তি

করে। এ-ই যদি মুসলমানদের করবার ছিল, তাহলে আমরা তো তাদের আগেই এই প্রস্তাব পেশ করেছিলাম; কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি কথাটি বলছিলাম; এমন সময় মসজিদের এক কোণ থেকে তাকবীরধ্বনির মতো একটা আওয়াজ শোনা গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, লোকেরা একব্যক্তিকে – যিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন – ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সফরে একদিন আমি কুয়েত রেডিওতে اسمعي يا زهرة الصحراء (শোনো হে মরুর ফুল!) নামে একটি ভাষণ প্রদান করি। এ ভাষণে আমি কুয়েতের এই আকস্মিক উত্থান ও উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করে – যেন মরুবিয়াবানে হঠাৎ একটা ফুল আত্মপ্রকাশ করল – কুয়েত এখন বর্তমান সভ্যতা ও বর্তমান বিশ্বচিত্রে কী ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশ্বকে সে কী দিতে পারে, তাকে নিজের কোন ব্যক্তিত্ব ও দৃশ্যমান কোন ক্যারেক্টারের নমুনা বিশ্বের সম্মুখে পেশ করা উচিত এবং আধুনিক বিশ্বে সে কীভাবে মর্যাদার আসন তৈরি করে নিতে পারে এসব বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

কুয়েতের এই সফরে আমি কুয়েতের আমির শায়খ আবদুল্লাহ্ আস-সালিম আস-সাব্বাহকে একটি পত্র দিয়েছি, যাতে আমি আরবদের উন্নতি, ঐক্য, নেতৃত্ব ও তাদের সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরেছি। শেষে আমি এদেশে অমুসলিম উপাসনালয় নির্মাণে শঙ্কা সম্পর্কেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যা কুয়েত ও উপসাগরীয় রাজ্যগুলোতে নির্মিত হতে শুরু হয়েছিল এবং যা কিনা আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা 'জাযিরাতুল আরবে দুই ধর্মের সহাবস্থান চলতে পারে না'-এর স্পষ্ট পরিপন্থী।

তিন সপ্তাহ কুয়েতে অবস্থান করে রমযানের দ্বিতীয় দশকে আমরা সাফল্যের সঙ্গে কুয়েত ত্যাগ করি। দুদিন কাতারের দোহায় অবস্থান করে বাহরাইনের পথে বোম্বাই ফিরে আসি। এই সফর দাওয়াতি মিশনেও বেশ উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। সফরে সূচনা এমন একটা সময়ে করা হয়েছিল, যখন আমার মুরশিদ আমাকে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সফলতার জন্য দু'আ করেছিলেন।

ফিরে আসার পর হযরত সফরের বিস্তারিত বিবরণ শোনেন। যাওয়ার সময় বলেছিলেন, ওই ভালো মানুষগুলোকে বলবে, সম্পদের যেন তারা সঠিক ব্যবহার করে। ফিরে আসার পর কারগুজারি শুনতে গিয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমার বার্তাটি কোন পর্যন্ত পৌঁছানো গেল?

সপ্তদশ অধ্যায়

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা ও রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমার প্রতিষ্ঠা, পবিত্র হেজাযে তৃতীয় সফর ও 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর শুভ যাত্রা

জামেয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা

আমার দ্বিতীয় হেজায সফরের ('৫০-'৫১ খ্রি.) পর ১০ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে পুনর্বার হেজায যাওয়ার কোনো আয়োজন বা সূত্র তৈরি হয়নি। এই সফরের সামর্থ্য আমার নিজের না আগে ছিল, না এখন ('৬১-'৬২ তে) আছে। না অন্য কোনো দিক থেকে কোনো চেষ্টা হলো, না উপযুক্ত কোনো বদলি হজের প্রস্তাব এল। মাঝে-মধ্যে মনে ভাবনা আসত, বিগত কোনো হাজিরির সময় এমন কোনো বেয়াদবি হয়ে থাকবে যে, আজীবনের জন্য আমাকে এই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন কুয়েত সফরে, তখন সৌদি সরকারের অর্থমন্ত্রী শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর আস-সাব্বান (যিনি কোনো মাধ্যমে আমার কুয়েত আগমনের সংবাদ জেনে ফেলেছিলেন)-এর তারবার্তা পেলাম, আপনি কুয়েত এসে পড়েছেন। আমি আপনাকে হেজায ও হজের দাওয়াত দিচ্ছি।

জানা কথা যে, আমার ও আমার সফরসঙ্গীদের সফরের আয়োজন তিনি অনায়াসে করতে পারবেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এই দাওয়াত পুরোপুরি নিষ্ঠাপূর্ণ ও আন্তরিক। কিন্তু আমি সঙ্গীদের বললাম, কারও ব্যক্তিগত দাওয়াতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এই সফর করা যাবে না। মহান আল্লাহর প্রতি আমি আশাবাদী যে, গায়েব থেকে তিনি এর বন্দোবস্ত করে দেবেন।

১৯৬২ সালের মার্চের শেষের দিকে ছানির ছোট একটি অপারেশনের জন্য আমি আলীগড় গিয়েছিলাম এবং গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি হলাম। সৌদি সরকারের রাষ্ট্রদূত শায়খ ইউসুফ আল-ফাওযান আমার সঙ্গে দেখা করতে

এসেছিলেন। কিন্তু সঠিক নির্দেশনার অভাবে তিনি আমার কাছে আসতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে যখন লাখনৌ এলাম, তখন তাঁর পত্র পেলাম, আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক বার্তা আছে। হয় আপনি নিজে দিল্লি আসার কষ্ট স্বীকার করুন, নাহয় বিশ্বস্ত কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি স্নেহাস্পদ রাবেকে পাঠালাম। রাষ্ট্রদূত জানালেন, সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে মাওলানার আমন্ত্রণপত্র এসেছে। মদিনায় জামেয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের সরকার চাচ্ছে, মাওলানা ওখানে শিক্ষকতার খেদমত কবুল করে নেবেন।[১]

এখানেও আমার জবাব তা-ই ছিল, যেমনটি ছিল দামেশক ইউনিভার্সিটির প্রস্তাবে বেলায়। অর্থাৎ– স্থায়ীভাবে দায়িত্বগ্রহণে সম্মতি নেই। খণ্ডিতভাবে ও সাময়িকের জন্য খেদমত করতে রাজী আছি। রাষ্ট্রদূতকে আমার উত্তর জানিয়ে দিলাম। তিনি আমার জবাব পৌঁছিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর আমার কাছে সংবাদ এল, আমাকে জামেয়া ইসলামিয়ার মজলিসে শূরার সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তার প্রথম বৈঠক যিলহজের তৃতীয় সপ্তাহে মদিনায় অনুষ্ঠিত হবে। একে আমি একটি গায়েবি মদদ ও নিজের জন্য একটি নেয়াতম ও সুসংবাদ মনে করলাম। সবার আগে হযরত শায়খুল হাদীছের সঙ্গে পরামর্শ ও হযরত রায়পুরির অনুমতি প্রার্থনা করলাম। হযরত খুশিমনে অনুমতি দিলেন। আমি আমার মঞ্জুরির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। রাষ্ট্রদূত আমার সফরের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেললেন এবং আমাকে দিল্লি আসার অমন্ত্রণ জানালেন। আমি মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেবকেও এই সফরে শরিক করে নিলাম। সৌভাগ্যবশত ডক্টর মুহাম্মাদ ইশতিয়াক হুসাইন সাহেব কুরাইশিও এ বছরের হজযাত্রী ছিলেন। তিনি আর কালপির এক বন্ধু হাজী ওয়াজেদ বেগ হেজায পৌঁছে আমাদের কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন।

যুলকাদার শেষ দশকে (মে ১৯৬২) আমরা বোম্বাই থেকে টি.ইউ.এ জাহাজে করে যাহরান এবং সেখানে এক রাত অবস্থান করে ইহরাম বেঁধে সৌদি বিমানে করে মক্কার উদ্দেশে রওনা হলাম। স্নেহাস্পদ মৌলভী আবদুল্লাহ আব্বাস নদবি সে-সময় জেদ্দায় সৌদি রেডিও স্টেশনে কাজ

---

১. বছরকয়েক পর জামেয়া ইসলামিয়ার রেজিস্ট্রারার শায়খ মুহাম্মাদ নাসের আল-উবুদী জানালেন, এটি সৌদি বাদশার ব্যক্তিগত পত্র ছিল, যেটি তিনি নিজের হাতে লিখেছিলেন। সাধারণত তিনি কাউকে ব্যক্তিগত পত্র লিখেন না। কিন্তু আপনার বেলায় ব্যতিক্রম করেছেন।

করছিল। সে একটি পরিচিতি ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করল। সভায় বেশ কটি আরব দেশের রাষ্ট্রদূত, একাধিক বিশিষ্ট নাগরিক ও ইরাকি এখওয়ানি নেতা প্রখ্যাত মুজাহিদ শায়খ মুহাম্মাদ মাহমুদ আস-সাওয়াফ অংশগ্রহণ করলেন। আমি ভাষণ দিলাম। এ-ভাষণে আমি ইসলামি ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরলাম। বললাম, ইসলামই শক্তি ও মর্যাদার একমাত্র উৎস। এ-ভাষণে আমি আরব জাতীয়তার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কথা বললাম, যার উপর শায়খ মুহাম্মদ মাহমুদ আস-সাওয়াফ প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করেছেন। সে-সময় জামাল আবদুন নাসের-এর মুখে আরব জাতীয়তার (দীনি ঐক্য ও ইসলামি দাওয়াতের সমান্তরালে) দাওয়াত শুরু হয়ে গিয়েছিল। সুয়েজখালের জাতীয়করণের সাফল্য ও ব্রিটেন-ইসরাইল-এর আক্রমণ পিছিয়ে যাওয়া তাতে জাদুর ক্রিয়া তৈরি করে দিয়েছিল এবং আরব যুবকরা তার বিরুদ্ধে একটি শব্দও শুনতে প্রস্তুত ছিল না। বরং মিশরি সাংবাদিকতা ও কোনো-কোনো লেখক প্রেসিডেন্ট নাসেরকে 'আরব জাতীয়তার নবী' উপাধিতে স্মরণ করছিল। বিশ্বাসের উপরও তার ক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং বহুসংখ্যক আরব তরুণ-যুবকের মুখ থেকে কুফরি বাক্য পর্যন্ত নির্গত হচ্ছিল।

এই আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনা তখন থেকেই শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে নিজের বিশেষ আলোচ্যবিষয় তখন বানালাম এবং তাকে সময়ের জিহাদ মনে করলাম, যখন ১৯৬৭ সালে মিশর-ইসরাইল যুদ্ধে মিশর ও জামাল আবদুন নাসের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের গোটা মুসলিম ভূখণ্ড হাত থেকে বেরিয়ে যায়।

আমার এ বিষয়ের ভাষণ ও নিবন্ধগুলোর সংকলন المسلمون وقضية فلسطين (মুসলিম জাতি ও ফিলিস্তিন সমস্যা) নামে ১৯৬৯ সালে এবং তার উরদু তরজমা عالم عربی کا المیہ (আরব বিশ্বের ট্রাজেডি) নামে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার পৌঁছার দিনকতক আগে হাজী আরশাদ সাহেব পেশোয়ারি সৌদি আরবে অটোমেটিক টেলিফোন স্কিম-এর ইনচার্জ ও অফিসরের পদে এই বিভাগের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে জেদ্দায় অবস্থানরত ছিলেন। তার ঘর আমার নিজেরই ঘরের মতো ছিল। এবার আমি তার ঘরেই অবস্থান করলাম। আমি তারই ঘরে বসে সৌদি রেডিওর ফরমায়েশে وفود الامة بين يدى نبيها (উম্মতের কয়েকটি প্রতিনিধিদল তার নবীর সকাশে)

শিরোনামে একটি ভাষণ প্রস্তুত করলাম। এই ভাষণে কল্পনার জগতে দেখানো হয়েছিল, উম্মতের প্রতিটি শ্রেণি মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যা ও বিষয়ের প্রণেতাগণ, আরবি ভাষার গ্রামার ও অলংকারশাস্ত্রবিদগণ, উম্মতের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ, উঁচু মানের অলিগণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্থপতি ও শাসকমণ্ডলি, উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে নিয়ে কবিগণ পর্যন্ত, সময়ের মুজাহিদদের থেকে শুরু করে জিহাদ, আযাদি ও সুস্থ বিপ্লবের সিঙ্গায় ফুৎকার দানকারী কবিগণ পর্যন্ত, পুরুষ শ্রেণি থেকে নিয়ে নারীজাতি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণি রেসালাতের দরবারে নিজের, নিজের ও প্রচেষ্টার ময়দানের নজরানা পেশ করেছে এবং এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে যে, এসবই হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের অনুদান এবং তাঁর মানুষ গড়া ও জীবনের বিভিন্ন অঙ্গন ও মানবীয় গুণাবলির বিকাশে তাঁর অনুগ্রহের ফল।[১]

হজের সময় ঘনিয়ে এলে পবিত্র মক্কা চলে এলাম। যেহেতু আমরা সরকারের মেহমান ছিলাম, তাই প্রথমবার মক্কার সর্ববৃহৎ হোটেল লোকান্দা মেসের-এ উঠলাম, যেখানে হজ করতে আসা বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সরকারের অতিথিগণ অবস্থানরত ছিলেন। হোটেলটা হারাম শরীফের কাছাকাছিই ছিল। সেজন্য হাজিরিতে কোনো সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়নি। পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ধারা শুরু হয়ে গেল। হারামাইন শরীফাইনের সঙ্গে আমার আত্মা ও আবেগের সম্পর্ক ছিল। এখানে আগেও দুবার দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গেছি। তাই মনে হলো, এখান থেকে গিয়েছি বেশি দিন হয়নি আর যেন আমি আমার আপন ভুবনেই ফিরে এসেছি।

রাবেতা আলমে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

এই অবস্থানকালে আমি মহান আল্লাহর আরও একটি নেয়ামতলাভে ধন্য হলাম। আল্লাহ যখন বান্দাকে পুরস্কৃত করেন, তখন একের-পর-এক দিতেই

১. এটি ছিল একটি আবেগময় ও ঈমান-আলোকিত নিবন্ধ, যেটি সৌদি রেডিও স্টেশন ও খোদ লাখনৌ-এর রেডিও স্টেশন একাধিকবার সম্প্রচার করেছে। মূল আরবি নিবন্ধটির নাম الطريق الى المدينة (মদিনার পথে)। তার উরদু অনুবাদ (মুহাম্মাদ মিয়া মরহুমের কলমে) 'কারওয়ানে মদীনা'য় সংযুক্ত। পাকিস্তানে মুতামার আলমে ইসলামীর পক্ষ থেকে সেটি আলাদা পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

থাকেন। একদিন একব্যক্তি খুঁজে-খুঁজে আমার কাছে এল। লোকটা আমাকে আমার এক পুরনো বন্ধু মক্কার এক নেতৃস্থানীয় বুযুর্গ শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল-কাযযার[১]-এর একখানা পত্র দিল। তাতে লিখা ছিল, যিলহজের ১৪ তারিখে একটি ইসলামি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠক বসবে রাজভবনে। সৌদি বাদশাহ তাতে অংশগ্রহণ করবেন। আপনার কাছে অংশগ্রহণের আবেদন রইল।

নির্দিষ্ট তারিখে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। তাতে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট ইদরীস সানূসিসহ বিপুলসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। ওখানেই 'রাবেতা আলমে ইসলামী' নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তার মূল কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করা হয়, যাদের মাঝে আমিও একজন ছিলাম। সদস্যপদের পাশাপাশি আমাকে এই মর্যাদাও প্রদান করা হয় যে, যখন তার স্থায়ী প্রেসিডেন্ট শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়খ (সৌদি সরকারের শায়খুল ইসলাম ও প্রধান বিচারপতি) কোনো প্রয়োজনে বৈঠক থেকে উঠে যেতেন বা আসতেন না, তখন আমার উপর সভাপতির দায়িত্ব অর্পিত হতো।

রাবেতার এই প্রথম বৈঠকে আমি الاخوة الاسلامية فوق العصبيات القومية (ইসলামি ভ্রাতৃত্ব সাম্প্রদায়িকতার উপরে) নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, যেটি

---

১. শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ-এর সঙ্গে ১৯৫১-৫২ সালের মক্কা অবস্থানেই আমার বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আনন্দদায়ক পন্থায় নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছিলেন। তা এভাবে যে, আমাদের তিনি ছাওর গুহা পরিদর্শনের দাওয়াত দিলেন, যার অবস্থান মক্কা থেকে বেশ দূরে এবং ওখানে যেতে দুটি চড়াই অতিক্রম করতে হয়। তিনি তার পুরোপুরি ব্যবস্থা করলেন। আমি আমার বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব ও তাবলীগি জামাতের সাথীদের নিয়ে তাঁরই মোটরে করে ওখানে পৌঁছলাম। পথে পানীয় ও ফলফলাদির পুরোপুরি আয়োজন ছিল। গন্তব্যে পৌঁছে আমরা নিশ্চিন্ন মনে জায়গাটা পরিদর্শন করলাম। পাহাড়ের চড়াই থেকে নেমে যখন আমরা নিচে নামলাম, তখন যোহর ও আছরের মাঝামাঝি সময়। আমরা সবাই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমাদের কাছে তিনি খাওয়ার কোনো আলোচনা করেননি। কিন্তু দেখলাম, দস্তরখান লাগানো আছে। তাঁর খাদেমরা পরম যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে খাবার প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে। এই পরিদর্শনের বরকত আর এই খাবারের স্বাদ কখনও ভুলব না। শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর-এর মৃত্যুর পর শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ রাবেতার মহাসচিব নির্বাচিত হন। তাঁরই আমলে আমার আফগানিস্তান, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের সুযোগ ঘটে।

ميزان العلم والتاريخ (জ্ঞান ও ইতিহাসের মানদণ্ডে জাতীয়তা) শিরোনামে আমার প্রবন্ধ সংকলন العرب والاسلام (ইসলাম ও আরব)-এ অন্তর্ভুক্ত। এটি আমার প্রতি বছর হেজায হাজিরির (জামেয়া ইসলামিয়া ব্যতীত) আরেকটি উপলক্ষ্যে পরিণত হলো।

হজ সমাপণের পর পবিত্র মদিনায় হাজিরা দিলাম। ২২ যিলহজ জামেয়া ইসলামিয়ার মজলিসে শুরার বৈঠক বসল। সৌদি আরবের বাছাবাছা বিশিষ্ট আলেমে দীন, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন আরব দেশের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান থেকে সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদুদীকে নির্বাচন করা হয়েছিল, যিনি কয়েক বছর যাবত রাবেতার সদস্য ছিলেন।

আমি প্রথম অধিবেশনে একটি মানসম্পন্ন ও দাওয়াতি শিক্ষাকেন্দ্রের (যেটি পবিত্র মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হবে) কাঠামো উপস্থাপন করলাম এবং তার ব্যবস্থাপনা ও সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরলাম। তার মৌলিক ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কী হওয়া দরকার তা-ও ব্যক্ত করলাম। এবার আমি বন্ধুবর আলহাজ মুহাম্মাদ নুর অলী সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে তাঁর বাড়ি 'বুস্তানে নুর অলী'তে অবস্থান করলাম এবং তার পর থেকে যখনই আমাকে মদিনায় থাকতে হলো, তাঁর বাড়িতে থাকা নিয়মে পরিণত হয়ে গেল।[১]

এভাবে পবিত্র হেজাযে বাৎসরিক হাজিরির (কোনো-কোনো বছর দুবারও) ধারা শুরু হয়ে গেল এবং মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 'আমি তাকে কল্পনাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করি'-এর বাহিঃপ্রকাশ শুরু হয়ে গেল। আমরা মুহাররমে হিন্দুস্তান ফিরে এলাম।

জামেয়ায় লেকচারের ধারা

পরবর্তী বছরই; মানে ১৩৮২ হিজরিতে (১৯৬৩ সাল) জামেয়ার পক্ষ থেকে আমাকে লেকচারের আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমি মদিনার সঙ্গে মিল রেখে النبوة والانبياء في ضوء القران (নবুওত ও নবীগণ কুরআনের আলোকে)

---

১. মদিনায় অবস্থানকালে (শরীয়তের বিধান মনে করে নয় – স্রেফ আবেগের তাড়নায়) তাড়নায়) কোনো হোটেলে থাকা আমার পছন্দ নয়, জামেয়ার পক্ষ থেকে প্রতিবারই তার মেহমানদের জন্য যার আয়োজন হয়ে থাকে। আমার এই নিয়মে মাত্র একবার ব্যত্যয় ঘটেছিল। তখন বুস্তানে হাজীদের অবস্থান ছিল এবং জামেয়ার ভাইস চ্যান্সেলর বন্ধুবর ডক্টর আবদুল্লাহ যায়েদ 'কাসরুর রুহাব'-এ অবস্থানের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, যেটি কিনা মজজিদের খুবই কাছাকাছি ছিল।

শিরোনাম নির্বাচন করলাম এবং এ বিষয়টির উপর একাধিক লেকচার তৈরি করে নিলাম, যেগুলো পরে এই শিরোনামেই আরবিতে এবং তার উরদু তরজমা منصب نبوۃ اور اس کے عالی مقام حاملین (নবুওতের পদমর্যাদা ও তার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ধারকগণ) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। আমি ১১ মার্চ ১৯৬৩ হেজাযের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। এই সফরে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে নদবি আমার সঙ্গে ছিল। লেকচারের ধারা ৩ যিকাদা ১৩৮২ (৩০ মার্চ ১৯৬৩) থেকে শুরু হয়ে আটটি ভাষণে সমাপ্ত হয়। এই লেকচার প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার হতো। জামেয়ার ভাইস চ্যান্সেলর ও দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দীন ও দাঈ শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায সশরীরে অংশগ্রহণ করতেন এবং আমার লেকচার সমাপ্তির পর তিনি নিজে তার উপর পর্যালোচনা করতেন।

এই সফরেও আমি বুস্তানে নুর অলীতে অবস্থান করি। দারুল উলূমের পাঁচজন ছাত্র মুযযাম্মিল হুসাইন সিদ্দীকি রামপুরি, সিরাজুর রহমান আন্দুরি, মুহাম্মাদ ইউনুস নেগরামি, মুযাফফরুল হক নদবি কানপুরি ও তকিউদ্দীন বিহারি জামেয়ার ছাত্র ছিল। তাদের কারণে আমি অতিরিক্ত আরাম ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি। সম্ভবত সফরের লক্ষ্য ও এ বিষয়টির ক্রিয়া ছিল (যার সম্পর্ক রেসালাতের মর্যাদা ও নবীজির ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ছিল) যে, এই হজিরিতে আমি যে-স্বাদ ও মর্যাদা লাভ করেছি, অন্য কোনো হাজিরির সময় তেমনটি কমই পেয়েছি।

এ সফরের একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, প্রথমবারের মতো হারাম শরীফে মুসাল্লায়ে শাফেয়ীর উপর মিযানা থেকে (যার গজকয়ের ব্যবধানে ঠিক তার উলটো দিকে বাইতুল্লাহ শরীফ ও মাতাফের অবস্থান) আমাকে হাজীদের উদ্দেশে ভাষণ দানের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সে ছিল এক অভাবিতপূর্ব দৃশ্য, যা আমি কখনও ভুলব না যে, হজের দু-তিন দিন আগে যখন হজের সমাবেশ তুঙ্গে ছিল এবং তাওয়াফের বরকতময় ও মনকাড়া আমল শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিল, ঠিক সে-সময় আমি ভাষণদানের সৌভাগ্য ও বাইতুল্লাহ শরীফ দর্শনের স্বাদ একই সময়ে উপভোগ করছিলাম।

বাদশাহ্ ফয়সালের সঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎ ও পত্রযোগাযোগ

হেজাযের প্রতিটি হাজিরির সময় আমি এই পবিত্র ভূখণ্ডে – যেটি ইসলামের কেন্দ্রই নয় – হৃৎপিণ্ডও ধর্মীয় ও চারিত্রিক অধঃপতনের নানা লক্ষণ এবং সম্পদ ও পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলাম। আমি

দেখলাম, দাওয়াত ও দীনি শিক্ষার বন্ধন সমাজের উপর থেকে ক্রমশ ঢিলা হয়ে যাচ্ছে, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায়ে বাধাদান (যে-নামে দেশটিতে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে, যে কিনা সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোশকতায় পরিচালিত হচ্ছে) তার ক্রিয়া ও প্রভাব হারিয়ে ফেলছে। মনে হচ্ছে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর দাওয়াত যেখানে বিশ্বাসের ময়দানে এবং নির্ভেজাল তাওহীদ ও শিরকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বৃত্তে (যেটি নবীগণের প্রেরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য এবং ইসলামের মৌলিক আহ্বান) একটি বৈপ্লবিক ও সংস্কারমূলক কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছিল, সেখানে সময়-সুযোগের অভাবে, দাওয়াতের অভ্যন্তরীণ শক্তির দুর্বলতার কারণে (যেটি এরূপ সংস্কার ও সংশোধনমূলক আন্দোলনগুলোর জন্য একান্ত আবশ্যক) সেই প্রজন্মটিকে প্রস্তুত করতে পারছিল না যে, তারা বস্তুবাদ ও সম্পদের প্রাচুর্য এবং উন্নতি ও সভ্যতার জোয়ারের সময় স্বল্পেতুষ্টি, দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্যদান ও মনের অবিচলতার নমুনা পেশ করতে পারত। তদুপরি শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ও শায়খের পরিবারের বিদ্বান ও প্রভাবশালী সদস্যগণ (যাদের আলে শায়খ বলা হয়) সরকারের উঁচু-উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও সরকারের বেতন ভোগ করার কারণে ইলম ও দীনের নিঃস্বার্থ সেবা এবং সরল-সহজ ও কৃচ্ছ্রতামূলক জীবনের সেই নমুনা জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে, সমাজের উপর যার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে।

ধর্ম ও জাতিগুলোর ইতিহাস বলছে, দীনের প্রাণ ও সারবত্তা, দীনি ও আখলাকি বৈশিষ্ট্য আর সময়ের চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন করা এবং বিপর্যয় ও বিচ্যুতির উপায়-উপকরণের উপস্থিতিতে সেরাতে মুসতাকিমের উপর অবিচল থাকা কঠিনতর কাজ, যা গভীর ও পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের দৃঢ়তা ও মানসিকতার দাবিদার। মানবীয় ইতিহাসে এই কীর্তি একমাত্র সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য, যাঁরা ক্ষমতা ও সম্পদের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদী-সাগর অতিক্রম করে গেছেন; কিন্তু তাতে তাঁদের আঁচলও ভিজেনি। আক্ষেপের বিষয় হলো, সৌদি সরকার (যেটি এ যুগের একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র, যার ভিতই রচিত দাওয়াত ও জিহাদের উপর) নিষ্ঠাবান, বিচক্ষণ ও নিঃস্বার্থ উপদেষ্টা ও কার্যকর পরিকল্পনা পায়নি, যা সরকারের এই সূচনা ও উত্থানের মাঝে সুসমঞ্জস, দীনি শিক্ষামালা, সভ্যতা ও উন্নতির অনস্বীকার্য চাহিদাগুলোর মাঝে সহযোগিতা ও সমন্বয় তৈরি করে দিতে পারে। সে পেয়েছে এক দল মিশরি ও সিরীয় উপদেষ্টা আর গোমস্তা, যারা নিজেরা এই রাষ্ট্র ও তার

সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাচ্ছিল এবং এই তরুণ রাষ্ট্রটির (যে কিনা তার তাওহীদ ও জিহাদের আত্মা দ্বারা ইসলামি বিশ্বের বিরাট একটি শক্তিতে পরিণত হতে পারত) ধার্মিকতা ও স্থিতিশীলতা যাদের কাম্য ছিল না।

ওদিকে আরেকটি পরীক্ষা সামনে এল যে, ১৯৬০ সালের পর থেকে প্রেসিডেন্ট নাসের আরব জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুললেন এবং চেষ্টা চালালেন, মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র তারই প্রভাব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধারাবাহিকতায় তার সবচেয়ে বড় টার্গেট ছিল সৌদি আরব, যেখান থেকে নিত্যনতুন পেট্রলের খনি আবিষ্কার হচ্ছিল এবং যেখানে সম্পদের সর্ববৃহৎ ভাণ্ডার ছিল। তিনি একের-পর-এক এই দেশটিকে হুঙ্কার দিতে, তার শাসকদের দুর্বলতাগুলো প্রচার করতে এবং দেশটিতে অস্থিতিশীলতা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন, যার ফলে দেশটিতে একধরনের অনাস্থা ও হীনম্মন্যতার পরিবেশ তৈরি হতে লাগল। মিশরের রেডিও ও তার প্রচারযন্ত্র আরব বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও ও প্রেস ছিল। কোনো-কোনো পণ্ডিত তার প্রতিকার এই বুঝেছেন যে, খোদ এই দেশটিকে উন্নতি ও আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করে তোলা হোক। এখানে বিনোদনের উপকরণ তৈরি করে দেওয়া হোক। পবিত্র হেজাযকেও সেই স্তরে নিয়ে আসা হোক যে, কোনো 'প্রাণবান' মানুষের দম এখানে যাতে না আটকায় এবং তারা মিশর যেতে এবং ওখানকার রেডিও ও টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দ্বারা মন ভোলাতে বাধ্য না হয়।

১৯৬৩ সালের হাজিরিতে সরকারের এই ঝোঁক সম্পর্কে আমার আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল। সে-সময় শাহ সউদ দেশের বাদশাহ এবং তাঁর ভাই আমির ফয়সাল যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী। ঘটনাক্রমে আমার মদিনা অবস্থানের সময় তিনি একবার মদিনা এলেন। আমি বন্ধুবর শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায-এর মাধ্যমে – যিনি জামেয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারার ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং আমির ফয়সাল তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন – আবেদন জানালাম, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে একান্তে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি তা করে দিলেন। আমি মদিনায় তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজকীয় অবস্থানস্থলে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হলাম, যেখানে শুধু আমার সফরসঙ্গী মুহাম্মাদ রাবে নদবি ছিল। আলোচনার শুরুতেই আমি তাঁর কাছে আবেদন পেশ করলাম, আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি শুধু শুনবেন – কিছুই বলবেন না। আমার এই আবেদন তিনি গ্রহণ করে নিলেন। আমি কথা বললাম এবং আশঙ্কা ব্যক্ত করলাম, সৌদি রাজ্য, বিশেষ করে পবিত্র

হেজাযকে উন্নত আরব দেশগুলোর পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এমন একটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে, যার ফলে হারামাইন শরীফাইনে হাজিরির লক্ষ্য, তাদের একটি আদর্শ ইসলামি নগরী হওয়ার মর্যাদা ও পবিত্রতা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

তিনি চুপচাপ আমার বক্তব্য শুনলেন, পবিত্র হেজাযের পরিকল্পনা তৈরির ব্যাপারে তাঁর সরকারের সতর্কতা ও নেক নিয়তির কথা ব্যক্ত করলেন এবং আমাকে নিশ্চয়তা দিলেন, এখানে এমন কিছু হবে না, যা মারকাযে ইসলামের মর্যাদা ও বার্তার পরিপন্থী।

তারপর যখন তিনি রাষ্ট্রের বাগডোর হাতে নিলেন, তখন আমি একটি বিস্তাতির পত্র লিখে তাঁর হাতে পৌঁছালাম, যার মৌলিক ভাষ্য ছিল, পবিত্র হেজায একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন স্থান ও বার্তা এবং প্রতিটি যুগে তার সুরক্ষা জরুরি। এমন কোনো সংস্কার, উন্নয়নের এমন কোনো পদক্ষেপ, কোনো সেবা বা বিনোদনমূলক এমন কোনো পরিকল্পনা বৈধ নয়, যা তার ব্যক্তিত্ব ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে।

তারপর আরেকটি পত্র লিখলাম, যাতে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলেছি, কোনো দেশের জনগণের স্বাধীন জীবন, চিত্তবিনোদন ও মনচাহি জীবন যাপনের উপকরণ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং তার মাধ্যমে তাদের সরকারের সমালোচনা থেকে বিরত রাখা, অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধন চিন্তা থেকে উদাসীন করে রাখার এবং তাদের অন্য কাজে ব্যস্ত প্রচেষ্টা সেই বনু উমাইয়ার আমল থেকে আজ অবধি ব্যর্থই হয়েছে। এই শ্রেণিটি – যাদের মাঝে সম্পদের প্রাচুর্য থাকে এবং তাদের অন্য কিছু ভাববার বাহ্যত কোনো ফোরসত থাকে না – সবচেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত, অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ে থাকে। অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশও তাদেরই থেকে হয়। তার বিপরীতে দীনদার শ্রেণিটি আস্থাভাজন ও অনুগত হয়ে থাকে।

এই পত্রের উত্তর তিনি ১৯৬৫ সালের ১১ জুনের একপত্রে দিয়েছিলেন, যার গায়ে তাঁর সাক্ষর রয়েছে। এছাড়া একবার জেদ্দায়, একবার পবিত্র মক্কায় আমার ও তাঁর একান্তে আলাপ হয়। তাতে আমি আমার আশঙ্কাগুলো তাঁর কাছে তুলে ধরলাম আর তিনি নম্বরওয়ারি তাঁর ও তাঁর সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন। আমি তাঁর অসাধারণ মেধা, সহনশীলতা, সচ্চরিত্র ও সরলতা দ্বারা খুবই প্রভাবিত হই এবং এই প্রতিক্রিয়া সবসময় বহাল থাকে। কিন্তু অনুমান করলাম, কারণ ও বাধ্যবাধকতা যা-ই হোক রাষ্ট্র সেই গতিরই উপর চলছে, যার উপর '৬৩-'৬৪ সালে তিনি পা রেখেছিলেন।

সাপ্তাহিক 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর প্রকাশনা শুরু

'৬০-'৬১ সালে তীব্রভাবে অনুভব হতে লাগল, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি এ দুটি অঙ্গনে এমন সাহসী নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে, যা মুসলমানদের সমস্যাবলি ও বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ও সঠিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং সেইসঙ্গে তার উপর দীনি চিন্তার রং প্রবল। এই অনুভূতি মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নুমানি ও আমাকে বাধ্য করল, যেন উপকরণের স্বল্পতা এবং খালেস ইলমি ও দীনি মেজাজ হওয়া সত্ত্বেও এই ময়দানে কিছু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সৌভাগ্যক্রমে আমরা ডক্টর মুহাম্মাদ আসেফ সাহেব কুদওয়াইর মতো বিজ্ঞ রাজনীতিক ও পরিপক্ব লেখকও পেয়ে গেলাম, যিনি বেশিরভাগ সময় তার সম্পাদকীয় লিখতেন।

আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে ১৯৬২ সালের ১২ মার্চ 'নেদায়ে মিল্লাত'-এর প্রথম সংখ্যাটি বের করলাম, যেটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রুচিবান ও চিন্তাশীল মহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে ফেলল। 'নেদায়ে মিল্লাত' ইসলামি পত্র-পত্রিকার মাঝে নিজের একটি স্থান তৈরি করে নিল। আমি দেখতে লাগলাম, একটি নতুন দীনি ও চিন্তানৈতিক নেতৃত্বের উত্থান ঘটছে। কিন্তু মুসলমানদের অন্য অনেক কাজের মতো ৬-৭ বছরনাগাদ সাফল্যের সঙ্গে চলার পর তার গায়েও নজর লেগে গেল। তার অল্প কজন কর্মকর্তার মাঝেও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেল। ফলে বাধ্য হয়ে '৬৮ সালের শেষ কিংবা '৬৯ সালের গোড়ার দিকে তার ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হলো।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কয়েকটি গুরুতর দুর্ঘটনা, ইউরোপের প্রথম সফর, স্পেন পরিদর্শন ও হিন্দুস্তানের শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি দাঙ্গা

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহেব (রহ.) ও হযরত রায়পুরি (রহ.)-এর মৃত্যু

১৯৬২ সালে আমি গুরুতর দুটা দুর্ঘটনার শিকার হলাম। একটা হলো হযরত আহমাদ আলী সাহেব লাহোরির মৃত্যুর ঘটনা, যেটা ১৩৮১ হিজরির ১৮ রমযান (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) ঘটেছিল। তার ছয় মাস পর ১৩ রবিউল আউয়াল ১৩৮২ হিজরি (১৬ আগস্ট ১৯৬২) মারা গেলেন হযরত রায়পুরি (রহ.)। তার দিনকতক আগে বন্ধুবর ডক্টর সাঈদ রমযান তাঁর মারকাযে ইসলামী জেনেভার পরিচালনা পরিষদের বৈঠকে অংশগ্রহণ ও ইউরোপ প্রবাসী মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকার এবং তাদের উদ্দেশে ভাষণদানের আমন্ত্রণপত্র পাঠালেন। আমন্ত্রণটি গ্রহণ না করার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহপাকের পরম করুণা যে, হযরত রায়পুরির শোচনীয় অবস্থার একের-পর-এক সংবাদের ভিত্তিতে তখন আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম এবং ইউরোপ সফরের উপর লাহোর সফরকে প্রাধান্য দিলাম। ফলে আমার এই সৌভাগ্য অর্জিত হলো যে, হযরতের জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমি তাঁর খেদমতে হাজির থাকতে এবং তাঁর কাফন-দাফনে শরিক হতে পেরেছি। ঘটনা যদি তার বিপরীত হতো, তাহলে এর মর্মবেদনা আমাকে গোটা জীবন বইতে হতো।

ইউরোপ সফর

১৯৬৩ সালে আমি ইউরোপের সেই সফরে বের হলাম, যেটি পশ্চিমা বিশ্বে আমার প্রথম সফর ছিল। এই সফর ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে একই বছরের নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহে শেষ হয়েছিল। এই সফরে সঙ্গী হিসেবে আমি বন্ধুবর ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশিকে বেছে নিলাম, যিনি ডাক্তারি

শিক্ষা অর্জনের জন্য ইতিপূর্বে লন্ডন অবস্থান করে এসেছেন। মূল সফরটা ছিল বন্ধুবর ডক্টর সাঈদ রমযান-এর আমন্ত্রণে জেনেভার ইসলামিক সেন্টারের সম্মেলনগুলোতে যোগদানের নিমিত্ত, যার জন্য তিনি মধ্য ইউরোপে শিক্ষারত আরব ও মুসলমান ছাত্রদের দীনি জ্ঞানার্জন ও নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সফর পিআইএতে করে করাচির পথে হয়েছিল, যেখানে বহুসংখ্যক বন্ধু-সুহৃদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

এই সফরে আমি জেনেভা, বুজান, বার্ন, লন্ডন, ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্লাসগো, এডিমবারা, মাদ্রিদ, টলেডো, সুল্লা, কর্ডোভা ও গ্রানাডা ভ্রমণ করেছি। ভাষণগুলোর মধ্যে এডিমবারা ইউনিভার্সিটির ভাষণ, লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ন হলের ভাষণ, বিবিসিতে দুটি ভাষণ – যার একটির শিরোনাম ছিল 'একজন লন্ডন পর্যটকের প্রতিক্রিয়া' আর অপরটির বিষয়বস্তু ছিল আরবি ভাষার উন্নয়নের সম্ভাবনা ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে তার সম্পর্কবিষয়ক – বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লন্ডন ইউনিভার্সিটি হলের ভাষণটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটি আরবিতে بين الشرق والغرب (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সম্পর্ক) প্রস্তুত করা হয়েছিল। ডক্টর যফরুল হক আনসারি সাহেব – যিনি তখন লন্ডনে অবস্থানরত ছিলেন – 'বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট' নামে অনুবাদ করেছেন এবং এক নওমুসলিম ইংরেজ মুস্তফা এওয়াস সেটি অত্যন্ত উদ্দীপনা ও আবেগের সাথে পাঠ করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্য থেকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবি বিভাগের প্রফেসর বিস্টন, ক্যামব্রিজ-এর খ্যাতনামা প্রাচ্যবিশারদ পণ্ডিত ডক্টর এরবরি ও 'স্কুল অফ অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর ভারতের ইতিহাস (প্রাক-ইসলাম) বিষয়ের প্রফেসর বারিশ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। অপর এক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ এরিক বার্থ-এর সঙ্গেও দেখা হয়, যিনি আমেরিকাস্থ মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুসংঘের প্রধান এবং যার ইয়েমেন-বিষয়ক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ইতিমধ্যেই আমি পড়েছি। মুসলমানদের পণ্ডিতদের মধ্যে মুহাম্মাদ আসাদ, ডক্টর হামীদুল্লাহ ও ডক্টর যকী প্রমুখের সাথে আমার দেখা হয়েছে। এই সফরে আমি খুবই সুযোগ-সুবিধা ও প্রশান্তি লাভ করেছি।

লণ্ডন অবস্থানকালে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি এবং আমার রচনাধীন গ্রন্থ 'মুসলিম মামালেক মেঁ ইসলামিয়াত ওয়া মাগরেবিয়াত কা কাশমকাশ' (মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) গ্রন্থটির ভূমিকা

লন্ডনের এই অবস্থানেই লিখেছি। সৌভাগ্যক্রমে সে-সময় স্নেহাস্পদ মৌলভী আবদুল্লাহ্ আব্বাস নদবি লন্ডন অবস্থান করছিল। ফলে আমি তারই '১০, কুইন্স ভিউ'র ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছি। তাতে আমার অনেক সহযোগিতা ও আরাম হয়েছে।

স্পেনের মাটিতে

এই সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় অংশ ছিল মৃত উনদুলুস (বর্তমান স্পেন)-এর যেয়ারত। এমন একটি দেশের নাম আমার জানা নেই, যেখানে মুসলমান ছিল এবং পরে তাদের নাম-চিহ্ন মুছে গেছে আর ওখানে গিয়ে এমন আপনতা, এমন মমতা, এমন চিত্তাকর্ষণ অনুভূত হয়েছে যে, মনে হচ্ছে, ওখানকার আবহাওয়া আমাকে জড়িয়ে ধরছে আর বিন্দু-বিন্দু আপনতার বার্তা দিয়ে যাচ্ছে যেমনটি স্পেনে অনুভূত হয়েছিল। ওখানকার নামায ও টুটা-ফাটা যিকিরে যে আবেগ ও স্বাদ অনুভব করেছি, যা অন্য কোথাও কমই অনুভূত হয়েছে। স্পেনে আমি মদীনাতুয যাহরার ধ্বংসাবশেষও দেখেছি, আলহামরার স্মৃতিচিহ্ন, নকশা-নমুনাও দেখেছি। আক্ষেপের বিষয় হলো, এই সফরের কাহিনী আমি লিখতে পারিনি। সেজন্য এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রতিক্রিয়া চোখে দেখা স্মৃতির কথা উল্লেখ করছি।

স্পেন সফরে পুরনো দাগ; বরং হৃদয়ের ক্ষত তাজা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকশো বছরের প্রতাপ-প্রতিপত্তি, যোগ্যতা ও কীর্তির ইতিহাস – যা নাফহুত্তায়্যিব[১] ও আল-হুলালুস সানদাসিয়্যা[২]র কয়েক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এবং যাকে সংক্ষিপ্তভাবে আমি ছাত্রজীবনেই আল্লামা কুরদ আলীর 'গাবিরুল উনদুলুসি ওয়া হাজিরুহা' (স্পেনের অতীত ও বর্তমান) এবং মৌলভী খলীলুর রহমান সাহেবের 'আখবারুল উনদুলুস' (স্পেনের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে পড়েছি – স্মৃতিতে ভেসে উঠল এবং কল্পনার জগতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

ইসলামি-আরবি স্মৃতিমালা মাদ্রিদে (সাবেক মাজরিত) কম আর টলেডোতে (সাবেক তাইলিতা) বেশি। আমরা মাদ্রিদ থেকে টলেডো ট্যুরিস্ট বাসে গিয়েছি। পর্যটক ও পরিদর্শকদের ইংরেজিভাষী ও ফ্রান্সভাষী গাইডদের

---

১. আল্লামা মুকিররির বিখ্যাত গ্রন্থ

২. আমীর শাকীব আরসালান-এর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ

মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হলো। আমাদের গাইড ইংরেজিতে বিভিন্ন চিহ্ন ও স্থানের পরিচয় দিচ্ছিল। যখনই কোনো ঐতিহাসিক জায়গার পরিচয় দিত, প্রায়ই সে 'যখন আমরা আরবদের দেশ থেকে তাড়িয়েছি' বাক্যটি বলত। বারকয়েক শোনার পর আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, দয়া করে এই বাক্যটা বলা বন্ধ করুন; এতে আমার খুবই কষ্ট হয়। গাইড বাক্যটা বলা বন্ধ করে দিল এবং ক্ষমা চেয়ে বলল, আমাদের শাসনকর্তা জেনারেল ফ্রাংকো আরবদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন আর আমরাও তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করি।

মাদ্রিদ থেকে কর্ডোভা যাওয়ার পথে রেলের জানালার সম্মুখে আমি কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং ইকবালের এই কবিতাটি সত্যায়ন করছিলাম :

بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے
رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

'ইয়েমেনের ঘ্রাণ আজও তার বাতাসে বিদ্যমান;
হেজাযের রং আজও তার সুরে বিরাজমান।'

আমরা কর্ডোভা মসজিদে পৌঁছলাম। সবাইকে ছাড়িয়ে ইকবালের বিশ্ববিখ্যাত কবিতা 'মসজিদে কুরতুবা', যেটি ইকবাল সাহিত্যেই নয় – (প্রফেসর রশীদ আহমাদ সিদ্দীকি ও আমার মতে) বিশ্বসাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসন তৈরি করে নিয়েছে আমার কানে গুঞ্জরিত হতে লাগল আর ইকবালের এই চরণগুলো বিশেষভাবে আমার মনে পড়ে গেল :

تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل
تیری بنا پائدار تیرے ستوں بیشمار شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل

তোমার প্রতাপ ও সৌন্দর্য প্রমাণ করে, তুমি একজন কীর্তিমান পুরুষ। তিনিও প্রতাপশালী, সুন্দর; তুমিও প্রতাপশালী, সুন্দর।
তোমার ভিত অক্ষয়, তোমার খুঁটি গণনাতীত। যেমন গণনাতীত শামের মরুসাহারায় খেজরবৃক্ষ।

মসজিদের অভ্যন্তরে নির্মিত গির্জাগুলো – যেগুলোর সংখ্যা ছয় জানানো হয়েছে – মসজিদের গঠন-আকৃতি বিকৃত করে রেখেছে এবং কেবলার দিক নির্ণয় করাও দুষ্কর করে তুলেছে। তারপরও আমি অনুসন্ধান করে মেহরাবে

দাঁড়িয়ে গেলাম। খ্রিস্টান গাইড জানাল, এখানে যে-শব্দ তোলা হবে, তা মসজিদের শেষ কোণটি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এটি একটি প্রাকৃতিক মাইক, যেটি উনদুলুসের আরব শিল্পীগণ আবিষ্কার করেছিলেন।[১]

আমি ওখানে উচ্চৈঃস্বরে আযান দিলাম। গাইড চেঁচামেচি করে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করল। আমি আরেকবার পবিত্র কুরআনের وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (কাফেররা বলল, এই কুরআন তোমরা শোনো না আর তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করো যাতে তোমরা জয়ী হতে পার) আয়াতটির ব্যাখ্যা ও মর্ম সামনে এসে পড়ল। একজায়গায় আমি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইকবালের মতো দু-রাকাত নামায পড়েছি। আসরের নামাযের সময় ছিল। আমরা বের হয়ে মসজিদের আঙিনায় আযান ও জামাতের সাথে নামায আদায় করেছি এবং নগরীর বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান নাগরিক বিস্ময়ের সাথে সেই দৃশ্য দেখতে থাকল।

গ্রানাডার অবস্থানে, যেখান থেকে মুসলমানদের সর্বশেষ কাফেলাটি উনদুলুসের মাটি থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং যেখানকার মাটি আরবদের রাজত্ব ও সভ্যতার আখেরি বাহার প্রত্যক্ষ করেছিল, আমার আবেগ ও জযবার এই প্রতিক্রিয়া আরও বেড়ে গিয়েছিল এবং ইকবালের এই চরণগুলো যথোপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল :

دیدہ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں

آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں

নক্ষত্রমালা অধীর অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে তোমার আকাশ
ও পৃথিবীর পানে। আহ! না জানি কত শত বছর মহাশূন্য
আযানের ধ্বনি থেকে বঞ্চিত!

গ্রানাডায় অবস্থানকালে জুমা এসে পড়ল। আমি আরব ছাত্রদের – যাদের বেশিরভাগই মরক্কোর নাগরিক – দাওয়াত দিলাম যে, এসো; আমরা সবাই মিলে আজ জুমার নামায আদায় করি। সময়ের স্বল্পতা আর যুবকদের সাহসের অভাবে খুব অল্প লোকই এল। আমরা এক আরব যুবকের কক্ষে জুমার নামায আদায় করলাম। জানি না, কত শত বছর পর এই মাটিতে জুমা পড়া হলো। আমার ফিরে আসার পর এক আরব ছাত্র সংবাদ জানাল, এই ধারা এখন কিছু হলেও অব্যাহত আছে। জানি না, এখনও আছে কিনা।

১. বেজাপুর জামে মসজিদেও এই শিল্প বিদ্যমান। দিল্লির মোগল আমলের আগেকার একটি মসজিদেও এই শিল্পের অস্তিত্ব রয়েছে।

মুসলমানদের ভীরুতা আর সামর্থ্যহীনতার জন্য মনটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে যে, কোনো দেশের মুসলমানরা (বিশেষ করে আরবরা) এই হারিয়ে-যাওয়া-জান্নাতটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেনি! শাসনক্ষমতা হাতে নেওয়া তো দূরের কথা এই দেশটিতে ইসলামের দাওয়াত ও তাকে পরিচিত করার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত কেউ করেনি। এতটুকুও হয়নি যে, কিছু যুবক স্পেনিশ ভাষা শিখত আর স্পেন গিয়ে বলত তারা ইসলাম ও মুসলমানদের দেশে থেকে তাড়িয়ে কী হারিয়েছে, কী পেয়েছে এবং আপন দেশটিকে কোন উচ্চতা থেকে কোন অধঃপাতে নামিয়ে এনেছে। যাক, অভিযোগ-অনুযোগ যা করবার আল্লাহর কাছেই করছি!

ইউরোপ সফরের কিছু প্রতিক্রিয়া

ইউরোপের এই সফরের বিস্তারিত বিবরণ এজন্য লেখা জরুরি মনে করছি না যে, ওখানে থাকা অবস্থায় আমি যে-পত্রগুলো আপনজনদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সেগুলোতে সংক্ষিপ্ত সফরনামা ও জরুরি বিবরণি এসে পড়েছে।[১]

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেব সিন্ধি ১৯৪৪ সালে লাখনৌ এসেছিলেন এবং নদওয়ার মেহমানখানায় অবস্থান নিয়েছিলেন। সে-সময় তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'মৌলভী আবুল হাসান সাহেব! আপনার গুণ অনেক; কিন্তু কাজের পরিধি সীমিত। আপনার ইউরোপে একটা সফর দেওয়া দরকার।' আমারও দীর্ঘদিনের বাসনা ছিল, আমি পশ্চিমা সভ্যতা ও পাশ্চাত্য নিয়ে বই-পুস্তক ও নিবন্ধাদিতে পর্যালোচনা করে আসছি। কিন্তু শোনা কথা নিজের চোখে দেখা বিষয়ের মতো হয় নাকি? কাজেই এই জগতটা সরাসরি নিজের চোখে দেখা দরকার। আল্লাহর শোকর যে, আমি স্বচক্ষে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্থানগুলো দেখেছি এবং তার সামান্য যেটুকু প্রভাব আমার মনে ছিল, তাও চলে গেল।

এখানে আমি আমার সেই পত্রগুলোর কয়েকটি চয়ন উপস্থাপন করছি, যার দ্বারা আমার প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা অনুমান করা সম্ভব হবে।

প্যারিস থেকে ১৯৬৩ সালের ১লা অক্টোবর স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ মিয়ার নামে একটি পত্র লিখেছিলাম। তাতে ইউরোপে নারী যে 'মর্যাদা' লাভ করেছে এবং সারা বিশ্বে যার ডংকা বাজানো হচ্ছে, তার আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছি :

---

১. দেখুন 'মাকাতীবে ইউরোপ' (ইউরোপের পত্রাবলি)

'ইউরোপে নারী যে-মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, তার রহস্যও আমার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। বেচারী ভাড়ার টাট্টুতে পরিণত হয়ে গেছে। দোকানদারও তারা, কুলি-মজুরও তারা। হীন-থেকে-হীনতর কাজে তারা নিয়োজিত। রেল, মেট্রো, বাস সবখানে তারা পুরুষদের ধাক্কা খেয়ে ফিরছে। পুরুষরা আরামের সাথে বসে থাকছে আর নারী দাঁড়িয়ে। নারিত্ব, লজ্জা, আকর্ষণ তার থেকে একদম হারিয়ে গেছে। এর দ্বারা বর্তমান সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও যৌনতায় ভরা গল্প-উপন্যাসের প্রতি এই ঝোঁক আর নিত্যদিনকার এই নগ্নতার কারণ আমার বুঝে এসেছে যে, নারীর মাঝে আজ কোনো আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। সেজন্য একে তারা এসব উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করছে এবং পুরুষদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।'[১]

১৯৬৩ সালের ১৫ অক্টোবর পাঠানো আরেক পত্রে লিখেছি :

'শোনা কথা চোখে দেখা বিষয়ের মতো হয়ে গেছে।' কথাটা যিনি বলেছেন, তিনি সর্বৈব সত্য বলেছেন। শুনে-শুনে জানা গুণ ও দোষগুলো প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। পশ্চিমা সভ্যতা থেকে হতাশা ও দূরত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এই পাথরে জোঁক লাগা খুবই দুষ্কর মনে হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে বড়ই সুধারণা তৈরি হয়। এখানকার জীবন মানেই যান্ত্রিক ও কৃত্রিম। এরা অন্য কোনো উন্নত বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করবে এ আল্লাহ চাইলেই কেবল সম্ভব হবে।'[২]

আরেকটি চয়ন ইউরোপের গোটা জীবন, সভ্যতা ও ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করছে :

'ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গের সঙ্গে ফিরিঙ্গির উল্লেখও জরুরি। বস্তুবাদ, জীবনের ব্যস্ততা, টিকে থাকার লড়াই, নিজেদের তৈরী মানদণ্ড ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের দৌড়ঝাঁপ সূক্ষ্মতর অনুভূতি, আত্মিক পিপাসা ও খোদা-

---

১. মাকাতীবে ইউরোপ পৃ. ২৭

২. মাকাতীবে ইউরোপ পৃ. ৩৯, ৪০

অম্বেষণের চেতনাকে প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে। এজন্যই নিজেদের সমস্ত মেধাগত যোগ্যতা, ইচ্ছাশক্তি, দায়িত্বের অনুভূতি, শৃঙ্খলাবোধ এবং অন্য আরও অনেক গুণ-যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা নির্ভুল রূহানি আন্দোলন এবং দীনি ও রূহানি বিজয় থেকে বঞ্চিত এবং নানা বিদ্যা ও যোগ্যতার পারদর্শী লোকদের সেই ভূখণ্ড, যে কিনা জগতের চিত্র ও জীবনের ধারা পালটে দিয়েছে 'আল্লাহচেনা' লোকদের থেকে শূন্য। সম্ভবত এজন্যই পাশ্চাত্যের 'পাল্‌স এক্সপার্ট' ইকবাল বলেছিলেন :

یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی

এই উপত্যকা উপযুক্ত নয় তাজাল্লি পাওয়ার!

অবশেষে সৃষ্টিগত ভালোমানুষির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল এবং তিরস্কারকারী মনের যেটুকু ভর্ৎসনা বাকি ছিল, মদ আর শূকর তা-ও নিঃশেষ করে দিল। এখানে কয়েকটা দিন অবস্থান করে 'পাপের আড্ডা' মদ-শূকর হারাম হওয়ার রহস্য (যার উপর আলহামদুলিল্লাহ ঈমান ও স্পষ্ট বুঝ সব সময়ই ছিল) দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেল।[১]

ইউরোপের দ্বিতীয় সফর

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো জায়গার সফর হচ্ছে না তো দীর্ঘদিন যাবত হচ্ছেই না। কিন্তু যখন একবার হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রায়ই বারবার হচ্ছে। ইউরোপ সফরের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছে যে, একবার করে আসার পরবর্তী বছরই; মানে ১৯৬৪ সালে অক্টোবর মাসে আবারও মারকাযে ইসলামী জেনেভার সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য স্নেহাস্পদ মৌলভী রাবে নদবিকে সঙ্গে করে দ্বিতীয় সফর হলো। এবার লন্ডনে অবস্থান নিলাম শ্রদ্ধেয় সাইয়িদ মুনাওয়ার হুসাইন সাহেব বিহারির বাড়িতে। সাইয়িদ সাহেব ওখানকার তাবলীগ জামাতের আমীর ছিলেন এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন। এই সফরে ফ্রান্সের বদলে জার্মানি গেলাম, যার ফলে বার্লিন, আখিন ও মিউনিখ ভ্রমণের সুযোগ পেলাম। বন হয়েও পথ অতিক্রমণ করলাম।

---

১. মাকাতীবে ইউরোপ পৃ. ৫৫, ৫৬

বিশেষ কথা হলো, পশ্চিম বার্লিন গিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, কৃত্রিমতা ও জবরদস্তিমূলক হওয়ার এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম যে, যদি পঞ্চাশটি গ্রন্থও পড়তাম, তাতেও এই অভিজ্ঞতা হতো না।

এই সফরের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দুটি অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হলো বেকর স্ট্রীট লন্ডনের ভাষণ, যেটি মুসলিম ছাত্র ও যুবকদের সামনে প্রদান করেছি। অপরটি বার্লিনে (২৭ অক্টোবর ১৯৬৪) ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ জার্মানি জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ। এই ভাষণটি আমি আরবিতে প্রদান করেছি আর জার্মান ভাষায় আগে থেকে প্রস্তুতকৃত অনুবাদ তখনই শোনানো হয়েছে।

ফেরার পথে এক দিন ইস্তাম্বুলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছি। তারপর তিন দিন দামেশকে অবস্থান করে করাচির পথে হিন্দুস্তান ফিরে আসি। এই সফরের পর দুটি সফর হয় ইউরোপে আর একটি ১৯৭৮ সালে আমেরিকায়, যার বিস্তারিত বিবরণ ও রোজনামচা 'দো মাহীনে আমেরিকা মে' (দু-মাস আমেরিকায়) নামে মৌলভী মুহাম্মাদ রাবে নদবির কলম থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

কলিকাতা, জমশেদপুর ও রাওড়কেলার ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ আর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারির শুরুর দিনগুলোতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে মুসলমানদের ব্যাপক প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। এই ঘটনায় মুসলমানদের বিপুলসংখ্যক শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একদিকে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি, অপরদিকে মুসলিম সংগঠন ও সংস্থাগুলোর (যারা আপন-আপন পতাকাতলে ত্রাণ বিতরণের কাজ শুরু করে দিয়েছিল) পারস্পরিক বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও অসহযোগিতার জযবা। সর্বোপরি দেশে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব ও সম্মিলিত প্লাটফর্মের অনুপস্থিতি – যার মাধ্যমে মুসলমান নিজেদের অভিযোগ-অনুযোগ সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং নিজেদের আওয়াজকে প্রভাবশালী করতে পারে – আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানদের চিন্তার আহ্বান জানাচ্ছিল যে, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি একটি প্রতিকার খুঁজে বের করো। জনসাধারণও এই পরিস্থিতির কারণে না শুধু বেচইন ও বেজার হচ্ছিল, বরং তারা দাবি জানাচ্ছিল, মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনগুলোর দায়িত্বশীলগণ

এক জায়গায় বসুন এবং একটি একক নেতৃত্ব তৈরি করুন, মুসলমানদের জন্য একটি প্লাটফর্ম দাঁড় করান। ডক্টর সাইয়িদ মাহমুদ সাহেব – যিনি সে-সময় কলিকাতা গিয়েছিলেন – এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে উত্তর ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা পটিরাঞ্চি, জমশেদপুর ও রাওড়কেলায় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় শুধু জমশেদপুর ও রাওড়কেলায় তিন হাজারেরও বেশি মুসলমান নিহত হয়। ঘটনার ভয়াবহতা এবং তাতে জড়িত লোকদের হিংস্রতা ও পাষণ্ডতা অনুমান করতে মিস্টার জে প্রকাশ নারায়ণ-এর সেই পত্রটির একটি উদ্ধৃতি-ই যথেষ্ট হবে, যেটি তিনি পার্লামেন্টের উভয় সভার (লোকসভা ও রাজ্যসভা) প্রধান ও রাজনৈতিক দলগুলোর নামে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> 'নির্যাতন-নিপীড়ন সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন হলো, এ কাজে কোনো সীমানা অবশিষ্ট থাকেনি। সর্বপ্রকার ঘৃণ্য ও লজ্জাকর আচরণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে যা কিছু হয়েছে, তা-ই শিক্ষামূলক ছিল। কিন্তু কিছু-কিছু আচরণে তো নির্মমতা ও হীনতার অনুমান করাও অসম্ভব। এমন-এমন ভয়াবহ আচরণ করা হয়েছে, দিল্লি কিংবা রাষ্ট্র জানে না তার পরিমাণ কত।'

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি আরও লিখেছেন :

> 'এও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, শিক্ষা হিংস্রতা ও অপরাধপ্রবণতার প্রতিকার নয়। আর এরও প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সরকারের প্রশাসনযন্ত্র কতখানি অপর্যাপ্ত ও অযোগ্য।'

সবার আগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মতো ইস্যু

এই ঘটনা – যার ধরন ও দৈর্ঘ্য-প্রস্ত বিগত দিনকার সমস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিধি ছাড়িয়ে গিয়েছিল – আমার ও আমার সহকর্মীদের স্নায়ুতন্ত্রগুলোকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং প্রতিজন বুঝমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ভাবতে বাধ্য করেছিল, যদি এ-জাতীয় ঘটনার ধারা অব্যাহত থাকে এবং যাতে এধরনের ঘটনা ঘটতে না পারে, তার জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না হয়, তাহলে হিন্দুস্তানে শিক্ষা ও গঠনমূলক কোনো কাজের সুযোগ থাকবে না

শুধু তা-ই নয়; মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্বও সন্দিগ্ধ হয়ে যাবে এবং তারা স্বদেশ ছেড়ে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে কিংবা অচ্ছ্যুত ও পশ্চাদপদ জাতিগুলোর মতো – যারা আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ধর্মপরিচয় পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত – তাদের রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যাবে। সেজন্য সমস্ত শিক্ষা ও গঠনমূলক কাজের আগে এই ইস্যুটির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা জরুরি।

সেইসঙ্গে এ চিন্তাও মাথায় এল যে, এ কাজের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীটির এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ ও ত্যাগী নেতা দরকার, যারা এ সময়ে গান্ধীজির মতো মাঠে নেমে আসবেন এবং তার জন্য আপন জীবনের বাজি লাগাবেন। কারণ, তারা যদি পরম নিষ্ঠা ও পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়েও কাজ করেন, তবু তা ততটুকু ক্রিয়াশীল হবে না, যতখানি হবে অমুসলিম নেতাদের কথায়। কারণ, মুসলমানরা হলো সংখ্যালঘু ও দুর্বল। তাদের এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে আপন গোষ্ঠীর সুরক্ষা, দুর্বলতা ও ভীরুতা বলে বিবেচিত হবে।

যখন এ বিষয়ে চিন্তা করা হলো, তখন সবার আগে চোখ পড়ল মিস্টার জে প্রকাশ নারায়ণ ও আচারিয়া অনুবা ভাওজির উপর। প্রথমজনের উপর এ কারণে যে, তিনি এই দাঙ্গাগুলোতে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আওয়াজ উচ্চকিত করেছিলেন এবং 'শান্তি সেনা' নামে একটি নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়জনের উপর চোখ পড়ার কারণ হলো, তিনি গান্ধীজির স্থলাভিষিক্ত এবং মানবতাবাদী ফকিরমানস ব্যক্তি। এই চিন্তা মাথায় নিয়ে আমি ও মাওলানা মানযূর নুমানি সফর শুরু করে দিলাম। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ জে প্রকাশ নারায়ণজির সাথে দিল্লিতে তার বাসভবনে দেখা করলাম। এই আলোচনায় অনুবা ভাওজির ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আন্নাজিও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সঙ্গে 'দাওয়াত'-এর সম্পাদক মৌলভী মুহাম্মাদ মুসলিম সাহেব আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। জে প্রকাশ নারায়ণজিও আমাদের অনুবা ভাওজির সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, আমারও এদিকে আসবার ইচ্ছা আছে। আমিও এ কাজে আপনাদের সাহায্য করব।

অনুবা ভাওজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হতাশা

আমি ও মাওলানা মানযূর নুমানি সাহেব এই অভিযানে নাগপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। ভুপাল থেকে আমি মাওলানা হাফেয ইমরান খান

সাহেব নদবিকেও সঙ্গে নিয়ে নিলাম। মুফতী আতীকুর রহমান সাহেবের পরামর্শে কাজী মাসউদ সাহেব নানুতবিও আমাদের এই প্রতিধিনিদলে যোগদান করলেন। অনুবা ভাওজি সে-সময় অর্ধা থেকে – যেটি তার স্থায়ী নিবাস ছিল – পদব্রজে বের হয়েছিলেন। আমরা ২৮ মার্চ ১৯৬৪ খ্রি. নাগপুর থেকে ছয় মাইল দূরে এক পল্লীতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। ঘটনাক্রমে সেদিন তার সেই 'বারাত' (হিন্দুদের বিশেষ ধরনের রোযা) ছিল, যার ফলে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমি আগে থেকেই একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম, যার ইংরেজি অনুবাদ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই স্মারকলিপির একটি অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরলাম :

> 'পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের একটি কার্যকর প্রচেষ্টা দরকার। হিন্দুস্তান ইতিহাসের একটি নাজুক মোড় ও সিদ্ধান্তবাগীশ দোরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা পথ গেছে আজীবনের জন্য ধ্বংস, অপার বিশৃঙ্খলা ও অনিঃশেষ পতনের দিকে। অপরটির গন্তব্য চিরশান্তি, ঐক্য ও সম্প্রীতি। এ জাতীয় প্রতিটি মোড়ে এমন কিছু লোক এসে পড়েন, যারা ইতিহাসের গতি ও ঘটনাবলির ধারা পালটে দেন। তাদের সাহসিকতা, স্পষ্ট বক্তব্য ও জানবাজি গোটা দেশ ও সমগ্র জাতিকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায় আর এরাই হন দেশের স্থপতি ও ত্রাণকর্তা। এ জাতীয় মানুষগুলোকে সাধারণত রাজনীতি ও সরকারের বাইরে দেশের নিঃস্বার্থ সেবক ও দরবেশদের মধ্যে পাওয়া যায়, যাঁদের নিয়তের উপর কোনো সন্দেহ করা যায় না, যাদের সত্যবাদিতা ও স্বার্থহীনতা সর্বজনস্বীকৃত হয় এবং তাঁদের অতীত হয় সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।
>
> আমরা এই প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি যে, এই স্পর্শকাতর মুহূর্তে আপনি দেশের নেতৃত্ব হাতে নেবেন এবং পুরোপরি নিষ্ঠা, দৃঢ় প্রত্যয়, আত্মত্যাগ, চেতনা, ও মানবতাপ্রেমের পরিচয় দেবেন।'

এই বক্তব্যে আমি সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার প্রতিও ইঙ্গিত করেছি এবং অনুবা ভাওজিও নিশ্চয় তার নিজস্ব মাধ্যমেও সেসম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকবেন। কিন্তু আমরা অনুভব করলাম, এই

স্মারকলিপিটি পড়ে তার হৃদয়ের উপর যে-চোট লাগার কথা ছিল এবং তার চেহারা ও চোখে এই হিংস্র আচরণ ও মানববিধ্বংসী চরিত্রের যে-প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠবার কথা ছিল, তার কিছুই প্রকাশ পেল না।

২৯ মার্চ বেলা ৩টার সময় আচারিয়াজির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ও বিস্তারিত আলোচনা হলো। ততক্ষণে জে প্রকাশ নারায়ণজিও এসে পড়েছিলেন। তার সঙ্গেও দেখা হলো। কিন্তু আমরা আশার কোনো আলো দেখতে পেলাম না। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এ বিষয়টির সত্যায়ন করে দিল যে, তার মাথায় ভূদান আন্দোলন ও 'গোরক্ষা'র বিষয়টির যতখানি গুরুত্ব ছিল, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিহত করার এবং মানুষের জীবন রক্ষার গুরুত্ব ততখানি ছিল না। একাজে জীবনের বাজি লাগানো তো দূরের কথা; এর জন্য তিনি এমন কোনো কার্যকর ও ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করেননি, যেটি এই পরিস্থিতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। পরবর্তী কালে তার সবটুকু দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু (বিশেষ করে জীবনের শেষ দিনগুলোতে) নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল 'গোরক্ষা আইন' প্রণয়ন ও 'গোহত্যা বন্ধ' করার কাজে। তার এই চিন্তারীতি ও কর্মরীতিকে সামনে রেখে আমি তার জন্য 'বে-তাওফীক' (অন্য কোনো ভাষায় যার অনুবাদ করা দুষ্কর) শব্দের চেয়ে অধিক অর্থবহ আর কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না।

দাঙ্গাকবলিত অঞ্চলগুলো পরিদর্শন এবং জমশেদপুর ও রাওড়কেলার সফর

খুবসম্ভব এপ্রিলের শেষ আর মে'র শুরুতে মাওলানা মানযূর নুমানি মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব নদবিকে সাথে নিয়ে জমশেদপুর ও রাওড়কেলা সফর করেন। ফিরে এসে তাঁরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, ঘটনাস্থগুলোতে গিয়ে নিজের চোখে না দেখে ঘটনার ভয়াবহতা অনুমান করা সম্ভব নয়। তাঁরা আমাকে উৎসাহিত করলেন, যেন আমিও গিয়ে নিজের চোখে এক নজর দেখে আসি।

আমি মে'র শেষের দিনগুলোর কোনো এক তারিখে মৌলভী আবুল ইরফান সাহেব নদবিকে সাথে করে সেভান রওনা হলাম, যেখানে একটি তাবলীগি জামাতে যোগদানের লক্ষ্যে সোনপুরে স্টীমারে চড়ে পাটনা গিয়ে নামি এবং সেখান থেকে জমশেদপুর ও রাওড়কেলার উদ্দেশে রওনা হই। সেখানে আমি নিজচোখে দেওয়ালে-দেওয়ালে রক্তের ছোপ-ছোপ দাগ আর মাঠে-প্রান্তরে বিপুলসংখ্যক মানবমুণ্ডু ক্ষেতের বাঙ্গি-তরমুজের মতো পড়ে

আছে দেখতে পেয়েছি। হিংস্রতা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনেছি। এমন কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যারা তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল। এমন লোকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচানোর কাজে ঝুঁকি বরণ করে নিয়েছিল। তাদের মাঝে উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যার সঙ্গে আমাদের রাওড়কেলায় দেখা হয়েছিল। আমরা আগাম বাবুর সাথেও দেখা করেছি, যিনি মানবীয় সহানুভূতি, সভ্যতা ও সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। এই দুজন লোকের দেখা পেয়ে মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে, হ্যাঁ; আজও জগতে এবং প্রতিটি গোষ্ঠীতে এমন কতিপয় সভ্য, সাহসী, বিবেকবান ও হৃদয়বান মানুষের অস্তিত্ব আছে, যারা নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে অপরের জীবন রক্ষা করেন এবং কঠিন-থেকে-কঠিনতর পরীক্ষার সময়ও সত্য উচ্চারণে এবং এমন সাক্ষ্য প্রদানে তাদের বুক কাঁপে না, যা কিনা খোদ তাদেরই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর এমন আরও দু-চারজন লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো আর আমরা ভদ্রোচিত ও বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাদের শুকরিয়া জানাই এবং প্রশংসা করি। জুনের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে আমরা ফিরে আসি।

'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত'-এর আহ্বান ও তার প্রতিষ্ঠা

এই প্রচেষ্টার পরিণতি দেখার পর আমাদের সামনে একটি-ই পথ ছিল। তা হলো, একদিকে মুসলমানদের মাঝে পরিস্থিতি মোকাবেলার যোগ্যতা, প্রত্যয়, আল্লাহর উপর আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের শান তৈরি করতে হবে এবং নেতৃত্বের সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে, এই দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে যার মুখ্য ভূমিকা আছে। অপরদিকে দেশে এমন পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করতে হবে, যার ফলে এই স্নায়ুবিক টানাপড়েন কমে আসবে, দেশের নাগরিকরা মানুষ ও স্বদেশির মতো একে অপরের সাথে জীবন কাটাতে উদ্বুদ্ধ হবে, মানবতার মর্যাদা সৃষ্টি হবে এবং মন থেকে ঘৃণার সেই বিষ যথাসম্ভব বেরিয়ে যাবে, যা কিনা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, উত্তেজনাকর ভাষণ-বক্তৃতা ও দায়িত্বহীন প্রচারমাধ্যমগুলো তৈরি করে দিয়েছে।

ডক্টর সাইয়িদ মাহমুদ এই পরিস্থিতির ফলে সবচেয়ে বেশি চিন্তান্বিত ও বিমর্ষ ছিলেন। তার ধারণা ছিল, রাজনৈতিক নেতাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা শোচনীয়রূপে বিষাক্ত হয়ে গেছে। তবে হিন্দুস্তানের জনসাধারণ আজও এই রাজনৈতিক বিষ থেকে নিরাপদ। তাদের বিবেক এখনও মরে

যায়নি। কাজেই তাদের কাছে পৌঁছা এবং তাদের হৃদয় ও বিবেকের দুয়ারে করাঘাত করা দরকার। তার ধারণা ছিল (এবং তার এই ধারণা সঠিকই ছিল), এ দেশে চারিত্রিক ও নৈতিক নেতৃত্বের একটি শূন্যতা আছে, যেটি শুধু মুসলমানরাই (কুরআনি শিক্ষা ও নববি আদর্শের সাহায্যে) পূরণ করতে পারে। এই নেতৃত্বের দায়িত্ব তাদের বরণ করে নেওয়া আবশ্যক।

এ ক্ষেত্রে আমার ও মাওলানা মানযূর নুমানি সাহেবের সঙ্গে লাখনৌতে, মুফতী আতীকুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবুল লাইছ সাহেব নদবি ও 'দাওয়াত'-এর সম্পাদক মৌলভী মুহাম্মাদ মুসলিম সাহেবের (যিনি এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন) সঙ্গে দিল্লিতে তার স্বতন্ত্র যোগাযোগ ছিল। এসব পরামর্শের ফল এই বের হলো যে, অতি তাড়াতাড়ি একটি 'মুসলিম মজলিসে মুশাওয়ারাত' আহ্বান করতে হবে, যেখানে কর্মপন্থা ঠিক করা হবে এবং কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। নানা দিক বিবেচনা করে এই সম্মেলন দিল্লির পরিবর্তে লাখনৌতে আয়োজন করা-ই সমীচীন মনে করা হলো। আমি ও মাওলানা মানযূর সাহেব নুমানি তার দায়িত্ব বরণ করে নিলাম। সম্মেলনের জন্য ১৯৬৪ সালের ৮ ও ৯ তারিখ নির্ধারণ করা হলো এবং মুসলিম সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও দীনদরদী মুসলমানদের নামে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

বোম্বাইয়ে চোখের অপারেশন ও লাখনৌয়ে মজলিসে মুশাওয়ারাত-এর সম্মেলন

এ সময় জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে চোখের অপারেশনের জন্য আমাকে বোম্বাই যেতে হলো। মেজর ইরানি আমার চোখের অপারেশন করলেন। বোম্বাইয়ের এই অবস্থানে স্নেহাস্পদ মৌলভী মুরতজা আমার সঙ্গে ছিল। বোম্বাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে হাজী আহমাদ গরীব সাহেব, মুহাম্মাদ ভাই (বোম্বাই-অন্ধ্র ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক), সুফী আবদুর রহমান সাহেব (ওমর ভাই, চাঁদ ভাই) ও মুহাম্মাদ ইসমাঈল মানসুরি সাহেব অতিশয় নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ও পরম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অপারেশনের পর ধুবিতলায় মুহাম্মাদ ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ঠাঁই নিলাম। তার পর থেকে তারই মদনপুরার বাড়িতে থাকার ধারা শুরু হয়ে গেল।

এ সময়ে সবদিকের বিস্তারিত খবরাখবর থেকে আমি অন্ধকারে রইলাম এবং ময়দানের কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকলাম। আগস্টের প্রথম

সপ্তাহে আমি রায়বেরেলি ফিরে এলাম। সার্জন পুরোপুরি সতর্কতা ও বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ছয় সপ্তাহ যাবত কোনো ভাষণ দিতে এবং জোরে কথা বলতে একদম নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আমি রায়বেরেলির বাড়িতে ছিলাম। হঠাৎ একদিন মাওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নুমানি সাহেবের বার্তা এল, ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠেয় 'সর্বভারতীয় মতবিনিময় সভা'র-স্বাগত ভাষণের জন্য আমাকে কিছু লিখিয়ে দেওয়া দরকার। এই ফরমায়েশে মোল্লা জান সাহেবের ইঙ্গিত ছিল, যার সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাতই হয়নি। গতানুগতিক স্বাগত ভাষণ থেকে – যার বিশেষ কিছু রীতি ও ঐতিহ্য রয়েছে – ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু আমার কর্তব্য ছিল, আমি মোটের উপর এই সম্মেলনের পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করব এবং তার জন্য কর্তব্যের অনুভূতি ও মুসলমানদের সমস্যাবলিকে দীনি চিন্তা-চেতনা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থের সেই চেতনার সাথে বোঝা ও সেসবের সমাধান খুঁজে বের করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যা সাধারণত এমন সম্মেলনগুলোতে তৈরি হয় না, যেখানে রাজনৈতিক ধাঁচের সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নানা স্বার্থ একটি অপরটির সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে। এ কাজটি এমনিতেই দুষ্কর ছিল; তদুপরি তখন আমার স্বাস্থ্য এতই খারাপ ছিল যে, কাজটি আঞ্জাম দেওয়া আমার পক্ষে কঠিনতরই ছিল না, বরং অসম্ভব ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু যে-পরিবেশে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল, সেই পরিবেশ আমাকে অন্য কিছু ভাববার ও গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ দিল না। আমি একটি নিবন্ধ লিখিয়ে দিলাম। লেখানোর সময় আমার চোখে ব্যথা দেখা গিয়েছিল এবং এর জন্য আমাকে কিছু সময় বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! নিবন্ধ লেখানোর কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে স্নেহাস্পদ মৌলভী আবুল ইরফান নদবি নিবন্ধটি পাঠ করে শোনান এবং লক্ষ্য অর্জনে সেটি অনেকখানি সফলও হয়।

আল্লাহপাকের ইচ্ছা যে, অপারেশন দ্বারা যে-ফলাফল আশা করেছিলাম, তা হয়নি। খানিকটা (মিউনিখের জার্মান সার্জনের ভাষ্যমতে) এ কারণে যে, অপারেশনে কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। আবার নিজের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় সাবধানতার অভাব ছিল। এদিকে সম্মেলন চলাকালে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যে মনে হয়েছিল, এই আয়োজনটি ভণ্ডুল হয়ে যাবে এবং সম্মেলন ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় করে সমাপ্ত হবে, যার ফলে গোটা দেশে হতাশা ও দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিগুলোতে বন্ধুবর ডক্টর ফরীদি

সাহেবের স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমি নিজের চোখদুটোকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে পারলাম না। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সম্মেলন সফল তো হলো; কিন্তু আমার চোখের অবস্থা গুরুতর হয়ে গেল।

সংগঠনের প্রতিনিধিদলের দাঙ্গাকবলিত এলাকাগুলো পরিদর্শন

এদিকে সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এই সংগঠনের সর্বপ্রথম যে-কাজটি করা দরকার, তা হলো, তার একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল দাঙ্গাকবলিত এলাকাগুলো ঘুরে আসবে। দলে আমার অংশগ্রহণকেও জরুরি মনে করা হলো। আমি আমার রুগ্ন চোখদুটো নিয়ে প্রতিনিধিদলে যুক্ত হয়ে গেলাম। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রতিনিধিদলের সফর শুরু হয়ে গেল। সফরের স্পটগুলো ছিল রাঁচি, চকরধরপুর, চাইবাসা, জমশেদপুর ও রাওড়কেলা। জমশেদপুর সেই অঞ্চল, যার মাটি থেকে বোধহয় এই দিনকতক আগে মুসলমানদের দেহঝরা রক্তের দাগ মুছেছে। রাতে একটা খোলা মাঠে জনসভা হলো। টাটা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার (যিনি একজন পাঞ্জাবি হিন্দু ছিলেন) সভার সভাপতিত্ব করেন। মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল, যাদের মধ্যে বহুসংখ্যক হিন্দু-খ্রিস্টানও ছিল।

আমি আমার ভাষণে জমশেদপুরের শিল্প-কেন্দ্রিকতাকে (যেখানে লোহা বিশেষ ভূমিকা পালন করে) আলোচ্যবিষয় বানিয়ে মানুষের অধঃপতন ও মানবতার ব্যর্থতার কথা তুলে ধরলাম এবং বললাম, এই কাঁচা লোহাটির যদি যবান থাকত, তা হলে চিৎকার দিয়ে বলত, 'সৃষ্টিকর্তা আমাদের এজন্য তৈরি করেননি, আমাদের উপর এই কারখানাগুলোতে এজন্য শ্রম ব্যয় করা হয়নি যে, আমাদের দ্বারা মানুষের – যারা সৃষ্টির সেরা জীব – গলা কাটা হবে। একাজে আমাদের কোনো ত্রুটি নেই। সমস্ত দোষ সেই লেখাপড়াজানা মানুষগুলোর, যারা আমাদের দ্বারা সংরক্ষণের পরিবর্তে ধ্বংসের, গঠনের বদলে ধসানোর এবং সভ্যতার স্থলে বর্বরতার কাজ নিচ্ছে।' সভার সভাপতি – যিনি উরদু ভালো বুঝতেন এবং যার মধ্যখানে উঠে চলে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল – রাস্তা বদল করে আমার কাছে এলেন এবং কানে-কানে বললেন, আপনার বক্তৃতা সময়োপযোগী হয়েছে এবং আমার খুবই ভালো লেগেছে। এ জাতীয় ভাষণ-বক্তৃতার বড় বেশি প্রয়োজন।

প্রতিনিধিদল জমশেদপুর থেকে রাঔড়কেলা গেল। আমার ইউরোপের দ্বিতীয় সফরের তারিখ খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। তাই আমি জমশেদপুর থেকেই ফিরে এলাম। লাখনৌ এসে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ রাবে নদবিকে সঙ্গে নিয়ে লাহোর-করাচি হয়ে পিআইএতে করে জেনেভার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম, যেখানে মারকাযে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদানের কথা ছিল। মিউনিখে ডক্টর সাঈদ রমযান ওখানকার সবচেয়ে বড় চক্ষুসার্জন ও প্রফেসর থেকে চোখ দেখানোর জন্য সময় নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললেন, অপারেশন প্রয়োজনীয় সতর্কতার সাথে করা হয়নি এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তিনি কালক্ষেপন না করে অতি তাড়াতাড়ি পুনরায় অপারেশন করাবার পরামর্শ দিলেন, যার জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারলাম না এবং পরদিনই ইস্তাম্বুল ও দামেশক হয়ে হিন্দুস্তান ফিরে এলাম।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সংগঠনের প্রতিনিধিদল গুজরাট সফর করে। এ-দলেও আমি শরিক ছিলাম।

আমি মুহাম্মাদ মিয়াকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। আর স্নেহাস্পদ আবদুর রাযযাক তো তখন সফরে-হজরে আমার সঙ্গেই থাকছিল। এই সফরে পণ্ডিত সুন্দরলালও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সংগঠনের প্রায় সবকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আহমদাবাদের উপকণ্ঠ ও আশপাশের পল্লী অঞ্চলগুলো ভ্রমণ করেন। প্রতিটি জায়গায় পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আমাদের স্বাগত জানানো হয়। বিশাল-বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মনে হচ্ছিল, খেলাফত আন্দোলনের যুগ ফিরে এসেছে। এর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে নডিয়াড, গোধরা, বড়ুদা, ভড়ুচ ও সুরাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সফরগুলোর মধ্যে দীর্ঘ, ব্যাপক, ক্রিয়াশীল ও সফল ছিল মহিশুর সফর। কিন্তু যেহেতু সেটি ১৯৬৫ সালের পরের (১১, ১২ নভেম্বর ১৯৬৬) ঘটনা, তাই বিষয়টি এখনকার আলোচনার পরিধির বাইরের ব্যাপার।

রাবেতার সম্মেলনে যোগদান

১৩৮৪ হিজরির যিলহজ মাসে (এপ্রিল ১৯৬৫) রাবেতা আলমে ইসলামী বিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার প্রথম সম্মেলনের আয়োজন করে, যাতে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ইসলামি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র এবং কোনো-কোনো অমুসলিমপ্রধান

দেশ – যেখানকার মুসলমানদের বিশেষ পজিশন ছিল – প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আমি ও মাওলানা মানযূর নুমানি (যিনি কিছুদিন আগে রাবেতার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন) সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করলাম।

বজ্রপাতের মতো একটা সংবাদ

মক্কা পৌঁছলাম সবে দিনকতক হলো। এখনও হজ ও সম্মেলনের সময় আসতে কয়েক দিক বাকি। এমন সময় একদিন হারাম শরীফে এক বন্ধু জানাল, পাকিস্তান থেকে খবর এসেছে, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব লাহোরে ইনতেকাল করেছেন। খবরটা বজ্রের মতো মন ও মস্তিষ্কের উপর পতিত হলো। কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোদ দিলাম যে, দূরের ব্যাপার; হজের ডামাডোল, গুজব ও অসমর্থিত সংবাদের ছড়াছড়ি; কাজেই সত্য না-ও হতে পারে। খবরের মাধ্যম ও উৎসের খোঁজ নিলাম। জানতে পারলাম, করাচি থেকে কেউ একজন এইমাত্র এসেছেন আর তিনি সংবাদটা বলেছেন। তারপর জানতে পারলাম, আমার বন্ধু ডক্টর ইসমাঈল মায়মানি এই আজই করাচি থেকে এসেছেন। তাকে খুঁজে বের করা হলো। সাক্ষাতের পর জানালেন, করাচি থেকে রওনার খানিক আগে তিনি সংবাদটা পেয়েছেন এবং রওনার আগেই তার সত্যায়নও করে এসেছেন। এবার সংশয়ের আর কোনো অবকাশ রইল না। পরে অন্যান্য মাধ্যম ও মাদরাসা সাওলাতিয়ার মাধ্যমে আরও সত্যায়ন পাওয়া গেল।

আমরা সবাই হতভম্ভ ও স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার শানের উপর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। মাওলানার ঈমানি ও দাওয়াতি শক্তি ও উন্নতি তুঙ্গে ছিল। তাঁর মহৎ প্রচেষ্টাগুলোর বৃক্ষ পত্র-পল্লবে ছেয়ে গিয়েছিল। জগতটাকে তিনি কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। ঠিক এমন সময় সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষী ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক এসে পড়ল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পরিচিতজনরা পরস্পর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছিল। রাবেতা আলমে ইসলামীর কেন্দ্রে খবর পৌঁছল। শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায (রাবেতার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জামেয়া ইসলামিয়ার উপাচার্য) ও শায়খ মুহাম্মাদ সুরুর আস-সাব্বান (রাবেতার রেজিস্ট্রারার) বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুবাদে আমার কাছে শোক জানালেন।

মাওলানার জীবনীর (সংকলক স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ ছানী) ভূমিকায় আমি লিখেছি :

'ইসলামি বিশ্বের ব্যাপারে ব্যাপক জানাশোনার উপর ভিত্তি করে আমি এ কথা বলার সাহস করতে পারি যে, ঈমান বিল গায়েব-এর দাওয়াতের নিমগ্নতা ও ক্রিয়ার ব্যাপকতা ও শক্তিতে আমি এ যুগে মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের কোনো সমকক্ষ ও বিকল্প দেখিনি। তাঁর এই ঈমানি দাওয়াত যেসব ফলাফল সৃষ্টি করেছে, যা করতে আমাদের 'ভারসাম্যপূর্ণ' দাওয়াতগুলো (সমকালীন যুগের বাস্তবতার উপর যাদের দৃষ্টি আছে) অক্ষম।'

রাবেতার সম্মেলন

সৌভাগ্যক্রমে সে-বছরই কাশ্মিরের সিংহ শেখ আবদুল্লাহ হজে এসেছিলেন। রাবেতা তাঁকেও আমন্ত্রণ জানাল এবং তিনিও সম্মেলনে যোগ দিলেন।[১] ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব উছমানি (যিনি রাবেতার পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন), আলহাজ মুহাম্মাদ সালীম সাহেব, দিল্লি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার নুরুদ্দীন ও কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক মৌলভী সাইয়িদ সাহেব বরকতি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

এ সম্মেলনে আমি নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী, সেদেশের ঈমানদার নেতা ও দীনি দাঈ আহমাদ উবল্লুকে কাছে থেকে দেখেছি এবং ইংরেজিতে প্রদত্ত ঈমানদীপ্ত ভাষণ শুনেছি। ভাষণে তিনি পরিষ্কার ভাষায় আরব জাতীয়তার সমালোচনা করেছেন। বাদশাহ ফয়সাল সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন

---

১. এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। শেখ আবদুল্লাহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে খুবই দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, যদি তিনি ভারত ফিরে যান, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে যাবেন। তাঁর এই বিশ্বাস অযৌক্তিক ছিল না। তাঁর খেয়াল ছিল, তিনি ইউরোপেরই কোথাও অবস্থান করে মামলা চালাবেন। আমি বললাম, শেখ সাহেব! এটা আপনার বিরাট ভুল হবে। আমার অভিজ্ঞতা হলো, যিনি দেশ ছেড়েছেন, তিনি আজীবনের জন্য গেছেন। আপনি গ্রেফতার হয়ে যাবেন বটে; কিন্তু থাকবেন না। তিনি বললেন, আপনি এসতেখারা করে বলুন। আমি এসতেখারা করলাম এবং তারপরও তাকে একই পরামর্শ দিলাম। তিনি ভারত ফিরে এলেন এবং আসামাত্র গ্রেফতার হয়ে গেলেন। কিন্তু অবশেষে ভারত সরকার তাঁকে ছাড়তে বাধ্য হলো এবং তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি সবসম্মতিক্রমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।

ও সভাপতিত্ব করেন। পরের অধিবেশনগুলোর সভাপতিত্ব করেন ও নেতৃত্ব দেন যুবরাজ ফাহাদ। এ সম্মেলনে পাঠ করার জন্য আমি নিবন্ধ প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, যার শিরোনাম ও প্রাণ ছিল 'ইসলামি জীবনের নির্ভুল নমুনা উপস্থাপন করা, "আল-বালাদুল আমীন" (নিরাপদ নগরী)-এর দায়িত্ব এবং তাকে প্রতিটি যুগে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা আবশ্যক।' এই নিবন্ধটি আমি তাড়াহুড়ার মধ্যে বাহরাইনের বিমানবন্দরে বসে লিখিয়েছি, যেখানে পুরোটা দিন বসে-বসে বিমানের অপেক্ষায় কাটাতে হয়েছিল। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে নিবন্ধটি নিজে পাঠ করতে পারছিলাম না। আমার অনুরোধে 'জামাতে আবদুর রহমান' (লেবানন)-এর প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ ওমর আদ-দাউক সেটি পড়ে শোনান।

সঙ্গী ও সহযোগী হিসেবে এ সফরে মৌলভী মুঈনুল্লাহ সাহেব নদবি আমার সাথে ছিলেন। সফর হয়েছে করাচি ও বাহরাইনের পথে। হজ ও সম্মেলন থেকে অবসর হয়ে মদিনা তাইয়িবায় হাজিরি ও জামেয়ার মজলিসে শূরার বৈঠকে যোগদান করি।

ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল জলীল ফরীদি

মজলিসে মুশাওয়ারাত প্রতিষ্ঠার পর যখন মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মপরিচয় ও দেশের সর্বজনীন স্বার্থের পক্ষে কাজ করার একটি নতুন যুগ শুরু হয়ে গেল, তখন ডাক্তার মুহাম্মাদ আবদুল জলীল ফরীদি সাহেবের সাথে – যিনি আমাদের শহরের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব, একজন নামকরা ও সফল ডাক্তার এবং একজন সাহসী ও নিঃস্বার্থ জাতীয় কর্মী ছিলেন – আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বেড়ে গেল। এর প্রধান কারণ ছিল তাঁর ভদ্রতা, ধার্মিকতা ও আমার প্রতি তাঁর সুধারণা। তিনি আমার যত কাছে আসতে থাকলেন, তাঁর সঙ্গে আমার যত বেশি মেলামেশা হতে লাগল, তাঁর গুণাবলি, চিন্তাগত ও আমলি যোগ্যতাসমূহ তত বেশি উজ্জ্বল হয়ে আমার সম্মুখে ভেসে উঠতে লাগল। আমি জানতে পারলাম, লাখনৌই শুধু নন; গোটা প্রদেশেই তিনি একজন সর্বজনস্বীকৃত ও সফল ডাক্তার, যার বক্ষব্যাধির চিকিৎসায় আছে বিশেষ দক্ষতা। কিন্তু খোদ তিনি জাতির দরদ ও তার জন্য মাত্রাতিরিক্ত চিন্তার রোগের রোগী। 'পুরানে চেরাগ' (প্রাচীন প্রদীপ)-এ তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছি :

> 'আমার সীমিত জ্ঞানে ডাক্তার মরহুম মুখতার আহমাদ আনসারির পর কোনো মুসলিম নেতা দেশ ও জাতির জন্য

> নিজের পেশার এত বড় কুরবানি দেননি। না এরূপ অকুণ্ঠ মনে নিজের সময় ও পেশাকে এ পথে ব্যয় করেছেন, যেভাবে ডাক্তার সাহেব করেছেন।'

তাঁর সম্পর্কে আমি একথাও লিখেছি যে, 'তিনি শতবার ভুল করতে পারেন; কিন্তু একটিবারও বিকাতে পারেন না।' আমাকে উদ্দেশ করে তিনি বারবারই বলতেন, তিনি আমার কথায় এ-ময়দানে এসেছেন এবং আমি একথা ভেবে সবসময় তাঁকে সাহস ও শক্তি জোগানোর চেষ্টা করেছি যে, তাঁর মতো সাহস ও নিঃস্বার্থতার কোনো বিকল্প তাঁর স্তর ও মানের লোকদের মাঝে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গতা ও সহযোগিতা করার মতো লোকের অভাবের অনুভূতি তাঁর তীব্রভাবে ছিল। কয়েকবারই তিনি আমাকে বলেছেন,' এবার অনুমতি দিন, আমিও রাজনীতির মাঠ ছেড়ে নিজের চিকিৎসালয় ও আপন পেশায় ফিরে যাই। আমি জানতাম, মুখে বললেও ডাক্তার সাহেব নিজেও কাজটা করতে পারবেন না। এই অঙ্গন ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, তাঁর ও জাতীয় রাজনীতির কাহিনীটা হলো সাঁতারু আর ভল্লুকের কাহিনীর মতো। তদুপরি তাঁর কোনো বিকল্পও ছিল না। সেজন্য আমিও সান্ত্বনা আর সাহস জোগানোর মতো কিছু কথা বলে চুপ হয়ে যেতাম আর তিনিও এই ময়দানে হাত-পা ছুড়তে থাকতেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এলে সঙ্গে-সঙ্গে রায়বেরেলির বাড়িতে আমার কাছে চলে আসতেন। সে-সময় রাস্তাও ছিল না। সেজন্য কাঁচা মেঠো পথে মোটরে করে আসতে তাঁর অনেক কষ্ট করতে হতো; যদিও এই কাঁচা রাস্তা সেই উঁচু-নিচু ও দুর্গম পথের তুলনায় গনিমত ছিল, যার উপর তিনি রাজনীতি গাড়ি চালাতেন। ১৯৬৯ সালের লন্ডন সফরে তিনি চোখের ব্যাপারে ডাক্তারি পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাকে বিরাট সহযোগিতা করেছেন। অবেশষে ১৯৭৪ সালের ১৪ মে মহান আল্লাহর ডাকে লাব্বাইক বলে তিনি পরপারে চলে গেছেন। আমি মদিনায় বসে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনি।

চোখের ব্যথা ও বারবার হাসপাতালে ভর্তি

আমি 'দীনি শিক্ষা কাউন্সিল'-এর পক্ষ থেকে পশ্চিম ইউ.পির এক সফরে ছিলাম। প্রচণ্ড গরম ছিল। লু চলছিল। বাসযোগে সফর ছিল এবং একাধিক জায়গায় কয়েক ঘণ্টা করে দুপুরের গরমের মধ্যে থামতে ও অপেক্ষা করতে হলো। ১৯৬৫ সালের ২২ জুন মিরাঠের কর্মসূচি ছিল। আমি রাতে এক জনসভায় ভাষণ দিলাম। পরে অবস্থানস্থলে এসে শুয়ে পড়লাম। ফজরের

আগে চোখ খুললে অনুভব করলাম, বাঁ চোখের (যে-চোখে অপারেশন হয়েছিল) দৃষ্টিশক্তি একদম চলে যাচ্ছে। মনের উপর প্রচণ্ড একটা চাপ পড়ল। মিরাঠ থেকে দারুল উলূমের মজলিসে শূরায় যোগদানের জন্য যাওয়ার কথা ছিল। আমি গেলাম এবং এক দিন মিটিং-এ যোগ দিয়ে মুহতামিম সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সাহারানপুর এসে পড়লাম। শায়খ সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে লাখনৌ যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। লাখনৌ এসে ২৬ জুন ১৯৬৫ সিতাপুরের বিখ্যাত চক্ষুহাসপাতালে ভর্তি হলাম। জানতে পারলাম, হেমরেজ (রক্তক্ষরণ) হয়েছে। ডাক্তারগণ – যারা পরম যত্নের সাথে চিকিৎসা করছিলেন এবং যাদের মাঝে ডাক্তার পাওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে ফেললেন এবং ১৪ আগস্ট ছুটি দিয়ে দিলেন।

আমি আমার ঠিকানায় ফিরে এসে জ্ঞানচর্চা ও লেখানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সে-সময়েই 'মজলিসে মুশাওয়ারাত'-এর এক বিশেষ বৈঠকের জন্য – যেটি ডাক্তার ফরীদি সাহেবের বাড়িতে চলছিল এবং যেখানে ডাক্তার সাইয়িদ মাহমুদ সাহেব ও মজলিস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন – একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। আমার অসহনীয় সর্দি ছিল। আমি দ্রুত সুস্থতা লাভের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ঔষধ সেবন করে নিবন্ধটি লিখিয়ে ফেললাম। কিন্তু বোধহয় তারই প্রতিক্রিয়া হবে যে, দিনচারেক পরই (৬ ডিসেম্বর ১৯৬৫) সেই চোখটির উপর গ্লুকোমার প্রচণ্ড আক্রমণ হলো। পরদিনই (৭ ডিসেম্বর ১৯৬৫) আবারো সিতাপুর হাসপাতালে ভর্তি হলাম। সেখানে আমার চোখের অপারেশন হলো। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া গেল না।

এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ও একরকম জীবনমৃত্যুর টানা-হেঁচড়ার দিন ছিল। তীব্র ব্যথা সইতে না পেরে কয়েকবারই আমি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি, যদি এই অবস্থা অব্যাহত থাকা তোমার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে ঈমানের সঙ্গে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে যাও। আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন আমাকে অবশিষ্ট গোটা জীবন অন্ধ ও অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে কাটাতে হবে। তার উপর ব্যথার কষ্ট তো ভোগ করতেই হবে। আমার এই কষ্ট ও রোগের খবর শুনে-শুনে আমার দুর্বল মায়ের (যাঁর বয়স নব্বই ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং আমার প্রতি যাঁর মমতা স্বাভাবিক মাতৃস্নেহের চেয়েও খানিক বেশি ছিল) অবস্থা কেমন হতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। পরিবারের সদস্যবর্গ ও আত্মীয়-বন্ধুরা বিপুল সংখ্যায় আসতে থাকল এবং আমার অবস্থা দেখে বিষণ্ণ ও উৎকণ্ঠিত হতে লাগল।

কিন্তু কেউ কোনো সাহায্য করতে পারছিল না। এই অবস্থায় আম্মাজান, বোনেরা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ ও আত্মীয়-বন্ধুরা ছাড়া আরও যাঁরা ব্যাকুল মনে দিনরাত আমার সুস্থতার জন্য দু'আ করছিলেন, তাঁদের মাঝে শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব ও হযরত মাওলানা ওসিউদ্দীন সাহেব ফতেহপুরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিতাপুরের উভয়বারের অবস্থানের পুরোটা সময় – যার পরিধি প্রতিবার প্রায় আড়াই থেকে তিন মাস হয়েছিল – আমার, আমার সাথে অবস্থানকারী ও আমাকে দেখতে আসা লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা পুরোপুরি সিতাপুরের উকিল ভাই যফর আহমাদ সাহেব সিদ্দীকি করেছেন। এই পুরোটা ব্যয় তিনি করেছেন নিজের ক্ষেতের উৎপাদিত শস্য আর জমির আয় দ্বারা। আমি কদিন পর-পরই তাকে নিবেদন জানাতাম, এই ধারা অনেক ব্যাপক ও দীর্ঘ; এবার আপনি আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে দিন। উত্তরে তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতেন, ব্যস, একথাটি বলবেন না; এছাড়া আপনার অন্য যেকোনো আদেশ মানতে আমি রাজী আছি।

তিনি ছাড়া শ্রদ্ধেয় হাজী মুহাম্মাদ হুসাইন সাহেব বিসওয়ানি, তাঁর পুত্র স্নেহাস্পদ তাফাজ্জুল হুসাইন (যার পক্ষ থেকে আমার ঔষধ আসত), শ্রদ্ধেয় মুজতবা হুসাইন সাহেব আইউবি, এডভোকেট শেখ বুনিয়াদ হুসাইন সাহেব ও সিতাপুরের অন্যান্য বন্ধুরা আমার মনোরঞ্জন, আরাম পৌঁছানো ও সমবেদনা প্রকাশে একটা মুহূর্তও নষ্ট হতে দেননি। আমার সেবা ও সঙ্গদানে যারা দিনরাত এক পায়ে খাড়া ছিল, তাদের মাঝে স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ সাঈদ আফ্রিকি ও আলী আদম নদবি আফ্রিকি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাদের সবাইকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন।

অবশেষে সার্থক কোনো ফলাফল না দেখে ও মাওলানা অসিউল্লাহ ফতেহপুরির পরামর্শে প্রায় আড়াই মাস হাসপাতালে অবস্থান করে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাখনৌ ফিরে এলাম এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিলাম, যার ফলে আলহামদুলিল্লাহ ব্যথা ধীরে-ধীরে উপশম হতে লাগল।

সিতাপুর হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার পর নিজেকে একজন প্যারোলে মুক্ত কারাবন্দীর মতো মনে হতো লাগল। তাই ভাবলাম, এই সাময়িক স্বাধীনতা থেকে যত বেশি সম্ভব স্বার্থ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলা দরকার। এই ভাবনা আমার অনেক উপকার করেছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আমি জরুরি কাজগুলো সম্পন্ন করলাম। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো আমার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'আল-আরকানুল আরবাআ'র রচনার

কাজ, হাসপাতাল অবস্থানের দিনগুলোতে যার তাগাদা তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম। আরেকটি হলো, পিতাজির গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'জান্নাতুল মাশরিক'-এর বিন্যাস ও সমাপ্তকরণ, যেটি পরে দায়েরাতুল মাআরিফ থেকে الهند فى العهد الاسلامى নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া 'নুযহাতুল খাওয়াতির' অষ্টম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করা এবং ফাঁকে-ফাঁকে শূন্য রেখে যাওয়া জায়গাগুলো পূরণ করার কাজগুলোও এ সময়ে সম্পন্ন করেছি।

আমার চোখের এই অক্ষমতা ১৯৭৮ সালের ১লা জুলাইয়ের সে-সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যখন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় আল্লাহর ফজলে আমার ডান চোখের সফল অপারেশন হয়। তার পর থেকে আমি সরাসরি পড়ালেখা করার যোগ্য হয়ে যাই। তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল, আমি পুনর্জীবন লাভ করেছি। আমি জীবনের স্বাদ ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।[১] অক্ষমতার এ-সময়টিতে আমার কয়েক ডজন দেশি ও বিদেশি সফর হয়েছে, যেগুলোতে আমি সীমাহীন কষ্টের সম্মুখিন হতাম। অনেক সময় আমাকে লজ্জিতও হতে হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে হেফাযত করেছেন। অবশেষে একদিন আমার এই অর্ধ অন্ধত্ব ও অক্ষমতার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

— প্রথম খণ্ড সমাপ্ত —

১. কুদরতের কারিশমা দেখুন, চৌদ্দ বছরের এই চোখের সমস্যার মধ্যে — যখন একটা চিঠি লেখা আর কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়াও আমার পক্ষে দুষ্কর ছিল — আমার বেশ কটি রচনা — যেগুলোর জন্য সূত্রগ্রন্থের পাতা উলটানোর খুব প্রয়োজন পড়ত — অস্তিত্বে এসেছে।

এ লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহ

০১। মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?
০২। সীরাতে সাইয়িদ আহমেদ শাহীদ রহ. (১ম-২য়)
০৩। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম-৭ম) খণ্ড
০৪। কারওয়ানে জিন্দেগী (১ম-৭ম) খণ্ড
০৫। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)
০৬। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র)
০৭। তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান
০৮। হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)
০৯। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ ফেসানী
১০। ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান
১১। ইসলাম ঃ ধর্ম, সমাজ সংস্কৃতি
১২। সীরাতে রসূল আকরাম (সা.)
১৩। হযরত আলী-এর জীবন ও খিলাফত
১৪। নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
১৫। ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী
১৬। ইসলামী জীবন বিধান
১৭। সালাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৮। সিয়াম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৯। হজ্ব : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২০। যাকাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২১। আরকানে আরবা'আ
২২। ছোটদের আলী মিয়া
২৩। ঈমান যখন জাগলো
২৪। কারওয়ানে মদীনা
২৫। প্রাচ্যের উপহার
২৬। বিধ্বস্ত মানবতা
২৭। আমার আম্মা
২৭। আমার আব্বা
২৮। নয়া খুন
২৯। নবীয়ে রহমত
৩০। পুরানো চেরাগ (১ম-৩য়) খণ্ড
৩১। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
৩২। বিশ্ব সভ্যতায় রসূল আকরাম (সা.)
৩৩। হযরত আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)
৩৪। মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণা মূলক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৮২২-৮০৬১৬৩; ০১৭২৮-৫৯৮৪৪০